বাল্মীকীয় রামায়ণ ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* উপলব্ধ বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা শাখার অধীনে পিএইচ্.ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণানিবন্ধ

গবেষক :

কৌশিক সরকার

পঞ্জিকরণ সংখ্যা : A00SA0500519

বর্ষ : ২০১৯-২০২০

তত্ত্বাবধায়ক :

ড. চিন্ময় মণ্ডল

সহযোগী অধ্যাপক

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২৪

Vālmīkīya Rāmāyaṇa o *Vaiyāsika Mahābhārate* Upalabdha Vikr̥tendriya Vyaktivarger(a) Pārivārik(a), Sāmājik(a) o Rājanaitik(a) Avasthān(a)

A thesis submitted to the Faculty of Arts of Jadavpur University in partial fulfilment for the Award of the Degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

in

SANSKRIT

By

Kaushik Sarkar

Registration No. : A00SA0500519

Session : 2019-2020

Under the Supervision of

Dr. Chinmay Mandal

Associate Professor

Department of Sanskrit

Jadavpur University

Department of Sanskrit

Jadavpur University

Kolkata

2024

Certified that the Thesis entitled

"বাল্মীকীয় রামায়ণ ও বৈয়াসিক মহাভারতে উপলব্ধ বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান" [*Vālmīkīya Rāmāyaṇa* o *Vaiyāsika Mahābhārate* **Upalabdha Vikṛtendriya Vyaktivarger(a) Pārivārik(a), Sāmājik(a) o Rājanaitik(a) Avasthān(a)**] submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of **Dr. Chinmay Mandal, Associate Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University** and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor : Chinmay Mandal

Dated : 23.12.2024

Associate Professor
Department of Sanskrit
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Candidate : Kaushik Sarkar

Dated : 23.12.2024

Declaration

I do hereby declare that the thesis entitled ***“বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* উপলব্ধ বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান” [*Vālmīkīya Rāmāyaṇa* o *Vaiyāsika Mahābhārate* Upalabdha Vikr̥tendriya Vyaktivarger(a) Pārivārik(a), Sāmājik(a) o Rājanaitik(a) Avasthān(a)]** being submitted in partial fulfilment for the award of the degree of **Doctor of Philosophy** in **Sanskrit** under the guidance and supervision of **Dr. Chinmay Mandal,** Associate Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University, Kolkata, is an original research work carried out by me. It has not been submitted before and published elsewhere for any degree or diploma. Any help or source of information, which has been availed in this connection, is duly acknowledged.

Date : (Kaushik Sarkar)

নিবেদন

সদাশিবসমারম্ভাং শঙ্করাচার্যমধ্যমাম্।
অস্মদাচার্যপর্যন্তাং বন্দে গুরুপরম্পরাম্।।

বাল্মীকীয় রামায়ণ **ও** ***বৈয়াসিক মহাভারতে*** **উপলব্ধ বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান** নামাঙ্কিত বিষয়কে আশ্রয় করে বহু আয়াসসিদ্ধ গবেষণা কর্মের সমাপ্তিলগ্নে গবেষণা-সন্দর্ভের বিষয়ে যাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য ব্যতিরেকে এই মহৎ কর্মের স্বার্থক পরিণতি সম্ভব ছিল না, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

গবেষণা-কর্মের এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যাঁর সহযোগিতায় আমি গবেষণা-নিবন্ধটি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছি, তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. চিন্ময় মণ্ডল মহাশয়। তিনি তাঁর বহু-কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়েও আমাকে গবেষণা-কার্যের বিষয়-নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ, গবেষণা-নিবন্ধের আদ্যোপান্ত পর্যবেক্ষণ ও সক্রিয় দিগ্-নিদর্শন সর্বদা করে গেছেন। অধ্যাপক মহাশয়ের উপদেশ এবং তাঁর শুভাশীর্বাদ শীরোধার্য করেই দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে আজ আমি গবেষণা-নিবন্ধটি উপস্থাপন করার সমর্থ হয়েছি। তাঁর পূর্ণসাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে গবেষণা-নিবন্ধটির বাস্তবরূপ দেওয়া অসম্ভব ছিল। এছাড়াও ব্যক্তিজীবনে অধ্যাপক মহাশয়ের নানান উপদেশ ও সাহায্য আমাকে পথ চলতে সক্ষম করেছে। তাই অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। অধ্যাপক মহাশয়ের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সর্বপ্রথম আমি তাঁকে প্রণাম ও চিরকৃতজ্ঞতা জানাই।

কৃতজ্ঞতা জানাই এই গবেষণা-কর্মের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য দুই প্রথিতযশা অধ্যাপিকা ও এক অধ্যাপককে। প্রথমেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা ড. দেবার্চনা সরকার ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা ও বিভাগীয় প্রধান ড. মনিদীপা দাস মহাশয়াকে সশ্রদ্ধ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ষাণ্মাসিক প্রতিবেদনে আমার অগ্রগতি তাঁদের মূল্যবান উপদেশের দ্বারা সাধিত হয়েছে। এছাড়াও প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই উপদেষ্টা কমিটির অন্যতম সদস্য ড. মুক্তিপদ সিনহা মহাশয়কে। তাঁর বিভিন্ন উপদেশ আমার গবেষণা-কর্মে পাথেয় হয়েছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও কাব্যশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ ব্যানার্জী মহাশয়কে আমি শ্রদ্ধা, প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন উপদেশমূলক তথ্য আমার গবেষণা-কর্মে পাথেয় হয়েছে।

গবেষণা-সন্দর্ভের বিষয়ে অপর একজনের উদ্দেশ্যে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা আশু প্রয়োজন, তিনি হলেন বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও প্রাক্তন প্রধান বৈয়াকরণ-কেশরী ড. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তিনি সর্বদা আমার গবেষণা কর্মের বিষয়ে চিন্তান্বিত ছিলেন। তাঁর চরণযুগলে জানাই প্রণামাঞ্জলি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধান ড. মনোজিৎ মণ্ডল মহাশয়কেও আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর অনুপ্রেরণা ছাড়া আমার গবেষণা-কার্যে পদার্পণ করা সম্ভবপর ছিল না। তিনি গবেষণা বিষয়ে আমাকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছেন। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্রের প্রথিতযশা অধ্যাপক ড. হার্দিক ব্রত বিশ্বাস মহাশয়ের কাছেও তথ্যানুসন্ধান বিষয়ে কয়েকবার সাহায্য পেয়েছি। তাঁকেও জানাই প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিশিষ্ট অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণের কাছে পাঠ গ্রহণ করে এই বিভাগে গবেষণা-কর্মে সুযোগ পাওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। বিভাগের সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকার উদ্দেশ্যে প্রণামাঞ্জলি ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গবেষণা-নিবন্ধে উল্লিখিত চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কিত বিবিধ ঔষধ ও সেই সম্পর্কিত গ্রন্থের অনুসন্ধানের নিমিত্ত কয়েকজন সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন— ডঃ আকাশ দাশগুপ্ত, ডঃ কুন্তল চক্রবর্তী, ডঃ অমিত ভৌমিক, ডঃ অভিজিৎ রায়, ডঃ দীপ্তাংশু দাস, ডঃ তথাগত চ্যাটার্জি, ডঃ আর. এ. আলম, ডঃ উত্তম হালদার, ডঃ ঋতব্রত চ্যাটার্জি প্রমুখ এলোপ্যাথিক ও ডঃ তন্ময় সূত্রধর, ডঃ শক্তিপদ চ্যাটার্জি প্রমুখ হমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। তাঁদের সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

এই মহৎ কর্মের অন্তরালে আমার পূর্বপুরুষদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ রয়েছে। যাঁদের আশীর্বাদ ব্যতিরেকে কোনভাবে এই গবেষণা-কর্ম সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হত না, তাঁরা হলেন আমার জন্ম, কর্ম

ও জ্ঞানদাতা পিতা শ্রী কার্তিক সরকার ও মাতা শ্রীমতী চন্দনা দাস সরকার। তাঁদের স্বপ্ন সফল করতে এই প্রয়াস। যাঁদের অনুপ্রেরণা ছাড়া আমার এই মহানগরীতে পড়াশুনা ও গবেষণা-কার্যে মনোনিবেশ করা অসম্ভব ছিল। তাঁদের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণা-কর্মের বিষয়ে অপর একজনের অবদান অনস্বীকার্য, তিনি হলেন আমার সহধর্মিণী সঞ্চারী সরকার। তার সাহায্য ও নিরন্তর উৎসাহ ব্যতিরেক গবেষণা-কর্ম সুসম্পন্ন হত না। সর্বোপরি আমার পিতৃকুল, শ্বশুরকুল ও সুহৃদকুলের সকলে অহরহ উৎসাহ দিয়ে গবেষণার কাজকে ত্বরান্বিত করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই।

এই শুভক্ষণে বিদ্যালয় জীবনের কয়েকজন শিক্ষাগুরুকে স্মরণ করছি। যাঁদের সুশিক্ষা ও সহযোগিতায় আমি উচ্চশিক্ষার দ্বারে পৌঁছতে পেরেছি।

কর্মক্ষেত্র বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ের সকল সহকর্মির সহমর্মিতা জন্য সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আমার সহকর্মিবৃন্দ, যাঁরা আমার গবেষণার নিমিত্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কারণে মহাবিদ্যালয়ে আমার দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার কৃতজ্ঞতা রইল।

গবেষণার কাজে যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাশে পেয়েছি, তাঁরা হলেন অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক চিন্ময় মিশ্র, অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্র নাথ বর, ড. বিষ্ণু চন্দ্র বর্মন, উৎপল মণ্ডল, মনোজ কর্মকার, অঞ্জন দাস, নিলাদ্রি ঘড়া, অরুপ ঘোষ ও ভাতৃ-প্রতিম, রূপম সরকার, দেবাশীষ নস্কর, রানু মণ্ডল, মমতা বাঁক, রাহুল কুণ্ডু, প্রিয়াঙ্কা সরদার, মিঠুন মণ্ডল ও সুদীপ সরদার। সকলকে আমার সবিনয় শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ্.ডি. সেল ও রিসার্চ সেকশনের নিকট আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এই কয়েক বছরে তাঁদের সাহায্য পেয়েছি।

এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সংস্কৃত বিভাগের গ্রন্থাগার’, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার’, ‘সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগার’, ‘গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট্ অব্ কালচার’, ‘দি এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার’ এবং ‘বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার’ থেকে তথ্য আহরণ করে আমার গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে। অতএব উক্ত সকল গ্রন্থাগারের আধিকারিক ও কর্মচারিবৃন্দকে তথ্য পরিবেশনের নিমিত্ত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

করছি। গবেষণা সন্দর্ভটির গ্রন্থরূপ দানে সহযোগিতার নিমিত্ত ধর ব্রাদার্স- এর আধিকারিকদেরকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সর্বশেষে বলি এই গবেষণা-নিবন্ধটি সুসম্পন্ন করতে একনিষ্ঠ শ্রম ও গভীর মনোনিবেশের কোন কার্পর্ণ্য করিনি। গভীর আয়াসসাধ্য গবেষণা-কর্মের অল্প ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকলে, তার জন্য আমি বিদ্বজনের নিকট ক্ষমাসুলভ দৃষ্টি প্রার্থনা করছি। গবেষণা সন্দর্ভটি পরবর্তী গবেষক ও গবেষিকার নিকট যদি কোনভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, তাহলে নিজের শ্রমকে সার্থক মনে করব।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কোলকাতা- ৭০০০৩২

বিনয়াবনত —
শ্রী কৌশিক সরকার

সূচিপত্র

সূচিপত্র
(Index)

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	**১-৯**
প্রথম অধ্যায় : ১.০. বিকৃতেন্দ্রিয় শব্দের আভিধানিক অর্থ, লক্ষণ ও স্বরূপ নিরূপণ	**১০-৫৪**
১.১. বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের আভিধানিক অর্থ	১০-১৪
১.২. জন্মসূত্রে বিকৃতেন্দ্রিয় হওয়ার কারণ	১৪-২১
১.৩. বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের স্বরূপ নিরূপণ	২১-৫০
দ্বিতীয় অধ্যায় : ২.০. *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* প্রতিফলিত বিকৃতেন্দ্রিয়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	**৫৫-১২৬**
২.১.বাল্মীকীয় রামায়ণের বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রসমূহ	৫৫
২.১.১. ঋষ্যশৃঙ্গ	৫৫-৬০
২.১.২. অন্ধকমুনি	৬০-৬২
২.১.৩. কুশনাভের শতকন্যা	৬৩-৬৮
২.১.৪. মন্থরা	৬৮-৭৫
২.১.৫. বৈশ্রবণ বা কুবের	৭৫-৮০
২.১.৬. শূর্পণখা	৮০-৮৪
২.২. বৈয়াসিক মহাভারতে চরিত্রসমূহ	৮৪-৮৫
২.২.১. ধৃতরাষ্ট্র	৮৫-৯২
২.২.২. দীর্ঘতমস্	৯২-৯৮
২.২.৩. অরুণ	৯৮-১০০

২.২.৪. অষ্টাবক্র ১০০-১০৪

২.২.৫. দ্যুমৎসেন ১০৪-১০৮

২.২.৬. উপমন্যু ১০৮-১১১

২.২.৭. পৌষ্য ১১১-১১৪

২.২.৮. একলব্য ১১৪-১১৭

২.২.৯. শকুনি ১১৭-১১৯

তৃতীয় অধ্যায় : ৩.০. বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ১২৭-২৫২

৩.১. পরিবারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিরূপণ ১২৭-১৩১

৩.১.১. বাল্মীকীয় রামায়ণে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক অবস্থান ১৩১-১৪৩

৩.১.২. বৈয়াসিক মহাভারতে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক অবস্থান ১৪৩-১৬৬

৩.২. সমাজের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিরূপণ ১৬৬-১৬৯

৩.২.১. বাল্মীকীয় রামায়ণে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বর্ণনা ১৬৯-১৭২

৩.২.২. বৈয়াসিক মহাভারতে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বর্ণনা ১৭২-১৭৮

৩.৩. গার্হস্থ্যদশা ১৭৮-১৮০

৩.৩.১. বাল্মীকীয় রামায়ণ ও বৈয়াসিক মহাভারতে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের উপর্যুক্ত বিবাহের বর্ণনা ১৮০-১৯২

৩.৩.২. পুত্রোৎপত্তি ও তার শ্রেণীবিভাগ ১৯২-১৯৪

৩.৩.২.১. বাল্মীকীয় রামায়ণ ও বৈয়াসিক মহাভারতে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পুত্রোৎপত্তি বর্ণনা ১৯৪-২০৩

৩.৪. বানপ্রস্থদশা ২০৩

৩.৪.১. বাল্মীকীয় রামায়ণ ও বৈয়াসিক মহাভারতে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের বানপ্রস্থদশা বর্ণনা ২০৩-২০৬

৩.৫. সন্ন্যাসদশা ২০৬

৩.৫.১. বাল্মীকীয় রামায়ণ ও বৈয়াসিক মহাভারতে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের সন্ন্যাসদশা বর্ণনা ২০৬-২০৮

৩.৬. বাল্মীকীয় রামায়ণ ও বৈয়াসিক মহাভারতে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের বিবিধ সংস্কারবিধি বর্ণনা ২০৮-২১৪

৩.৭. বিকৃতেন্দ্রিয়দিগের রাজনৈতিক অবস্থান ২১৪-২৪৩

চতুর্থ অধ্যায় : ৪.০. সাংবিধানিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক পর্যালোচনা ২৫৩-৩৪১

৪.১. বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের অধিকার সুরক্ষায় স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত বিধানসমূহ ও তার প্রতিফলন ২৫৪-২৫৬

৪.১.১. মনুষ্যের ন্যায় অক্ষম কোন প্রাণীকে দিয়ে ভার বহন বা যানকার্যে ব্যবহার শাস্ত্রনিষিদ্ধ ২৫৬

৪.১.২. বিবিধ বিকৃতেন্দ্রিয় বংশে পুরুষ ও কন্যার বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ ২৫৬-২৫৮

৪.১.৩. বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের মন্ত্রণাস্থানে অপসারণের বিধি ২৫৮-২৫৯

৪.১.৪. বিকলাঙ্গ বা অসুস্থ রাজার অনুপস্থিতে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বপ্রণালী ২৫৯

৪.১.৫. বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রতি কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া করলে রাষ্ট্রকর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্তির বিধান ২৫৯-২৬০

৪.১.৬. পিতার ধনসম্পত্তির উপর বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের গ্রাসাচ্ছাদনের বিধান ২৬০

৪.১.৭. বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রতি রাজার শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য ২৬০-২৬১

৪.১.৮. বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের গুপ্তচররূপে বিজিগীষু রাজা কর্তৃক নিয়োগ ২৬১-২৬২

৪.১.৯. অপরাধী বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রতি বিজিগীষু রাজা কর্তৃক শারীরিক দণ্ডবিধি ২৬২-২৬৩

৪.১.১০. বিকলাঙ্গ ব্যক্তির প্রতি অস্ত্রবিদ্যাসংক্রান্ত বিধি ২৬৩

৪.১.১১. উপার্জনে অক্ষম বিকলাঙ্গ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকতে সাংসারিক দায়িত্বরক্ষণে কনিষ্ঠ ভ্রাতার কর্তব্য সম্পর্কিত বিধান ২৬৩-২৬৪

৪.২. বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের অধিকার সুরক্ষায় ভারতীয় সংবিধানের বিধানসমূহ ২৬৫-২৭৩

৪.৩. বিকৃতেন্দ্রিয়ত্বের অন্তরালে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বান্বেষণ ও এবিষয়ে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি ২৭৩-৩৩২

পঞ্চম অধ্যায় : ৫.০. প্রাচীন ও বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের বিশেষাধিকার (Privileges) সমূহ ৩৪২-৩৯৬

৫.১. প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের নিরিখে (মনুসংহিতা ও অর্থশাস্ত্র) বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি বিশেষ ব্যবস্থা ৩৪৩-৩৪৪

৫.১.১. বিকলাঙ্গ ব্যক্তি কর্তৃক নিজ ভার্যার রক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাগ্রহণ ৩৪৪

৫.১.২. বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের জন্য শাস্ত্রসম্মত গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ৩৪৪-৩৪৫

৫.১.৩. বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের বিবাহ বিষয়ক ব্যবস্থাগ্রহণ ৩৪৫-৩৪৬

৫.১.৪. বিজিগীষু রাজা কর্তৃক বিকৃতেন্দ্রিয় গুপ্তচরের প্রতি বার্ষিক ভাতা ও অবসরভ্রাতা প্রদান ৩৪৬-৩৪৭

৫.১.৫. বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের কাছ থেকে বিজিগীষু রাজা কর্তৃক যেকোন যানবাহনে চলাফেরার জন্য শুল্ক ছাড়ের ব্যবস্থাগ্রহণ ৩৪৭-৩৪৮

৫.১.৬. বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের বিবিধ শিক্ষা-কর্ম বিষয়ক ব্যবস্থা ৩৪৮-৩৪৯

৫.২. বাল্মীকীয় রামায়ণ ও বৈয়াসিক মহাভারতে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ ৩৪৯-৩৫৭

৫.৩. বর্তমান সময়ে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ ৩৫৭-৩৫৮

৫.৩.১. দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার প্রতিকারমূলক বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা ৩৫৯-৩৬৯

৫.৩.২. দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ৩৬৯-৩৭০

৫.৩.৩. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য খেলাধূলা, শারীরিক ব্যায়াম এবং অবসর বিনোদনের ব্যবস্থাসমূহ ৩৭০-৩৭৪

৫.৪. শ্রবণ প্রতিবন্ধিতার প্রতিকারমূলক বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা ৩৭৪-৩৮২

৫.৫. শিক্ষাব্যবস্থা ৩৮২-৩৮৪

৫.৬. অস্থিগত প্রতিবন্ধকতার প্রতিকারমূলক বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা ৩৮৪-৩৮৫

৫.৭. মানসিক প্রতিবন্ধকতার প্রতিকারমূলক বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা ৩৮৫-৩৮৭

৫.৭.১. মানসিক প্রতিবন্ধিদের জন্য বিশেষ পাঠক্রম পদ্ধতি ৩৮৭-৩৮৮

৫.৭.২. মানসিক প্রতিবন্ধিদের বিশেষ শিক্ষাপ্রক্রিয়া ৩৮৯

৫.৭.৩. মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি বিদ্যালয় শিক্ষা ৩৮৯-৩৯২

উপসংহার **৩৯৭-৪০৭**

অনুশীলিত গ্রন্থপঞ্জি **৪০৮-৪১৮**

বর্ণানুক্রমিক শব্দসূচি **৪১৯**

সংকেতসূচী

সংকেতসূচী :
(Abbreviation)

অর্থশা.	=	*অর্থশাস্ত্র*
অনু.	=	অনুশাসনপর্ব
অযো.কা.	=	অযোধ্যাকাণ্ড
অ.কা.	=	অরণ্যকাণ্ড
অত্রি. সং.	=	*অত্রিসংহিতা*
আদি.	=	আদিকাণ্ড
আশ্র.	=	আশ্রমবাসিকপর্ব
আ.সং.	=	*আমাদের সংবিধান*
উ.কা.	=	উত্তরকাণ্ড
উত.	=	উত্তরতন্ত্র
ঊশ. সং	=	*ঊশনঃসংহিতা*
কর্ণ.	=	কর্ণরোগাধিকার
কাত্যা. সং.	=	*কাত্যায়নসংহিতা*
গো.গৃ.সু.	=	*গোভিলগৃহ্যসূত্র*
চরক.	=	*চরকসংহিতা*
জন.ভার.	=	*জনপ্রশাসন ও ভারতীয় প্রশাসন*
জৈ.সূ.	=	*জৈমিনি সূত্র*
তু.রা.শ.	=	*তুলনামূলক রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা*

দেবী. পু.	=	*দেবীভাগবত পুরাণ*
দি.জি.ডি.	=	*দি জিয়োগ্রাফিক্যাল ডিক্শেনারি অফ এনশিয়েণ্ট অ্যাণ্ড মেডিভ্যাল ইন্ডিয়া*
নি.স্থা.	=	নিদানস্থান
নেত্র.	=	নেত্ররোগাধিকার
পদ্ম.পু.	=	*পদ্ম পুরাণ*
পরা.সং.	=	*পরাশরসংহিতা*
পা.গৃ.সু.	=	*পারস্করগৃহ্যসূত্র*
পু.কো.	=	*পুরাণকোষ*
প্র্যাক.অ.মে.	=	*প্র্যাকটিস্ অফ মেডিসিন*
বন.	=	বনপর্ব্ব
ব.শব্দ.	=	*বঙ্গীয় শব্দকোষ*
বাত.	=	বাতব্যাধ্যধিকার
বা.পু.	=	*বায়ুপুরাণ*
বি.সং.	=	*বিষ্ণুসংহিতা*
বুদ্ধ.	=	*বুদ্ধচরিতম্*
বৃহৎ.উপ.	=	*বৃহদ্দারণ্যক উপনিষদ্*
ব্রহ্মাণ্ড.পু.	=	*ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্*
ব্যা.সং.	=	*ব্যাস সংহিতা*
ব্যাতি.	=	*ব্যাতিক্রমধর্মী শিশু*

ব্যাতি.শিশু.	=	*ব্যাতিক্রমধর্মী শিশু ও তার শিক্ষা*
ভাগ.	=	*ভাগবত পুরাণ*
ভৈ.র.	=	*ভৈষজ্য রত্নাবলী*
মহা.চ.প.	=	*মহাভারতের চরিত্র পরিচিতি*
মহা.প্রতি.	=	*মহাভারতের প্রতিনায়ক*
মহা.নী.অ.দু.	=	*মহাভারত নীতি-অনীতি-দুর্নীতি*
মনু.	=	*মনুসংহিতা*
মহা.	=	*মহাভারতম্*
মান.প্রতি.	=	*মানসিক প্রতিবন্ধিতা : জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানগত দিক*
মীমাং. সূ.	=	*মীমাংসাসূত্র*
মূর্চ্ছা.	=	মূর্চ্ছাধিকার
মৎ.পু.	=	*মৎস পুরাণ*
যা.সং.	=	*যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা*
রঘু.	=	*রঘুবংশম্*
রাজ.সমা.	=	*রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব*
রামা.	=	*রামায়ণম্*
শব্দ.	=	*শব্দকল্পদ্রুম্*
শান্তি.	=	শান্তিপর্ব্ব
শ্রীমদ্ভগ.	=	*শ্রীমদ্ভগবদগীতা*
ষ.দ.সমু.	=	*ষড়দর্শনসমুচ্চয়ম্*

সভা.	=	সভাপর্ব
স.শি.	=	*সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষা ও শিক্ষায় লিঙ্গ প্রসঙ্গ*
সমা.রূ.	=	*সমাজতত্ত্বের রূপরেখা*
সামা.রাজ.	=	*সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারণা ও বিচার্য বিষয়সমূহের রূপরেখা*
স্ক.পু	=	*স্কন্দপুরাণ*
সু.সং.	=	*সুশ্রুত সংহিতা*
হোমিও.চি.পরি.	=	*হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পরিচয়*
হোমিও.চি.বি.	=	*হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিধান*
A.G.V.I.F.S.	=	*A Guide to Visually Impaired Friendly Sport*
A.H.A.S.L.	=	*A History of Ancient Sanskrit Literature*
A.H.S.	=	*A Handbook of Sociology*
A.N.B.C.S.S.F.M.	=	*A Novel Blind Chessboard Support System (BCSS) Featuring Magnetorheological Elastomer Sensor*
A.S.L.E.W.	=	*American Sign Language the Easy Way*
Caraka.	=	*Caraka Saṃhitā*
C.A.B.C.V.I.	=	*Creating Audio Books for Children with Visual Impairment : The Collaborative Approach Leading to Virtual Learning*
C.M.G.L.D.	=	*Children with Mild General Learning Disabilities*
C.L.I.C.C.S.	=	*Constitutional Law of India a Critical Commentary with Supplement*
D.T.	=	*Different types-of-disabilities*
D.C.E.	=	*Disability Care and Education in 19th Century India : Some Dates, Places and Documentation*
D.D.I.	=	*Disability Development in India*

Di. Ri.	=	*Disability Rights (Rights of Persons with Disabilities Act & National Trust Act) and Mental Healthcare Act*
E.O.	=	*Epidemiology of otitis media in children*
E.I.A.S.T.	=	*Enhancing Independent Auditory and Speechreading Training*
F.S.	=	*Fundamental of Sociology*
G.H.L.	=	*Genetic Hearing Loss with no Associated Abnormalities : a Review Journal of Speech and Hearing Disorder*
G.N.B.	=	*Gods of Northern Buddhism*
H.I.L.	=	*History of Indian Literature*
H.P.	=	*Hindu Polytheism,*
H.L.C.	=	*Hearing Loss of Children*
Id.	=	*Idiocy : and its Treatment by the Physiological Method*
I.T.C.I.	=	*Introduction to The Constitution of India Ninth Edition*
I.M.L.	=	*Indian Myth and Legend*
I.P.T.	=	*Indian Political Thought*
Mahā.	=	*Mahābhārata*
M.A.B.P.S.	=	*Martial Arts for the Blind and Partially Sighted*
M.H.H.I.	=	*Mental Health and the Hearing Impaired*
Parāśa.	=	*Parāśara Saṃhitā*
P.D.H.M.	=	*Person with Disability in Hindu Mythology*
P.E.	=	*Puranic Encyclopedia : a comprehensive dictionary with special reference to the epic and Puranic literature*
P.T.S.C.D.	=	*Piaget's Theory and Stages of Cognitive Development*
P.I.S.I.	=	*Politics India the State-Society Interface*
P.O.M.	=	*Practice of Medicine*
P.M.R.I.	=	*Prediction of Mental Retardation in Infancy*

Rāmā.	=	*Rāmāyaṇa of Vālmīki*
Ṛgveda Saṁ	=	*Ṛgveda Saṁhitā*
S.I.A.	=	*Society : An Introductory Analysis*
S.C.P.B.C.	=	*Sighted Children's Perception of Blind Childrens*
S.T.P.G.P.E.E.	=	*Speech Training for Primary Grades Preliminary and Experimental Edition*
T.C.P.D.C.	=	*The Causes of Profound Deafness in Childhood*
T.C.B.C.	=	*The Causes of Blindness in Childhood : A study of 776 children with severe visual handicaps*
T.C.S.B.S.I.	=	*The Changing Status of the Blind from Separation to Integration*
T.C.I.S.	=	*The Constitution of India a Comparative Study*
T.M.R.C.	=	*The mentally retarded child : A Psychological approach*
T.P.S.	=	*The Psychology of Society*
T.M.V.I.	=	*Training Module on Visual Impairment*
U.T.C.A.B.	=	*Using The Cranmer Abacus for The Blind*
V.D.S.R.C.T.	=	*Validity of the Durrell Sullivan Reading Capacity Test*

ভূমিকা

ভূমিকা

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।।

যাঁর কৃপায় মূক অর্থাৎ বধির লোক বাগ্মী হয়ে ওঠেন এবং কোন পঙ্গু ব্যক্তি পাহাড় অতিক্রম করতে সক্ষম হন, সেই পরমানন্দ মাধবকে আমি সর্বদা বন্দনা করি। কারণ ঈশ্বরের কৃপা ব্যাতিরেক মনুষ্য তথা জীবজগতের পরিত্রাণ নেই। এই পৃথিবীতে মানুষ, জীব-জন্তু, প্রকৃতি প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে নানা বৈচিত্র। এমনকি একই প্রজাতির মানুষের মধ্যেও রয়েছে কতই না বৈচিত্র। বৈচিত্র বিরাজ করে যেকোন মানুষের স্বভাবে, মননে ও মানসিকতায়। আবার কখনও বা বৈচিত্র দেখা যায় মানুষের শারীরিক, মানসিক ও অভ্যন্তরীণ গঠনে। মানবসমাজের এক বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গ। সৃষ্টির আদিকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিকৃতেন্দ্রিয় মানুষের উপস্থিতি সমানভাবে লক্ষিত হয়। তাঁদের এই অঙ্গবৈকল্যের পিছনে রয়েছে নানা কারণ ও উপাখ্যান। বিকৃতেন্দ্রিয় মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন নিয়ে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। সেই প্রশ্ন থেকেই আলোচ্য গবেষণার সূত্রপাত ঘটেছে।

বিষয় নির্বাচনের তাৎপর্য্য : সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের দরবারে যে দুটি ভারতীয় মহাকাব্য যুগ যুগ ধরে বন্দিত হয়ে আছে, সে দুটি হল মহর্ষি বাল্মীকি প্রণিত *রামায়ণ* (সম্ভবতঃ ৩০০ খ্রীঃ পূঃ)[১] ও মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত *মহাভারত* (সম্ভবতঃ খ্রীঃপূঃ ৪০০- ৪০০ খ্রীঃ)।[২] ঋষি কবিদ্বয় দ্বারা রচিত বলে *রামায়ণ* ও *মহাভারতকে* বলা হয় আর্য মহাকাব্য। *রামায়ণ* ও *মহাভারত* মহাকাব্যে আমরা অনেক চরিত্র দেখতে পাই। এই চরিত্রগুলির মধ্যে কিছু মহত্বমণ্ডিত ও কিছু স্বল্পখ্যাত চরিত্রের সন্ধান আমরা পাই। এমন কিছু সংখ্যক মহত্বমণ্ডিত ও স্বল্পখ্যাত চরিত্র *রামায়ণ, মহাভারতে* আমরা দেখতে পাই, যাঁদের ক্ষণস্থায়ী বা চিরস্থায়ীভাবে অঙ্গের হানি বা আধিক্য হয়েছে। তাঁরা স্বাভাবিক মানুষের মতো কার্য সম্পাদনে সক্ষম নয়, সে অবস্থাটিকেই বোঝায় অঙ্গবিকার বা বিকৃতেন্দ্রিয়। অঙ্গবিকার বা বিকৃতেন্দ্রিয় বিষয়ে আচার্য পাণিনি বলেছেন- 'যেনাঙ্গবিকারঃ'[৩] অর্থাৎ 'যেনাঙ্গেন বিকৃতেনাঙ্গিনো বিকারো লক্ষ্যতে, ততঃ তৃতীয়া স্যাৎ'। অর্থাৎ সূত্রে 'যেন' পদের অর্থ যে অঙ্গের দ্বারা। অঙ্গবিকারঃ = অঙ্গস্য বিকারঃ অর্থাৎ যে অঙ্গের বিকৃতির

দ্বারা অঙ্গির বিকৃতি লক্ষিত হয়। এছাড়া পঙ্গু শব্দটি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গবাচী হয়ে থাকে। স্ত্রীলিঙ্গবাচী পঙ্গু শব্দ বিষয়ে পাণিনি বলেছেন— 'পঙ্গোশ্চ'[৪] অর্থাৎ পঙ্গু শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঊঙ্' প্রত্যয় হয়। যেমন- পঙ্গূঃ। এখানে 'পঙ্গূ' শব্দে নারী বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে।

এই সকল ব্যাক্তিগণের সামাজিক অধিকার পর্যালোচনা পূর্বে কীরূপ ছিল এবং তৎকালীন সমাজে এদের গুরুত্ব কতখানি ছিল, তা এই গবেষণা-সন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও এই গবেষণার বিষয়টি চয়ন করার পেছনে বর্তমানে শব্দের মাধুর্যও গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ এই গবেষণা নিবন্ধের নামকরণে 'বিকৃতেন্দ্রিয়' চয়ন করার পিছনে সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা অপরিমেয়। কারণ বর্তমানে সমাজে এই জাতীয় লোকদেরকে 'প্রতিবন্ধী' ও 'প্রতিস্পর্ধী' নামে অভিহিত করা হয়। যার আভিধানিক অর্থ হল বাধাজনক, ব্যাঘাত, বিঘ্নকারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবিশেষ। সুতরাং বর্তমানে এই জাতীয় ব্যক্তিদেরকে প্রতিবন্ধী ও প্রতিস্পর্ধী নামে অভিহিত করলে সমাজে তারা সর্বদা সাধারণ মানুষের ন্যায় সমতার সহিত অবস্থান না করে নিম্নেই অবস্থান করবে। এছাড়াও বর্তমানে বিবিধ যানবাহনে ও লোকস্থানে এইজাতীয় ব্যক্তিদের প্রতি বহুল প্রচলিত 'দিব্যাঙ্গ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই 'দিব্যাঙ্গ' শব্দের দ্বারা বলা হয়, যার দিব্য অঙ্গ রয়েছে অর্থাৎ ঈশ্বরের যেরূপ দিব্য অধিক বা কম অঙ্গ রয়েছে, তেমন অঙ্গ যাঁদের, তাঁরা দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি। তাদের যেকোন অঙ্গের হানি ঘটলে অথবা তাঁরা অসাধারণ বৌদ্ধিক, শারীরিক ক্ষমতার অধিকারী হলেও, সমাজে এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি 'দিব্যাঙ্গ' শব্দ অত্যন্ত অপমানজনক। কারণ বর্তমানে সকল মানুষ সমাজে সমতা বজায় রেখে বাঁচতে চায়। সেই হেতু কোন ব্যক্তির অঙ্গহানির ফলে, তাঁরা বিশেষ বিশেষ কর্ম করতে অসুবিধার সম্মুখীন হলেও, সমাজে সামগ্রিক অগ্রগতিতে তাঁদের বিশেষ বাধার সম্মুখীন কখনোই পড়তে হয় না। অতএব এই গবেষণা-সন্দর্ভ যেহেতু ভারতবর্ষের দুই প্রাচীন মহাকাব্যের আঙ্গিকে রচিত হয়েছে এবং মহাকাব্য দুটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়ার দরুণ এই জাতীয় ব্যক্তিবিশেষকে একত্রে 'বিকৃতেন্দ্রিয়' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ 'বিকৃতেন্দ্রিয়' শব্দটি সমাস করলে হয় 'বিকৃতং ইন্দ্রিয়ং যস্য স' অর্থাৎ 'বিকৃত অঙ্গ রয়েছে এমন সকল ব্যক্তিবিশেষ'।

আমার গবেষণা-সন্দর্ভের বিষয় হল: ***বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* উপলব্ধ বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান**। গবেষণা-সন্দর্ভটিতে

রামায়ণ ও *মহাভারত* এই দুই মহাকাব্যে বর্ণিত বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান পর্যালোচিত হয়েছে, তার সাথে একবিংশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থায় ভারতীয় অঙ্গবিকার বা বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের অবস্থান পর্যালোচিত হয়েছে। এছাড়াও বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রগুলি আর্শীবাদ না অভিশাপস্বরূপ তার উপর আলোকপাত এবং বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রের অন্তরালে কাহিনী এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার বিশ্লেষণও ব্যাখাত হয়েছে। বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভে প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিকৃতেন্দ্রিয় জনগণের প্রতি সামাজিক যে অনুশাসন রয়েছে, সেগুলির পর্যালোচনা *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, মনুসংহিতা, অর্থশাস্ত্র,* বিবিধ *স্মৃতিশাস্ত্র* এবং *Hindu Inheritance Act* অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়েছে। এই গবেষণানিবন্ধটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে, সেগুলি হল—

প্রথম অধ্যায় : **বিকৃতেন্দ্রিয় শব্দের আভিধানিক অর্থ, লক্ষণ ও স্বরূপ নিরূপণ।**

দ্বিতীয় অধ্যায় : ***বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* প্রতিফলিত বিকৃতেন্দ্রিয়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।**

তৃতীয় অধ্যায় : **বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান।**

চতুর্থ অধ্যায় : **সাংবিধানিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক পর্যালোচনা**

পঞ্চম অধ্যায় : **প্রাচীন ও বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের বিশেষাধিকার সমূহ (Privileges)।**

মানব সমাজের এক বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে এইসব অস্বাভাবিক, বিকলাঙ্গ, প্রতিবন্ধী ও মানসিক রোগগ্রস্থ মানুষ, যাঁদের এই সন্দর্ভে 'বিকৃতেন্দ্রিয়' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই জাতীয় ব্যক্তিগণ সাধারণ মানুষের ন্যায় কার্য করতে সক্ষম হন না। এই সকল মানুষের প্রতি পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি কার্যত মানবিক হওয়া প্রয়োজন। তাঁদের প্রতি নানারকম কুসংস্কার, পরিহাস, করুণা থেকে শুরু করে তাদের জন্য সেবা কার্যক্রমের উদ্ভব, এদের নিয়ে গবেষণা করা ও সামাজিক স্বীকৃতি বিবেচনা করা উচিত। ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্য অর্থাৎ

বাল্মীকীয় রামায়ণ ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* উপলব্ধ সকল বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কীভাবে জীবনযাপন করেছিলেন এবং তাদের প্রতি সামাজিক মনোভাব কীরকম ছিল, তা আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার জন্যই মূলতঃ এই সন্দর্ভের অবতারণা করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের উপর্যুক্ত অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হল :

প্রথম অধ্যায় : বিকৃতেন্দ্রিয় শব্দের আভিধানিক অর্থ, লক্ষণ ও স্বরূপ নিরূপণ।

পৃথিবীতে যেসকল মানুষের শারীরিক ক্ষমতা, মানসিক যোগ্যতা, সংবেদনশীল ক্ষমতা, সামাজিক ও ভাববিনিময়ের দক্ষতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কম থাকে, তাদের বিকলাঙ্গ বা বিকৃতেন্দ্রিয় মানুষ বলে। যেসকল মানুষের অঙ্গসমূহের মধ্যে হাত-পা নেই, দৈহিক গঠন অস্বাভাবিক, চোখে দেখে না, কানে শোনে না, বুদ্ধিমত্তা কম— এরাই বিকলাঙ্গ বা বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তি। বিকৃতেন্দ্রিয় পদটির সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হবে বিকৃত + ইন্দ্রিয়। প্রথমেই এই গবেষণা সন্দর্ভে ‘বিকৃত’ পদটির বিবিধ আভিধানিক অর্থ বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের নিরিখে পর্যালোচিত হয়েছে। পুনরায় ‘ইন্দ্রিয়’ পদটির আভিধানিক অর্থও ব্যাখাত হয়েছে।

অধ্যায়টির পরবর্তী স্তরে যেসকল শিশুরা জন্মসূত্রে বিকৃত হয়ে জন্মগ্রহণ করে, তার কারণ ও স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। যেমন কোন শিশু মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হওয়ার কারণরূপে গর্ভ কী? গর্ভের লক্ষণ কী? প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনাও প্রদত্ত হয়েছে। এছাড়াও যেকোন পুরুষের শুক্রাণু ও মহিলার ডিম্বাণু থেকে ভূমিষ্ঠ শিশুর দেহের কোন কোন অংশ সৃষ্টি হয় তাও আলোচিত হয়েছে। *চরকসংহিতার* ‘খুড্ডীকা গর্ভাবক্রান্তি’ নামক তৃতীয় অধ্যায়ে গর্ভের ছয়টি ভাব অর্থাৎ গর্ভের মাতৃজ অংশ, গর্ভের পিতৃজ অংশ, গর্ভের আত্মজ অংশ, গর্ভের সাত্ম্যজ অংশ, গর্ভের রসজ অংশ ও গর্ভের সত্ত্বজ অংশ আলোচিত হওয়ার পর স্ত্রীগণ কী কারণে বিকৃত, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ ও বিকৃতেন্দ্রিয় শিশু প্রসব করে তা বিশদে বর্ণিত হয়েছে।

পুনরায় বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে *চরকসংহিতা* অনুসারে তিনপ্রকার বিকৃতি আলোচিত হয়েছে। এরপর মানুষের ইন্দ্রিয়ভেদে প্রধান চার প্রকার বিকৃতি আলোচিত হয়েছে। চার প্রকার বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গ হল— ১. দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা, ২. শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা. ৩. অস্থিগত প্রতিবন্ধকতা ও ৪. মানসিক প্রতিবন্ধকতা। এই চারপ্রকার বিকৃতেন্দ্রিয় মানুষের সংজ্ঞা আধুনিক

ভারতীয় আইন অনুযায়ী আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও পরিশেষে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত চার প্রকার বিকৃতেন্দ্রিয় মানুষের শ্রেণিবিভাগ, প্রতিবন্ধকতার কারণ, বৈশিষ্ট্য ও শনাক্তকরণ বিশদে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* প্রতিফলিত বিকৃতেন্দ্রিয়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

অধ্যায়টি দুটি অংশে বিভক্ত হয়েছে। প্রথম অংশে আলোচিত হয়েছে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গ এবং দ্বিতীয় অংশে আলোচিত হয়েছে *বৈয়াসিক মহাভারতে* প্রতিফলিত বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রসমূহ। গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত *বাল্মীকীয় রামায়ণের* বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ হলেন— ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি, অন্ধকমুনি, কুশনাভের শতকন্যা, মন্থরা, কুবের, শূর্পণখা এবং *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গরা হলেন— ধৃতরাষ্ট্র, ঋষি দীর্ঘতমস্, অরুণ, অষ্টাবক্র মুনি, দ্যুমৎসেন, উপমন্যু, পৌষ্য, একলব্য, শকুনি। মূলতঃ এই অধ্যায়ে উপর্যুক্ত পঞ্চদশ প্রকার বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের শারীরিক বৈকল্যের কাহিনী সুবিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও ভবিষ্যতে অনেক বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রসমূহের স্বাভাবিক শরীর প্রাপ্তিতে যেসকল পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে তাও বিশ্লেষিত হয়েছে। এছাড়াও ভারতীয় দুই মহাকাব্যের নিরিখে সংস্কৃত সাহিত্যে তাদের অবদান কী ছিল এবং তাদের নামকরণ কী প্রকারে হয়েছে? তাও সুবিন্যস্ত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান।

অধ্যায়টি গবেষণা-সন্দর্ভের নামকরণের নিরিখে অভিহিত হয়েছে। বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের চরিত্রদিগের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের নিরিখে অধ্যায়টি তিনটি অংশে বিভক্ত হয়েছে। প্রথম অংশে পরিবারের বিবিধ আভিধানিক সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিরূপণ করা হয়েছে। এছাড়াও পারিবারিক এই অংশ *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারত* এই দুই মহাকাব্যের চরিত্রসমূহের নিরিখে দুটি অংশে বিভক্ত হয়েছে। গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত দুই বৃহৎ মহাকাব্যের যেসকল বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের কথা বলা হয়েছে তাদের সকলের পিতা-মাতা সহ পূর্বপুরুষের সঙ্গে জীবনযাপনের পারিবারিক ইতিহাস এবং তাদের জন্মচিত্র রেখাচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা-সন্দর্ভের দ্বিতীয় অংশে সমাজের স্বরূপ নিরূপণ প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র ও আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে। পুনরায় *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের চতুরাশ্রমকে ভিত্তি করে সমাজ জীবন অতিবাহিত করার কাহিনী ব্যাখ্যাত হয়েছে। চতুরাশ্রমগুলি হল ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। গবেষণা সন্দর্ভে উল্লিখিত চতুরাশ্রমগুলির মধ্যে *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রাথমিক ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালনের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্যদশায় প্রত্যেক বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের সাংসারিক জীবনে প্রবেশের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। জীবনের দ্বিতীয়ভাগে সকল স্নাতক ব্রহ্মচারী সবর্ণা ও সুলক্ষণা নারীকে বিবাহ করে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করেন, এবিষয়ে পর্যালোচিত হয়েছে। সেইহেতু গবেষণা-সন্দর্ভে শাস্ত্রসম্মত আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই শাস্ত্রসম্মত আট প্রকার বিবাহের মধ্যে *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত প্রত্যেক বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের নিজ নিজ বিবাহ চিত্র প্রশস্তভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও গার্হস্থ্য আশ্রমের দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ বিবাহের পর শাস্ত্রসম্মত দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণা-সন্দর্ভের এই অংশে উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের সকল সন্তানাদির নাম, উৎপত্তির কাহিনী এবং তাঁরা শাস্ত্রসম্মত কী জাতীয় পুত্র জন্ম দিয়েছিলেন, তারও সুবিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় আশ্রম অর্থাৎ *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতের* বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের বানপ্রস্থদশাও আলোচিত হয়েছে। সর্বশেষ আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাসদশা উভয় মহাকাব্যে উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের সামাজিক ও ধার্মিক অবস্থানের নিরিখে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও শাস্ত্রসম্মত বিবিধ সামাজিক সংস্কারবিধি এই অংশে সুবিস্তৃতভাবে স্থান পেয়েছে। দশ প্রকার সামাজিক সংস্কারবিধি হল— গর্ভধান বা ঋতুসংস্কার, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, মাঙ্গলিক আচার, চূড়াকর্ম, উপনয়ন, কেশান্ত ও সমাবর্তন।

গবেষণা-সন্দর্ভের তৃতীয় অংশেও রাজনীতির প্রাচীন ও আধুনিক সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা সন্দর্ভে উল্লিখিত যেসকল বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গ নিজ বুদ্ধিবলে ছল অর্থাৎ রাজনীতিকে আশ্রয় করে দুই মহাকাব্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেই সকল ব্যক্তিগণের রাজনৈতিক কুশলতা বা বিচক্ষণতার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : সাংবিধানিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক পর্যালোচনা

গবেষণা-সন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়টিকেও তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। তিনটি অংশ হল— **১.** স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত বিবিধ বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের অধিকার প্রশস্ত, **২.** বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের অধিকার সুরক্ষায় বর্তমান ভারতীয় সংবিধানের বিধানসমূহ, **৩.** বিকৃতেন্দিয়ত্বের অন্তরালে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বান্বেষণ ও এবিষয়ে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম অংশটি **বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের অধিকার সুরক্ষায় স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত বিধানসমূহ ও তার প্রতিফলন** এই নামে অভিহিত হয়েছে। এই অংশে মূলতঃ *মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, উশনঃ সংহিতা, কাত্যায়ন সংহিতা, পরাশর সংহিতা* ও *ব্যাস সংহিতা* থেকে বিবিধ তৎকালীন সাংবিধানিক উদ্ধৃতি গ্রহণ করে সেই সময়ের বিকৃতেন্দ্রিয় মানুষের শাস্ত্রসম্মত সামাজিক অধিকার বিষয়ক কার্যকলাপ পর্যালোচিত হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত বিবিধ সামাজিক কার্যকলাপে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের অংশগ্রহণ-বিষয়ক নিয়মাবলী বর্ণিত হয়েছে। যেমন, বিকৃতেন্দ্রিয় মানুষের ন্যায় অক্ষম কোন প্রাণিকে দিয়ে কোন কঠিন কাজে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ, বিবিধ বিকৃতেন্দ্রিয় বংশে পুরুষ ও কন্যার বিবাহ শাস্ত্রানুযায়ী নিষিদ্ধ, বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের মন্ত্রণাস্থানে অপসারণের বিধি প্রভৃতি।

গবেষণা-সন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশটি **বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের অধিকার সুরক্ষায় ভারতীয় সংবিধানের বিধানসমূহ** নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই অংশে প্রধানত ভারতীয় সংবিধানের RPWD (Right of Persons of Disability) ১৯৯৫ ও ২০১৬ আইনের বিবিধ ধারা অনুযায়ী সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের ন্যায় বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের সামাজিক কার্যে অংশগ্রহণ ও তাদের সামাজিক অধিকারসমূহ বিষয়ে অনুশাসন প্রণালীও লিপিবদ্ধ হয়েছে।

গবেষণা-সন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় অংশটি **বিকৃতেন্দ্রিয়ত্বের অন্তরালে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানেষণ ও এবিষয়ে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি** নামে অভিহিত হয়েছে। প্রধানতঃ গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারত* অনুযায়ী চার শ্রেণির অক্ষম ব্যক্তিগণের কথা বলা হয়েছে। সেহেতু গবেষণা সন্দর্ভের এই অংশে উক্ত চার শ্রেণির বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের চিকিৎসাপদ্ধতির বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। মানুষের শরীরের বিবিধ কর্মেন্দ্রিয়ে সৃষ্ট চার প্রকার

বিকলতা হল— নেত্রগত বিকলতা, কর্ণগত বিকলতা, অস্থিবিকলতা ও মানসিক বিকলতা। এক্ষেত্রে চারপ্রকার অঙ্গবৈকল্য অনুযায়ী *আয়ুর্বেদে* উল্লিখিত মানুষের ঐ সকল অঙ্গে সৃষ্ট বিবিধ রোগের নাম এবং সেই সকল রোগের উপশম প্রণালী আলোচিত হয়েছে। গবেষণা-সন্দর্ভে মূলতঃ *সুশ্রুতসংহিতা* অনুযায়ী রোগের নাম এবং *ভৈষজ্য রত্নাবলী* গ্রন্থ অনুযায়ী উক্ত সকল রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। *সুশ্রুতসংহিতা* অনুযায়ী ছিয়াত্তর প্রকার চক্ষুরোগ, আঠাশ প্রকার কর্ণরোগ, সাত প্রকার অস্থিরোগ এবং ছয় প্রকার মানসিক-রোগ সমূহ এবং তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি গবেষণা সন্দর্ভে উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের নিরিখে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত বিবিধ বিকৃতেন্দ্রিয়ত্বের নিরিখে আধুনিক হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসা প্রণালী সম্পর্কিত বিবিধ ঔষুধের নাম ও ঔষুধের গুণাবলী পর্যালোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : প্রাচীন ও বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের বিশেষাধিকার সমূহ (Privileges)।

গবেষণা-সন্দর্ভের এই অধ্যায়ে স্মৃতিশাস্ত্রের নিরিখে (*মনুসংহিতা* ও *অর্থশাস্ত্র*) অনুযায়ী রাজা বা প্রদেশের মুখ্য ব্যক্তিগণের দ্বারা বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি নিজ ভার্যার রক্ষণ, গ্রাসাচ্ছাদন, বিবাহ, বিজিগীষু রাজা কর্তৃক বার্ষিক ভাতা ও অবসর ভ্রাতা প্রদান, যানবাহনে চলাফেরা করার জন্য মাশুল ছাড় ও শিক্ষা-কর্ম বিষয়ক যেসকল সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তাও ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত পনেরো জন বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তির জীবনধারণের জন্য যে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তাও পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখাত হয়েছে। এই অধ্যায়ের সবশেষে বর্তমান সমাজে জীবনধারণের নিরিখে উল্লিখিত চারপ্রকার বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রতিও বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও আলোচিত হয়েছে।

এই পাঁচটি অধ্যায়ের শেষে রয়েছে **উপসংহার,** যেখানে গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান বিষয়ক পর্যালোচনা এবং আধুনিক সমাজে এই জাতীয় ব্যক্তিগণের প্রতি সাধারণ মানুষের মনোভাব বিষয়ে নিজ মতামত ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়াও *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতের* বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা যে যথেষ্ট

সন্মান ও খ্যাতিলাভ করেছিলেন, সেই সূত্রে আধুনিক সময়ে বিশ্বে সফল বিকৃতেন্দ্রিয় মানুষের নাম গবেষণা সন্দর্ভে উল্লিখিত চার শ্রেণির অঙ্গবৈকল্যের নিরিখে আলাদাভাবে সজ্জিত হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি : বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ গবেষণা-সন্দর্ভটি 'Kalpurush' ফন্টে লেখা হয়েছে, ফন্ট সাইজ ১৪। যেখানে ইংরেজী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে 'Times New Roman' এর ১৪ সাইজ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যেক সাধারণ সরণির মাঝে ১.১৫ সেন্টিমিটার ব্যবধান করা হয়েছে। আর সংস্কৃত শ্লোকগুলির ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় 'Kalpurush' ফন্টে ১.২৭ সেন্টিমিটার Indent করে ফন্ট সাইজ ১২ তে লেখা হয়েছে এবং দুটো পঙক্তির মধ্যে ১ সেন্টিমিটার ব্যবধান রাখা হয়েছে। পাদটীকার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় 'Kalpurush' ফন্টের ১২ এবং ইংরেজী ভাষায় 'Times New Roman' এর ১২ সাইজ ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি পৃষ্ঠার উপরে ও নীচে ২ সেন্টিমিটার এবং ডান ও বাম পাশে বাঁধাই এর জন্য ২.৫ সেন্টিমিটার জায়গা ছাড়া হয়েছে। গবেষণা-সন্দর্ভের গ্রন্থপঞ্জিতে MLA8 (8^{th} Edition of the Modern Language Association's) পদ্ধতি অনুযায়ী অনুসৃত হয়েছে, যা তত্ত্বাবধায়কের সমর্থনে অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণা সন্দর্ভটি রচনার নিমিত্ত সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী এবং হিন্দি ভাষায় রচিত বিবিধ পুস্তক অনুসৃত হওয়ায় সন্দর্ভটিতে গ্রন্থপঞ্জি তৈরির ক্ষেত্রে অভিন্নতা রক্ষার্থে ইংরেজীভাষায় Roman Diacritic Font ব্যবহার করা হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থপঞ্জি 'Times New Roman' এর ১২ সাইজ ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. H.I.L., Vol- I, p. 453.

২. *তদেব,* p. 417.

৩. পা.সূ., ২।৩।২০

৪. *তদেব,* ৪।১।৬৮

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়:

বিকৃতেন্দ্রিয় শব্দের আভিধানিক অর্থ, লক্ষণ ও স্বরূপ নিরূপণ

'বিকৃতং ইন্দ্রিয়ং যস্য স বিকৃতেন্দ্রিয়ঃ' (বহুব্রীহি সমাস)। বিকৃতেন্দ্রিয় বিষয়ে আচার্য পাণিনির সূত্র–'যেনাঙ্গবিকারঃ'।[১] এবিষয়ে দীক্ষিতকারের বৃত্তি—'যেনাঙ্গেন বিকৃতেনাঙ্গিনো বিকারো লক্ষ্যতে ততঃ তৃতীয়া স্যাৎ'।[২] যে অঙ্গের বিকার হলে অঙ্গির বিকার লক্ষিত হয়, সেই অঙ্গবাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা– অক্ষ্ণা কাণঃ, পাদেন খঞ্জঃ। হানির ন্যায় অঙ্গের আধিক্যও বিকাররূপে সূচিত হয়। যথা– বপুষা চতুর্ভুজঃ, মুখেন ত্রিলোচনঃ।

অর্থাৎ বিকৃতেন্দ্রিয় বলতে বোঝায়–অক্ষমতা, শক্তিহীনতা, বিকলতা, বিকলত্ব, দৌর্বল্য, অসামর্থ্য ব্যক্তিবর্গ। বিকল+অঙ্গ = বিকলাঙ্গ; স্বভাবতঃ অধিক অথবা ন্যূন অঙ্গযুক্ত, এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'Disability' যার অর্থ হল – 'Lack of adequate power, strength or physical or mental ability; incapacity'.[৩]

১.১. বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের আভিধানিক অর্থ : বিকৃতেন্দ্রিয় পদটির সন্ধিবিচ্ছেদ হবে– বিকৃত + ইন্দ্রিয়। পূর্বে 'বিকৃত' পদটির আভিধানিক অর্থ নিরূপণ প্রয়োজন। বি–পূর্বক √কৃ ধাতুর উত্তর ক্ত-প্রত্যয়যোগে 'বিকৃত' পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'বিকৃত' পদটির অনেকগুলি আভিধানিক অর্থ পাওয়া যায়, সেগুলি হল নিম্নরূপ–

ক. 'বিকৃতেন্দ্রিয়' শব্দের প্রথম আভিধানিক অর্থ পাওয়া যায় 'অন্যথাকৃত, প্রাপ্ত বিকার' অর্থাৎ যে পূর্বাবস্থাতেই বিকারগ্রস্ত। সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য অশ্বঘোষ বিরচিত *বুদ্ধচরিতম্* নামক গ্রন্থের 'সংবেগোৎপত্তিঃ' নামক তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে–

> প্রত্যঙ্গহীনান্ বিকলেন্দ্রিয়াংশ্চ জীর্ণাতুরাদীন্ কৃপণাংশ্চ ভিক্ষূন্।
> ততঃ সমুৎসার্য্য পরেণ সাম্না শোভাং পরাং রাজপথস্য চক্রুঃ।।[৪]

খ. 'বিকৃতেন্দ্রিয়' শব্দের দ্বিতীয় আভিধানিক অর্থ হল – 'বিরূপ, ব্যঙ্গ'। প্রসঙ্গক্রমে *বৈয়াসিক মহাভারতের* 'বনপর্ব' নামক অধ্যায়ে কর্কোটক নাগকর্তৃক নলকে দংশন এবং নলের শারীরিক অবস্থার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

স দৃষ্ট্বা বিস্মিতস্তস্থাবাত্মনম্ বিকৃতং নলম্।
স্বরূপধারিণং নাগং দদর্শ স মহীপতিঃ।।[৫]

অর্থাৎ নলরাজা নিজেকে বিকৃত দেখে বিস্মিত হয়ে রইলেন এবং কর্কোটককে স্বরূপধারী অবস্থায় দেখলেন। *ভারতকৌমুদী* নামক টীকায় বিকৃত বিষয়ে বলা হয়েছে–'বিকৃতং বিষপ্রভাবেণান্যথাভূতং কৃষ্ণম্'।[৬]

এছাড়াও *মনুসংহিতার* নবম অধ্যায় 'স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম, দায়বিভাগ, দ্যূতক্রীড়া, চৌর্যাদি-নিরাকরণোপায় ও বৈশ্য-শূদ্রের কর্তব্য' নামক অধ্যায়ে বৈশ্যদের গৃহে বিকৃতাকার পুরুষ জন্মানোর প্রতিষেধ হিসাবে বলা হয়েছে–

নিষ্পদ্যন্তে চ শস্যানি যথোপ্তানি বিশাং পৃথক্।
ৰালাশ্চ ন প্রমীয়ন্তে বিকৃতং ন চ জায়তে।।[৭]

অর্থাৎ যেখানে বৈশ্যরা ভূমিতে শস্যাদি বপন করে শষ্যসমূহও পৃথকভাবে উৎপন্ন হয়, সেই রকম বৈশ্যগৃহে অকালে বালকদের মৃত্যু হয় না এবং সেই গৃহে অন্ধ-পঙ্গু-কানা প্রভৃতি বিকৃতাকার পুরুষ জন্মগ্রহণ করে না।

গ. 'বিকৃতেন্দ্রিয়' শব্দের তৃতীয় আভিধানিক অর্থ হল – স্বভাবহীন, বিকলাঙ্গ, হীনাঙ্গ। *বাল্মিকীয় রামায়ণ* এর কৱন্ধ নামক রাক্ষসের বর্ণনা প্রসঙ্গে ৰালকাণ্ডে বলা হয়েছে–

কৱন্ধং নাম রূপেণ বিকৃতং ঘোরদর্শনম্।।
তং নিহিত্য মহাৰাহুর্দদাহ স্বর্গতশ্চ সঃ।[৮]

কৱন্ধ শারীরিক দিক দিয়ে বিকারগ্রস্ত; তার সম্বন্ধে M.N. Dutt সম্পাদিত *Rāmāyaṇa of Vālmīki* গ্রন্থে উল্লেখ্য করেছেন – 'Rākṣasa Kabandha by name of a dreadful and

deformed shape. Having slain him, the mighty-armed one burnt his body and thereupon he went to heaven'.[৯]

ঘ. 'বিকৃতেন্দ্রিয়' শব্দের চতুর্থ আভিধানিক অর্থ – 'অঙ্গবিকার'। বিকার প্রসঙ্গে আচার্য পাণিনি সূত্র করেছেন— 'যেনাঙ্গবিকারঃ'।[১০] এবিষয়ে দীক্ষিতকারের বৃত্তি – 'যেনাঙ্গেন বিকৃতেনাঙ্গিনো বিকারো লক্ষ্যতে ততঃ তৃতীয়া স্যাৎ'।[১১] যে অঙ্গের বিকার হলে অঙ্গির বিকার লক্ষিত হয়, সেই অঙ্গবাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা–অক্ষ্ণা কাণঃ, পাদেন খঞ্জঃ। হানির ন্যায় অঙ্গের আধিক্যও বিকাররূপে সূচিত হয়। যথা–বপুষা চতুর্ভুজঃ, মুখেন ত্রিলোচনঃ।

ঙ. 'বিকৃতেন্দ্রিয়' শব্দের পঞ্চম আভিধানিক অর্থ— বীভৎস, কুৎসিত, কদর্য্য। বিভিন্ন গ্রন্থে উক্ত আভিধানিক শব্দের উদারণস্বরূপ বলা হয়েছে–'সর্ব্বে চ বিকৃতাননাঃ, বিকৃতাননমূর্দ্ধজ, বিকৃত বানরমুখ'।[১২]

চ. 'বিকৃতেন্দ্রিয়' শব্দের ষষ্ঠ আভিধানিক অর্থ হল- অসংস্কৃত, সংস্কারহীন, মলিন। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে, বিমাতার নিকট পিতৃসত্য পালনার্থে শ্রীরামচন্দ্রের বনে গমনের উদ্যোগ প্রসঙ্গে বলেছেন— 'তুমি আমি দোঁহে হব বিকৃতি আকৃতি'।[১৩]

ছ. 'বিকৃতেন্দ্রিয়' শব্দের সপ্তম আভিধানিক অর্থ বিরূপীকৃত, ছিন্ননাসাকরচরণাদি-রূপ। মনুষ্য কৃত অপরাধের দণ্ডপ্রসঙ্গে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে–

> অবীজবিক্রয়ী চৈব বীজোৎক্রষ্টা তথৈব চ।
> মর্যাদাভেদকশ্চৈব বিকৃতং প্রাপ্নুয়াদ্ বধম্।।[১৪]

আলোচ্য শ্লোকের অর্থপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে– যা বীজ নয় অর্থাৎ যে বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হতে পারে না, সেই বীজকে যে ব্যক্তি অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি সম্পন্ন বলে বিক্রয় করে, অথবা অপকৃষ্ট বীজের সাথে কিছু উৎকৃষ্ট বীজ মিশিয়ে সমস্ত বীজকেই যে লোক উৎকৃষ্ট বীজ বলে বিক্রয় করে এবং যে লোক মর্যাদা অর্থাৎ গ্রামাদির সীমা নষ্ট করে, এমন সকল লোককে রাজা নাক, কান, হাত, পা ইত্যাদি কেটে দিয়ে তাদের শরীর বিকৃত করে দণ্ড দেবেন। রাজার দণ্ডস্বরূপ *মেধাতিথিভাষ্যে* বলা হয়েছে – 'অৰীজং ৰীজপ্ররোহাসমর্থং ব্রীহ্যাদিপ্ররোহসমর্থমিতি কৃত্বা যো

ৰিক্রীণীতে, তথা অপকৃষ্টমেব কতিপয়োৎকৃষ্টপ্রক্ষেপেণ সর্বমিদং সোৎকর্ষমিতি কৃত্বা যো ৰিক্রীণীতে, যশ্চ গ্রামনগরাদিসীমাং বিনাশয়তি স বিকৃতনাসাকরচরণকর্ণাদিরূপং বধং প্রাপ্নুয়াৎ'।[১৫]

জ. 'বিকৃতেন্দ্রিয়' শব্দের অষ্টম আভিধানিক অর্থ— স্মরবিকারযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– 'ঋষ্যশৃঙ্গ বিকৃতম্ সমীক্ষ্য'।[১৬]

ঝ. 'বিকৃতেন্দ্রিয়' শব্দের নবম আভিধানিক অর্থ— পরিণতিপ্রাপ্ত, পরিণত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— 'জনঃ কালেন জাতো বিকৃতো বিনশ্যতি'।[১৭]

ঞ. 'বিকৃতেন্দ্রিয়' শব্দের দশম আভিধানিক অর্থ–মায়াবী। মায়াবী শব্দের অর্থস্বরূপ *রঘুবংশে* বলা হয়েছে–

> লক্ষ্মণঃ প্রথমং শ্রুত্বা কোকিলামঞ্জুবাদিনীম্।
> শিবাঘোরস্বনাং পশ্চাদ্বুৰুধে বিকৃতেতি তাম্।।[১৮]

মল্লিনাথ কৃত 'সঞ্জীবনী' টীকায় 'মায়াবী' শব্দের অর্থরূপে উক্ত শ্লোক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–'লক্ষ্মণঃ প্রথমং কোকিলাবন্মঞ্জুবাদিনীং পশ্চাচ্ছিবাবদ্ধোরস্বনাং তাং শূর্পণখা শ্রুত্বা। তস্যাঃ স্বনং শ্রুত্বেত্যর্থঃ। সুস্বনঃ শ্রূয়ত ইতিবৎ প্রয়োগঃ। বিকৃতা মায়াবিনীতি ৰুৰুধে ৰুদ্ধবান্'।[১৯]

❖ পুনরায় 'ইন্দ্রিয়' পদটি নপুংসকলিঙ্গে হয়। যার আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

ক. 'ইন্দ্রিয়' শব্দের দ্বারা একাদশ ইন্দ্রিয়কে বোঝায়। এই একাদশ ইন্দ্রিয় হল– পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ পরিস্পন্দনরূপ ক্রিয়ার জনক (পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পদ ও বাক্) এবং অন্তরিন্দ্রিয় মন। এবিষয়ে *মনুসংহিতায়* উক্ত হয়েছে–

> শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
> পায়ূপস্থং হস্তপাদং ৰাক্ চৈব দশমী স্মৃতা।।
> একাদশং মনো জ্ঞেয়ং স্বগুণোভয়াত্মকম্।
> যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ।।[২০]

অন্তরিন্দ্রিয় মন নিজগুণে অর্থাৎ সকল্পসহকারে বুদ্ধীন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয়) ও কর্মেন্দ্রিয় উভয়েরই প্রবর্তক হয়। সেই প্রসঙ্গে *মেধাতিথিভাষ্যে* উল্লেখ্য— 'একাদশসংখ্যাপূরকঞ্চ মনোরূপমন্তরিন্দ্রিয়ং

জ্ঞাতব্যং, স্বগুণেন সকল্পরূপেণ উভয়রূপেন্দ্রিয়গণপ্রবর্তকস্বরূপম্'।[২১] অতএব মনকে জয় করতে পারলেই পূর্বোক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় উভয়কেই জয় করা সম্ভব। মন উভয়াত্মক— এই অর্থে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় উভয়েরই নিজ নিজ বিষয় প্রবৃত্ত হতে গেলে তার মূলে 'সঙ্কল্প' থাকা প্রয়োজন, এইজন্য মন উভয়াত্মক- জ্ঞানেন্দ্রিয়াত্মক ও কর্মেন্দ্রিয়াত্মক। সুতরাং, বলা হয়ে থাকে যে, মন বশীকৃত হলে বুদ্ধীন্দ্রিয়সমষ্টি ও কর্মেন্দ্রিয়সমষ্টি এই দশটি ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়। কারণ অন্তরিন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা প্রেরিত হয়ে দশটি ইন্দ্রিয় স্বকার্যে লিপ্ত হয়।

খ. একাদশ ইন্দ্রিয় ব্যতীত পাঁচটি হল রূপ প্রভৃতি তন্মাত্র। তন্মাত্রগুলি হল— রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, গন্ধ তন্মাত্র, শব্দ তন্মাত্র এবং স্পর্শ তন্মাত্র। তন্মাত্রগুলি হল ভূতের অত্যন্তসূক্ষ্ম অংশ। এই তন্মাত্র থেকে স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়, যা আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় করণ, দর্শনাদি কর্ম, আত্মা কর্তা— এইরূপ অনুমাপক। গুণরত্নের মতে – 'তত্র রূপতন্মাত্রং শুক্লকৃষ্ণাদিরূপবিশেষঃ, রসতন্মাত্রং তিক্তাদি-রসবিশষঃ, গন্ধ-তন্মাত্রং সুরভ্যাদি-গন্ধবিশেষঃ, শব্দ-তন্মাত্রং মধুরাদি-শব্দবিশেষঃ, স্পর্শ-তন্মাত্রং মৃদুকঠিনতাদি-স্পর্শবিশেষঃ'।[২২]

সুতরাং, বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বলতে এককথায় বোঝায়, যেকোন কারণে দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বা পারস্পরিক প্রভাব। যার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধা প্রাপ্ত হন, সেই সকল ব্যক্তিসমূহকে বোঝায় বিকৃতেন্দ্রিয়।

১.২. জন্মসূত্রে বিকৃতেন্দ্রিয় হওয়ার কারণ :

বিকৃত শিশু উৎপাদনের কারণ হল গর্ভস্থ ভ্রূণের বা গর্ভের বিকার। গর্ভের বিকারের কারণপ্রসঙ্গে *চরকসংহিতার* শরীরস্থান নামক খণ্ডের 'মহতী গর্ভাবক্রান্তিঃ' নামক চতুর্থ অধ্যায়ে আত্রেয় বলেছেন— 'যতশ্চ গর্ভঃ সম্ভবতি যস্মিংশ্চ গর্ভসংজ্ঞা যদ্বিকারশ্চ গর্ভো যথা চানুপূর্ব্ব্যাভিনির্ব্বর্ততে কুক্ষৌ যশ্চাস্য বৃদ্ধিহেতুর্যতশ্চাস্যবৃদ্ধির্ভবতি যতশ্চ জায়মানঃ কুক্ষৌ বিনাশং প্রাপ্নোতি যতশ্চ কার্ৎস্ন্যেনাবিনশ্যন্ বিকৃতিমাপদ্যতে তদনুব্যাখ্যাস্যামঃ'।[২৩]

অর্থাৎ যা থেকে গর্ভ উৎপন্ন হয়, যাহাতে গর্ভসংজ্ঞা প্রদত্ত হয়, গর্ভ যে সমস্ত দ্রব্যের বিকার, যে আনুপূর্বিক নিয়মে কুক্ষিতে গর্ভ উৎপন্ন হয়, যাহা গর্ভের বৃদ্ধিকারণ, যে কারণে গর্ভের বৃদ্ধি হয়

না, গর্ভ উৎপন্ন হলেও যে কারণে কুক্ষির মধ্যে বিনষ্ট হয় এবং যে কারণে সম্পূর্ণ বিনষ্ট না হয়ে কেবল বিকৃতি প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং, আমাদের প্রথমে জানা দরকার গর্ভ কি? গর্ভের লক্ষণ নিরূপণপ্রসঙ্গে *চরকসংহিতায়* উল্লেখ্য— 'মাতৃতঃ পিতৃতঃ আত্মতঃ সাত্ম্যতো রসতঃ সত্ত্বতঃ ইত্যেতেভ্যো ভাবেভ্যঃ সমুদিতেভ্যো গর্ভঃ সম্ভবতি। তস্য যে যেঽবয়বা যতো যতঃ সম্ভবতঃ সম্ভবন্তি তান্ বিভজ্য মাতৃজাদীনবয়বান্ পৃথক্ পৃথগুক্তমগ্রে। শুক্রশোণিতজীবসংযোগে তু খলু কুক্ষিগতে গর্ভসংজ্ঞা ভবতি'।[২৪]

অর্থাৎ মাতা, পিতা, আত্মা, সাত্ম্য (রূপ, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ), রস ও সত্ত্ব সম্মিলিত এই সমস্ত ভাব বা অংশ হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়। গর্ভের যে যে অবয়ব যে যে ভাব হতে উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত অবয়ব মাতৃজাদি বিভাগানুসারে বিভক্ত করে পৃথক্ পৃথক্ রূপে কথিত হয়েছে। গর্ভাশয়ে শুক্র শোণিত ও জীবাত্মার সংযোগ হলে তা গর্ভ নামে অভিহিত হয়।

অতএব উপরিউক্ত মাতৃ প্রভৃতি ছয়টি ভাব হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়। অতএব এই ছয়টি ভাব আলোচনা করার আবশ্যিকতা রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ *চরকসংহিতার* খুড্ডীকা গর্ভাবক্রান্তিঃ' নামক তৃতীয় অধ্যায়ে আত্রেয় কর্তৃক বিশদ বিবৃতি রয়েছে মাতৃ প্রভৃতি ছয়টি ভাব বা অংশ নিম্নে আলোচিত হল—

১. গর্ভের মাতৃজ অংশ : 'ত্বক্ চ লোহিতঞ্চ মাংসঞ্চচ মেদশ্চ নাভিশ্চ হৃদয়ঞ্চ ক্লোম চ যকৃচ্চ প্লীহা চ বুক্কৌ চ বস্তিশ্চ পুরীষাধানাঞ্চামাশয়শ্চ পক্কাশয়শ্চোত্তরগুদঞ্চাধরগুদঞ্চ ক্ষুদ্রান্ত্রং চ স্থূলান্ত্রং চ বপা চ বপাবহনঞ্চেতি মাতৃজানি'।[২৫]

অর্থাৎ ত্বক্ (skin), শোণিত (blood), মাংস (flesh), মেদ (fat), নাভি (umbilicus), হৃদয় (heart), ক্লোম (pancrease), যকৃৎ (liver), প্লীহা (spleen), বৃক্ক (kidney), বস্তি (bladder), আমাশয় (from cardiac end of stomach to the illeoocacal valve ie, stomach, duodenum, small intestine), পুরীষাধান (Sigmoid & pelvic colone), পক্কাশয়, উত্তরগুদ-অধোগুদ (uper and lower parts of the anus), ক্ষুদ্রান্ত্র (small intestine), বৃহদন্ত্র (large intestine), মেদ, বপাবহন (mesentery and omentum অর্থাৎ মেদবাহী, চক্রপাণি দত্ত বলে

তৈলবর্ত্তিকা। অর্থাৎ যে শিরা বৃক্ক হইতে বস্তিকে মূত্র বহন করে, তাহার আকার তৈলবর্ত্তির ন্যায়) প্রভৃতি মাতৃজ গর্ভ অর্থাৎ মাতা হইতে উৎপন্ন হয়।

২. গর্ভের পিতৃজ অংশ : 'কেশশ্মশ্রুনখলোমদন্তাস্থিশিরাস্নায়ুধমন্যঃ শুক্রমিতি পিতৃজানি'।[২৬]

অর্থাৎ গর্ভের যে যে অংশ পিতৃজ বা পিতা হইতে উৎপন্ন হয়; সেগুলি হল– কেশ (hair of the head), শ্মশ্রু (hair of the face), নখ (nails), লোম (small hairs of the body), দন্ত (teeth), অস্থি (bones), শিরা (veins), স্নায়ু (ligaments), ধমনী (arteries) ও শুক্র (semen)।

৩. গর্ভের আত্মজ অংশ : 'তাসু তাসু যোনিষূৎপত্তি-বায়ুরাত্মজ্ঞানং মন ইন্দ্রিয়াণি প্রাণা-পানৌ প্রেরণং ধারণমাকৃতি-স্বরবর্ণবিশেষাঃ সুখ-দুঃখে ইচ্ছা-দ্বেষৌ চেতনাধৃতিবুদ্ধি-স্মৃতিরহঙ্কারঃ যত্নশ্চেত্যাত্মজানি'।[২৭]

অর্থাৎ গর্ভোৎপত্তিকালে আত্মা হইতে গর্ভের যা যা উৎপন্ন হয়, তা হল– আয়ু (life span), আত্মজ্ঞান (self-realisation), মন (mind), ইন্দ্রিয় সকল (senses), উচ্ছ্বাস-নিশ্বাস (to take things into and to excrete things out of the body) প্রেরণ-ধারণ (stimulation and sustenance of sense organs), আকৃতিভেদ (characteristic shape), স্বরবর্ণভেদ (voice and complexionof the individual), সুখ (desire for happiness), দুঃখ (desire for sorrow), ইচ্ছা (liking), দ্বেষ (disliking), চেতনা (consciousness), ধৃতি (courage), বুদ্ধি (intellect), স্মৃতি (memory), অহঙ্কার (egoism) ও যত্ন (efforts)।

৪. গর্ভের সাত্ম্যজ অংশ : 'আরোগ্যমনালস্যমলোলুপত্বমিন্দ্রিয়প্রসাদঃ স্বরবর্ণবীজসম্পৎ প্রহর্ষভূয়স্ত্বঞ্চেতি সাত্ম্যজানি'।[২৮]

অর্থাৎ গর্ভের যাহা যাহা সাত্ম্য থেকে উৎপন্ন হয় তা হল–আরোগ্য (the state of freedom from diseases), অনালস্য (laziness), অলোভ (greed), ইন্দ্রিয়প্রসাদ (clarity of senses), স্বরবর্ণবীজের উৎকর্ষ (excellence of voice and seeds), শুক্রশোণিতের উৎকর্ষ এবং প্রফুল্লচিত্ততার আধিক্য (excessive sex-vigor)।

৫. গর্ভের রসজ অংশ : 'শরীরস্যাভিনির্ব্বৃত্তিরভিবৃদ্ধিঃ প্রাণানুবন্ধস্তৃপ্তিঃ পুষ্টিরুৎসাহশ্চেতি রসজানি'।[২৯]

গর্ভের যা যা রসজ অর্থাৎ গর্ভের জন্মকালে যা যা রস হইতে উৎপন্ন হয় তা হল— শরীরের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি (manifestation and growth in height of the body), প্রাণানুবন্ধ অর্থাৎ প্রাণধারণ (continuity of the strength), তৃপ্তি (satisfaction), পুষ্টি (nutrition) ও উৎসাহ (enthusiasm)।

৬. গর্ভের সত্ত্বজ অংশ : 'ভক্তিঃ শীলং শৌচং দ্বেষঃ স্মৃতির্মোহস্ত্যাগো মাৎসর্য্যং শৌর্য্যং ভয়ং ক্রোধস্তন্দ্রা উৎসাহস্তৈক্ষ্ণ্যং মার্দ্দবং গাম্ভীর্য্যমনবস্থিতত্বমিত্যেবমাদয়শ্চান্যে তে সত্ত্বজা বিকারা যানুত্তরকালং সত্ত্বভেদমবিকৃত্য উপদেক্ষ্যাম ইতি সত্ত্বজানি'।[৩০]

গর্ভের যেগুলি সত্ত্বজ অংশ অর্থাৎ গর্ভের জন্মকালে যা যা মন থেকে উৎপন্ন হয়, তা হল– ভক্তি (devotion), শীলতা (grace), শুচিত্ব (purity), দ্বেষ (enemity), স্মৃতি (memory), মোহ (attachment), ত্যাগ (detachment), মাৎসর্য (strong desire not to part with), শৌর্য (valour), ভয় (fear), ক্রোধ (anger), তন্দ্রা (drowsiness), উৎসাহ (enthusiasm), তীক্ষ্ণতা (sharpness), মৃদুতা (softness), গাম্ভীর্য (seriousness), অনবস্থিতা এবং অন্যান্য গুণ প্রভৃতি (unstability and such other manifestations of the mind which will be described later while discussing the various types of mind)।

বিকৃত ব্যক্তিবর্গের স্বরূপ জানার পূর্বেই মনে রাখা দরকার যে স্ত্রীগণ কী কারণে বিকৃত, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ ও বিকৃতেন্দ্রিয় সন্তান প্রসব করে তার কারণস্বরূপ *চরকসংহিতার* 'শরীরস্থান' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে–

> বীজাত্মকর্ম্মাশয়কালদোষৈমাতুস্তদাহার বিহারদোষৈঃ।
> কুর্ব্বন্তিদোষা বিবিধানিদুষ্টাঃ সংস্থানবর্ণেন্দ্রিয়বৈকৃতানি।।[৩১]

অর্থাৎ বীজ, শুক্র, শোণিত, আত্মকর্ম, গর্ভাশয় ও কালের দোষ এবং মাতার আহার-বিহারের দোষ, এই সকল কারণে বাতাদি দোষে দূষিত হয়ে গর্ভের আকৃতি, বর্ণ ও ইন্দ্রিয়ের বিবিধ বিকৃতি হয়। যে কারণে গর্ভ সমূলে নষ্ট না হয়ে বিকৃত প্রাপ্ত হয়, তার ছয়টি কারণ হল নিম্নরূপ—

প্রথমত, দোষপ্রকোপক দ্রব্যসমূহ সেবন করলে স্ত্রীর দোষসকল কূপিত হয়ে শরীরে বিসর্পণ করে এবং শোণিত ও গর্ভাশয়কে দূষিত করে থাকে। কিন্তু শোণিত গর্ভাশয় সম্পূর্ণরূপে দূষিত করতে পারে না। তৎকালে সেই স্ত্রী গর্ভধারণ করলে গর্ভের অবয়বাদিগের মধ্যে কোন এক বা ততোধিক অবয়ব বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। এ প্রসঙ্গে *চরকসংহিতায়* উল্লিখিত হয়েছে— 'যদা স্ত্রিয়া দোষপ্রকোপনোক্তান্যাসেবমানায়া দোষাঃ প্রকুপিতাঃ শরীরমুপসর্পন্তঃ শোণিতগর্ভাশয়ৌ দূষয়ন্তি তদা যং গর্ভং লভতে স্ত্রী তদা গর্ভস্য মাতৃজানামবয়বানামন্যতমোঽবয়বো বিকৃতিমাপদ্যতে একোঽথবানেক'।[৩২]

দ্বিতীয়ত, গর্ভের যে অবয়ব বীজের যে অংশ থেকে উৎপন্ন হয়, বীজের সেই অংশ দূষিত হলে গর্ভের সেই অবয়ব বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। এ প্রসঙ্গে *চরকসংহিতায়* উল্লেখিত হয়েছে— 'অস্য যস্য হ্যবয়বস্য বীজে বীজভাগে বা দোষাঃ প্রকোপমাপদ্যন্তে তৎ তমবয়বং বিকৃতিরাবিশতি'।[৩৩]

তৃতীয়ত, যে স্ত্রীর শোণিত গর্ভাশয় ও বীজভাগ দূষিত হয়ে যায়, সেই স্ত্রী বন্ধ্যা কন্যা প্রসব করে। আবার যখন স্ত্রীর শোণিত গর্ভাশয় ও বীজভাগের অবয়ব বিশেষ প্রদোষপ্রাপ্ত হয় তখন সেই স্ত্রী পূতিপ্রজা হয় অর্থাৎ দুর্গন্ধি সন্তান প্রসব করে। এ প্রসঙ্গে *চরকসংহিতায়* উল্লেখিত হয়েছে— 'যস্যাঃ হ্যস্যাঃ শোণিতগর্ভাশয়বীজভাগঃ প্রদোষমাপদ্যতে তদা বন্ধ্যাং জনয়তি। যদা পুনরস্যাঃ শোণিতে গর্ভাশয়বীজভাগাবয়বঃ প্রদোষমাপদ্যতে তদা পূতিপ্রজাং জনয়তি'।[৩৪]

চতুর্থত, যখন শোণিত গর্ভাশয় ও বীজভাগের অবয়ব বিশেষ এবং স্ত্রীজনক বীজভাগের একদেশ প্রদূষিত হয়, তখন সেই স্ত্রীলোকের আকৃতি বহুল কিন্তু স্ত্রীলক্ষণাক্রান্ত নয় এইরূপ বার্তা নামক নপুংসক বিশেষ উৎপাদন করে; ইহাকে স্ত্রীব্যাপৎ বলে। এ প্রসঙ্গে *চরকসংহিতায়* উল্লেখিত হয়েছে— 'যদা ত্বস্যাঃ শোণিত-গর্ভাশয়-বীজভাগাবয়বঃ স্ত্রী-করাণাঞ্চ শরীরবীজভাগানামেকদেশঃ প্রদোষমাপদ্যতে তদা স্ত্র্যাকৃতিভূয়িষ্ঠামস্ত্রিয়ং বার্ত্তা নাম জনয়তি তাং স্ত্রীব্যাপদমাচক্ষতে'।[৩৫]

পঞ্চমত, পুরুষের বীজভাগ দূষিত হলে পিতৃজ অবয়বসমূহের বিকৃতি হয়, এইরূপ স্থলেও ম্রিয়মাণ বা ক্লিন্নাঙ্গ সন্তান উৎপন্ন হয়। প্রাসঙ্গিক *চরকসংহিতায়* উল্লেখ্য— 'এবমেব পুরুষস্য বীজদোষে পিতৃজাবয়ববিকৃতিং বিদ্যাৎ যদা পুনরস্য বীজে বীজভাগাবয়বঃ প্রদোষমাপদ্যতে তদা পূতিপ্রজাং জনয়তি'।[৩৬]

ষষ্ঠত, শোণিত শুক্রাত্মক বীজে শুক্ররূপ বীজ-জনক অংশ দূষিত হলে ও আনুষঙ্গিক পুংচিহ্নকারক বীজাংশ দূষিত হলে পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট অথচ অ-পুরুষ তৃণপুলিকনামক সন্তান উৎপন্ন হয়; ইহাকে

'পুরুষব্যাপৎ' বলে। প্রাসঙ্গিক *চরকসংহিতায়* উল্লেখ্য— 'যদা ত্বস্য বীজে বীজভাগাবয়বঃ পুরুষকরাণাঞ্চ শরীরবীজভাগানামেকদেশঃ প্রদোষামাপদ্যতে। তদা পুরুষাকৃতিভূয়িষ্ঠমপুরুষং তৃণপুলিকং নাম জনয়তি তাং পুরুষব্যাপদমাচক্ষতে'।[৩৭]

পুনরায় গর্ভ বিকৃতির তুলনা প্রসঙ্গে *চরকসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> বর্ষাসু কাষ্ঠাশ্মঘনাম্বুবেগাস্তরোঃ সরিৎস্রোতসি সংস্থিতস্য।
> যথৈব কর্ষ্যুব্বিকৃতিং তথৈব গর্ভস্য কুক্ষৌ নিয়তস্য দোষাঃ।।[৩৮]

অর্থাৎ বর্ষাকালে কাষ্ঠ প্রস্তর মেঘ ও জলবেগ, নদীস্রোতঃস্থিত বৃক্ষের যেরূপ বিকৃতি সাধন করে; সেইরূপ বাতাদিদোষে কুক্ষিস্থিত গর্ভের বিকৃতি সম্পাদন করে থাকে।

পুনরায় *মনুসংহিতার* 'প্রায়শ্চিত্তবিধি' নামক একাদশ অধ্যায়ে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের উৎপত্তির কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে—

> ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্বকৃতৈস্তথা।
> প্রাপ্নুবন্তি দুরাত্মানো নরা রূপবিপর্যয়ম্।।[৩৯]

অর্থাৎ অধার্মিক লোকদের মধ্যে কেউ কেউবা ইহজন্মের পাপাচরণের ফলে এবং কেউ বা জন্মান্তরীয় পাপাচরণের ফলে শরীরের মধ্যে কুনখী প্রভৃতি হয়ে রূপবিপর্যয় প্রাপ্ত হয়। রূপবিপর্যয় প্রসঙ্গে *'মেধাতিথিভাষ্যে'* বলা হয়েছে–'ইহ জন্মনি নিষিদ্ধাচরণৈঃ কেচিৎ পূর্বজন্মকৃতৈঃ দুষ্টস্বভাবা মনুষ্যাঃ কৌনাখ্যাদিকং রূপবিপর্য্যং প্রাপ্নুবতী'। 'কৌনাখ্যাদিকং' এর অর্থ– রোগগ্রস্থ নখ (Disesed Nails)।[৪০]

পুনরায় যে লোক ব্রাহ্মণের সোনা চুরি করেছে সে তার দেহে কুনখিত্ব (Disesed Nails) প্রাপ্ত হয়, যে সুরাপান করে যে শ্যাবদন্ত অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ দন্ত বিশিষ্ট (Black Teeth) হয়, ব্রাহ্মণহত্যারূপ দুষ্কর্মের ফলে অপরাধী ক্ষয়রোগগ্রস্ত হয় এবং গুরুর পত্নীর সাথে সঙ্গমকারী ব্যক্তি দুশ্চর্মা (অর্থৎ পুরুষাঙ্গ চর্মাবরণশূন্য) হয়। পিশুনের (অর্থাৎ অন্যের কাছে কোনও লোকের অসাক্ষাতে তার অলীক কাল্পনিক দোষ যে কীর্তন করে, তার) পূতি-নাসিকতা (Foulsmelling Nose) হয়; সূচকের (অর্থাৎ কোনও লোকের যথার্থ দোষগুলি তার অসাক্ষাতে যে অন্যের নিকট বর্ণনা করে

তার) পূতিবক্ত্রতা হয় অর্থাৎ সে দুর্গন্ধ-মুখত্ব প্রাপ্ত হয়। যে ধান্যাদি শস্য অপহরণ করে সে অঙ্গহীন হয় এবং মিশ্রক (অর্থাৎ লাভের জন্য যে লোক একটি জিনিসের সাথে অন্য অপদ্রব্য ভেজাল দিয়ে বিক্রয় করে, সে) অধিকাঙ্গতা (একটি-দুটি বেশী আঙুল বেশী থাকা রূপ দোষ) প্রাপ্ত হয়। উপযুক্ত যেসকল শ্রেণির মানুষদের বিকলতা প্রসঙ্গে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে—

সুবর্ণচৌরঃ কৌনখ্যং সুরাপঃ শ্যাবদন্ততাম্।
ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগিত্বং দৌশ্চর্ম্যং গুরুতল্পগঃ।।
পিশুনঃ পৌতিনাসিক্যং সূচকঃ পূতিবক্ত্রতাম্।
ধান্যাচৌরাঽঙ্গহীনত্বমাতিরৈক্যং তু মিশ্রকঃ।।[৪১]

'মেধাতিথিভাষ্যে' বলা হয়েছে— 'ব্রাহ্মণ-সুবর্ণচৌরঃ কুৎসিত-নখত্বং প্রাপ্নোতি, নিষিদ্ধ-সুরাপঃ শ্যাবদন্ততাং, ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগিত্বং, গুরুভার্যাগামী বিকোষমেহনত্বম্। পিশুনো বিদ্যমান-দোষাভিধায়ী দুর্গন্ধ-নাসত্বম্, অবিদ্যমান-দোষাভিধায়কো দুর্গন্ধ-মুখত্বং, ধান্যচৌরোঽঙ্গহীনত্বং ধান্যাদেরপরদ্রব্যেণ মিশ্রণকর্তা অতিরাঙ্গত্বম্ প্রাপ্নোতি'।[৪২]

পুনরায় *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে—

অন্নহর্তাময়াবিত্বং মৌক্যং বাগপহারকঃ।
বস্ত্রাপহারকঃ শ্বৈত্রং পঙ্গুতামশ্বহারকঃ।।
দীপহর্তা ভবেদন্ধঃ কাণো নির্বাপকো ভবেৎ।
হিংসয়া ব্যাধিভূয়স্ত্বং স্ফীতোঽনস্ত্র্যভিমর্ষকঃ।।[৪৩]

অর্থাৎ যে সকল মনুষ্য অন্যের অন্ন অপহরণ করে সে আময়াবী অর্থাৎ অজীর্ণ রোগী (Dyspepsia) ও গরুর বিনানুমতিতে অন্যের বেদপাঠ শুনে বেদাধ্যয়নকারী ব্যক্তি মূকতা অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের বিকলতা (Dumbness) প্রাপ্ত হয়; অন্যের কাপড়-চোপড় অপহরণ করলে সেই ব্যক্তি শ্বেতকুষ্ঠ রোগগ্রস্ত (White Leprosy) হয়; এবং অন্যের ঘোড়া চুরি করলে ঐ চোর পঙ্গুতা (Lameness) প্রাপ্ত হয়। প্রদীপ চোর অন্ধ হয়, প্রদীপনির্বাণকারী ব্যক্তি কাণা অর্থাৎ একনেত্র হয়, প্রাণিহিংসাকারী বহুরোগগ্রস্ত এবং পরস্ত্রীকে ধর্ষণকারী ব্যক্তি বাতব্যাধিতে স্থূলদেহ হয়। উপরিউক্ত বিকৃত ব্যক্তির বিকলতা হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে '*মেধাতিথিভাষ্যে'* বলা হয়েছে—"অন্নচৌরো মন্দানলত্বম্, অনুনজ্ঞাতাধ্যায়ী মূকত্বং বস্ত্রচৌরঃ শ্বেতকুষ্ঠত্বম্, অশ্বচৌরঃ খঞ্জত্বং প্রাপ্নোতি। দীপচৌরোঽন্ধো নেত্রেন্দ্রিয়বিকলো ভবেৎ,

দীপনির্বাণকারী কাণ একনয়নো ভবেৎ। বিশেষাতিরিক্তপ্রাণিনাং হিংসয়া রোগবাহুল্যম্, অন্যদারাভিমর্ষণাৎ বাতব্যাধিনা স্ফীতঃ স্থূলদেহো ভবেদিতি পূর্বেণান্বয়ঃ''।[৪৪]

উপর্যুক্ত বিশেষ বিশেষ দুষ্কর্মের ফলে মানুষকে জড়, মূক, অন্ধ, বধির ও বিকৃত আকৃতিযুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং তারা সাধুজনের দ্বারা নিন্দিত হন। প্রসঙ্গক্রমে *'মনুসংহিতায়'* বলা হয়েছে—

> এবং কর্মবিশেষেণ জায়ন্তে সদ্বিগর্হিতাঃ।
> জড়মূকান্ধবধিরা বিকৃতাকৃতয়স্তথা।।[৪৫]

পুনরায় সকল মনুষ্যের দুষ্কর্মের ফল হিসাবে *'মেধাতিথিভাষ্যে'* বলা হয়েছে— 'এবং ঋদ্ধি-বাক্-চক্ষুঃ-শ্রোত্র-বিকলাবিকৃতরূপাঃ-সাধুবিগর্হিতাশ্চ-প্রাগ্-জন্মার্জিতোপভুক্ত দুষ্কৃতশেষেণোৎপদ্যন্তে'।[৪৬]

১.৩. বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের স্বরূপ নিরূপণ :

বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের স্বরূপ নির্ণয় পূর্বে জানা উচিত। 'বিকৃতি' প্রসঙ্গে *চরকসংহিতার* 'ইন্দ্রিয়স্থান' নামক খণ্ডের 'বর্ণস্বরীয়' নামক অধ্যায়ে 'বিকৃতি'কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে; সেই প্রসঙ্গে *চরকসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> বিকৃতিঃ পুনর্লক্ষণনিমিত্তা চ লক্ষ্যনিমিত্তা চ নিমিত্তানুরূপা চ।[৪৭]

অর্থাৎ 'বিকৃতি' তিন প্রকার; যথা– ক. লক্ষণনিমিত্ত খ. লক্ষ্যনিমিত্ত গ. নিমিত্তানুরূপ।

ক. লক্ষণনিমিত্ত বিকৃতি :

> লক্ষণনিমিত্তা নাম সা যস্যাঃ শরীরে লক্ষণান্যেব হেতুভূতানি ভবন্তি।[৪৮]

শরীরে সৌভাগ্যাদির হেতুভূত যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, তাদের বিকৃতি হলে সেই বিকৃতিকে লক্ষণনিয়ত বলা যায়। শরীরগত লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্নসমূহ বিকৃতির হেতু দেখা যায় যে, শরীরের কোন কোন লক্ষণ শরীরে সময়ে সময়ে উদিত হয় এবং উদিত হয়ে কোন কোন বিকার উৎপাদন করে। যেমন– রোগাদি।

খ. লক্ষ্যনিমিত্ত বিকৃতি :

লক্ষ্যনিমিত্তা তু সা, যস্য উপলভ্যতে নিমিত্ত যথোক্তং নিদানেষু।[৪৯]

যে বিকৃতির নিদান রোগনিদানকালে উল্লিখিত হয়েছে, তাই লক্ষ্যনিমিত্ত বিকৃতি। যথা— বাতাদির প্রকোপ বিকৃতি ও রুক্ষাদিসেবন সেই বিকৃতির নিদান।

গ. নিমিত্তারূপ বিকৃতি :

নিমিত্তানুরূপা তু নিমিত্তার্থানুকারিণী যা তামনিমিত্তাং নিমিত্তমায়ুষঃ প্রমাণজ্ঞানস্যেচ্ছন্তি ভিষজো ভূয়শ্চায়ুষঃ ক্ষয়নিমিত্তাং প্রেতলিঙ্গানুরূপাং যামায়ুষোঽন্তর্গতস্য জ্ঞানার্থমুপদিশন্তি ধীরাঃ।[৫০]

যে বিকৃত অকারণে উৎপন্ন হয়ে আয়ুর প্রমাণজ্ঞানের কারণ হয় অথবা আয়ুক্ষয়ই যে বিকৃতির কারণ ও যাহা প্রেতলিঙ্গের অনুরূপ অর্থাৎ মুমূর্ষুর মরণবোধক এবং পুরুষাশ্রিত যে সমস্ত মুমূর্ষু লক্ষণ অতঃপর বর্ণিত হবে, অন্তর্গত আয়ু জ্ঞানের জন্য সেই সকল বিকৃতিকেই চিকিৎসকগণ নিমিত্তানুরূপ বিকৃতি বলে থাকেন।

অতএব উপরিউক্ত তিন প্রকার বিকৃতির কথা বলা হলেও ইন্দ্রিয় ভেদে বিকৃতি মূলতঃ চার প্রকার; তা হল—

১. দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা (Visual Impairment)।

২. শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা (Hearing Impairment)।

৩. অস্থিগত প্রতিবন্ধকতা (Loco-motor Impairment & Cerebral Palsy)।

৪. মানসিক প্রতিবন্ধকতা (Mental Retardation and Mental Illness)।

১.৩.১. দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা (Visual Impairment) : দৃষ্টি বিষয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আলোর উপস্থিতি একেবারে বুঝতে পারে না অথবা অল্প বোঝে। যেসকল ব্যক্তিগণ অল্প দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, তাদের ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন (Low Vision) বলা হয়। তারা খুব কাছের বস্তু দেখতে পায় বা অনেক বড়ো হরফ দেখতে পায়। যারা আলো একেবারে বুঝতে পারে না তাদের অন্ধ বা Blind বলা হয়। দৃষ্টিশক্তি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিমাপ করে দৃষ্টিহীন এবং ক্ষীণদৃষ্টির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা

হয়েছে। সাধারণ ব্যক্তি ৬০ মিটার বা ২০০ ফুট দূরের যেকোন বস্তুকে খালি চোখে পরিষ্কার দেখতে পায়। কোন ব্যক্তি যদি চশমা পরেও ৬ মিটার বা ২০ ফুটের দূরত্বের বস্তুকে অপেক্ষাকৃত ভালো চোখ দিয়ে না দেখতে পায় তবে তাকে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী বলা যায়। এছাড়াও যাদের দৃষ্টির কৌণিক প্রসারতা (Field of Vision) ২০ ডিগ্রি বা তার কম, তাদেরও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলা হবে।[৫১]

১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের *Persons with Disabilities Act* অনুযায়ী দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা[৫২] বিষয়ে বলা হয়েছে—

Blindness refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions, namely:

1. Total absence of light; or
2. Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (Snellen) in the better eye even with correction lenses; or
3. Limitations of the field of vision subtending an angle of 20 degree or worse.

ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কাছের জিনিস দেখতে পায়, আলো কতটা আছে, বস্তুটি কতো বড়ো বা কীরকম তার উপর নির্ভর করে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ক্ষীণদৃষ্টির যে কার্যকরী সংজ্ঞা (International Classification of Diseases – ICD) দিয়েছেন তা হল নিম্নরূপ—

'A person with low vision is one who has impairment of visual functioning even after treatment, and or standard refractive correction, and has a visual acuity of less than 6/18 to light perception or a visual field of less than 10 degrees from the point of fixation, but who uses or is potentially able to use, vision for the planning and execution of a task'.[৫৩]

১.৩.১.১. দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Visual Impairment) : Barrage Erin ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের কোন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান প্রয়োজন এবিষয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার শ্রেণিবিন্যাস করেছেন।[৫৪] শ্রেণিবিন্যাসগুলি হল নিম্নরূপ—

ক. দৃষ্টিজনিত প্রতিবন্ধকতা (Visually Handicapped) : সেইসব ব্যক্তিদের বলা হবে যাদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

খ. অন্ধ (Blind) : যে সকল ব্যক্তির কোনরকমভাবে আলোর অনুভূতি হয় না বা যারা আলো-অন্ধকারের মধ্যে তফাৎ করতে পারে না, তাদের শিক্ষার জন্য ব্রেইল (Braille) বা অদৃষ্টিজনিত শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করতে হয়।

গ. ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন : এদের কিছুটা কার্যকরী স্বল্প দৃষ্টিশক্তি আছে। সেটা স্বল্প দূরত্ব হতে পারে, বড়ো অক্ষর হতে পারে কিংবা ঝাপসা দর্শন (Blurred Vision) হতে পারে প্রভৃতি। তাই এরা পুরোপুরি ব্রেইল নির্ভর না হয়েও লেখাপড়া করতে পারে।

১.৩.১.২. দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার কারণ (Causes of Visual Impairment) : দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার কোন সুস্পষ্ট কারণ কী এ নিয়ে এখনও বিজ্ঞানীরা কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। আর্থসামাজিক পরিকাঠামো, জলবায়ু, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদির বিভিন্নতা কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে, বিভিন্ন সমাজে নির্দিষ্ট কোন কারণে সমহারে দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, এ কথাও বলা যায় না। বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষার ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল—

ক. বংশগত ও গঠনগত কারণ : দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল বংশগত কারণ ও চোখের গঠনগত কারণ। বংশগত কারণ প্রসঙ্গে শিশুর জন্মের সময় জিন বাহিত যে বংশগতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তার কিছু ত্রুটি। Fraser & Friedman এর সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রায় ৪২.১% শিশুর দৃষ্টিহীনতার কারণ বিভিন্ন প্রকার বংশগত বা জেনেটিক রোগ। এদের মধ্যে ৫% ক্ষেত্রে রেটিনোব্লাস্টোমা রোগে শিশুদৃষ্টিহীন হয়। এই বংশগত রোগটি মেন্ডেলীয় প্রকট চরিত্রের, কখনো কখনো ব্যক্তির মধ্যে এই রোগটি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মে রোগটি আত্মপ্রকাশ করে এবং শিশুর দৃষ্টিহীনতার কারণ হয়। সাধারণত শৈশবে বা প্রাক্-বাল্যকালে এই রোগটির প্রকাশ ঘটে। এই রোগে চোখের রেটিনাতে অত্যন্ত ক্ষতিকারক টিউমার-এর সৃষ্টি হয়, ফলে চোখকে একেবারে তুলে ফেলতে হয়। এই রোগে শিশু একেবারেই তার দৃষ্টিশক্তি হারায়, তবে আধুনিক চিকিৎসায় এর বৃদ্ধিকে রোধ করা সম্ভব হয়েছে।[৫৫]

শিশুর জন্মগত ও শৈশব-ছানিও একটি বংশগত রোগ। শৈশবকালীন ডায়াবেটিস কারণেও চোখে ছানি পড়তে পারে। এছাড়াও রেটিনাইটস, পিগমেনটোসা, টোসিস, অ্যালবিনিজম প্রভৃতি বংশগত রোগও শিশুর দৃষ্টিহীনতার কারণ।

গঠনগত দিক থেকে বলা যায়, যদি চোখের আকৃতি সঠিক না হয়, চোখের মণি যদি অত্যধিক ছোটো হয়, মস্তিষ্কের গঠনগত ত্রুটি, সঞ্চালনকারী পেশির ত্রুটির জন্য চক্ষুদ্বয়ের অক্ষিগোলকের মধ্যে নড়াচড়া না করতে পারা ইত্যাদি কারণেও দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে।

খ. সাধারণ কারণসমূহ : দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার সাধারণ কারণসমূহকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়, তা হল নিম্নরূপ—

I. **শিশু জন্মের পূর্ববর্তী কারণসমূহ :** জন্ম পূর্ববর্তী কারণগুলোর মধ্যে প্রধান কারণ হল গর্ভবতী মায়ের বিভিন্ন প্রকার উপসর্গ। Fraser & Friedman এর সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রায় ৬% এর কমসংখ্যক শিশুর দৃষ্টিহীনতার কারণ মায়ের গর্ভাবস্থায় রুবেলা, সিফিলিস্, গুটিবসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ। এছাড়াও মা গর্ভাবস্থায় টক্সোপ্লাজমোসিস্, সাইটোমেগালো ভাইরাস, হার্পিস সিমপ্লেক্স বা গনোরিয়া প্রভৃতিতে আক্রান্ত হলে শিশু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী জন্মায়। গর্ভাবস্থায় মায়ের শরীরে পরিবেশের ক্ষতিকারক উপাদানের প্রবেশ, অ্যালকোহল পান, শরীরে তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রবেশ, মায়ের অপুষ্টি, গর্ভকালীন মায়ের বয়স, পিতামাতার রক্তের শ্রেণী ও রেসাস্ ফ্যাক্টর এর অসামঞ্জস্য নবজাতকের দৃষ্টিহীনতার কারণ।[৫৬]

II. **শিশু জন্মকালীন কারণসমূহ :** শিশুর জন্মের সময় যদি কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় (অক্সিজেনের অভাব, মাতৃ গর্ভে শিশুর গলায় নাড়ি প্যাঁচানো), তাহলেও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হয়। সাধারণত Fraser & Friedman এর সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রায় ৩৩.২% দৃষ্টিহীনতার কারণ শিশুর জন্মকালীন কোন সমস্যা। সাধারণত কম ওজনের ও অপরিণত কোন শিশু জন্মালে ইনকিউবেটর যন্ত্রে রাখার সময় তার জীবনকে বাঁচানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন দিতে হয়; ফলে শিশুর রেটিনা ও ভিট্রিয়াস বডি আক্রান্ত হয়ে শিশু রেট্রোলেন্টাল ফাইব্রোপ্লাবিয়া নামক রোগে আক্রান্ত হয় এবং পুরোপুরি দৃষ্টিশক্তি হারায়।

শিশুর জন্মের সময় মাতৃযোনিতে গনেরিয়া বা অন্যান্য ধরণের সংক্রমণ থাকলে, তা থেকেও শিশুর জন্মগত কনজাংটিভাইটিস রোগ দেখা দিতে পারে। এই রোগে চোখের কর্নিয়াতে আলসার হয়ে কর্নিয়া অস্বচ্ছ ও ফুটো হয়ে যেতে পারে এবং শিশু দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতে পরিণত হতে পারে।[৫৭]

III. **শিশু জন্মের পরবর্তীকালীন এবং দুর্ঘটনা জনিত কারণ :** শিশুর জন্মের পরবর্তীকালের বিভিন্ন কারণ যেমন দুর্ঘটনাজনিত কোন আঘাত, চোখে বহিরাগত কোন পদার্থের উপস্থিতি, সংক্রামক কোন জীবাণু, ভাইরাস বা ছত্রাক, চোখের টিউমার, চোখের রক্তনালীর কোন রোগ, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ইত্যাদি কারণেও শিশুর বিভিন্ন চক্ষুরোগ ও তৎজনিত অন্ধত্ব আসতে পারে। Fraser & Friedman এর গবেষণায় জানা গেছে যে প্রায় **১১.৩%** শিশুর দৃষ্টিহীনতার কারণ জন্মের পরবর্তীকালের বিভিন্ন কারণ। শিশুর বারংবার উদারময় বা ডায়রিয়া, শরীরে ভিটামিন অভাব, বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগের আক্রমণ, বহুমূত্ররোগ বা ডায়াবেটিস মেলাইটাস রোগ, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, চোখে বা মস্তিষ্কে কোন আঘাত, চোখের বা মস্তিষ্কের টিউমার, লেন্সের প্রতিসরণজনিত ত্রুটি শিশুর দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার জন্য দায়ী হতে পারে।[৫৮]

১.৩.১.৩. দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Visually Impairment) : মানুষের পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে অন্যতম গুরত্বপূর্ণ একটি ইন্দ্রিয় হল চক্ষু। যে কোন বস্তুর প্রতিমূর্তি সম্পর্কে ধারণা প্রধানত চক্ষু যুগলের উপর নির্ভরশীল। দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা এক্ষেত্রে প্রধান বাধা, ফলে এই জাতীয় শিশুরা বাস্তব জগতের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে স্বভাবতই বঞ্চিত হন। পরিবেশের সঙ্গে সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ অভিযোজন তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব হয় না।

যে কোন সমাজের চিন্তাধারা কিছু ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক ধারণার উপর নির্ভরশীল। যদিও এই একবিংশ শতকেও কিছু সংখ্যক মানুষ আছেন যারা বিশ্বাস করেন, অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার মতো দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাও পূর্বজন্মের পাপের ফল। এই ধরণের বদ্ধ ধারণা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব গঠনে প্রধান অন্তরায়; যার ফলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে।

অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, সমাজের সদস্যরা তো বটেই, পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যরাও কোন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুকে অত্যন্ত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন এবং সঠিক যত্ন ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। আবার কখনো কখনো বৈপরিত্য ঘটে থাকে, যখন দেখা যায় পিতা-মাতা তার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি অত্যন্ত বেশি পরিমাণে যত্নবান হয়ে থাকেন যে আত্মনির্ভরশীলতা গঠনের কোন সুযোগই শিশুটির থাকে না। এই উভয় কারণেই কোন একটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়; ফলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুটির মধ্যে সৃষ্টি হয় কিছু আচরণগত সমস্যা।

স্বাভাবিক শিশু ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর বুদ্ধির দিক থেকে উল্লেখ্যযোগ্য কোন পার্থক্য দেখা যায় না। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর বুদ্ধির প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে; যেহেতু দর্শনেন্দ্রিয় ছাড়াই তাদের ধারণা গঠন করতে হয়, তাই ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে তাদের অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। ধারণা বিকল্প হিসাবে স্পর্শেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে। দর্শনেন্দ্রিয়ের বিকল্প হিসাবে স্পর্শেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভর করার ফলে, উক্ত ইন্দ্রিয়গুলির প্রখরতা অনেক বেশি হয়।

সবশেষে বলা যায়, সভ্যতার অগ্রগতি এবং নানা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে দৃষ্টিহীনদের প্রতি সমাজের চিন্তাধারা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই আশা করা যায়, এই শিশুরা ক্রমে তাদের হীনম্মন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারে এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহের পরিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের প্রতিবন্ধকতাকে জয় করতে পারে এবং শিক্ষা সহ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতির ধারা অব্যহত রাখতে সক্ষম হয়।

১.৩.১.৪. শনাক্তকরণ (Identification) :

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে দৃষ্টি সংক্রান্ত নানা সমস্যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিচারে দেখা যায়। তদনুযায়ী দৃষ্টি সম্পর্কিত সমস্যায় বৈশিষ্ট্যও নানারকম। এখানে সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ শ্রেণিকক্ষে পর্যবেক্ষণযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা পূর্বাভাসগুলি উল্লেখ করা হল[৫৯]–

১. ঘন ঘন চোখ লাল হওয়া, জলপড়া।

২. চোখ পিটপিট করা।

৩. চোখের খুব কাছে নিয়ে দেখার চেষ্টা।

৪. ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা দেখতে না পাওয়া।

৫. দৃশ্যবস্তুর কথা অন্যকে জিজ্ঞাসা করে জানার চেষ্টা।

৬. উজ্জ্বল দিনের আলোতেও আলোর অনুভূতি না হওয়া।

৭. ঝাপসা দেখা।

৮. চলাফেরায় পদে পদে বাধা পাওয়া এবং স্পর্শ করে চলার পথ নির্ণয়ের চেষ্টা করা।

৯. উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি।

১০. সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও আচরণে অক্ষমতা ইত্যাদি।

১.৩.২. শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা (Hearing Impairment) : শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা বলতে বোঝায় শ্রবণ প্রক্রিয়ার কোন রকম ক্ষতি বা শ্রবণ প্রক্রিয়ার গঠনগত ত্রুটি। শ্রবণ প্রতিবন্ধী বলতে সেইসকল ব্যক্তিদেরকে বোঝায় যাদের শ্রবণ ক্ষমতা অতিসামান্য থেকে গুরুতর মাত্রা পর্যন্ত নষ্ট হয়েছে। যন্ত্রের কোন ত্রুটিজনিত কারণে কোন ব্যক্তি যখন শুনতে অসুবিধা বোধ করে, তদনুসারে শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা দুই ধরণের হতে পারে–

প্রথমত, শ্রবণ অক্ষমতা (Hard of Hearing) : যে সকল ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট উচ্চ মাত্রার শব্দ সরাসরি শুনতে পায় অথবা শ্রবণ যন্ত্রের সাহায্যে শুনতে পায়, সেই সকল ব্যক্তিদেরকে বোঝানো হয়।

দ্বিতীয়ত, বধিরতা : জন্ম থেকে যে সকল ব্যক্তিরা শ্রবণে অক্ষম অর্থাৎ যাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন কার্যকারিতা থাকে না, তাদের বধির বলা হয়।

শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার ধারণা দুইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়– শারীরবৃত্তীয় (Physiological) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিমাপের ভিত্তিতে শব্দের স্তর, যা ব্যক্তি শুনতে পায়, তার ভিত্তিতে এবং শিক্ষাগত (Educational) দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাবিজ্ঞানের ভাষায় শ্রবণ প্রতিবন্ধী বলতে বোঝায়–

- Deaf means a hearing impairment is so severe that the child is impaired in processing linguistic information, through audition. With or without hearing aid. (বধিরতা বলতে বোঝায়, এমন চরম শ্রবণ অক্ষমতা যে অবস্থায়, কোন শিশুর শ্রবণযন্ত্রসহ বা শ্রবণযন্ত্র ছাড়া ভাষাগত তথ্য আহরণ করতে অক্ষম হয়)।[৬০]

- A person who is hard of hearing generally, with the use of a hearing aid, has residual hearing sufficient to enable successful processing of linguistic information through audition. (যে ব্যক্তি শ্রবণে অক্ষম হওয়ায় অতিরিক্ত শ্রবণ যন্ত্র ব্যবহার করে শব্দ জ্ঞানের জন্য বা ভাষা জ্ঞানের জন্য যথেষ্ট জারণ করতে সক্ষম, তাকে বলা হয় বধির)।[৬১]

শব্দের মাত্রানুযায়ী সংজ্ঞার চেয়েও শ্রেণিবিভাগ করার ক্ষেত্রে বেশি সুপ্রযুক্ত।

১.৩.২.১. শ্রবণ অক্ষমতার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Hearing Impairment) : নিম্নলিখিত পর্যায় সারণীতে শব্দের মাত্রানুযায়ী শ্রেণিবিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যাবে।

শ্রবণের মাত্রানুযায়ী শ্রবণ অক্ষমতার শ্রেণিবিভাগ :

শ্রেণী	অপেক্ষাকৃত ভালো কানে শুনতে পাওয়া শব্দের মাত্রা	বৈশিষ্ট্য (ভাষাগত অক্ষমতা)
সামান্য (Slight)	২৭-৪০ dB	I. শোনার সামান্য অসুবিধা। II. কথা বুঝতে অসুবিধা।
মৃদু (Mild)	৪১-৫৫ dB	I. ৩-৫ ফুট দূরত্ব থেকে কথা বুঝতে পারে। II. ক্লাসের অর্ধেক কথা শুনতে পায় না। III. শব্দভাণ্ডার (Vocabulary) একটু কম।
যথেষ্ট (Moderate)	৫৬-৭০ dB	I. জোরে বললে শুনতে পায়। II. দলের সঙ্গে আলোচনায় অসুবিধা। III. কথা বলায় সমস্যা। IV. ভাষার বিকাশ অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

গুরুতর (Severe)	৭১-৯০ dB	I. ১ ফুট দূরত্ব থেকে জোরে কথা বলতে হয়। II. পরিবেশ থেকে আসা শব্দ বুঝতে পারে না। III. ত্রুটিপূর্ণ ভাষার বিকাশ।
মারাত্মক (Profound)	৯০ dB র উপর	I. অত্যন্ত জোরে শব্দ শুনতে পেলেও তার কোন অর্থ নেই। II. শোনার চেয়ে দেখার উপর নির্ভরশীল। III. ভাষার বিকাশ হয় না।

ভাষার বিকাশ এবং শ্রবণ অক্ষমতার উৎপত্তির ভিত্তিতে আরএকটি শ্রেণিবিভাজন বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানে (Development Psychology) অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তা হল নিম্নরূপ :

- **<u>প্রাক্-বাচনিক বধিরতা (Pre-speech or Pre-lingual Deafness)</u> :** জন্মসহজাত অথবা জন্মোত্তরকালীন বধিরতা যা শিশু কথা বলতে শেখার পূর্বেই দেখা যায়।
- **<u>বচনোত্তর বধিরতা (Post-lingual Deafness)</u> :** ভাষা শেখার পর কোন ব্যাধি, দুর্ঘটনা বা বয়স ইত্যাদি কারণে বধিরতা সৃষ্টি।

১.৩.২.২. শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার কারণ (Causes of Hearing Impairment) : শিশু বা ব্যক্তির শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা পেছনে বহু সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার সম্ভাব্য কারণগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। জন্মপূর্ব কারণসমূহ, জন্মকালীন কারণসমূহ এবং জন্ম পরবর্তী কারণসমূহ।

I. শিশুর জন্মপূর্ব কারণসমূহ : শিশুর জন্মপূর্ব যে সকল কারণ বধিরতার জন্য দায়ী, তা নিম্নে আলোচিত হল :

ক. <u>বংশগত বা জিনগত বধিরতা (Hereditary or genetic deafness)</u> : ১৯৬৭ সালে A. C. Proctor & B. Practor এর মতে প্রতি ২০০০ - ৬০০০ জন জীবিত শিশুর মধ্যে একজনের

কারণ বংশগত বা জিনগত বধিরতা। এই ধরণের বধিরতা উভয় কানে হয়, বধিরতার মাত্রা গভীর, অন্তঃকর্ণের ককলিয়া ও শ্রুতি স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং চিকিৎসায় এই ধরণের বধিরতা হতে শিশুকে মুক্ত করা যায় না। R.G. Fraser ১৯৬৪ সালে এবং W. B. Konigsmark ১৯৭২ সালে বলেন যে, গভীরমাত্রার শৈশবকালীন বধিরদের প্রায় ৪০% এর উৎস দেহকোষের প্রচ্ছন্ন জিন, ১০% এর উৎস দেহকোষের প্রকট জিন এবং ৩% এর উৎস যৌন সন্নিবদ্ধ জিন।[৬২]

খ. <u>রুবেলা সংক্রমণ (Rubella Infection)</u> : গর্ভাবস্থার প্রথম তিনমাসের মধ্যে বিশেষত গর্ভ শুরু হওয়ায় ১২-১৬ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভবতী মহিলা রুবেলা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হলে গর্ভস্থ ভ্রুণের ককলিয়া নষ্ট হয়ে শিশু সেনসরি নিউরাল বধির হয় অথবা শিশু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বা হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারে।[৬৩]

গ. <u>সাইটোমেগালো ভাইরাস (Cytomegalovirus Infection)</u> : গর্ভাবস্থায় সাইটোমেগালো ভাইরাসের দ্বারা মহিলাদের সংক্রমিত হওয়ার প্রবণতা অধিক হলেও গর্ভস্থ ভ্রুণের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভবনা তুলনামূলক হারে কম। ১৯৭৭ সালে A. R. Peterson তাঁর গবেষণাপত্রে বলেন যে, সাইটোমেগালো ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমিত শিশুর ২০-৫০% এর মধ্যে সেনসরি নিউরাল বধিরতা লক্ষ্য করা যায়।[৬৪]

ঘ. <u>টক্সোপ্লাজমোসিস ও হার্পিস সংক্রমণ (Toxoplasmosis & Herpes Infections)</u> : গর্ভাবস্থায় মা টক্সোপ্লাজমোসিস ভাইরাস বা হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হলে শিশু শ্রবণ প্রতিবন্ধী হয়।[৬৫]

ঙ. <u>সিণ্ড্রোমসমূহ (The Syndromes)</u> : কতগুলো সিণ্ড্রোম যেমন– ডাউনস্ সিণ্ড্রোম, আশারস সিণ্ড্রোম, টিচার কলিনসং প্রভৃতিতে শিশু বিভিন্ন মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধী হয়।

চ. <u>ওষুধ ও অ্যালকোহল সেবন</u> : গর্ভাবস্থায় মা ম্যাডিলোমাইড জাতীয় ঔষধ সেবন করলে এবং অতিরিক্ত অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় সেবন করলে জ্রূণের সম্মুখ, মধ্য বা অন্তঃকর্ণের গঠন বাধাপ্রাপ্ত হয়, এইজন্য শিশু গভীর মাত্রায় শ্রবণ প্রতিবন্ধী হয়।

ছ. অপুষ্টি ও RH অসামঞ্জস্যতা (Malnutrition & RH-Factor incompatibility) : যদি পিতা-মাতার রক্তের রেসাস্ শ্রেণীর অসামঞ্জস্য (পিতা RH+ ও মাতা RH-) এবং গর্ভবতী মা যদি অপুষ্টিতে ভোগেন, তাহলে গর্ভস্থ্ ভ্রূণের রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রাধিক্য ঘটায় এরূপ ক্ষেত্রে শিশু বধির ও অ্যাথিটয়েড স্প্যাস্টিট হতে পারে।

II. শিশুর জন্মকালীন কারণসমূহ :

ক. অপরিণত শিশুর জন্ম (Pre-maturity) : পরিপূর্ণ গর্ভকাল পূর্ণ হওয়ার বহু পূর্বে শিশুর জন্ম হলে ঐ শিশু স্বাভাবিকভাবে শ্বাসকার্য করতে পারে না ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে শিশু বধির হয়। বধিরতা প্রসঙ্গে ১৯৭৮ সালে প্রাশ্চাত্য পণ্ডিত D. Moores তাঁর *Mental Health and the Hearing Impared* গ্রন্থে বলেছেন – 'All through … prematurity is more common among the deaf population than among the normal hearing, the degree to which it is a causative factor is debatable'.[৬৬]

খ. জন্মকালীন শ্বাসকষ্ট (Anoxia) : প্রসবকাল বিলম্বিত হলে বা প্রসবকালীন কোন অসুবিধা দেখা দিলে বা শিশুর গলায় জন্মনাড়ি পেঁচিয়ে থাকলে নবজাতকের শ্বাসকষ্ট হয় এবং শিশুর মস্তিষ্কে ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে অক্সিজেনের অভাব ঘটে, ফলে মস্তিষ্ক বা স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শিশু বধির হয়।[৬৭]

গ. নবজাতকের জনডিস (Neonatal Jaundice) : জন্মকালে শিশুর যকৃৎ পরিণত না হলে নবজাতকের শারীরবৃত্তীয় জনডিস্ হয়, ফলে রক্তের লোহিত রক্ত কণিকাগুলো দ্রুত ভেঙে যায় এবং লোহিত রক্ত কণিকার বিলিরুবিন যকৃত হতে বৃক্কের মাধ্যমে রোচিত হয়। কিন্তু কোন কারণে বিলিরুবিনের রেচন ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হলে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রাধিক্য ঘটার ফলে মস্তিষ্কের ব্রেনস্টেম অংশের শ্রুতি স্নায়ুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে শিশু বধির হয়।[৬৮]

III. শিশু জন্মের পরবর্তীকালের কারণসমূহ :

ক. ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমণ (Viral Infections) : মাম্পস্ দ্বারা সংক্রমিত হলে শিশুর শ্রবণ ক্ষমতা নষ্ট হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে দুটো কানই সমভাবে নষ্ট নাও হতে পারে। এছাড়াও শিশু

হাম ভাইরাস (Measles) দ্বারা শিশু সংক্রমিত হলে অল্পসময়ের মধ্যে উভয় কানে শিশুর সেনসনিউরাল বধিরতা আসতে পারে। সাধারণতঃ হামের দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার পর শিশুর কানে পুঁজ (Othitis media) হয়, যার ফলে শিশুর কনডাকটিভ বধিরতা দেখা দিতে পারে।

শিশু মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হলে এবং ঠিক সময়মতো শিশুর উপযুক্ত চিকিৎসা না করলে শিশু গুরুতর মাত্রায় বধির হয় এবং অন্তঃকর্ণের ককলিয়া আক্রান্ত হওয়ায় শিশুর পক্ষে দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করা অসুবিধাজনক হয়। এছাড়াও এনকেফেলাইটিসে আক্রান্ত এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের আক্রমণের কারণেও শিশু বধির হতে পারে।

খ. ওষুধ (Medicine) : কতগুলো বহুল ব্যবহৃত ওষুধ যেমন স্ট্রেপটোমাইসিন, কুইনাইন, অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড ইত্যাদি শিশুর শরীরে প্রবেশ করলে, তা শিশুর পক্ষে বধিরতার কারণ হতে পারে।

গ. কানের ময়লা বা সেরুমেন (Cerumen) : কানের ময়লা বা সেরুমেন কানের মধ্যে জমে শক্ত হয়ে গেলে তা শব্দতরঙ্গ প্রবাহের বাধা সৃষ্টি করে; ফলে শিশুর শ্রবণশক্তি হ্রাস পায়।

ঘ. কানে বাহ্যিক পদার্থের প্রবেশ : চক, ছোট পেন্সিল, দেশলাই কাঠি, ছোটো পাথর, মাটি ইত্যাদি শিশুর কানে প্রবেশ করলে এবং অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগা, এলার্জি, গলা ফুলে যাওয়া ইত্যাদি কারণে মধ্যকর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং শিশু বধির হয়।

ঙ. শব্দদূষণ (Noise Pollution) : অত্যধিক জোরালো শব্দ নিয়মিত কোন ব্যক্তির কানে প্রবেশ করলে, তা বধিরতার কারণ হতে পারে। মাইক্রোফোন, টেপরেকর্ডার, যানবাহনের এয়ার হর্ন, বাজি পটকার শব্দ ইত্যাদি ব্যক্তির বধিরতার অন্যতম কারণ হিসেবে স্বীকৃত।[৬৯]

চ. Otitis Media : কানের ভেতরে বা বাইরের যে কোন অংশে সংক্রমণজনিত প্রদাহকে Otitis বলে। সাধারণত মধ্যকর্ণের কোন সংক্রমণ হতে যে পুঁজের সৃষ্টি হয়; তাকেই Otitis Media বলে। শিশুর বয়স, যৌনতা, জাতি (সাদা চামড়ার মানুষদের বেশি হয়), জিনগত উপাদান, আবহাওয়া, পরিবেশ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে এই রোগের ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে,

তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৮০ সালে প্রাশ্চাত্য গবেষক Teele এর লেখা *Epidemiology of otitis media in children* গ্রন্থে।[৭০]

জীবনের যে-কোন সময় শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ তীব্র করে ব্যক্তির সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু সবরকম শ্রবণ প্রতিবন্ধকতায় এটি ফলপ্রসূ হয় না।

১.৩.২.৩. শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Hearing Impaired) : শ্রবণ প্রতিবন্ধিদের কানে বাইরের শব্দ যতটা এবং যেভাবে পৌঁছায় তার ভিত্তিতে তাদের আচরণগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়।[৭১] সাধারণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল–

- শ্রবণের মাত্রা অনুযায়ী শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুরা ভাষার বিকাশ, কথা বলার ধরণ, শব্দ ও বাক্য ব্যবহারের প্রকৃতি নির্ভর করে। শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুরা প্রায়ই কম কথা বলে, বিকৃত উচ্চারণ ও বধিরতা থাকলে শারীরিক ভাষা (ইশারা, ইঙ্গিত ইত্যাদি) বেশি ব্যবহার করে।
- সামনের দিকে ঝুঁকে শোনার চেষ্টা করে, এছাড়া কানে হাত দিয়ে শোনার চেষ্টা করে।
- ক্লাসে অমনোযোগী হয়; অন্যের কথার অর্থবোধ হয় না।
- বধির শিশুদের মধ্যে সামাজিক আচরণ সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেয়।
- কখনো-কখনো প্রক্ষোভজনিত সমস্যা (অতি ক্রুদ্ধ আচরণ) দেখা দিতে পারে।
- লেখা ও দেখার উপর বেশি নির্ভরশীল।
- অন্যের ঠোঁট নাড়া দেখে বুঝতে চেষ্টা করে।
- পাঠ্য বিষয়ের স্মৃতি কম কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সামগ্রিকভাবে স্মৃতি দুর্বল।

১.৩.৩. অস্থিগত প্রতিবন্ধকতা (Loco-motor Impairment & Cerebral Palsy) : জন্মগতভাবে বা জন্মসূত্রে কোন ব্যক্তি হাতে-পায়ে বিকলগ্রস্ত হলে অথবা যেকোন দুর্ঘটনার ফলে হস্ত-পদাদি অস্থিবিশেষ বিকলগ্রস্ত হয়, এছাড়াও হাত-পায়ের যোগস্থল বা পেশী বিকল হলে, তখন তাকে বলে অস্থি প্রতিবন্ধকতা বা Loco-motor Impairment। The Rights of Persons with

Disabilities (RPWD) Act ২০১৬ অনুযায়ী Locomotor Disability এর সংজ্ঞা করা হয়েছে— 'Strictly speaking Locomotor Disability means problem in moving from one place to another - i. e. disability in legs. But, in general, it is taken as a disability related with bones, joints and muscles. It causes problems in person's movement (like walking, picking or holding things in hand etc).[৭২]

এছাড়াও যেসকল ব্যক্তির পেশি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যাহত হওয়ার ফলে সহজভাবে চলাফেরা করা, কাজ করা, কথা বলা, নানা ধরণের সঞ্চালনমূলক ক্রিয়া বিঘ্নিত হয়; যেহেতু মস্তিষ্কের এক-ধরণের পক্ষাঘাত বা অকর্মণ্যতা থেকে এই সমস্যা সৃষ্টি হয়, সেহেতু একে স্নায়বিক বৈকল্য (Neurological Impairment) বলা হয়। এর সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত নাম সেরিব্রাল পালসি (Cerebral Palsy)। The Rights of Persons with Disabilities (RPWD) Act ২০১৬ অনুযায়ী Cerebral Palsy (CP) এর সংজ্ঞা করা হয়েছে – 'Cerebral Palsy (CP) is a disabling physical condition in which muscle coordination in impaired due to damage to the brain. It occurs at or before child birth. Cerebral Palsy is not a progressive condition; meaning it does not get worse with time. However, muscle disuse could increase the extent of disability over the period time. At present there is no cure available for this condition. Thus, Cerebral Palsy is incurable and life-long condition, at present'.[৭৩]

১.৩.৩.১. অস্থিগত প্রতিবন্ধকতার (Loco-motor Impairment & Cerebral Palsy) শ্রেণিবিভাগ : ব্যক্তি শরীরের কোন অংশ এবং কী ধরণের ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার উপর নির্ভর করে মূলতঃ ছয়টি [৭৪] বিভাগে অস্থিগত প্রতিবন্ধকতাকে বিভক্ত করা হয়েছে–

I. Spastic Hemiplegia : হাত, কখনো-কখনো পায়ের পেশিও শক্ত হয়; যার ফলস্বরূপ সঞ্চালনমূলক সক্রিয়তা ব্যাহত হয়।

II. Spastic Diplegia : শরীরের নীচের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে হাঁটু, পা (অনেকসময় আড়াআড়িভাবে থাকে) ইত্যাদি অঙ্গ প্রায় অকেজো অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

III. <u>Spastic Quadriplegia</u> : এটি সবচেয়ে মারাত্মক, প্রায় সারা শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেকক্ষেত্রে মানসিক প্রতিবন্ধিও হয়। এর বিভিন্ন প্রকার ধরণ রয়েছে, সেগুলি নিম্নে আলোচিত হল—

Monoplegia : এই সকল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের যেকোন একটি অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Paraplegia : এই সকল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের নিম্নাঙ্গ ও দুটি পা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Hemiplegia : এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের যেকোন একদিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Triplegia : এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের যেকোন তিনটি অঙ্গ (সাধারণত দুই পা এবং একটি হাত) ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Quadriplegia : এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চারটি অঙ্গই (দুই হাত ও দুই পা) ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Diplegia : এই সকল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির হাতের চেয়ে পা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Double Hemiplegia : এই সকল রোগীদের শরীরের দুই দিক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও একদিকের চেয়ে অপরদিক বেশি।

IV. <u>Ataxic Cerebral Palsy (Ataxia)</u> : জিনগত কোন কারণ, জন্মকালীন মস্তিষ্কের আঘাত, কম ওজন বিশিষ্ট শিশুর জন্ম এবং নবজাতকের হাইড্রোসেফালাস অর্থাৎ মস্তিষ্কের পুষ্টি সরবরাহ বা বর্জ্য প্রভৃতি পদার্থের যথাযথ নিষ্কাষণ না হলে শিশুরা এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

V. <u>Athetoid or Dyskinetic Cerebral Palsy</u> : মাথা, ঘাড়, হাত প্রভৃতি পেশি দুর্বলতার কারণে তাদের চলাফেরা ব্যাহত হয়।

VI. <u>Hypotonic Cerebral Palsy</u> : এই রোগে মূলতঃ শিশুরা আক্রান্ত হয়ে শিশুর শরীরে মাথা, ঘাড়, হাত, পা পভৃতি পেশি দুর্বলতার ফলে তাদের স্বেচ্ছা সঞ্চালন ব্যাহত হয়।

১.৩.৩.২. <u>অস্থিগত প্রতিবন্ধকতার কারণ (Causes of Loco-motor Impairment & Cerebral Palsy)</u> : বিশেষত অস্থিগত অক্ষমতার কারণ সম্বন্ধে এখনও স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট কিছু জানা যায়নি। তবে যেসস্ত কারণ সাধারণত উল্লেখ্য করা হয় তার মধ্যে রয়েছে–

I. জিনঘটিত বা বংশানুক্রমিক কারণ

II. শারীরিক কারণ, যেমন- স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপ, মেরুদন্ড বা মস্তিষ্কের অস্বাভাবিকতা ও পেশীগত অস্বাভাবিকতা।

III. ভিটামিনের অভাব।

IV. গর্ভাবস্থায় মা মাদকাসক্ত হলে।

V. গর্ভাবস্থায় মায়ের অপুষ্টি খাদ্যাভাস এবং শৈশবে শিশুর অনাহার, অপুষ্টি এবং অস্বাস্থ্যকর ও প্রতিকূল পরিবেশ।

VI. দূর্ঘটনা জনিত বা বাহ্যিক আঘাত।

১.৩.৩.৩. <u>অস্থিগত প্রতিবন্ধকতার বৈশিষ্ট্য (Common Characteristics of Loco-motor Impairment & Cerebral Palsy)</u> : এইপ্রকার প্রতিবন্ধিদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়; যেমন–খোঁড়া, Crippled ইত্যাদি। যে সকল শিশু ব্যক্তির দেহে ও পেশিগত প্রতিবন্ধকতা শিশুদের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে, তাদেরকে অস্থিগত প্রতিবন্ধকতা বলে। অস্থিগত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি হল :

১. অস্বাভাবিকভাবে হামাগুড়ি দেওয়া, হাঁটা, কথা বলা ইত্যাদির বিকাশ বিলম্বিত হওয়া।

২. অস্বাভাবিকভাবে পেশি চালনা করা, প্রয়োজনের সময় পেশি সঞ্চালন করতে পারে না কিন্তু স্থির হয়ে থাকার সময় অনিয়ন্ত্রিত পেশিচালনা ঘটে।

৩. শরীরের একদিক ব্যবহারের প্রবণতা থাকতে পারে।

৪. পেশির অতিরিক্ত বেশি বা অতিরিক্ত কম বিকাশ (Underdeveloped) ঘটতে পারে।

৫. অনৈচ্ছিক পেশি সঞ্চালন (Involuntary movements) ঘটে, যার ফলস্বরূপ পেশি শক্ত হয়ে থাকে এবং অস্বাভাবিকভাবে সংকুচিত হয়।

৬. সমন্বয় ও ভারসাম্য রক্ষায় অক্ষম প্রভৃতি।

১.৩.৪. মানসিক প্রতিবন্ধকতা (Mental Retardation and Mental Illness) : প্রাচীন কাল থেকেই মানসিক প্রতিবন্ধকতাকে সমাজ বিশেষ দৃষ্টিতে গ্রহণ করে আসছে। সমাজের সাধারণ মানুষেরা কখনোই মানসিক প্রতিবন্ধীদের সহানুভূতি ও উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করেনি। কিন্তু বর্তমানে নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও মানুষের চেতনার জগতের নানা পরিবর্তনের ফলে, আধুনিকতার স্পর্শে মানসিক প্রতিবন্ধিরা সমাজের কাছে অস্পৃশ্য নয়। কারণ চিকিৎসা-বিজ্ঞান আমাদের বুঝতে শিখিয়েছে যে, মানসিক প্রতিবন্ধকতা কোন সংক্রামক রোগ নয়; এটি একধরণের অক্ষমতা। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহরে-গ্রামীণ যে কোন দম্পতির সন্তানের ক্ষেত্রে এই অক্ষমতা দেখা দিতে পারে।

এছাড়াও 'মানসিক অসুস্থতা' ও 'মানসিক প্রতিবন্ধকতা' দুটি ধারণাও সম্পূর্ণ পৃথকধর্মী। মানসিক অসুস্থতা এক ধরণের রোগ যা কোন একজন সুস্থ মানুষের জীবনে, যে-কোন প্রকার মানসিক আঘাতজনিত কারণে যে-কোন সময় ঘটতে পারে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বনে তার নিরাময়ও সম্ভব। কিন্তু মানসিক প্রতিবন্ধকতা একটি সম্পূর্ণ জন্মগত অসম্পূর্ণতা যার লক্ষণ শিশুর বিকাশের সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে থাকে এবং যার সম্পূর্ণ নিরাময় কখনোই সম্ভব নয়। সাধারণভাবে বলা যায়, মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের দৈহিক বিকাশ অন্যান্য বিকাশের সঙ্গে মানসিক বিকাশ সমহারে ঘটে না। ফলে তারা বোধগম্যতায় অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্যান্য শিশুদের থেকে পিছিয়ে পড়ে অর্থাৎ শিশুর সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে এক এক ধরণের অসম্পূর্ণতা সৃষ্টি করে, এই বিষয়টিকে বর্তমানে Mental Retardation বলে।

মনোবিজ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী মানসিক প্রতিবন্ধকতার নানারূপ সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল-

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে *Mental Deficiency Act* অনুযায়ী মানসিক প্রতিবন্ধকতা বলতে বোঝানো হয়েছে – 'Mental defectiveness as a condition of arrested or incomplete development of mind existing before the age of 18 years, whether arising from inherent causes of induced by disease or injury'.[৭৫]

অর্থাৎ সাধারণতঃ জন্মগত কোন কারণে অথবা অসুখ-বিসুখ বা দুর্ঘটনাজনিত কোন কারণে ১৮ বছর বয়সের পূর্বে মানসিক বিকাশের অসম্পূর্ণতাকেই বলা হয় মানসিক বিকারগ্রস্ততা।

Encyclopaedia Britanica তে বলা হয়েছে– A state of subnormal evaluation of the human organism in consequence of which the individual affected is incapable of assuming the responsibilities expected of a socially adequate person, such as self-direction, self-support and social participation.[৭৬]

অর্থাৎ কতগুলি মানবিক সত্তা বা অস্বাভাবিকতার সমষ্টি, যা কোন একজন মানুষকে সামাজিকভাবে দায়িত্বসম্পন্ন হিসাবে প্রকাশিত এবং আত্মনির্ভরশীল হতে বাধার সৃষ্টি করে, তাই হল মানসিক প্রতিবন্ধকতা।

পুনরায় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে মানসিক প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য মন্তব্যটি করে Rick Herber এর নেতৃত্বে গঠিত সংস্থা American Association on Mental Deficiency (AAMD); তাঁদের সংজ্ঞা WHO কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। তারা বলেন যে– Mental retardation means significantly sub-average general intellectual functioning existing concurrently with deficits in adaptive behaviour and manifested during the developmental period.[৭৭]

অর্থাৎ মানসিক প্রতিবন্ধকতা হল, বিকাশকালীন সময়ে গ্রহণযোগ্য বা পরিবর্তনশীল আচরণের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা, যা বোধমূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে।

১.৩.৪.১. মানসিক প্রতিবন্ধকতার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Mental Retardation and Mental Illness) : মানসিক প্রতিবন্ধিদের শ্রেণিকরণের একমাত্র স্বীকৃত মানদণ্ড হল, বিভিন্ন অভীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q)। AAMD (American Association on Mental Deficiency) অভীক্ষার প্রাপ্ত বুদ্ধ্যঙ্কের মাত্রা অনুযায়ী মানসিক প্রতিবন্ধকতারও তীব্রতা শ্রেণীকরণ করে থাকে।

AAMD এর অনুসারে মানসিক প্রতিবন্ধকতার স্তরগুলি নিম্নে ছকে দেখানো হল। এতে বহুল ব্যবহৃত দুটি বুদ্ধি অভীক্ষার স্তরের নির্ণীত বুদ্ধ্যঙ্ক মান দেওয়া হয়েছে।[৭৮]

স্তর	বুদ্ধি অভীক্ষা বা বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.)	
	Stanford-Binet	**Wechsler**
I. মৃদু মাত্রার (Mild Retardation)	৬৮-৫২	৭০-৭৫
II. মধ্যম মাত্রার (Moderate Retardation)	৫১-৩৬	৫৪-৪০
III. গুরুতর মাত্রার (Sever Retardation)	৩৫-২০	৩৯-২৫
IV. গভীর মাত্রার (Profound Retardation)	১৯ এবং কম	২৪ এবং কম

I. স্বল্প মাত্রায় মানসিক প্রতিবন্ধকতা (Mild Mental Retardation) : স্বল্প মাত্রায় প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রায়শঃ শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাদানযোগ্য প্রতিবন্ধী বা Educable Mentally Retarded (EMR) বলে থাকেন। পাশ্চাত্য দেশে এসব শিশুদেরকে শিক্ষা দেওয়া হত সরকারি বিদ্যালয়ের সাধারণযোগ্য শ্রেণিকক্ষে। বর্তমানে এই শ্রেণির (mildy) বহু প্রতিবন্ধী শিশুকে বিদ্যালয়ের নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে স্বাভাবিক শিশুদের মাঝে রেখে চিরাচরিতভাবে শিক্ষাদান করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে একজন বিশেষ শিক্ষায় অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ শ্রেণিশিক্ষককে প্রতিবন্ধী শিশুর উপযোগী স্বতন্ত্র বা ব্যক্তিক (individualized) পাঠ নির্দেশনা দান কার্যে সহায়তা করে থাকেন। প্রয়োজনমাফিক তিনি শিক্ষা সহায়ক কক্ষে (resource room) তাকে অতিরিক্ত শিক্ষা প্রদান (extra-tutoring) করেন। উল্লেখ্য যে, স্বল্প মাত্রায় বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্কুলে ভর্তি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিবন্ধী হিসেবে সনাক্ত করা যায় না। এমনকি এও দেখা যায় যে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীতে তারা যখন অধিকতর জটিল শিক্ষাক্রমের সম্মুখীন হয়, তখন তাদেরকে চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়।[৭৯]

II. মধ্যম মাত্রায় মানসিক প্রতিবন্ধকতা (Moderate Mental Retardation) : মধ্যম স্তরের প্রতিবন্ধী শিশু বলতে অনেক সময় শিক্ষাবিদগণ প্রশিক্ষণযোগ্য মানসিক প্রতিবন্ধী বা trainable mentally retarded (TMR) বুঝিয়ে থাকেন। 'প্রশিক্ষণযোগ্য' বা trainable শব্দটি এই বিশ্বাস বা ধারণা থেকে ব্যবহৃত হয় যে, এই শ্রেণীর প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকাংশই প্রথাগত বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম থেকে উপকৃত হবে না, বরং তাদের জন্য বিশেষ নৈপুণ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির

দরকার। যে কর্মসূচিতে নিজের যত্ন ও পরিচর্যা, ভাববিনিময় এবং সামাজিক নৈপুণ্য অর্জনের উপর জোর দেওয়া হবে। মৃদু মাত্রায় প্রতিবন্ধী শ্রেণীর শিশু বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে যাদের বিশেষ ধরণের শিক্ষার প্রয়োজন অনুধাবন করা যায় না তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অধিকাংশ শিশুর স্কুল-পূর্ব বয়স ধরে বিকাশের অগ্রগতি বিলম্বিত হচ্ছে।

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মধ্যম ধরণের প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের সমবয়স্ক স্বাভাবিক শিশুর সার্বিক বুদ্ধি, সামাজিক ও পেশীসঞ্চালন ক্ষমতার ক্ষেত্রে বিকাশের পার্থক্য সাধারণত বাড়তে থাকে। মধ্যম শ্রেণীর প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত শিশুদের প্রায় শতকরা ৩০-ভাগ ডাউন উপসর্গ (Down Syndrome) সম্পন্ন। প্রায় শতকরা ৫০-ভাগ মধ্যম ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কোন না কোন ধরণের মস্তিষ্ক বিকৃতি রয়েছে (Neisworth & Smith)। মৃদু প্রতিবন্ধিদের তুলনায় এদের মধ্যে আরও অন্যান্য পঙ্গুত্ব বা শারীরিক বৈকল্য সাধারণত অনেক বেশি দেখা যায়।[৮০]

III. <u>গুরুতর মানসিক মাত্রায় প্রতিবন্ধকতা (Sever and Profound Retardation)</u> : গুরুতর বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মের সময় অথবা তার অব্যবহিত পরেই সনাক্ত করা যায়। এই সকল শিশুদের অধিকাংশের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের (Central nervous system) মারাত্মক ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় এবং অন্যান্য অনেক বৈকল্য থাকতে পারে। AAMD (American Association on Mental Deficiency) যদিও বুদ্ধ্যঙ্কের মাধ্যমে গুরুতর এবং গভীর প্রতিবন্ধিদের ভেতর পার্থক্য নির্ধারণ করে তবুও দেখা যায় যে, দুই শ্রেণীর প্রতিবন্ধকতার পার্থক্য প্রধানতঃ কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে। গুরুতর প্রতিবন্ধিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুনির্দিষ্টভাবে নিজের যত্ন নেওয়ার কৌশল শেখানো, যেমন মলমূত্র সংক্রান্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কৌশল, পোশাক পরা, খাদ্য গ্রহণ, পানীয় গ্রহণ এবং ভাষা বিকাশ ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ। সম্প্রতি উন্নত প্রশিক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে বর্তমানে গুরুতর প্রতিবন্ধিরা এমন সব নৈপুণ্য আয়ত্ত করতে সক্ষম, অতীতে যেগুলো তাদের সামর্থ্যের অতীত বলে মনে করা হত। কিন্তু অনেকসময় এখন এমন কী এও দেখা যায় যে, এরা একজন বয়স্ক প্রায়-স্বাবলম্বী ব্যক্তি হিসেবে সমাজে বসবাস এবং কাজ করার পারদর্শিতা আয়ত্ত করতে পারে।[৮১]

IV. গভীর মানসিক মাত্রায় প্রতিবন্ধকতা (Profound Mental Retardation) : এই ধরণের প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্মের সময় বা জন্মের অব্যবহিত পরেই শনাক্ত করা যায়; এদের শারীরিক বৈকল্য লক্ষণীয় প্রকৃতির। মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের এক শতাংশেরও কম হল গভীর বা চূড়ান্ত মাত্রার প্রতিবন্ধী। একজন গভীর প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত চাহিদা নিজে নিজে মেটাতে সক্ষম নাও হতে পারে। তাকে হয়তো সবসময় বিছানায় শুয়ে থাকতে হয় বা হুইল চেয়ারে বসে থাকায় ২৪ ঘন্টা তার সেবা-যত্নের প্রয়োজন হতে পারে। এদের অনেকেই কার্যত বহু প্রতিবন্ধিতে পরিণত হয়। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের পর এর সামান্য আধো আধো কথা বলতে পারে এবং হাঁটতে পারে; কেবলমাত্র পরিচিত ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম। অনেক ক্ষেত্রে এদের মধ্যে দর্শন ও শ্রবণ প্রতিবন্ধিও দেখা যায়। যাইহোক, মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের উপযুক্ত চিকিৎসা, প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব। আর এজন্য মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের অভিভাবকদের সহযোগিতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।[৮২]

১.৩.৪.২. মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণ (Cause of Mental Retardation and Mental Illness) : প্রতিবন্ধী হিসেবে বিবেচিত লোকজনের মধ্যে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিদের সংখ্যা ৮০% থেকে ৮৫%। ঐ বিপুল সংখ্যক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার মূল কারণ এখনো অজানা রয়েছে। এইসকল ব্যক্তির মধ্যে জৈবিক প্রণালীর সুস্পষ্ট কোন অসুস্থতা, মস্তিষ্কের ক্ষত অথবা অন্যান্য কোন শারীরিক সমস্যা নেই।

বুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতার ২৫০ টি পরিচিত কারণ নির্ণীত হলেও প্রতিবন্ধকতার ক্রমাবনতির ভিত্তিতে তথা মৃদু, মধ্যম, গুরুতর, গভীর স্তর অনুযায়ী সকল মানসিক প্রতিবন্ধকতার মাত্র ১০ থেকে ২০ শতাংশ প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা গেছে।[৮৩] প্রতিবন্ধকতার সমস্ত পরিচিত কারণগুলি হয় জৈবিক অথবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্যাবলী সংক্রান্ত অথবা চিকিৎসা সংক্রান্ত; এইসকল প্রতিবন্ধকতাকে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বা চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত মস্তিষ্ক ক্ষত প্রতিবন্ধকতা বলা হয়। AAMD (American Association on Mental Deficiency) এর মতে মধ্যম, গুরুতর এবং গভীর প্রতিবন্ধকতার অনেকগুলো কারণ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে; সেগুলি হল নিম্নরূপ[৮৪]–

I. প্রদাহ সংক্রমণ এবং Intoxication (উদাহরণ – রুবেলা, সিফিলিস্, এনসেফালাইটিস্ (encephalitis), মেনিনজাইটিস্ ইত্যাদি।

II. আঘাত বা ক্ষত এবং শারীরিক অবস্থা (উদাহরণ–সন্তান প্রসবের পূর্বে, প্রসবের সময় এবং পরে কোন দুর্ঘটনা; যেমন– অক্সিজেন ঘাটতি)।

III. বিপাক এবং পুষ্টি (উদাহরণ– Phenylketonuria)।

IV. মস্তিষ্কের মারাত্মক রোগ (যেমন– টিউমার)।

V. গর্ভাবস্থার প্রভাব (উদাহরণ– অস্বাভাবিক বড়ো মস্তিষ্ক বা Hydrocephalus, অস্বাভাবিক ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বা Microcephalus)।

VI. ক্রোমোজোমগত অস্বাভাবিকতা (যেমন– Downs Syndrome)।

VII. গর্ভধারণ সংক্রান্ত বৈকল্য (উদাহরণ– নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্মানো)।

নিম্নে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতার কতিপয় 'জৈবিক কারণ' বা Organic Cause খানিকটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হল–

I. প্রদাহ এবং ইনটক্সিকেশন (Infection and Intoxication) : গর্ভধারণের প্রথম মাসে মা রুবেলায় (Rubella and German Measles) অর্থাৎ একধরণের সংক্রমণযোগ্য হামজ্বরে আক্রান্ত হলে, এই সংক্রমণের ফলে শতকরা ৫০ ভাগ গর্ভস্থ শিশু অস্বাভাবিক হতে পারে। কোন মায়ের সিফিলিস্ রোগ হলে গর্ভস্থ শিশুর দেহে তা সংক্রমিত হতে পারে এবং নবজাতকের নানা ধরণের বৈকল্য ঘটতে পারে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে অন্ধত্ব, বধিরতা এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতা। জন্মগ্রহণের পর নবজাতক ভাইরাসজনিত, ব্যাকটেরিয়াজনিত অথবা পরজীবী সংক্রমণ (Parasitic) দ্বারা আক্রান্ত হলে শিশুটির এনসেফালাইটিস রোগ (মস্তিষ্কের এক ধরণের গুরুতর স্ফীতি) হতে পারে এবং এর ফলাফল হিসেবে প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনা থাকে।[৮৫]

II. আঘাত, ক্ষত বা শারীরিক ক্রিয়া : প্রসবকালীন জটিলতার ফলে শিশুর মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এই ধরণের ক্ষতি স্কুলে যাবার বয়স হওয়ার আগে সুস্পষ্ট হয় না। প্রসবের সময় শিশুর দেহে অক্সিজেনের স্বল্পতা (anoxia) যা কখনো গর্ভস্থ শিশুর গলায় গর্ভনাড়ি (Umbilical

Cord) জড়িয়ে যাবার কারণ হয়ে থাকে, এইরকম হলে শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে। শিশুকালে দুর্ঘটনায় মস্তিষ্কের ক্ষতি বা দীর্ঘ সময় ধরে অজ্ঞান থাকার ফলেও অনেকসময় মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, ফলে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতা সূচিত হতে পারে।

ক. মস্তিষ্ক পক্ষাঘাত (Cerebral Palsy) : মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতগ্রস্ত শিশুর মধ্যে পেশি সঞ্চালনের অসঙ্গতি, নড়াচড়া থেকে শুরু করে স্বেচ্ছায় পেশি নিয়ন্ত্রণ করার অক্ষমতার মতো বিভিন্ন প্রকার অক্ষমতার উপসর্গ দেখা যায়। এই ধরণের শিশুদের বুদ্ধি পরীক্ষা করা খুবই কঠিন কাজ, কেননা তাদের পেশি সঞ্চালনের অক্ষমতা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সর্বাধিক প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, মস্তিষ্ক প্রতিবন্ধকতার মোট পরিমণ্ডলের পক্ষাঘাতগ্রস্ত শিশুদের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ এর নীচে এবং এদের শতকরা ৫০ ভাগের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০ এর নীচে থাকে।[৮৬]

খ. মৃগীরোগ (Epilepsy) : অনেক মৃগীরোগীর বুদ্ধি গড় এবং গড়ের উর্ধ্বে হলেও প্রতিবন্ধিদের মধ্যে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগের মধ্যে মৃগীরোগ দেখা যায়। বস্তুতঃ মৃগীরোগ এবং বুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতা একসাথে দেখা দিলেও তার দ্বারা দুটি রোগের কোনটিরই মূল কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। দুটি রোগ একই মস্তিষ্ক আঘাতের ফলে উৎপন্ন হতে পারে, অথবা খিঁচুনির কারণে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।[৮৭]

গ. অস্বাভাবিক ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বা মস্তক (Microcephaly) : এই বৈকল্যের বৈশিষ্ট্য হল একটি অস্বাভাবিক রকমের মাথার পরিধি ছোট। এটি একটি প্রধান শারীরিক সমস্যা যা গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা প্রায় ২০ জনের মধ্যে দেখা যায়। এটি দুটি কারণে ঘটতে পারে :

প্রথমত, 'জেনেটিক' যার জন্য দায়ী একটি দুর্বল জিন এবং দ্বিতীয়টির জন্য দায়ী গর্ভকালীন অবস্থায় মায়ের শরীরে ইনফেকশন জাতীয় সমস্যা এবং জন্মের সময়কার ক্ষত। (Heber, 1959)। Plummer এর বিবরণ অনুযায়ী গর্ভাবস্থার প্রথম ২০ সপ্তাহ সময়ে হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণকালে ঐ এলাকায় ১২০০ মিটারের মধ্যে ছিলেন এরকম ১১ জন মহিলার ৭ জনের সন্তানেরই মস্তিষ্কে এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

ঘ. মস্তিষ্কে অত্যধিক জল (Hydrocephaly) : এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কের খুলির আকৃতি স্বাভাবিক থেকে অনেক বড়ো। অত্যধিক সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (Cerebrospinal

Fluid) জমা হওয়ার কারণে খুলি বড়ো হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। এই ফ্লুইড জমে যেতে পারে মূলতঃ দুটি কারণে— প্রথমত, ফ্লুইড মস্তিষ্ক থেকে স্পাইনাল ক্যানালে যাওয়ার নলে বা ক্যানালে বাধা তৈরি হয়। দ্বিতীয়ত, ফ্লুইডের প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সার্জারির মাধ্যমে ফ্লুইডের অতিরিক্ত চাপ বা ক্যানালের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করা হয়।[৮৮]

III. বিপাকক্রিয়া ও পুষ্টি (Metabolism or Nutrition)[৮৯] :

ক. ফেনিলকিউটোনিউরিয়া (Phenylketonuria) : অসামঞ্জস্য বিপাকক্রিয়ায় সৃষ্ট অসুবিধাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণকারী রোগের নাম হচ্ছে ফেনিলকিউটোনিউরিয়া (Phenylketonuria)। এই রোগে শরীরের ফেনিল এ্যালাইন নামের একটি অ্যামিনো এসিডের (Amino Acid) উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ হারায় ফলে শিশুর শরীরে অত্যধিক ফেনিল এ্যালাইন উৎপন্ন হয়ে মস্তিষ্কের দুরারোগ্য ক্ষতিসাধন করে। এতে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতার সাথে সাথে খিঁচুনি ও অন্যান্য স্নায়ুবিক অসুস্থতা দেখা দেয়। এই রোগটি সনাক্ত হওয়ার পর থেকে অবশ্য রোগ সনাক্তকরণ এবং রোগ মুক্তকরণ পদ্ধতি অনেক উন্নত হয়েছে। যেমন– মূত্র পরীক্ষা, বাধ্যতামূলক রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদি।

খ. ক্রেটিনিজম : অপর বহুল আলোচিত বিপাক ক্রিয়াজনিত অসুখ হচ্ছে ক্রেটিনিজম বা থাইরয়েড গ্রন্থির ত্রুটিজনিত স্বল্পতা। থাইরয়েড গ্রন্থি স্বল্প নিঃসরণের কারণে মস্তিষ্কের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে না। অসুখটি সারানো যেতে পারে যদি শৈশবেই রোগ ধরা পড়ে এবং যদি থাইরয়েড এক্সট্রাক্ট (extract) দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। যদি শৈশবেই এর চিকিৎসা না হয় তবে এর ফলে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতা, শারীরিক গঠনে খর্বতা, বড়ো জিহ্বা, চোখের ত্রুটিপূর্ণ গঠন ইত্যাদি নানা ধরণের স্থায়ী ত্রুটি তৈরি হয়। শৈশব ও বাড়ন্ত বয়সে নিয়মিত পুষ্টির যথেষ্ট অভাবও বুদ্ধির স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটায়।

IV. মস্তিষ্কের সাধারণ রোগসমূহ : হান্টিংটনস্ কোরিয়া রোগ, খিঁচুনি এবং হাঁপানির লক্ষণসহ ধরা পড়ে; ক্রমে এই শারীরিক অসুবিধাগুলো বাড়তে থাকে এবং একসময় রোগীর মৃত্যু হয়। চার বছর বয়সের আগে খুব কম ক্ষেত্রেই রোগের লক্ষণ ধরা পড়ে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগের লক্ষণ ৩০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে দেখা যায় টিউবারাস স্কেলরোসিস অথবা Epiloia নামে

আরেকটি মস্তিষ্কের রোগ, যা মস্তিষ্কের ও দেহের হৃৎপিণ্ড, বৃক্কসহ যে-কোন জায়গায় টিউমারের কারণ হয়ে থাকে।

V. ক্রোমোজোমঘটিত অস্বাভাবিকতা (Chromosomal Abnormality) :

ক. মোঙ্গোলিজম (Mongolism) : ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও গঠনে অস্বাভাবিকতা এ রোগের কারণ, পিতা অথবা মাতা কর্তৃক কোন ঔষধ গ্রহণ, জিনের স্বাভাবিক পরিবর্তন, তেজস্ক্রিয় পদার্থের কাছাকাছি অবস্থানসহ আরো বিভিন্ন কারণ এই রোগের পেছনে রয়েছে যা এখনো সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

সবচেয়ে পরিচিত ক্রোমোজোমঘটিত অস্বাভাবিকতা হচ্ছে ডাউন্স উপসর্গ (Down's Syndrome), একে মোঙ্গোলিজম বলা হয়ে থাকে। ১৮৬৬ সালে Langdon Down প্রথম এই রোগটি সনাক্ত করে। এই রোগ আসলে মানুষের বিবর্তন প্রক্রিয়ার একটি আদিম পর্যায়ের পুনরুদ্ভব যা মঙ্গোলিয়ান জাতির মধ্যেই ঘটেছে।

ক্রোমোজোমের গঠনে অস্বাভাবিক বিকাশের কারণে ডাউন উপসর্গ দেখা দেয়। স্বাভাবিক কারণে একজন মানুষের প্রত্যেক কোষে ৪৬ টি ক্রোমোজোম (২৩ জোড়া) থাকে। ডাউন উপসর্গগ্রস্ত শিশুর ২১ তম জোড়ায় একটি অতিরিক্ত ক্রোমোজোম থাকে। ফলে, ক্রোমোজোমের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৭। যেহেতু ২১ তম জোড়ায় এক জোড়ার পরিবর্তে ৩ টি থাকে তাই একে ট্রাইসোমি-২১ বলে।

যদিও মোঙ্গোলিজমে আক্রান্ত খুব কম শিশুরই এ রোগের সবকটি লক্ষণ দেখা যায়; তবে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো এ রোগে আক্রান্ত সকলের মধ্যেই দেখা যায়। চোখের তির্যক গঠন, চোখের আইরিস বা কণিকায় ফুটকি চিহ্ন, স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক মোটা চোখের পাতা, চ্যাপ্টা ও বিস্তৃত মুখমণ্ডল ও নাক, স্থূল জিহ্বা, ছোটো ও চ্যাপ্টা কাঁধ, খাটো আঙুল প্রভৃতি।[৯০]

খ. টার্নার উপসর্গ (Turner Syndrome) : দৈহিক প্রতিবন্ধকতার বেশ কিছু লক্ষণ জনন ক্রোমোজোম সংবাহিত হয়। একজন স্বাভাবিক নারী দুটি X জনন ক্রোমোজোমের অধিকারী আবার একজন স্বাভাবিক পুরুষ একটি X ও একটি Y ধরণের ক্রোমোজোমের অধিকারী হয়ে

থাকেন। টার্নার উপসর্গে আক্রান্ত নারীরা দুটির বদলে একটি X ক্রোমোজোমলাভ করেন। ফলে বয়ঃসন্ধিতে এসে দ্বিতীয় পর্যায়ের যৌন বৈশিষ্ট্য লাভ থেকে তারা বঞ্চিত হন। উল্লেখ্য, এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকে নারীদের স্তন গঠন ও যৌনকোশের জন্ম। টার্নার উপসর্গের অন্যান্য লক্ষণ পূর্বে ধরা পড়লেও এসব লক্ষণ পরিস্ফুট হয় রোগিনীর বয়ঃসন্ধিতে। স্বল্প থেকে মাঝারি মাত্রার বুদ্ধি ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকে শতকরা ২০ ভাগ মহিলার মধ্যে।[৯১]

গ. <u>ক্লিনফেল্টার উপসর্গ (Klinefelter's Syndrome)</u> : এটি শুধু পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ জনন ক্রোমোজোমঘটিত রোগ। এই রোগে বা উপসর্গে ভ্রূণে পুরুষ শিশুটির জনন ক্রোমোজোম একক অতিরিক্ত X ক্রোমোজোমযুক্ত হয়ে XY ক্রোমোজোম এর পরিবর্তে ত্রুটিপূর্ণ XXY ক্রোমোজোম গঠন তৈরি করে। এই রোগের লক্ষণও বয়ঃসন্ধিতেই বালকের দ্বিতীয় পর্যায়ের যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিস্ফুট না হওয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তবে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতা সাধারণভাবে প্রকাশিত না হলেও চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে ক্লিনফেল্টার উপসর্গ বেশি খুঁজে পাওয়া যায়।[৯২]

VI. <u>গর্ভাবস্থাকালীন সমস্যা</u> : সদ্যপ্রসূত যেসকল শিশুর ওজন ২৫০০ গ্রাম (৫ পাউন্ড ৮ আউন্স) চেয়ে কম তাদের বলা হয়– 'প্রয়োজনের তুলনায় নিম্ন ওজনযুক্ত প্রসূত শিশু'। জৈব চিকিৎসার তিনটি পর্যায় যথা–

ক. <u>প্রসব পূর্বকালীন (Pre-natal Period)</u> : গর্ভাবস্থার প্রথম তিনমাস সময়ে মা যদি হাম, সিফিলিস, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে শারীরিক প্যারালাইসিস, বধিরতা ও বুদ্ধ্যঙ্ক হ্রাস দেখা দিতে পারে।

খ. <u>প্রসবকালীন (Natal Period)</u> : জন্মমুহূর্তে ফরসেপের ব্যবহার, দীর্ঘমেয়াদী ও জটিল প্রসব-বেদনা, সদ্যপ্রসূত শিশুর মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ ইত্যাদি কারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে।

গ. <u>প্রসবপরবর্তী সময় (Post-Natal Period)</u> : মস্তিষ্কে দুর্ঘটনাজনিত আঘাত, হঠাৎ রক্তক্ষরণ, শৈশবে দীর্ঘমেয়াদি রোগ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। পুষ্টির অভাবও মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এছাড়া পুষ্টিহীন মায়ের শিশু ক্ষতিগ্রস্ত মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মাতে পারে।

১.৩.৪.৩. মানসিক প্রতিবন্ধকতার বৈশিষ্ট্য (Common Characteristics of Mentally Impairment) : মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ কোন একটি শিশুর মধ্যে সকল ধরণের মানসিক প্রতিবন্ধকতার বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি সকল মানসিক প্রতিবন্ধকতার বৈশিষ্ট্যই সকল শিশুর মধ্যে থাকে না। এই সকল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা মাথায় রেখেও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাদানের জন্য তাদের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ[৯৩]–

শিক্ষাদানযোগ্য মানসিক প্রতিবন্ধিকতার বৈশিষ্ট্য (Characteristic of Educable Mentally Retarded) :

ক. দৈহিক বৈশিষ্ট্য (Physical Characteristics) :

i. উচ্চতা, ওজন এবং অঙ্গসঞ্চালনের দিক দিয়ে এই সকল মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষাদানযোগ্য শিশুরা প্রায় স্বাভাবিক। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের সমস্যাজনিত কারণে শারীরিক কিছু ত্রুটিও দেখা যেতে পারে।

ii. কিছু কিছু শিক্ষাদানের যোগ্য মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে শ্রবণ, দর্শন এবং অঙ্গ সঞ্চালনের দিক থেকে কিছু সমস্যা দেখা যায়।

iii. এই জাতীয় অধিকাংশ শিশুই সাধারণত নিম্নবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বিদ্যালয়ে আসে এবং তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে বিশেষ ধারণা থাকে না।

খ. বৌদ্ধিক বৈশিষ্ট্যাবলী (Intellectual Characteristics) :

i. শিক্ষাদানযোগ্য প্রতিবন্ধী শিশুরা ভাষাগত এবং ভাষাবর্জিত উভয় প্রকার বুদ্ধির অভীক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নমানের পারদর্শিতা প্রদর্শন করে। কারণ তাদের মানসিক বিকাশের হার সাধারণ শিশুদের তুলনায় তিন-চতুর্থাংশ থেকে অর্ধেক পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ii. এই জাতীয় শিশুরা কখনোও কখনোও বিশেষ বৌদ্ধিক কাজের ক্ষেত্রে স্বল্প দক্ষতা দেখিয়ে থাকে। যেমন – মুখস্থ করা, ভাষাগত দক্ষতা, অর্থ অনুধাবন করার ক্ষমতা, কল্পনা শক্তি, সৃজনশীলতা ইত্যাদি।

গ. শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য (Academic Characteristics) :

i. ছয় বছর বয়সে যখন একটি শিক্ষাদানযোগ্য মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু বিদ্যালয়ে আসে তখন সে পড়া, লেখা, কোন শব্দ ভাঙ্গা, অঙ্ক করা ইত্যাদি কোন কিছুই পারে না। কিন্তু উচ্চারণাদি সকল দক্ষতা অর্জন করতে তাকে ৮-১১ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। অবশ্য এই বিলম্বতা তার সাধারণ বয়সের জন্য নয়, সম্পূর্ণভাবে মানসিক বয়সের জন্য।

ii. এই জাতীয় শিশুর শিক্ষাগত উন্নতি অবশ্যই তার মানসিক বিকাশের উপর নির্ভরশীল। সাধারণ শিশুদের মতো এরা কখনোই কোন নির্দিষ্ট পাঠক্রম নির্ধারিত সময়ে আয়ত্ত করতে পারে না।

iii. এই শিশুরা প্রথাগত শিক্ষার শেষ পর্যায়ে সাধারণ শিশুদের তুলনায় দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ পর্যায়ের (২-৬ Grade) অভিজ্ঞতাই অর্জন করতে পারে।

ঘ. ব্যক্তিগত ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য (Personal & Social Characteristics) :

i. শিক্ষাদানযোগ্য মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের দৈহিক, মানসিক ও বাচনিক ইত্যাদি সম্ভাব্য বিকাশের হার খুব কম হয়ে থাকে।

ii. সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং ব্যক্তিগত আচার-আচরণের ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুরা খুবই অপরিণত হয়ে থাকে।

iii. বাস্তব জগৎ সম্পর্কে এই শিশুরা খুব উদাসীন হয় এবং প্রকৃতি ও সমাজের সকল বিষয়ের পরিবর্তে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়েই তাদের আকর্ষণ খুব সীমাবদ্ধ থাকে।

iv. কোন বিষয়ের প্রতি এদের মনোযোগ কম স্থায়ী হয় এবং একাগ্রতার অভাব দেখা যায়। এছাড়াও স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় এদের কৌতুহল খুব কম হয়।

ঙ. পেশিগত বৈশিষ্ট্য (Occupational Characteristics) :

i. শিক্ষাদানযোগ্য মানসিক প্রতিবন্ধিরা প্রাপ্তবয়সে সামান্য কিছু দক্ষতাপূর্ণ কাজ এবং অর্ধ-দক্ষতাপূর্ণ (Semi-skilled) কাজ করতে পারে।

ii. শুধুমাত্র কিছু দক্ষতাহীন, পুনঃপুন করা হয় এমন সামাজিক কাজ করে নিজের দায়ভার আংশিক বা পূর্ণভাবে বহন করতে সক্ষম হয়।

১.৩.৪.৪. প্রশিক্ষণযোগ্য ও তত্ত্বাবধানযোগ্য মানসিক প্রতিবন্ধিদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Trainable & Custodial Mentally Retarded) : ব্যাপকতার দিক থেকে গুরুতর এবং চূড়ান্ত মাত্রার প্রতিবন্ধিরা এই শ্রেণিভুক্ত। এই জাতীয় শিশুদের যে সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল :

i. বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করলেও এরা প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না।

ii. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অসুবিধার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরের সাহায্য ছাড়া এরা চলাফেরা করতে পারে না।

iii. মানসিক বিকাশ বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায়, সাধারণত বয়স বাড়লেও এরা ছোটো শিশুর মতই আচরণ করে।

iv. প্রথাগত শিক্ষার পরিবর্তে এদের শুধুমাত্র কিছু দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক কৌশল প্রশিক্ষণের সাহায্যে শেখানো হয়।

v. এদের প্রতিবন্ধকতার মাত্রা চূড়ান্ত পর্যায়ের হওয়ায় কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতে পরিণত হয়।

সবশেষে বলা যায়, সকল প্রতিবন্ধী শিশুর পিতামাতাকে সঙ্কটজনক অবস্থা হতে মুক্ত করার জন্য কাউন্সেলর বা ডাক্তার এমন একটি স্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি করবেন যেখানে পিতামাতারা সমালোচনার ভয়ে ভীত না হয়ে অত্যন্ত সহজভাবে তাঁদের মানসিক প্রতিক্রিয়াকে প্রকাশ করতে পারবেন।

তথ্যসূত্র :

১. পা.সূ., ২।৩।২০

২. তত্রৈব।

৩. *Dictionary.com*

৪. বুদ্ধচ., সম্পা. জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, ৩।৫

৫. বন., ৫৪।১৩, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৬. *তদেব,* পৃ. ৫৮৫।

৭. মনু., সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯।২৪৭

৮. *Rāmā.*, Vol-I, Ed. Ravi Prakash Arya, p. 4.

৯. *তদেব,* পৃ. ৪।

১০. পা.সূ., ২।৩।২০

১১. তত্রৈব।

১২. ব.শব্দ., দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৫২৫।

১৩. *https://www.ebanglalibrary.com*

১৪. মনু., সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯।২৯১।

১৫. *তদেব,* পৃ. ৯৯৩।

১৬. ব.শব্দ., দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৫২৫।

১৭. *তদেব,* পৃ. ১৫২৫।

১৮. রঘু., সম্পা. তুকারাম জাবজী, ১২।৩৯।

১৯. *তদেব,* পৃ. ২৪৬।

২০. মনু., সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ২।৮৯-৯২।

২১. *তদেব,* পৃ. ২৯২।

২২. ষ.দ.সমু., পৃ. ৪৯।

২৩. Caraka., Vol-II, Ed. R. K. Sharma & Bhagwan Dash, p. 387.

২৪. *তদেব,* পৃ. ৩৮৭।

২৫. *তদেব,* পৃ. ৩৭০।

২৬. *তদেব,* পৃ. ৩৭১।

২৭. *তদেব,* পৃ. ৩৭৫।

২৮. *তদেব,* পৃ. ৩৭৬।

২৯. *তদেব,* পৃ. ৩৭৭।

৩০. *তদেব,* পৃ. ৩৭৮।

৩১. চরক., দ্বিতীয় খণ্ড, ২।২৮, সম্পা. যশোদানন্দন সরকার।

৩২. *তদেব,* পৃ. ৫৪।

৩৩. তত্রৈব।

৩৪. *তদেব,* পৃ. ৫৫।

৩৫. তত্রৈব।

৩৬. তত্রৈব।

৩৭. তত্রৈব।

৩৮. চরক., দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা. ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, পৃ. ২১৫।

৩৯. মনু., সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১।৪৮, পৃ. ১০৭০।

৪০. *তদেব,* পৃ. ১০৭০।

৪১. তত্রৈব।

৪২. *তদেব,* পৃ. ১০৭১।

৪৩. তত্রৈব।

৪৪. তত্রৈব।

৪৫. তত্রৈব।

৪৬. তত্রৈব।

৪৭. চরক., দ্বিতীয় খণ্ড, ২।২৮, সম্পা. যশোদানন্দন সরকার, পৃ. ১১৬।

৪৮. *তদেব,* পৃ. ১১৬।

৪৯. তত্রৈব।

৫০. তত্রৈব।

৫১. S.C.P.B.C., Ed. B. Bateman, pp. 42-46.

৫২. *Disability as per Persons with Disabilities (PWDs) Act 1995.*

৫৩. স.শি., সম্পা. প্রণব কুমার চক্রবর্ত্তী, পৃ. ৯০।

৫৪. *তদেব,* পৃ. ৯০।

৫৫. T.C.B.C., Ed. R. Faser & A. I. Fridman, Pp. 42-46.

৫৬. *তদেব,* পৃ. ৪৭।

৫৭. *তদেব,* পৃ. ৪৮।

৫৮. *তদেব,* পৃ. ৪৯।

৫৯. D.C.E., pp. 11-12.

৬০. স.শি., সম্পা. প্রণব কুমার চক্রবর্ত্তী, পৃ. ৯২।

৬১. *তদেব,* পৃ. ৯৩।

৬২. G.H.L., p. 89.

৬৩. *তদেব,* পৃ. ৯০।

৬৪. H.L.C., Ed. A. R. Peterson, p. 161.

৬৫. *তদেব,* পৃ. ১৬২-১৬৪।

৬৬. M.H.H.I., Ed. D. Moores, p. 7.

৬৭. *তদেব,* পৃ. ৮।

৬৮. *তদেব,* পৃ. ৯-১০।

৬৯. *তদেব,* পৃ. ১১-১৩।

৭০. E.O., pp. 5-6.

৭১. T.C.P.D.C., Ed. R. G. Fraser, pp. 107-108.

৭২. D.T., pp. 1-2.

৭৩. তত্রৈব।

৭৪. স.শি., সম্পা. প্রণব কুমার চক্রবর্ত্তী, পৃ. ৯৮-৯৯।

৭৫. ব্যাতি. শিশু., সম্পা. দেবব্রত দেবনাথ এবং আশিষ কুমার দেবনাথ, পৃ. ৬৫।

৭৬. *তদেব,* পৃ. ৬৬।

৭৭. তত্রৈব।

৭৮. ব্যাতি., সম্পা. বিষ্ণুপদ নন্দ এবং সারাওয়াতারা জামান, পৃ. ৮৪।

৭৯. C.M.G.L.D., Ed. L.M.Dunn, p. 73.

৮০. ব্যাতি., সম্পা. বিষ্ণুপদ নন্দ এবং সারাওয়াতারা জামান, পৃ. ৮৪-৮৫।

৮১. ব্যাতি. শিশু., সম্পা. দেবব্রত দেবনাথ এবং আশিষ কুমার দেবনাথ, পৃ. ৭১।

৮২. ব্যাতি., সম্পা. বিষ্ণুপদ নন্দ এবং সারাওয়াতারা জামান, পৃ. ৮৫।

৮৩. C.M.G.L.D., Ed. L.M.Dunn, p. 75.

৮৪. ব্যাতি. শিশু., সম্পা. দেবব্রত দেবনাথ এবং আশিষ কুমার দেবনাথ, পৃ. ৭২-৭৫।

৮৫. ব্যাতি., সম্পা. বিষ্ণুপদ নন্দ এবং সারাওয়াতারা জামান, পৃ. ৯৮।

৮৬. P.M.R.I., Ed. H.R.Holden, pp. 28-30.

৮৭. T.M.R.C., Ed. M.N.Robinson & B.H.Rpbinson, p. 76.

৮৮. ব্যাতি., সম্পা. বিষ্ণুপদ নন্দ এবং সারাওয়াতারা জামান, পৃ. ৯৯।

৮৯. *তদেব,* পৃ. ৯৯-১০০।

৯০. *তদেব,* পৃ. ১০০-১০১।

৯১. তত্রৈব।

৯২. তত্রৈব।

৯৩. ব্যাতি. শিশু., দেবব্রত দেবনাথ এবং আশিষ কুমার দেবনাথ, পৃ. ৮০-৮১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়:

বাল্মীকীয় রামায়ণ ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* প্রতিফলিত বিকৃতেন্দ্রিয়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বৈদিক সাহিত্য ও লৌকিক সাহিত্যের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে দুই বৃহদায়তন মহাকাব্যের আবির্ভাব ঘটে। এই মহাকাব্য দুটি হল— *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারত*। *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতের* বর্তমানে প্রাপ্ত রূপবয়বটি কোন ব্যক্তি বিশেষের একক সৃষ্টি নয়। সংকলন-পরিমার্জন-সংযোজনের ক্ষেত্রে এই দুই মহাকাব্যের ভূমিকা ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করেছে। এই দুই মহাকাব্যে কিছু মহান চরিত্র ও কিছু ক্ষুদ্র চরিত্রের সংমিশ্রণ বিশ্বের দরবারে সর্বদা প্রতিফলিত হয়েছে। মহান ও ক্ষুদ্র চরিত্রসমূহের মধ্যে এই দুই মহাকাব্যে এমন কিছু সংখ্যক চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে, যাদের কর্মেন্দ্রিয় বিশেষ কারণবশত ক্ষণস্থায়ী বা চিরস্থায়ী ভাবে হানি বা আধিক্য ঘটেছে এবং তারা স্বাভাবিক মানুষের ন্যায় যেকোনরূপ কর্ম করতে সক্ষম নয়, এইজাতীয় অবস্থাকে বলে অঙ্গবিকার বা বিকৃতেন্দ্রিয়। যেসকল বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের কথা *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লেখ রয়েছে, তাদের শারীরিক বিকলাঙ্গত্বের কাহিনী এবং তাদের পরিচয় কি প্রকারে এই দুই মহাকাব্যে উল্লিখিত হয়েছে তা নিম্নে আলোচিত হল—

২.১.*বাল্মীকীয় রামায়ণের* বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রসমূহ : আদিকবি বাল্মীকির আদিকাব্য *রামায়ণ* ভারতবর্ষের রমণীয় সম্পদ এবং ভারতীয়দের পরম শ্রদ্ধার বস্তু। আদিকবি বাল্মীকি তাঁর হৃদয়ের অপূর্ব মাধুরী দিয়ে এই মহাকাব্যকে বিচিত্রতায় পূর্ণ করে তুলেছেন। মহাকাব্যের বিচিত্রতার ফলস্বরূপের নিরিখে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* উপলব্ধ যেসকল বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রগুলি উল্লেখ্যযোগ্য, তাঁরা হলেন— ঋষ্যশৃঙ্গ, অন্ধকমুনি, রাজা কুশনাভের শতকন্যা, মন্থরা, বৈশ্রবণ বা কুবের, শূর্পণখা। নিম্নে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* উপলব্ধ বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হল :

২.১.১. ঋষ্যশৃঙ্গ : *বাল্মীকীয় রামায়ণের* আদিপর্বে ও *বৈয়াসিক মহাভারতের* বনপর্বে বর্ণিত হয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির উপাখ্যান। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি হলেন, মহামুনি কশ্যপের পৌত্র অর্থাৎ বিভাণ্ডক মুনি ও স্বর্ণমুখীর পুত্র। ঋষ্যশৃঙ্গের মাতা স্বর্ণমুখী পূর্বজন্মে একজন দেবকন্যা হলেও, পরবর্তীকালে তাঁর দ্বারা কোন অপরাধ কার্য ফলপ্রসূ হওয়ায় দেবতারা তাকে মৃগীরূপিণী হওয়ার অভিশাপ

দেন। দেবতাদের অভিশাভের ফলে স্বর্ণমুখী হরিণী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু জগৎসৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা মৃগীরূপিণী স্বর্ণমুখীকে পূর্বজন্মে বলেছিলেন যে, স্বর্ণমুখী দেবকন্যা হলেও অপরাধনিবন্ধের কারণে হরিণী হয়ে কোন মুনিকে প্রসব করলে সে মুক্তি লাভ করবে। দৈববশতঃ মৃগীরূপিণী হরিণীর গর্ভেই বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মপ্রসঙ্গে Ravi Prakash Arya সম্পাদিত *Rāmāyaṇa of Vālmīki* গ্রন্থে বলা হয়েছে—

> পিতা বিভাণ্ডকোঽস্মাকম্ তস্যাহং সুত ঔরসঃ।
> ঋষ্যশৃঙ্গ ইতি খ্যাতং নাম চ মে ভুবি।।[১]

ঋষ্যশৃঙ্গ নামের তাৎপর্য : মহর্ষি বিভাণ্ডকের ঔরসে ও স্বর্ণমুখী নামক হরিণীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মগ্রহণ করায়, জন্মকাল থেকেই মস্তকে একটি হরিণের ন্যায় শৃঙ্গ হয়েছিল। সেই কারণেই বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ এইরূপ নামকরণ। বিভাণ্ডক মুনির পুত্রের নামকরণ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতের* বনপর্বে বলা হয়েছে—

> তস্যর্ষেঃ শৃঙ্গং শিরসি রাজন্নাসীন্মহাত্মনঃ।
> তেনর্ষ্যশৃঙ্গ ইত্যেবং তদা স প্রথিতোঽভবৎ।।[২]

পুনরায় শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য বিরচিত *মহাভারত* গ্রন্থের শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃত *ভারতভাবদীপ* টীকায় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নামের তাৎপর্যকথনে বলা হয়েছে—

> 'ঋশ্যো মৃগস্তস্যৈব শৃঙ্গমস্যাস্তীতি ঋষ্যশৃঙ্গঃ'।[৩]

প্রসঙ্গতঃ মুনির মস্তকে ঋশ্যো অর্থাৎ কৃষ্ণসাররূপ মৃগ শৃঙ্গ অবস্থান করায় ঋষ্যশৃঙ্গ এইরূপ নামকরণ।[৪]

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পরিচয় : দেবতুল্য মহর্ষি বিভাণ্ডক দীর্ঘকাল তপস্যা করে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় কোন মহাহ্রদে স্নানরতা উর্বশী অপ্সরাকে দেখে তিনি কামাবিষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর বীর্য স্খলিত হয়ে জলে পড়ে। সেই সময় তৃষিতা এক ঋতুমতী হরিণী জলের সঙ্গে বিভাণ্ডকের শুক্রপান করে গর্ভিণী হয়ে পড়েন। হরিণীর গর্ভধারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

তস্য রেতঃ প্রচস্কন্দ দৃষ্টাপ্সরসমুর্ব্বশীম্।
অপ্সূ পস্পৃশতো রাজন্ ! মৃগী তচ্চাপিবত্তদা।।
সহ্ তোয়েন তৃষিতা গর্ভিণী চাভবত্ততঃ।[৫]

ঋতুমতী হরিণীর গর্ভবতী হওয়ার পিছনে জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান ব্রহ্মা পূর্বজন্মে তাকে বলেছিলেন যে, পূর্বজন্মে হরিণী দেবকন্যা হলেও, অপরাধবশতঃ সে দেবতাদের প্রকোপে হরিণী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু হরিণীরূপী দেবকন্যা যদি কোন মুনিকে প্রসব করতে পারেন তাহলে হরিণীরূপী দেবকন্যা মুক্তিলাভ করবেন। বিধাতার বাক্য অব্যর্থ হওয়ায় দৈববশতঃ সেই হরিণীর গর্ভেই মহর্ষি বিভাণ্ডকের ঔরসে ঋষ্যশৃঙ্গ নামক পুত্র জন্মেছিল। হরিণীর গর্ভধারণ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য বিরচিত *মহাভারতের* উপর নিজকৃত *ভারতকৌমুদী* টীকায় বলা হয়েছে—

ত্বং দেবকন্যাপি অপরাধান্মৃগী ভূত্বা, মুনিং সূয় প্রসূয় বিমোক্ষ্যস ইতি। অমোঘত্বাদ্-ব্রহ্মবাক্যস্য অব্যর্থত্বাৎ, বিধেশ্চ অবশ্যম্ভাবিনো ব্যাপারস্য চ দৈবনির্ম্মিতাৎ অদৃষ্টকৃতাড্ডাবিত্বাদ্ধেতোঃ। তস্য বিভাণ্ডকস্য।[৬]

ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মলাভের পরে বনের মধ্যেই সর্বদা পিতা বিভাণ্ডকের সহিত তপস্যা করে মহর্ষিরূপে খ্যাতিলাভ করেন।

ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত দশরথকন্যা শান্তার বিবাহ ও পুত্রলাভ : ঋষ্যশৃঙ্গ জন্ম থেকেই পিতা বিভাণ্ডকের সহিত বনে অবস্থান করায়, পিতা ভিন্ন অন্য মানুষের সংস্পর্শ লাভ করেন নি। তিনি সর্বদা ব্রহ্মচর্যে রত থাকতেন। ঋষ্যশৃঙ্গের ব্রহ্মচর্যাবস্থাতেই অঙ্গরাজ্যের অধিপতি দশরথের সখা লোমপাদ একবার স্বজ্ঞানে এক ব্রাহ্মণের সহিত মিথ্যা আচরণ করেছিলেন। এজন্য সকল ব্রাহ্মণ তাঁকে পরিত্যাগ করেন। লোমপাদ রাজার এই স্বেচ্ছাচারিতার জন্য ইন্দ্রদেব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর রাজ্যে বর্ষণ থেকে বিরত হন এবং সেই রাজ্যের প্রজাগণ কষ্ট পেতে থাকেন। দীর্ঘদিন অঙ্গরাজ্যে অনাবৃষ্টির দরুণ জনৈক মুনির পরামর্শে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মুনিদের প্রসন্ন করে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে তাঁর রাজ্যে আনার চেষ্টা করেন। কারণ ঋষ্যশৃঙ্গের পাদস্পর্শেই তৎক্ষণাৎ তাঁর রাজ্যে মেঘবর্ষণ করবে এবং প্রজারা দুঃখ-কষ্ট থেকে নিবৃত্তি পাবেন। জনৈক মুনিদের পরামর্শে লোমপাদ রাজা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনার জন্য বিভাণ্ডকের আশ্রমে মন্ত্রিদেরকে পাঠালেন এবং বিভাণ্ডকের ভয়ে ভীত হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে সেই রাজ্যে আনতে ব্যর্থ হলে রাজা চিন্তিত হয়ে পড়েন। পরবর্তীসময়ে রাজা

বুদ্ধি অবলম্বন পূর্বক মন্ত্রীদেরকে তৃতীয় দিনে বলেন, মুনিরূপধারী বেশ্যাগণের দ্বারা নানা উপায়ে বিভাণ্ডক মুনির অবর্তমানে ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করে লোমপাদের রাজ্যে যেন আনা হয়। লোমপাদ রাজার পরামর্শে বিভাণ্ডক মুনির অনুপস্থিতিতে বেশ্যাগণ নানা উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলোভিত করে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে আসেন। অঙ্গরাজ্যে ঋষ্যশৃঙ্গ আসামাত্রই ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হয়ে বর্ষণ আরম্ভ করেন। অঙ্গরাজ লোমপাদের কামনা এভাবে পূরণ হওয়ার পর তিনি তাঁর পালিতা কন্যা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গের হাতে সম্প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে শান্তা হলেন ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা দশরথের ঔরসজাত কন্যা। কিন্তু অঙ্গরাজ লোমপাদ শান্তাকে লালন পালন করেন। কারণ অঙ্গরাজ লোমপাদ ছিলেন রাজা দশরথের পরম মিত্র। লোমপাদ রাজা সন্তানহীন হওয়ায় রাজা দশরথের প্রতি প্রার্থনা জানায় যে, পুত্রফল প্রাপ্তির নিমিত্ত লোমপাদ রাজার হস্তে শান্তা নামক উত্তম কন্যাকে রাজা দশরথ যেন প্রদান করেন। স্বভাবতই করুণ-স্বভাব রাজা দশরথ মিত্র লোমপাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করে, অঙ্গাধিপতি লোমপাদের হস্তেই শান্তাকে দান করেন। রাজা দশরথের কন্যা শান্তাকে লোমপাদরাজার হস্তে প্রদান হেতু বাল্মীকীয় রামায়ণে বলা হয়েছে—

> অনপত্যায় মে কন্যাং সখে দাতুং ত্বমর্হসি।
> শান্তাং শান্তেন মনসা পুত্রার্থং বরবর্ণিনীম।।
> শ্রুত্বা দশরথো বাক্যং প্রকৃত্যা করুণাত্মকঃ।
> দাস্যতে তাং তদা কন্যাং শান্তামঙ্গাধিপায় সঃ।।[৭]

শান্তা নামক কন্যাকে গ্রহণ করে সন্তানহীন লোমপাদের সন্তাপ দূর করেন। পরবর্তী সময়ে পালিত কন্যা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির হস্তে প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির হস্তে অঙ্গরাজকন্যা শান্তার বিবাহ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> দদৌ চাস্মৈ তদা কন্যাং ভার্য্যাং কমললোচনাম্।
> শান্তাং শান্তেন মনসা দত্ত্বা হর্ষমবাপঃ সঃ।।
> এবং স ন্যবসত্তত্র তেন রাজ্ঞাভিপূজিতঃ।
> ঋষ্যশৃঙ্গো মহাতেজাঃ শান্তয়া সহ ভার্য্যয়া।।[৮]

শান্তার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ হওয়ার পর লোমপাদ কর্তৃক উভয়েই পূজিত হয়ে অঙ্গরাজ্যেই বাস করতে লাগলেন। তারপর বিভাণ্ডক মুনি নিজ আশ্রমে ফিরে এসে পুত্রকে দেখতে না পেয়ে

ক্রোধে বিদীর্ণ-প্রায় হয়ে লোমপাদ রাজার রাজ্য নষ্ট করার মানসে চম্পানগরীর দিকে রওনা হলেন। শ্রান্ত ও ক্ষুধিত বিভাণ্ডক এক ঘোষ পল্লীতে এলে ঘোষগণ তাঁকে বিধিপূর্বক পূজা করেন। তাঁদের মিষ্টবাক্য শুনে বিভাণ্ডকের ক্রোধ দূর হল। এরপর অঙ্গাধিপতির কাছে এলে তাঁর দ্বারা পূজিত হলেন এবং পুত্রবধূ শান্তাকে দেখে তুষ্ট হলেন। বিভাণ্ডক মুনি তুষ্ট হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তাকে পুত্রলাভের আশীর্বাদ প্রদান করেন। পিতার আশীর্বাদে ঋষ্যশৃঙ্গের ঔরসে শান্তার গর্ভে চতুরঙ্গ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

রাজা দশরথের পুত্র প্রাপ্তিতে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির ভূমিকা : ঋষ্যশৃঙ্গই দশরথের পুত্রপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করবেন বলে দশরথের মন্ত্রী সুমন্ত্র সনৎকুমারের নিকট থেকে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির উপাখ্যান বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করেছিলেন। সনৎকুমার ছিলেন *ভাগবৎ-পুরাণের* গল্প অনুযায়ী প্রজাপতি ব্রহ্মার চার মানসপুত্রের (সনক, সদানন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার) মধ্যে একজন এবং মুনিগনের সভায় দেবর্ষিতুল্য ভগবান। সনৎকুমার প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> এবং স দেবর্ষিবরো ভবিষ্যমিদমুক্তবান্।
> সনৎকুমারো ভগবান্ পুরা মুনিসমাগমে।।[৯]

সনৎকুমারের কাছ থেকে দশরথের মন্ত্রী সুমন্ত্র ভবিষ্যদ্-বাণী শুনেছিলেন যে, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে অযোধ্যায় রাজা দশরথ কৃত পুত্রেষ্টি যজ্ঞে বরণ করলে তিনি পুত্রলাভ করবেন।

পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, বসন্তকালে রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমারের কাছ থেকে ভবিষ্যদ্-বাণী শুনে দশরথের মন্ত্রী সুমন্ত্র যজ্ঞে ঋষ্যশৃঙ্গকে বরণ করেন। এবিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> স ঋষ্যশৃঙ্গমভ্যেত্য প্রণিপত্যাভিপূজ্য চ।
> হোতারং বরয়ামাস যজ্ঞে সন্তানকারণাৎ।।[১০]

রাজা দশরথ কর্তৃক পুত্রলাভের অনুনয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি পুনরায় দশরথকে পুত্রপদ বা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার কথা বলেন। তারপর রাজা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কথানুসারে পুত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য প্রবৃত্ত হলেন। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার পূর্বে ঋষ্যশৃঙ্গ সেই যজ্ঞে ভাগগ্রহণের নিমিত্ত সকল দেবতাগণের নিকট রাজা দশরথের হয়ে প্রার্থনা জানালেন যে, রাজা দশরথ পুত্রোৎপত্তির জন্য

তপস্যা করেছেন। শ্রদ্ধার সহিত দেবতাদের উদ্দেশ্যে রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন। পুত্রকামনায় পুনরায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ শুরু করেছেন। অতএব সকল দেবতাগণের প্রতি কৃতাঞ্জলি নিবেদন করে ঋষ্যশৃঙ্গ প্রার্থনা জানিয়েছেন যে, এই পুত্রাভিলাষী রাজার যজ্ঞ আহুতি গ্রহণ করে আপনারা অনুগ্রহপূর্বক প্রসন্ন হয়ে রাজাকে যোগ্য চার পুত্র দান করবেন। এ প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে–

অভিযাচে স বঃ সর্ব্বানস্যার্থেঽহং কৃতাঞ্জলিঃ।
ভবেয়ুরস্য চত্বারঃ পুত্রাস্ত্রৈলোক্যবিশ্রুতাঃ।।[১১]

রাজা দশরথ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পুণ্যফল স্বরূপ এবং ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির দেবতাদের উদ্দেশ্যে রাজা দশরথের জন্য প্রার্থনা স্বরূপ রাজা কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী এই তিন মহিষীর গর্ভে পুত্রপ্রাপ্তি বিষয়ে বর প্রাপ্ত হন। দৈববরের ফলস্বরূপ রাজা দশরথের সন্তানরূপে কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র, সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। রাজা দশরথের পুত্রোপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে–

তাসাং প্রজজ্ঞিরে পুত্রাশ্চত্বারোঽমিততেজসঃ।
রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্নভরতা দেবরূপিণঃ।।[১২]

২.১.২. অন্ধকমুনি : *বাল্মীকীয় রামায়ণের* 'অযোধ্যাকাণ্ডে' বর্ণিত রয়েছে অন্ধকমুনি এবং তাঁর স্ত্রী উভয়েই মৃত্যুকালীন অন্ধাবস্থায় রাজা দশরথকে অভিশাপ দেওয়ার কাহিনী। অন্ধকমুনি প্রদত্ত শাপকথনের রাত্রিতেই পুত্র রামের শোকে দশরথের প্রাণ-বিয়োগের কাহিনী। রামচন্দ্রের বনবাসের ষষ্ঠদিবসে অর্দ্ধরাত্রে জাগরিত রাজা দশরথ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে রামের জন্য শোক করতে করতে নিজের দারুণ দুষ্কর্ম স্মরণ করে কৌশ্যলাকে বলতে লাগলেন, মানুষ শুভ বা অশুভ যে কার্য্যই সম্পাদন করে থাকুক না কেন, কালক্রমে তার ফল অবশ্যই ফলবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, যে ব্যক্তি পুষ্প দর্শন করতে গিয়ে ফললাভের আশায় আম্রবন ত্যাগ করে পলাশবনে আশ্রয় ন্যায়, ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে সেই ব্যক্তি নিরাশ হয়। প্রসঙ্গক্রমে *বাল্মীকীয় রামায়ণের* 'অযোধ্যাকাণ্ডে' বলা হয়েছে–

তদ্-যথাম্রবণং হিত্বা পলাশবনমাশ্রয়েৎ।
পুষ্পং দৃষ্টাদ্ব ফলং প্রেপ্সুর্নিরাশঃ স্যাৎ ফলাগমে।।[১৩]

অবিবেচক ব্যক্তির ন্যায় রাজা দশরথও আম্রবন ত্যাগ করে পলাশবনে আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ রাজা দশরথ কোন এক রাত্রিতে শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ অবস্থায় একটি দুষ্কার্য্য করেছিলেন। যেরূপে কোন ব্যক্তি অজ্ঞানতা অবস্থায় বিষ ভক্ষণ করেন, সেইরূপ রাজা দশরথও পূর্বে অজ্ঞানতা বশতঃ তরুণ বয়সে একট পাপ কার্য্য করেছিলেন। পাপ কার্য্যটি হল এইরূপ, কোন একদিন বর্ষাকালে রাজা দশরথ পৃষ্ঠে ধনুষ্পাণি বেঁধে সরয়ূ নদীর তীরে মৃগয়ার নিমিত্ত গমন করেছিলেন। মৃগয়াবিহারে সময় ধনুকের জ্যা-এর শব্দের ফলে লক্ষ্যভেদে যাতে বিঘ্ন না হয়, সেকারণে রাত্রিতে সেই সরয়ূ নদীর নির্জ্জন তীরে উপস্থিত হয়ে, ধনুকে জ্যারোপণ করে রাত্রিকালে জলপানার্থী বন্য মৃগের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেইসময়ে অন্ধকমুনির পুত্র সিন্ধু অন্ধকারে রাতে কলসী ভরার নিমিত্ত সেই সরয়ূ নদীতে যান। অন্ধকারে তার কলসী নিমজ্জনের শব্দ শুনে হরিণের জলপানের শব্দ ভেবে, রাজা দশরথ শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করেন। পরিণামে মুনিপুত্র বাণবিদ্ধ হয়ে রাজা দশরথের উদ্দেশ্যে বলেন—

> বৃদ্ধস্যান্ধস্য দীনস্য বনে বন্যেন জীবিতঃ।
> মুনেঃ পুত্রবধাদেব হৃদি বাণো নিপাতিতঃ।।[১৪]

অর্থাৎ বনে বন্যফলমূলদ্বারা জীবণধারণকারী অন্ধ, বৃদ্ধ ও দরিদ্র মুনির পুত্রবধ রাজা দশরথ কর্তৃক শব্দভেদী বাণের ফলে হওয়ায়, সেই মুনির হৃদয়েই এই বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ সেই মুনিপুত্র তাঁর অন্ধ পিতা ও মাতার জন্য যেরূপে শোক করছিলেন, সেইরূপে নিজের প্রাণ-নাশের জন্য শোক করছিলেন না। কারণ মুনিপুত্রের অবর্তমানে সেই অন্ধকমুনি ও তাঁর পত্নীকে কে দেখবেন এই কথা স্মরণ করে। কিন্তু রাজা দশরথ মুনিপুত্রের প্রাণত্যাগের সময় কথা দেন যে, মুনিপুত্রের অবর্তমানে দীর্ঘকাল যাবৎ অন্ধক মুনিদম্পতিকে ভরণ-পোষণ করবেন। এই প্রসঙ্গে অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত *বাল্মীকীয় রামায়ণে* উপলব্ধ শিবসহায়-কৃত *রামায়ণশিরোমণি* টীকায় বলা হয়েছে—

> অন্ধমিথুনম্ অন্ধদম্পতী মাতাপিতৃযুগ্মমিত্যর্থঃ। ভৃতং পোষিতম্।[১৫]

কিন্তু মুনিপুত্র তখন রাজা দশরথকে জানান যে, এই নির্জন বনে অন্ধ অনাথ বৃদ্ধ পিতামাতা নিশ্চিতরূপে তার ফেরার আশায় অপেক্ষা করছেন, তার শরীর থেকে বাণমুক্ত করবার জন্য।

পুনরায় দশরথের প্রতি আক্ষেপের সহিত বলেন যে, মুনিপুত্র ব্রাহ্মণ নয়, তিনি বনবাসী ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। অতএব রাজা দশরথ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের ভয় পরিত্যাগ করে মুনিপুত্রের শরীর থেকে বাণমুক্ত করেন। এই প্রসঙ্গে অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত *বাল্মীকীয় রামায়ণে* উপলব্ধ শিবসহায়-কৃত *রামায়ণশিরোমণি* টীকায় বলা হয়েছে— "ব্রহ্মহত্যাকৃতাং ব্রহ্মহত্যাজনিতাং শঙ্কাং ভয়ং ত্যজ। তু যতোঽহয়ং ব্রাহ্মণেন শূদ্রায়াং জাতঃ এতেন পারশবাপরনামা নিষাদোঽস্মীতি সূচ্যতে"।[১৬]

পুনরায় মুনিপুত্রের কথানুযায়ী রাজা দশরথ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ ভয় পরিত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ অন্ধ বৃদ্ধ পিতার নিকট গিয়ে শব্দভেদী বাণের বৃত্তান্ত জানিয়ে শাপ থেকে বাঁচার উপায় নিশ্চিত করতে উদ্যত হন। কিন্তু বৃদ্ধ অন্ধ পিতা যখন জানতে পারে যে, শব্দভেদী বাণের দ্বারা তাদের পুত্র নিহত হয়েছে, সেই মুহূর্তেই তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শোকাবস্থায় রাজা দশরথকে জানাই যে, সামর্থ্যবিহীন অন্ধ বৃদ্ধ পিতা-মাতার ভরণপোষণ এর দায়িত্ব কে নেবেন। আজ থেকে তারাও অনাথের মতন জীবনধারণ করতে করতে নিশ্চিত খুব শীঘ্রই প্রাণ ত্যাগ করবেন। পুনরায় রাজা দশরথকে মুনি বলেন, যেহেতু রাজা অজ্ঞানতাবশত তার পুত্রকে হত্যা করেছেন, সেইহেতু রাজাকে ভস্ম না করে অভিশাপ দেয় যে, যেরূপে পুত্রশোকে কাতর অন্ধক মুনি প্রাণ ত্যাগ করছেন, সেইরূপে রাজা দশরথও পুত্রদর্শনের অভিলাষে ব্যাকুল হয়ে প্রাণ ত্যাগ করবেন। প্রসঙ্গক্রমে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> পুত্রশোকাতুরঃ প্রাণান্ সন্ত্যক্ষ্যাম্যবশো যথা।
> ত্বমপ্যন্তে তথা প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যসে পুত্রলালসঃ।।[১৭]

অন্ধকমুনি কর্তৃক রাজা দশরথকে এই অভিশাপ প্রদানের পরই মুনি ও মুনি পত্নী পুত্রশোকে বিহ্বল হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। রামচন্দ্রের বনগমনে পুত্র রামের শোকে বিহ্বল হয়ে রাজা দশরথ সেই শাপ বৃত্তান্ত কৌশল্যার নিকট বর্ণনা করে ষষ্ঠদিবসের অর্দ্ধরাত্রে প্রাণ ত্যাগ করেন। রাজা দশরথের প্রাণত্যাগ প্রসঙ্গ *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> স ব্রহ্মশাপো নিয়তমদ্য মাং সমুপস্থিতাঃ।
> তথাহি পুত্রশোকার্ত্তং প্রাণাঃ সংত্বরয়ন্তি মাম্।।
> চক্ষুর্ভ্যাং ন প্রপশ্যামি স্মৃতিস্মে দেবি লুপ্যতে।
> দূতা বৈবস্বতস্যৈতে ত্বরয়ন্তি চ মাং শুভে।।[১৮]

২.১.৩ কুশনাভের শতকন্যা : *বাল্মীকীয় রামায়ণের* 'আদিপর্বে' বর্ণিত হয়েছে মহারাজ কুশনাভ ও অপ্সরা ঘৃতচীর কাহিনী। প্রসঙ্গতঃ ঋষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক রামচন্দ্রের কথোপকথনে উঠে এসেছে কান্যকুব্জ নগরের বর্ণনা। সেই নগরের বর্ণনা প্রসঙ্গে রাজা কুশনাভের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ঋষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে বলেন, পূর্বকালে কুশনামক ব্রহ্মার এক মহান্ পুত্র ছিলেন। কুশ ও তাঁর পত্নী বৈদর্ভী মিলিত হয়ে কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজ ও বসু নামে বিখ্যাত পরাক্রমশালী, মহাপ্রযত্নশালী, দীপ্তিমান্, ক্ষাত্রধর্মপরায়ণ চারটি পুত্রের জন্ম দেন। চার পুত্রের প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে–

কুশাম্বং কুশনাভঞ্চ অমূর্ত্তরজসং বসুম্।
মহাত্মনো দীপ্তিমতঃ ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণান্।।[১৯]

পিতা কুশ তাঁর বেদজ্ঞ চার পুত্রকে বললেন যে, হে পুত্রগণ, তোমরা ধর্মানুসারে প্রজা পালন করতে প্রবৃত্ত হও। লোকপালসদৃশ চার পুত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করে পৃথক্ পৃথক্ চারটি নগর স্থাপন করলেন। পিতা কুশের চার পুত্রের মধ্যে প্রথম পুত্র কুশাম্ব কৌশাম্বী নামক শোভাময়ী পুরী স্থাপন করেন। দ্বিতীয় ধর্ম্মাত্মা পুত্র কুশনাভ কান্যকুব্জ নামক নগর স্থাপন করেন। প্রসঙ্গক্রমে অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত *বাল্মীকীয় রামায়ণে* উপলব্ধ লোকনাথ চক্রবর্তীর *মনোহরা* টীকায় বলা হয়েছে– 'মহোদয়ং কান্যকুব্জম্। মহোদয়ং কান্যকুব্জে চাধিপত্যাপবর্গয়োরিতি কোষঃ'।[২০] তৃতীয় বীর্যশালী পুত্র অমূর্ত্তরজাঃ প্রাগ্-জ্যোতিষ নামক নগর স্থাপন করেন এবং চতুর্থ দীপ্তিমান্ পুত্র বসু গিরিব্রজ নগর স্থাপন করেন। চার নগরের উৎপত্তি প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে–

তেষাং কুশাম্বঃ কৌশাম্বীং পুরীমাবাসয়চ্ছুভাম্।
কুশনাভস্তু ধর্ম্মাত্মা পুরং চক্রে মহোদয়ম্।।
তথামূর্ত্তরজা বীরশ্চক্রে প্রাগ্-জ্যোতিষং পুরম্।
ধর্ম্মারণ্যসমীপস্থং বসুশ্চক্রে গিরিব্রজম্।।[২১]

রাজা কুশনাভের শত কন্যার জন্ম এবং পবনদেব কর্তৃক তাদের কটিদেশ ভগ্ন : রাজা কুশনাভের ঔরসে অপ্সরা ঘৃতচীর গর্ভে রূপে-গুণে সমন্বিত শ্রেষ্ঠ একশত পরমরূপবতী কন্যা জন্মায়। এবিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে–

কুশনাভোঽপি রাজর্ষিঃ কন্যাশতমনুত্তমম্।
জনয়ামাস দুর্দ্ধর্ষো ঘৃতাচ্যাং রঘুনন্দন।।[২২]

রাজা কুশনাভের রূপযৌবনসম্পন্না শতকন্যা কোন একদিন কান্যকুব্জ নগরের মধ্যে অবস্থিত উদ্যানভূমিতে সুন্দররূপে গন্ধদ্রব্যে ও মাল্যে অলঙ্কৃত হয়ে আগমনপূর্ব্বক বিদ্যুন্মালার ন্যায় ক্রীড়া করছিলেন। সেই ক্রীড়ার ন্যায় কন্যাগণ গীত, বাদ্য ও নৃত্য করতে করতে পরম আনন্দ উপভোগ করছিলেন। কন্যাগণের ক্রীড়ারতাবস্থায় সর্বত্র বিচরণকারী পবনদেব সেই উদ্যানে উপস্থিত হন এবং সেই কন্যাগণের রূপযৌবন তাকে আকৃষ্ট করে। রূপযৌবনে আকৃষ্ট হয়ে কামাতুর পবনদেব শতকন্যার উদ্দেশ্যে বলেন—

অথ তাশ্চারুসর্ব্বাঙ্গী রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
দৃষ্ট্বা তু সর্ব্বগো বায়ুরিদং বচনমব্রবীৎ।।
অহং বঃ কাময়ে সর্ব্বা ভার্য্যা ভবত মেঽবলাঃ।
ত্যক্ত্বা মানুষ্যকং ভাবমমরত্বমবাপ্স্যথ।।[২৩]

অর্থাৎ পবনদেব রাজা কুশনাভের কন্যাগণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কন্যাগণকে কামনা করেন অর্থাৎ বিবাহ করতে চাই। এছাড়াও কামাতুর পবনদেব কন্যাগণের প্রতি বলেন, পবনেদেবের ভার্যা হওয়ার জন্য এবং কন্যাগণ পবনদেবের ভার্য্যা হলে তারা সকলেই মনুষ্যভাব পরিত্যাগ করে দেবভাব প্রাপ্ত হবেন। এ প্রসঙ্গে M.N. Dutt সম্পাদিত *Rāmāyaṇa of Vālmīki* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন– "The Air, beheld them and said- I seek for you: do you become my wives. Do you renounce this human guise, and attain long lives".[২৪]

পবনদেবের উপর্যুক্ত কামাতুর বাক্য শুনে সকল কন্যাগণ তার উদ্দেশ্যে বলেন– "হে মারুত, আপনি সকল প্রাণীর অন্তরে বিচরণ করেন এই বাক্য সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ রয়েছে, তা আমরা সকলেই জানি। তাছাড়া আপনার প্রভাব অবগত রয়েছি, কেন আপনি অনুচিত প্রার্থনা করে আমাদেরকে অপমান করছেন? আমরা সকলেই রাজা কুশনাভের কন্যা। সত্যবাদী পিতার অজ্ঞাতসারে কন্যারা বিবাহে অসম্মত হয়ে পবনদেবকে বলেন, আমাদের কুলধর্ম ভ্রষ্ট করা আপনার উচিত নয়। কারণ পিতাই আমাদের প্রভু, পিতাই আমাদের পরম দেবতা, তিনি যাঁহার হস্তে আমাদের সমর্পণ করবেন, তাকেই আমরা স্বামী বলে মেনে নেব। এই বাক্য শ্রবণ মাত্রই পবনদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ

হন এবং ক্রুদ্ধ পবনদেব সকল রাজা কুশনাভের শত কন্যার শরীরের প্রবেশ করে সর্বাঙ্গ বিকৃত ও ভগ্ন করে দেন"।[২৫] পবনদেব কর্তৃক রাজা কুশনাভের শতকন্যার ভগ্নতা বিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে–

> পিতা হি প্রভুরস্মাকং দৈবতং পরমং চ সঃ।
> যস্য নো দাস্যতি পিতা স নো ভর্তা ভবিষ্যতি।।
> স্পৃষ্টমাত্রে ততঃ পাণিং বিকুব্জা বিগতজ্বরাঃ।
> যুক্তাঃ পরময়া লক্ষ্যা বভুঃ কন্যাশতং তদা।।[২৬]

রাজা কুশনাভের শতকন্যার পবনদেব কর্তৃক শারীরিক বৈকল্য প্রসঙ্গে M.N. Dutt কর্তৃক সম্পাদিত *Rāmāyaṇa of Vālmīki* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে– "Our father verily is our lord an prime God. Of him even shall we become the wives to whom our father gives us away. At these words of theirs, that lord and adorable one, the Air, exceedingly enraged, then entered into their bodies, and break all their limbs".[২৭]

প্রসঙ্গতঃ অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত *বাল্মীকীয় রামায়ণে* উপলব্ধ ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত *রামায়ণমঞ্জুরী* গ্রন্থে কুশনাভের কন্যাগণের বিকলতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– 'মধ্যে কটিদেশে বভঞ্জ কুব্জীচকারেত্যর্থঃ। প্রবিশ্য সর্ব্বগাত্রাণি ক্রুদ্ধঃ কুব্জীচকারতাঃ'।[২৮]

<u>**কুশনাভের কন্যাগণের অঙ্গবৈকল্যের পরবর্তী অবস্থা ও পুনরায় স্বাভাবিক শরীর প্রাপ্তি**</u> **:** রাজা কুশনাভের সকল কন্যাগণ বায়ুকর্তৃক ভগ্ন শরীর নিয়ে পিতৃভবনে প্রবেশ করে আকুলচিত্তে, সলজ্জ ও সাশ্রুনেত্র হয়ে পিতা কুশনাভের সম্মুখে ভূতলে পড়ে গেলেন। কন্যাগণের এই দৃশ্য দেখে রাজা কুশনাভ স্নেহপরায়ণ হয়ে তাদের কটিদেশ ভগ্নতার কারণ জানতে চাইলেন। পিতার প্রশ্নের উত্তরে কন্যাগণ ভগ্নতার কারণ বিষয়ে বললেন–

> বায়ুরস্মানুপাগম্য বলবান্ কামমোহিতঃ।
> উৎক্রম্য ধর্ম্মমর্য্যাদাং প্রধর্ষয়িতুমুদ্যতঃ।।
> সোঽস্মাভিরুক্তঃ সর্ব্বাভির্ব্বায়ুঃ কামবশং গতঃ।
> পিতৃমত্যঃ স্ম ভগবন্ ন স্বচ্ছন্দচরা বয়ম্।।
> পিতরং নোঽভিযাচ ত্বং ন্যায়তো যদি মন্যসে।
> ন বয়ং স্বৈরচারিণ্যঃ প্রসীদ ভগবন্নিতি।।[২৯]

অর্থাৎ বলবান্ বায়ু কামমোহিত হয়ে কন্যাগণের নিকট আগমনপূর্বক ধর্মমর্য্যাদা উলঙ্ঘন করে বল প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছিল। সেই সময় কামপরতন্ত্র পবনদেবকে কুশনাভের কন্যাগণ বলেন— "হে ভগবান, আমাদের পিতা বর্তমানে আছেন, আমরা কামচারিণী নহি। যদি (ভাল) মনে করেন, তাহা হইলে পিতার নিকট (গিয়া) ন্যায়ানুসারে প্রার্থনা করুন। ভগবন্, আমরা স্বৈরচারিণী নহি। আমাদের প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন"।[৩০] এই বাক্য শ্রবণমাত্রই পবনদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে গিয়ে কন্যাগণের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে কটিদেশ ভগ্ন করেন এবং সেইহেতু কুশনাভের শতকন্যা সকলেই কুব্জত্ব প্রাপ্ত হয়। পবনদেব কর্তৃক শতকন্যার কুবজত্বা বিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

ইত্যুক্তং কুপিতো বায়ুঃ প্রবিশ্যাঙ্গানি নঃ প্রভো।
বভঞ্জঃ বলবাংস্তেন সর্ব্বাঃ কুব্জীকৃতা বয়ম্।।[৩১]

রাজা কুশনাভ তাঁর শতকন্যার মুখে কটিদেশ ভগ্নতার কথা শ্রবণ করে, কন্যাগণের উদ্দেশ্যে বলেন— "হে পুত্রীগণ, তোমরা যে পবনদেবের মর্য্যাদাতিক্রম ক্ষমা করিয়াছ এবং (তোমরা) যে আমার কুলশোভা (কুলমর্য্যাদা) রক্ষা করিয়াছ, তাহাতে আমার অতীব প্রিয় কার্য্য করা হইয়াছে। হে পুত্রীগণ, নারীদিগের ক্ষমাই বিশেষ ভূষণ। দেবতাদিগকে সর্ব্বতোভাবে ক্ষমা করা উচিত, ইহা আমি মনে করি"।[৩২] এ প্রসঙ্গে অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত *বাল্মীকীয় রামায়ণে* উপলব্ধ লোকনাথ চক্রবর্তীর *মনোহরা* টীকায় বলা হয়েছে— "বায়োর্ব্যভিচারকৃতং ব্যভিচারায় ভবতীভিঃ সহ সঙ্গমায় ঈদৃশং কৃতং কর্ম্ম। তদ্ যদ্ ভবতীভিঃ ক্ষান্তং তৎ সুকৃতং সুকর্ম্ম কৃতমহং মন্যে। দুষ্করমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। যস্মাৎ ক্ষমাকর্ম্মণা স্বয়মপি সুব্রতাঃ সুচরিত্রাঃ"।[৩৩]

অর্থাৎ বায়ু দেবতার এইসকল ব্যতিক্রমজনিত কার্য শতকন্যাগণ ক্ষমা করেছেন। তাতে রাজা কুশনাভ মনে করেন, কন্যাগণ এই কার্য করে নিজের পুণ্য করেছেন এবং সুচরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন। এই বাক্য বলার পর রাজা কুশনাভ সকল কন্যাগণকে বিবাহ দেওয়ার জন্য মনোস্থির করলেন এবং তার মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাপূর্বক কন্যাগণকে তাদের স্বকক্ষে যাবার নির্দেশ দিলেন। সেই সময় কুশনাভের নগরে চূলী নামক এক মহান্ ঋষি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করছিলেন। তার মহিমা বিষয়ে তিনি পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন। ধর্মজ্ঞ কুশনাভ তৎক্ষণাৎ সেই মহান্ ঋষির নিকটে গিয়ে তার কন্যাগণের সহিত যে বায়ু দেবতা কর্তৃক যে ব্যভিচার হয়েছে, তা চূলী নামক ঋষিকে

জানায়। এছাড়াও রাজা কুশনাভ তার শতকন্যাকে যোগ্য পাত্রের হস্তে নিবেদন করতে পারেন। তারজন্য ঋষির প্রতি অনুনয়-বিনয় করেন। কন্যাদের জন্য রাজা কুশনাভের অনুনয় শেষে চূলী ঋষি কন্যাদের প্রতি বর দেন যে, চূলী ঋষির ঔরসে এবং সোমদা নামক তপস্বীর গর্ভে কঠোর তপস্যার ফলে জাত কাম্পিল্য নগরের রাজা ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে বিবাহ হলে তারা স্বরূপ ফিরে পাবে। চূলী ঋষি প্রদত্ত বাক্য শ্রবণ করে রাজা কুশনাভ ব্রহ্মদত্তের হস্তে কন্যাগণকে অর্পণ করার জন্য উদ্যত হলেন। এবিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

তং শ্রুত্বা পরয়া লক্ষ্ম্যা কুশনাভোঽন্বিতং নৃপম্।
ব্রহ্মদত্তায় তাঃ কন্যাঃ প্রদাতুমুপচক্রমে।।[৩৪]

কুশনাভের কন্যাগণের কটিদেশ ভগ্নতার নিরিখে কান্যকুব্জ নগরের নামকরণ : ধর্মজ্ঞ কুশনাভ, কাম্পিল্য নগরের মহীপতি ব্রহ্মদত্তকে আহ্বান করে তাঁর প্রতি অতিপ্রসন্ন হৃদয়ে তার শত কন্যাদিগকে প্রদান করেন। অত্যন্ত তেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মদত্ত যথাক্রমে রাজা কুশনাভের শত কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং কন্যাগণের পাণিস্পর্শ মাত্রই সেই কন্যাগণ সম্পূর্ণরূপে ব্যাথামুক্ত হন। এছাড়া কন্যাগণ পুনরায় তাদের রূপ, ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণসমূহ ফিরে পায়। এ প্রসঙ্গে বিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

যথাক্রমং স সর্ব্বাসাং তাসামনুপমদ্যুতিঃ।
জগ্রাহ বিধিবৎ পাণীন্ ব্রহ্মদত্তো নরাধিপঃ।।
তেন চ স্পৃষ্টমাত্রেষু তাঃ পাণিষু গতব্যথাঃ।
বভূবুঃ সর্ব্বশঃ কন্যা রূপৌদার্য্যগুণান্বিতাঃ।।[৩৫]

পুনরায় M.N. Dutt সম্পাদিত *Rāmāyaṇa of Vālmīki* গ্রন্থে বলা হয়েছে— "And, O descendant of Raghu, king Brahmadatta resembling the lord himself of the celestials, by turns received their hands in marriage. And as soon as he touched them, the hundred daughters were cured of their crookedness, and became free from anguish, and were endowed with pre-eminent beauty".[৩৬]

মহীপতি কুশনাভ তাঁর কন্যাগণের বায়ুকৃত দোষ নির্মুক্ত দেখে পরম বিস্ময় প্রকাশ করলেন এবং আনন্দিত হয়ে কন্যাগণকে অভিনন্দন জানালেন। এ প্রসঙ্গে অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত *বাল্মীকীয়*

রামায়ণের স্বয়ংকৃত টিপ্পনীতে বলা হয়েছে— 'বায়ুনা বায়ুকৃতদোষেণ মুক্তাস্ত্যক্তাঃ। শিরোঃ। মুমুদে অভিননন্দ চ অনুকূলজামাতৃলাভেনেতি বোধ্যম্'।[৩৭]

যেহেতু কুশনাভের নগরে বায়ু তার শত কন্যাগণকে কুব্জ করেছিলেন, সেইজন্য রাজা কুশনাভকৃত নগর কান্যকুব্জ নামে খ্যাত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

যদ্ বায়ুনা চ তাঃ কন্যাস্তত্র কুব্জীকৃতাঃ পুরা।
কান্যকুব্জমিতি খ্যাতং ততঃ প্রভৃতি তৎ পুরম্।।[৩৮]

প্রসঙ্গক্রমে অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত *বাল্মীকীয় রামায়ণে* উপলব্ধ ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত *রামায়ণমঞ্জরী* গ্রন্থে কান্যকুব্জ নগরের নামকরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— 'কুব্জত্বাৎ কন্যকানাং তৎ কান্যকুব্জমভূৎ পুরমিতি'।[৩৯]

২.১.৪. মন্থরা : রাবণকে বধের নিমিত্ত ভগবান ব্রহ্মা যখন সকল দেবগণকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে বলেন, তখন দুন্দভী নামক গন্ধর্বীকে দেবতাগণের কার্যসিদ্ধির জন্য মর্ত্যলোকে যেতে আদেশ করেন। পিতামহের কথা শুনে দুন্দভী নামক গন্ধর্বী মনুষ্যলোকে কুব্জা মন্থরারূপে আবির্ভূত হয়। এ প্রসঙ্গে অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত *বাল্মীকীয় রামায়ণের* স্বয়ংকৃত টিপ্পনীতে বলা হয়েছে— "অথ সীতায়া লঙ্কাপুরপ্রবেশং বিনা রাবণবধস্যাশক্যতয়া তৎসিদ্ধয়ে দেবৈঃ প্রেরিতায়াঃ কৃতকুব্জাবেশায়া মন্থরায়া রামাভিষেকবিঘ্নপ্রবৃত্তিং তদ্রাত্রিগতং কৈকেয়ীবৃত্তান্তঞ্চ বক্তুমুপক্রমতে জ্ঞাতীত্যাদিনা"।[৪০] দশরথের স্ত্রী কৈকেয়ীর পিত্রালয় থেকে আগত দাসী হলেন মন্থরা। প্রসঙ্গতঃ *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

জ্ঞাতিদাস্যথ কৈকেয়্যাঃ সহোঢ়া পরিচারিকা।
প্রাসাদাগ্রমুপারূঢ়া তস্মিন্ কালে যদৃচ্ছয়া।।[৪১]

অর্থাৎ পরিচারিকারূপে মন্থরা নামক কৈকেয়ীর মাতৃকুলের সঙ্গে আগত একজন কুব্জা দাসী রাজা দশরথের প্রাসাদশিখরে আরোহণ করল। প্রাসাদ-শিখরে এসে সেই পরিচারিকা দেখতে লাগল যে, অযোধ্যা নগরের শোভমান রাজপথ, সমুন্নত-পতাকা সমন্বিতা (সমুচ্ছিতধ্বজবতীং সমুন্নতধ্বজবিশিষ্টাম্) এবং হৃষ্টপুষ্ট জনসমূহে (হৃষ্টৈ রামাভিষেকবার্ত্তাশ্রবণেন সঞ্জাত-হর্ষৈঃ পুষ্টৈরন্নাদিলাভেন চ পুষ্টিমাপন্নৈর্জনৈরাকুলাং ব্যাপ্তাম্) সমগ্র রাজ্য পরিব্যপ্ত।[৪২] অযোধ্যা নগরের

এরূপ দৃশ্য দেখে মন্থরা নগরের জনগণের আনন্দের কারণ জানতে চাইলেন। সেই সময় ধাত্রী নামক অযোধ্যা নগরের একজন অধিবাসী মন্থরাকে বললেন—

আচচক্ষে যথাবৃত্তং যৌবরাজ্যাভিষেচনম্।
শ্বঃ পুষ্যযোগেণ কিল যৌবরাজ্যে স্বমাত্মজম্।
অভিষেচয়িতা রামং রাজা গুণগণাকরম্।।[৪৩]

অর্থাৎ আগামীকাল পুষ্যানক্ষত্রযোগে রাজা দশরথ তাঁর সর্ব্বগুণাধার পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাবেন। সেই কারণেই সমগ্র অযোধ্যাবাসী সহিত রামমাতা কৌশল্যাও অত্যন্ত আনন্দিত। এই বাক্য শ্রবণ মাত্রই দাসী মন্থরা শয়নরতা কৈকেয়ীর কাছে গিয়ে প্ররোচনা দিয়ে বলেন, কৌশল্যা সৌভাগ্যবতী, কেননা তাঁর পুত্রের রাজ্যাভিষেক হবে, সেই সৌভাগ্য কৈকেয়ীর নেই। এ প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

বৃথা সৌভাগ্যমানেন দুর্ভগে ত্বং বিমুহ্যসে।
গিরিনদ্যা ইব স্রোতস্তব সৌভাগ্যমস্থিরম্।।[৪৪]

অর্থাৎ মন্থরাকৃত কৈকেয়ীর প্রতি উক্ত হয়েছে যে, বৃথা সৌভাগ্যগর্বে বিমুগ্ধ কৈকেয়ীর গিরিনদীর স্রোতের ন্যায় সৌভাগ্যও অস্থির, কেননা রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন। এমতবস্থায় কুটবুদ্ধিসম্পন্ন মন্থরা কৈকেয়ীর উদ্দেশে বলেন—

সাম্যপারে ভৃশং মগ্না দুঃখশোকমহার্ণবে।
প্রতপ্তাস্ম্যনলেনেব তদ্ধিতার্থমুপাগতা।।
তব দুঃখেন কৈকেয়ি মম দুঃখতরং ভবেৎ।
তব বৃদ্ধৌ হি মে বৃদ্ধিরিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।।[৪৫]

অর্থাৎ রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন বলে, মন্থরা অপার দুঃখশোক থেকে মহাসমুদ্রে অতীব মগ্ন হয়ে যেন অগ্নির দ্বারাই মানসিকভাবে দগ্ধ হয়েছে। সেই হেতু মন্থরা কৈকেয়ীর মঙ্গলের জন্য তাঁর নিকটে উপস্থিত হন এবং দশরথ পত্নী কৈকেয়ীর উদ্দেশ্যে বলেন, ‘তোমার দুঃখে আমার দুঃখ, তোমার অভ্যুদয়েই আমার অভ্যুদয়। অতএব হে কৈকেয়ী, তুমি মাতার ন্যায় হিত কামনায় পতিনামক আশীবিষ তুল্য শত্রুকে তোমার অঙ্কে ধারণ করেছ। শত্রু অথবা সর্পকে বিনাশ না

করলে তারা যেরূপে অনিষ্ট করে থাকে, রাজা দশরথ আজ সেইরূপে তোমার প্রতি অনিষ্টচারণ করছে'।[৪৬] এ প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> যথা তু কুর্য্যাৎ সর্পো বা শত্রুর্ব্বা প্রত্যুপেক্ষিতঃ।
> রাজ্ঞা দশরথেনাদ্য স পুত্রা ত্বং তথা কৃতা।।[৪৭]

মন্থরার এইরূপ বাক্য শুনে হর্ষযুক্তা কৈকেয়ী তৎক্ষনাৎ একখানি সুন্দর আভরণ নিজ গাত্র থেকে খুলে কুব্জাকে প্রদান করলেন এবং কৈকেয়ী মন্থরার উদ্দেশ্যে বললেন, মন্থরা বর্তমানে কুব্জার নিকট অভীষ্ট প্রিয় বার্তা নিবেদন করেছেন, সেই হেতু কুব্জার প্রতি এই প্রীতিদানপূর্বক আভরণ প্রদান করেছে। পুনরায় কৈকেয়ী মন্থরার উদ্দেশ্যে বলেন, রাম ও ভরতের কিছুই পার্থক্য তার কাছে নেই এবং রাজা দশরথ যে রামকে অভিষিক্ত করবেন, এতে কৈকেয়ীর সম্পূর্ণরূপে সম্মতি রয়েছে। অতএব রাজা দশরথ পুষ্যানক্ষত্রযোগে মহাপরাক্রমশালী প্রিয় অভীষ্ট ঔরস পুত্র গুণাকর রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন, এর থেকে অধিকতর প্রিয় সত্য তার কাছে কিছুই হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> রামে বা ভরতে বাপি বিশেষো নাস্তি কশ্চন।
> তস্মাৎ প্রিয়ং মে যদ্রামং রাজা রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।।
> ন মে প্রিয়ং কিঞ্চিদতঃ পরং ভবেদ্ যদস্য রাজা সুতমিষ্টমাত্মজম্।
> গুণাকরং রামমুদারবিক্রমং স যৌবরাজ্যে প্রতিপাদয়িষ্যতি।।[৪৮]

কৈকেয়ীর মুখে এইরূপ বাক্য শুনে মন্থরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রীতিদান আভরণ নিক্ষেপ করে পুনরায় বলতে লাগলেন যে, "হে মূঢ়ে, হে পাণ্ডিত্যাভিমানশালিনী, হে দুর্ভগে, হে জ্ঞানহীন, হে বিপরিতার্থদর্শিনি অর্থাৎ যে ইষ্টকে অনিষ্ট ও অনিষ্টকে ইষ্ট বলে গ্রহণ করেছ। অতএব তোমাকে সর্প দংশন করুক"।[৪৯] এছাড়াও কুটিলবুদ্ধি সম্পন্না মন্থরা পুনরায় বলেন, কৌশল্যাকে তিনি ভাগ্যশালিনী মনে করেছেন, কারণ কৌশল্যার পুত্র রামচন্দ্রই ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুষ্যানক্ষত্রে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন। যার ফলস্বরূপ অতি বিপুল ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত কৌশল্যাকে সমৃদ্ধিপরিশুন্যা কৈকেয়ীকে দাসীর ন্যায় সেবা করতে হবে। এছাড়াও মন্থরা আরও বলেন, রামপত্নী সমৃদ্ধিযুক্তা ও শ্রীসম্পন্না হবেন, কিন্তু কৈকেয়ী পুত্রবধূ শ্রীবিরহিতা ও অসমৃদ্ধ হবেন। এ বিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

কৌশল্যাং সুভগাং মন্যে যস্যাঃ পুত্রোঽভিষিচ্যতে।
যৌবরাজ্যে পৈতৃকেঽস্মিন্ পুষ্যেণ কৃতলক্ষণঃ।।
প্রাপ্তাং সুমহদৈশ্বর্য্যমৃদ্ধামৃদ্ধিবিবর্জ্জিতা।
উপস্থাস্যপি কৌশল্যাং দাসীব ত্বমপণ্ডিতে।।
ঋদ্ধিযুক্তা শ্রিয়া জুষ্টা রামপত্নী ভবিষ্যতি।
অশ্রীমতী ত্বসমৃদ্ধা স্নুষা তে চ ভবিষ্যতি।।[৫০]

মাতা কৈকেয়ীর মনে পুত্র রামচন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষজাগরণে মন্থরার ভূমিকা : রামের অভ্যুদয়ে প্রীতিসম্পন্না কৈকেয়ী অতিরিক্ত অসুন্তুষ্ট দাসী মন্থরার রামের প্রতি উপর্যুক্ত বাক্য বলতে দেখে, রামের গুণগ্রাহীর প্রশংসা করতে লাগলেন। কৈকেয়ী রামের হিতার্থে বলতে লাগলেন, ধর্মাত্মা, গুরুনির্দেশবর্তী, কৃতজ্ঞ, সত্যবাক্, শুচি, রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রাম যৌবরাজ্যে উপযুক্ত। এ প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

ধর্ম্মাত্মা গুরুবর্তী চ কৃতজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।
রামো রাজ্ঞঃ সুতো জ্যেষ্ঠো যুবরাজত্বমর্হতি।।[৫১]

পুনরায় কৈকেয়ী মন্থরার উদ্দেশ্যে বলেন, দীর্ঘায়ু রাম পিতার ন্যায় সকল ভাতৃগণকে পালন করবেন এবং মাতৃগণের প্রিয় কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করবেন। সর্বত্র সমদর্শী রামচন্দ্র তার নিজ মাতা কৌশল্যার থেকেও কৈকেয়ীকে অতিরিক্ত সম্মান প্রদান করে থাকেন। অতএব মহান রামচন্দ্রের অন্যের সম্বন্ধে অকল্যাণ বা অনিষ্টচিন্তা ও দ্বেষ নেই। অতএব রামের অভিষেক শ্রবণ করে মন্থরা যেন দুঃখ না করে। এছাড়াও কৈকেয়ী মন্থরার উদ্দেশ্যে বলেন, রামের রাজত্বের একশত বৎসর পরে নিশ্চয়ই ক্রমানুসারে ভরতও পিতৃপিতামহরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন। এই প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

ভরতশ্চাপি রামস্য ধ্রুবং বর্ষশতাৎ পরম্।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং ক্রমপ্রাপ্তমবাপ্-স্যতি।।[৫২]

অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত *বাল্মীকীয় রামায়ণে* উপলব্ধ শিবসহায়-কৃত *রামায়ণশিরোমণি* টীকায় বলা হয়েছে—'অভ্যুদয়ে রামাভিষেকজনিতোৎ সবে বর্ত্তমানে সতি ভবিষ্যতি ভরতাগমনজনিতে আগামিনি উৎসবে তদর্থমিত্যর্থঃ'।[৫৩]

উপর্যুক্ত কৈকেয়ী মুখনিশ্রিত বাক্য শ্রবণ করে মন্থরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করে কৈকেয়ীর উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন— "হে অনর্থদর্শিনী, হে অপ্রজ্ঞে, অনন্ত ও অগাধ দুঃখপাতালে নিমগ্না তুমি নিজের ভাগ্যের অবস্থা কেন বুঝতে পারছেন না কারণ রাম যদি এখন রাজা হন, তাহলে রামের অর্বতমানে রামের পুত্রই রাজা হবেন। তারপরে সেই রামপুত্রের বংশে অন্য কেউ এবং তারপরে তার বংশে অন্য কেউ রাজা হবেন"।[৫৪] অতএব এই রাজবংশ থেকে ভরত বিচ্যুত হবেন, কারণ রাজার বহুপুত্র থাকলেও কেবলমাত্র একজন পুত্রই রাজ্যে অভিষিক্ত হবেন। অতএব কৈকেয়ী পুত্র ভরত অনাথের ন্যায় সকলপ্রকার সুখ ও শাশ্বত রাজবংশ থেকে বিচ্যুত হবেন। কিন্তু রামচন্দ্র নির্বিঘ্নে এই রাজ্যের রাজা হয়ে নিশ্চিতরূপে ভরতকে দেশান্তরে প্রেরণ করবে অথবা হত্যা করবেন। এই বিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> ধ্রুবং চ ভরতং রামঃ প্রাপ্য রাজ্যমকণ্টকম্।
> দেশান্তরঞ্চ নয়িতা দেহান্তরমথাপি বা।।[৫৫]

কারণ মন্থরা মনে করছেন যে, রাম লক্ষ্মণের প্রতি অনুরক্ত, লক্ষ্মণও রামের প্রতি অনুরক্ত। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় রাম ও লক্ষ্মণের সৌভ্রাতৃত্ব পৃথিবী বিখ্যাত। অতএব রাম লক্ষ্মণের প্রতি কোন অনিষ্ট করবেন না, কিন্তু ভরতের প্রতি নিশ্চিত অনিষ্ট করবেন। এই প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> ভক্তো হি রামঃ সৌমিত্রিং লক্ষ্মণশ্চাপি রাঘবম্।
> অশ্বিনোরিব সৌভ্রাত্রমনয়োর্লোকবিশ্রুতম্।।
> তস্মান্ন লক্ষ্মণে কিঞ্চিৎ পাপং রামঃ করিষ্যতি।
> রামস্তু ভরতে পাপং কুর্য্যাদিতি ন সংশয়ঃ।।[৫৬]

মন্থরার এইরূপ পরামর্শ শুনে কৈকেয়ী ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার জন্য মনোস্থির করলেন। কিন্তু কৈকেয়ী চিন্তা করলেন কি উপায়ে রাজা দশরথকে এবিষয় সম্পর্কে বলবেন যে, ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন? সেই বিষয়েও কৈকেয়ী তৎক্ষণাৎ চিন্তা করতে লাগলেন। কুটবুদ্ধিসম্পন্ন মন্থরা সেই সময় কৈকেয়ীকে মনে করিয়ে দেয়, শম্বরাসুরের সাথে যুদ্ধে রাজা দশরথ আহত হলে কৈকেয়ী তাকে রণভূমি থেকে সরিয়ে এনে সেবা দিয়ে সুস্থ করেছিলেন। সেই সময় রাজা দশরথ তাকে একই সাথে দুটি বর দিতে রাজি হয়েছিলেন। এখনই সেই সময়

উপস্থিত হয়েছে তার উচিত প্রথম বরে রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠানো এবং দ্বিতীয় বরে ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা । প্রসঙ্গক্রমে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

রামপ্রব্রাজনায়ৈকং নববর্ষাণি পঞ্চ চ।
দ্বিতীয়ং যৌবরাজ্যায় ভরতস্য বরং শুভে।।
যৌ তু দেবাসুরে যুদ্ধে বরৌ দশরথৌ দদৌ।
তৌ স্মারয়িত্বা যাচেথাঃ পশ্চাদেতদ্ বরদ্বয়ম্।।[৫৭]

পুনরায় মন্থরা বলেন যে, রাজা দশরথ কখনই কৈকেয়ীর উক্ত বরদ্বয় লঙ্ঘন করতে সক্ষম নয় এবং এই সময়ই উপযুক্ত সময় উপস্থিত যেই সময়ে নৃপতি দশরথকে রামচন্দ্রের অভিষেক সঙ্কল্প থেকে নিবৃত্ত করা প্রয়োজন। মন্থরাকর্তৃক এইরূপ বাক্য কৈকেয়ী অনিষ্টকে ইষ্ট রূপে দেখতে লাগলেন এবং মন্থরাকে আলিঙ্গনপূর্বক বলতে লাগলেন, মন্থরা প্রকৃতই হিতভাষিণী এবং তার অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিষয়ে কৈকেয়ী জ্ঞাত ছিলেন না। কিন্তু এখন কৈকেয়ী প্রত্যক্ষ করেছেন যে, এই পৃথিবীতে বুদ্ধিতে মন্থরার তুল্য কেউ নেই। এবিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

প্রজ্ঞাং তে নাভিজানামি শ্রেষ্ঠাং শ্রেষ্ঠাভিধায়িনি।
অস্যাং পৃথিব্যাং কুব্জেঽন্যা বুদ্ধ্যা নাস্তি সম ত্বয়া।।[৫৮]

পুনরায় কৈকেয়ী মন্থরার উদ্দেশ্যে বলেন যে, মন্থরা তার প্রতি অনুরক্তা। মন্থরায় কৈকেয়ীর সর্বক্ষণের সাথী। মন্থরা প্রকৃতই কৈকেয়ীর হিতৈষিণী। পুনরায় কৈকেয়ী কুব্জা মন্থরার উদ্দেশ্যে বলেন যে, কৈকেয়ী রামের কুটিল অভিসন্ধি বোধগম্য করতে সক্ষম হয়নি। এছাড়াও কৈকেয়ী আরও বলেন যে, মন্থরার মতো এই পৃথিবীতে অনেক বক্রদেহী, বিকৃতরূপা ও বিকৃতমুখসম্পন্না কুব্জা মহিলা থাকা সত্ত্বেও, মন্থরা প্রকৃতভাবে পদ্মপাতার ন্যায় প্রিয়দর্শনা। এ প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

ত্বমেব চানুরক্তা মে নিত্যযুক্তা হিতৈষিণা।
নাহং জানামি কুটিলং কুব্জে রামচিকীর্ষিতম্।।
সন্তি দুঃসংস্থিতাঃ কুব্জা বিরূপা বিকৃতাননাঃ।
ত্বন্তু পদ্মান্তরনিভা কুব্জেতি প্রিয়দর্শনা।।[৫৯]

কৈকেয়ীর মুখে মন্থরার বৈকল্যযুক্ত শরীরিক বর্ণনা : মন্থরার উদ্দেশ্যে কৈকেয়ীর উপর্যুক্ত বাক্য বলার পর আনন্দে তার শরীরের বর্ণনা দিয়েছেন যে, মন্থরার বক্ষঃস্থল অত্যধিক বক্র নয় এবং কণ্ঠ থেকে সমগ্র মুখমণ্ডল সুন্দর। বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগে বিদ্যমান উদরদেশ কৃশ এবং স্তনদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন। প্রসঙ্গক্রমে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

উরস্তে নাতিনির্ভুগ্নমাকণ্ঠান্মুখমুত্তমম্।
অধস্তাচ্চোদয়ং শাতং বিলগ্নঞ্চ স্তনদ্বয়ম্।।[৬০]

মন্থরার শরীরের বর্ণনা প্রসঙ্গে অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত *বাল্মীকীয় রামায়ণে* উপলব্ধ শিবসহায়-কৃত *রামায়ণশিরোমণি* টীকায় বলা হয়েছে— "নাতিনির্ভুগ্নং নাতিবক্রং স্তোকনম্রমিত্যর্থঃ। আকণ্ঠাৎ কণ্ঠদেশাদ্ আরভ্য মুখম্ উত্তমং সুন্দরম্। অধস্তাদুন্নতোরঃস্থলাদধোভাগে বিদ্যমানম্ উদরম্"।[৬১]

পুনরায় কৈকেয়ী মন্থরার শরীর প্রসঙ্গে বলেছেন, মন্থরার জঘনদেশ মাংসপরিশূন্য এবং কাঞ্চীদামশোভিত অর্থাৎ কাঞ্চীবসন পরিধানে শোভিত। তার জঙ্ঘাদ্বয় দীর্ঘ ও কৃশ। এছাড়া পদদ্বয়ও দীর্ঘ ও কৃশ। কৈকেয়ী আরও বলেছেন যে, নীলবসন পরিহীতা বিস্তৃত ঊরুবিশিষ্টা মন্থরা যখন কৈকেয়ীর সম্মুখে গমন করেন, তখন তাকে দেখতে মনে হয় টিট্টিভ অর্থাৎ টিট্টিভ পাখি (ঝুঁটিধারী ছোটো পাখি, যাদের চলন অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন) স্ত্রীজাতির ন্যায়। মন্থরার শারীরিক বর্ণনা প্রসঙ্গে কৈকেয়ী তাঁকে বলেন—

জঘনং তে সুনির্ম্মাংসং রসনাদামশোভিতম্।
জঙ্ঘে দীর্ঘে তনূ চৈব পাদৌ চাপ্যায়তৌ কৃশৌ।।
ত্বমায়তাভ্যাং সক্-থিভ্যাং মন্থরে নীলবাসিনী।
অগ্রতো মম গচ্ছন্তী টিট্টিভীব বিরাজসে।।[৬২]

মন্থরা প্রসঙ্গে M.N. Dutt সম্পাদিত *Rāmāyaṇa of Vālmīki* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— "Your countenance is like the bright moon, Ah! O Mantharā, how lovely do you look! Your hips are smooth, and is decked with chains; and your thighs and legs are of large proportions. O Mantharā, O you clad in linen garment, O graceful damsel, with your pair of spacious humps, you go before me like a she-crane".[৬৩]

পুনরায় কৈকেয়ী ভরতের হিতকাঙ্ক্ষী মন্থরা বিবিধ বিশেষণে ভূষিত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, বৃষ বা বলদের কুকদের বা ঝুঁটির ন্যায় মন্থরার কুজ বা কুব্জ অতীব মনোহর। মন্থরার এই অসাধারণ কুজেই ভূত, ভবিষৎ ও বর্তমানবিষয়ক জ্ঞান, ক্ষত্রবিদ্যা বা রাজনীতি ও মায়াসমূহ বাস করছে। এ প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> যচ্চেদং ককুদাকারং কুব্জং চারু শুভাননে।
> মতয়ঃ ক্ষত্রবিদ্যাশ্চ মায়াশ্চাত্র বসন্তি তে।।[৬৪]

মন্থরার প্রতি কৈকেয়ীকর্তৃক প্রশংসা বারংবার উঠে এসেছে তাঁর কণ্ঠে এবং আনন্দে উৎসুক কৈকেয়ী বললেন যে, ভরত অভিষিক্ত হলে এবং রাম বনে গমন করলে, তিনি মন্থরার কুঁজে স্বর্ণমালা পরাবেন এবং তাঁর কুজে সুন্দর আভরণসমূহ নির্মাণ করবেন। মন্থরাকে তিনি বিবিধ অলংকার প্রদান করবেন। এ প্রসঙ্গে অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত *বাল্মীকীয় রামায়ণের* টীকায় বলা হয়েছে— 'হে কনকপ্রভে স্বর্ণোজ্জলে, তব মুখে চিত্রং নানারত্নখচিততয়া নানাবর্ণম্ আশ্চর্য্যকরং বা তিলকং তিলকাকারং ভূষণং তথা কুজে শুভানি সুন্দরাণি আভরণানি চ কারয়িষ্যামি'।[৬৫]

কৈকেয়ীর মুখনিসৃত উপর্যুক্ত প্রশংসাবাক্য শুনে বক্রদেহী মন্থরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। তার কূট অভিসন্ধি ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা, রামচন্দ্রের বনবাস যাত্রার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। সুতরাং মন্থরার উদ্দেশ্যে এককথায় বলা যায় যে, তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষেই একজন বিকৃতাকার, বক্রদেহী, ঈর্ষাপরায়ণ, কুটবুদ্ধিসম্পন্ন স্ত্রীলোক হলেও তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অপরিমেয়।

২.১.৫. বৈশ্রবণ বা কুবের : হিন্দুধর্মে কুবের বা কুবেরণ হলেন ধনসম্পদের দেবতা। কুবের যক্ষ ও কিন্নরদের অধীশ্বর ছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়* কুবেরকে যক্ষ ও রাক্ষসদের অধিপতি বলা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে *শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়* বলা হয়েছে— 'বিত্তশো যক্ষরক্ষসাম্'।[৬৬] ধনাধিপতি যেসকল দেবতা রয়েছেন কুবের তাদের ধনাগারের অধ্যক্ষ হওয়ায়, তাঁকে 'ধনদ'ও বলা হয়। মূলতঃ কুবের পুরাণ প্রসিদ্ধ দেবতা হলেও, পৌরাণিক যুগে কুবের ছিলেন অপ্রধান দেবতা।

কুবেরের পরিচয় : *বাল্মীকীয় রামায়ণ* অনুসারে কুবের ব্রহ্ম বর প্রাপ্ত পুলস্ত ঋষির পুত্র বিশ্রবা ও ভরদ্বাজ ঋষির কন্যা দেববর্ণিনীর পুত্র। কুবেরের জন্ম সম্পর্কে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* উক্ত হয়েছে— বিশ্রবা মুনির ঔরসে ভরদ্বাজ ঋষির কন্যা দেববর্ণিনীর গর্ভে ব্রহ্মার ন্যায় উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত এক পুত্রের জন্ম হয়। সেই নবজাতকের জন্ম হলে ব্রহ্মা আনন্দিত হয়ে এবং দেবর্ষিগণের পরামর্শে তাঁর নামকরণ করেন বৈশ্রবণ। যেহেতু বিশ্রবার পুত্র অথবা জন্ম থেকেই বিশ্রবার মত আকৃতি বিশিষ্ট হওয়ায়, তিনি বৈশ্রবণ নামে খ্যাত হয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে *বাল্মীকীয় রামায়ণের* উত্তরকাণ্ডে উক্ত হয়েছে—

স তস্যাং বীর্য্যসম্পন্নমপত্যং পরমাদ্ভুতম্।
জনয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সর্ব্বৈরার্য্যগুণৈর্যুতম্।।
তস্মিন্ জাতে তু সন্তুষ্টঃ স বভূব পিতামহঃ।
নাম তস্যাকরোৎ প্রীতঃ সার্দ্ধং দেবর্ষিভিস্তদা।।
যস্মাদ্বিশ্রবসোঽপত্যং সাদৃশ্যাদ্বিশ্রবা ইব।
তস্মাদ্বৈশ্রবণো নাম ভবিষ্যত্যেষ বিশ্রুতঃ।।[৬৭]

পরবর্তী সময়ে মহাত্মা বৈশ্রবণের বুদ্ধিদীপ্তি হয় যে, ধর্মই শ্রেষ্ঠগতি। যার ফলস্বরূপ তিনি কঠোর তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করেন। তপস্যার দ্বারা পরিতুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাকে বরস্বরূপ লোকপালত্ব ও ধনাধিপত্য প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

অহং হি লোকপালানাং চতুর্থং স্রষ্টুমুদ্যতঃ।
যমেন্দ্রবরুণানাং বৈ পদং তৎ তব চেপ্সিতম্।।
তৎ কৃতং গচ্ছ ধর্মজ্ঞ ধনেশত্বমবাপ্নুহি।
যমেন্দ্রবরুণানাং ত্বং চতুর্থোঽদ্য ভবিষ্যসি।।[৬৮]

বৈশ্রবণ যে লোকপালক বা লোকের দেবতা, এ বিষয়ে কথিত আছে যে প্রায় একবছর ধরে বৈশ্রবণ তপস্যা করার পর ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবতাদের বরে কুবের চতুর্থ লোকপালের পদ লাভ করেছিলেন। বৈশ্রবণের লোকপালত্ববিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে*—

পিতামহস্তু প্রীতাত্মা দদৌ বৈশ্রবণস্য হ।
অমরত্বং ধনেশত্বং লোকপালত্বমেব চ।।[৬৯]

পুনরায় অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত *বাল্মীকীয় রামায়ণে* উপলব্ধ লোকনাথ চক্রবর্তীর *মনোহরা* টীকায় বৈশ্রবণের লোকপালক বিষয়ে বলা হয়েছে— 'যমেন্দ্রবরুণানাং যৎ লোকপালত্বং দত্তং তৎ তবাপীপ্সিতং কৃতম্'।[৭০]

ব্রহ্মা বৈশ্রবণকে লোকপালত্ব এবং ধনাধিপত্য প্রদান করার পর পিতা বিশ্রবার নিকট বাসস্থানযোগ্য একটি নগর প্রার্থনা করেন। পিতা বিশ্রবা পুত্রের প্রার্থনা শুনে তাকে বলেন, দক্ষিণসমুদ্রের তীরে ত্রিকূট নামে যে পর্বত রয়েছে, সেই সুন্দর পর্বতশিখরে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় একটি বিশাল নগর রয়েছে। ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় সেই সুন্দর নগর বিশ্বকর্মাকর্তৃক রাক্ষসদের জন্য নির্মাণ করা হলেও, বর্তমানে সেই নগরের অধিপতি হলেন বৈশ্রবণ। বৈশ্রবণের লঙ্কাপুরীতে বাসস্থান প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> লঙ্কা নাম পুরী রম্যা নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা।
> রাক্ষসানাং নিবাসার্থং যথেন্দ্রস্যামরাবতী।
> তত্র ত্বং বস ভদ্রং তে রংস্যসে তত্র নিত্যশঃ।।[৭১]

কিন্তু পরবর্তীকালে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ কুবেরকে লঙ্কা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন এবং পুষ্পক রথটিও কেড়ে নিয়েছিলেন। *রামায়ণে* বৈশ্রবণের নাম উল্লেখ থাকলেও, তাঁর কুবের এই নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু *ভাগবতপুরাণে* উক্ত হয়েছে, বিশ্রবার পুত্র হলেন কুবের। কুবের নাম প্রসঙ্গে *ভাগবতপুরাণে* বলা হয়েছে—

> পুলস্ত্যোঽজনয়ৎ পত্ন্যামগস্ত্যঞ্চ হবির্ভুবি।
> সোঽন্যজন্মনি দহ্রাগ্নির্বিশ্রবাশ্চ মহাতপাঃ।।
> তস্য যক্ষপতির্দেবঃ কুবেরস্ত্বিলবিলসুতঃ।
> রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ তথান্যস্যাং বিভীষণঃ।।[৭২]

অর্থাৎ পুলস্ত্য হবির্ভূনামী পত্নীর গর্ভে অগস্ত্যের জন্ম দিয়েছিলেন। তিনি অন্য জন্মে দহ্রাগ্নি এবং মহাতপা বিশ্রবার জন্মদাতা। ইলবিলার গর্ভে বিশ্রবার ঔরসে জন্ম নেয় যক্ষপতি কুবের। *বিষ্ণু-পুরাণ ও বায়ু-পুরাণ* অনুসারে ইলবিলা ছিলেন বৈবস্বত মনুর পুত্র নাভাগের বংশের রাজা তৃণবিন্দুর কন্যা এবং মহর্ষি বিশ্রবার মাতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।[৭৩] পুনরায় বিশ্রবার দ্বিতীয় পত্নী

কেশিনীর গর্ভে জন্ম নেয় রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ; সেই কারণেই রাবণাদি ভাতৃগণ কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

পুনরায় *স্কন্দপুরাণ* অনুসারে পুলস্ত্য ত্রেতাযুগে বিশ্রবাকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলন। এই বিশ্রবার পুত্র হলেন ধনদ কুবের। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

ত্রেতাযুগে ব্রহ্মসমঃ পৌলস্ত্যো নাম বিশ্রবাঃ।
তপঃকৃত্বা সুবিপুলং পদ্মজাত সুতোদ্ভবঃ।।
ধনদং জনয়ামাস সর্বলক্ষণ লক্ষিতম্।।[৭৪]

কুবেরের পত্নীর নাম ঈশ্বরী। তিনিও ছিলেন যক্ষগণের অধিপতি, তাদের পুত্রের নাম কুণ্ড। এ প্রসঙ্গে *স্কন্দপুরাণে* বলা হয়েছে—

তস্য ভার্যা মহারাজ ঈশ্বরীতি চ বিশ্রুতা।
যক্ষো যক্ষাধিপঃ শ্রেষ্ঠস্তস্য কুণ্ডোঽভবৎ সুতঃ।।[৭৫]

পুনরায় *বৌদ্ধতন্ত্রে* কুবের পত্নীরূপে বসুধারা স্বীকৃত হয়েছে। বসুধারা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— “Vasudhārā, Goddess of Abundance, is the Śakti of Kubera, god of wealth. She is always represented as having one head, but may have from two to six arms, and wears all the Bodhisattva ornaments. When she has but two arms, the left hand holds a spike of grain, while the right holds a vase out of which pours a quantity of jewels”.[৭৬]

কুবের সম্পূর্ণ পৌরাণিক দেবতা রূপে বর্ণিত হলেও, *অথর্ববেদে* অন্ধকারের দানবদের অধীশ্বররূপেই স্বীকৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে Alain Danielou তাঁর বিরচিত *Hindu Polytheism* গ্রন্থে বলেছেন— ‘His (Kubera) name first appears in the Atharva Veda (8. 10. 28) where he is the chief of the spirits of darkness’.[৭৭]

কুবেরের দৈহিক বিবরণ : কুবের এই নামকরণ প্রসঙ্গে *বায়ুপুরাণে* বলা হয়েছে, কুৎসিত দেহ বিশিষ্ট হওয়ায় এইরূপ নামকরণ। অর্থাৎ ‘কু’ শব্দ নিন্দার্থক এবং ‘বের’ পদের অর্থ শরীর; সেই কারণেই বিশ্রবানন্দের এইরূপ নামকরণ। কুবের নামকরণ প্রসঙ্গে *বায়ু-পুরাণে* বলা হয়েছে—

কুৎসায়াং ক্বিতি শব্দোঽয়ং শরীরং বেরমুচ্যতে।
কুবেরঃ কুশরীরত্বান্নাম্না তেন চ সোঽঙ্কিতঃ।।[৭৮]

কুবেরের দৈহিক আকৃতি প্রসঙ্গে *বিষ্ণু-পুরাণে* বর্ণিত হয়েছে— কুবের তিনটি পাদবিশিষ্ট, বিরাট দৈহিক আকার, স্থূলমস্তক, বিশাল দেহ, আটটি দাঁত সমন্বিত, তামাটে দাড়ি, ছুঁচালো কান, ঈষৎ রক্তাভ, একটি বাহু হ্রস্ব ও একটি বাহু বিশাল, পিঙ্গলবর্ণ, ভয়ংকর, বৈবর্তজ্ঞান সম্পন্ন, জ্ঞান সম্পদে সমৃদ্ধ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয়েছে—

ত্রিপাদং সুমহাকায়ং স্থূলশীর্ষং মহাতনুম্।
অষ্টদংষ্ট্রং হরিৎশ্মশ্রুং শঙ্কুকর্ণং বিলোহিতম্।।
হ্রস্ব বাহুং প্রবাহুঞ্চ পিঙ্গলং সুবিভীষণম্।
বৈবর্তজ্ঞানসম্পন্নং সম্বুদ্ধং জ্ঞানসম্পদা।।[৭৯]

কুবেরের দৈহিক বিকলতার কারণস্বরূপ অভিশাপবৃত্তান্ত : কুবেরের এইরূপ রূপ হওয়ার পেছনে রয়েছে রুদ্রাণীর অভিশাপের কাহিনী। একদিন হিমালয়ে তপস্যাকালে কুবের দৈবাৎ দেবী রুদ্রাণীকে দর্শন করেন। ফলে তাঁর ডান-চক্ষু দগ্ধ এবং বাম-চক্ষু ধূলিকলুষিত পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে। তাঁর কঠোর তপস্যায় প্রীত হয়ে মহাদেব তাঁকে রক্ষা করেন। তাঁর এক চক্ষু নষ্ট এবং অন্য চক্ষু পিঙ্গল বলে তাঁর নাম হয় 'একপিঙ্গল'। একপিঙ্গল নাম প্রসঙ্গে Vettam Mani সম্পাদিত *Puranic Encyclopedia : a comprehensive dictionary with special reference to the epic and Puranic literature* গ্রন্থে বলা হয়েছে— 'Kubera once looked with jealousy at Pārvatī seated on the left thigh of Śiva, and therefore, he became blind in one eye. When Pārvatī regained her equanimity, she turned that eye of Kubera into yellow in colour so that he might always remember the incident. Henceforth Kubera came to be known as Ekapiṅgala'.[৮০]

কুৎসিত আকৃতি হওয়ায় কুবেরের এক শ্রেণির অনুচরের নাম দেওয়া হয়েছে কিন্নর। সংস্কৃত ভাষায় কুবের শব্দের অর্থ 'বিকৃতাঙ্গ বা দৈত্যাকার'। কু-শরীর অর্থাৎ কুবীর থেকে ধনাধিপতির নাম হয় কুবের।

দৈত্যাকার হওয়া সত্ত্বেও ধনাধিপতি কুবেরের বীরত্বের তেমন খ্যাতি লক্ষিত হয়নি। তার প্রমাণ স্বরূপ জানা যায়, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ শক্তিশালী হওয়ার দরুন সকলের উপর অত্যাচার শুরু করায়, কুবের দূতমুখে রাবণকে দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে ধর্মাচরণ করার উপদেশ দেয়। যার ফলস্বরূপ রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কুবেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও তাঁকে পরাজিত করে জয়চিহ্নস্বরূপ কুবেরের অত্যন্ত প্রিয় পুষ্পক রথ হরণ করেন।

২.১.৬. শূর্পণখা : *বাল্মীকীয় রামায়ণে* খলচরিত্র সমূহের মধ্যে অন্যতম খলচরিত্র হল রাবণভগিনী শূর্পণখা। শূর্পণখা হলেন ঋষি বিশ্রবার ও রাক্ষসী নৈকসী বা কৈকসীর কন্যা। ঋষি বিশ্রবার সহিত রাক্ষসী নৈকসী বা কৈকসীর বিবাহের যে কাহিনী রয়েছে তা হল নিম্নরূপ—

নৈকসী বা কৈকসী হলেন, রাক্ষস সুকেশের পুত্র সুমালীর ঔরসে গন্ধর্বী নর্মদার কন্যা কেতুমতীর পুত্র। একদিন সুমালী তাঁর কন্যা নৈকসী বা কৈকসীকে সঙ্গে নিয়ে মর্ত্যলোকে ভ্রমণ করছিলেন। সেখানে মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র কুবেরের ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হয়ে সুমালী মর্ত্যলোক থেকে পাতালে ফিরে আসেন। ধনপতি কুবেরের ঐশ্বর্য দেখে সুমালী ভাবতে থাকেন, কী উপায়ে তিনি কুবেরের মতো ঐশ্বর্য্যশালী হবেন?

এই কথা ভাবতে ভাবতে সুমালী তাঁর কন্যা নৈকসী বা কৈকসীকে মহর্ষি পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবার হস্তে দান করবেন বলে মনস্থির করেন। সুমালী ভাবেন যে, মহর্ষি বিশ্রবার ঔরসে তাঁর কন্যা নৈকসী বা কৈকসীর গর্ভে যে সকল পুত্র সন্তান হবে, তারাও কুবেরের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী হবেন। সুমালী তাঁর কন্যা নৈকসী বা কৈকসীকে বলেন যে, ‘সে বিবাহের উপযুক্ত হয়েছে। তাই সে যেন পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবাকে পতিত্বে বরণ করে’।[৮১]

পিতা সুমালীর আদেশ অনুসারে নৈকসী বা কৈকসী সন্ধ্যাবেলায় বিশ্রবার নিকট উপস্থিত হন। মহর্ষি বিশ্রবা তখন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করছিলেন। তখন নৈকসী বা কৈকসীকে দেখে তিনি তাঁর আগমনের কারণ ও নৈকসী বা কৈকসীর পরিচয় জানতে চান। সেইমুহূর্তে নৈকসী বা কৈকসী বিশ্রবা মুনির উদ্দেশ্যে নমস্কার করে তার প্রকৃত পরিচয় জানাই এবং নৈকসী বা কৈকসী কেন বিশ্রবা মুনির সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন তা তপস্যার প্রভাবে মুনির কাছে জানতে চান। নৈকসী বা কৈকসীর কথানুযায়ী বিশ্রবা মুনি তৎক্ষণাৎ ধ্যানস্থ হয়ে রাক্ষসীর পুত্র কামনার অভিলাষ জানতে

পারেন। সেইমুহূর্তে মহর্ষি বিশ্রবা নৈকসী বা কৈকসীর উদ্দেশ্যে বলেন যে, যেহেতু নৈকসী বা কৈকসী সন্ধ্যাবেলায় তাঁর কাছে এসে সন্তান কামনা করেছেন, সেহেতু নৈকসী বা কৈকসীর পুত্ররা অতিভয়ঙ্কর এবং ভীষণাকৃতিবিশিষ্ট হবেন। এবিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

দারুণান্ দারুণাচারান্ দারুণাভিজনপ্রিয়ান্।
জনয়িষ্যসি সুশ্রোণি রাক্ষসান্ ক্রূরকর্ম্মণঃ।।[৮২]

নৈকসী বা কৈকসী মহর্ষি বিশ্রবার মুখে উপরিউক্ত বাক্য শ্রবণ করে, বিশ্রবার উদ্দেশ্যে বলেন যে, এইরকম দুষ্ট প্রকৃতির সন্তান তিনি কামনা করেননি। তিনি বিশ্রবার ন্যায় তেজস্বী ও ধার্মিক পুত্র প্রার্থনা করেন। নৈকসী বা কৈকসী মুখ থেকে অনুনয়ের সহিত বিশ্রবা এই বাক্য শ্রবণ করেন। পরে তিনি নৈকসী বা কৈকসীকে আশ্বস্ত করেন এবং বলেন যে, তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বিশ্রবার ন্যায় সৎ ও ধার্মিক হবেন।

কিছু সময় পরে নৈকসী বা কৈকসী এক বিরাট আকৃতির রাক্ষস সন্তান প্রসব করেন। সেই সময় প্রকৃতির নানা অশুভ লক্ষণ ফুটে ওঠে। সেই সন্তানের দশটি মাথা, কুড়িটি হাত, বিশাল আকারের দাঁত ও লাল বর্ণের ওষ্ঠ। দশটি মাথা থাকার জন্য সেই রাক্ষস সন্তান দশানন বা রাবণ নামে খ্যাত হন। এরপর কুম্ভকর্ণ, শূর্পণখা ও বিভীষণ নৈকসী বা কৈকসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[৮৩] শূর্পণখার জন্ম প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

ততঃ শূর্পণখা নাম সংজজ্ঞে বিকৃতাননা।
বিভীষণশ্চ ধর্ম্মাত্মা নৈকস্যাঃ পশ্চিমঃ সুতঃ।।[৮৪]

অর্থাৎ রাক্ষসী নৈকসী বা কৈকসীর গর্ভে তৃতীয় সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শূর্পণখা নামক রাক্ষসী। শূর্পণখা নামের অর্থ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— 'শূর্পতুল্যনখবিশিষ্টা' অর্থাৎ কুলোর মতো নখবিশিষ্টা রাক্ষসী'।[৮৫]

লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্পণখার বিকলাঙ্গত্ব প্রাপ্তি : *বাল্মীকীয় রামায়ণের* 'অরণ্যকাণ্ডে' বর্ণিত রয়েছে ক্রুদ্ধ রামের আদেশে লক্ষণ কর্তৃক শূর্পণখার নাসিকা ছেদনের কাহিনী। বনবাসকালে একদিন দম্পতি সহ রামচন্দ্র এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে বসবাসরত অবস্থায়, দৈবক্রমে সেই স্থানে

শূর্পণখা নামে বিকৃত আকার বিশিষ্টা রাক্ষসী উপস্থিত হয়ে রামচন্দ্রকে দর্শন করতে থাকে। বিকৃত আকার বিশিষ্টা শূর্পণখার রূপপ্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* উদ্ধৃত হয়েছে—

সুমুখং দুর্ম্মুখী রামং বৃত্তপার্শ্বং মহোদরী।
বিশালাক্ষং বিরূপাক্ষী সুকেশং তাম্রমূর্ধজা।।
অতিরূপং বিরূপা সা সুস্বরং ভৈরবস্বনা।
তরুণং দারুণা বৃদ্ধা দক্ষিণং বামভাষিণী।।[৮৬]

অর্থাৎ কুবদনা, স্থূলোদরী, বিরূপনয়না, তাম্রবর্ণকেশা, বিকৃতাকারবিশিষ্টা, অতি ভীষণস্বরা, দারুণা, বৃদ্ধা, বিকটভাষিণী, দুর্ব্বৃত্তা, অপ্রিয়দর্শনা রাক্ষসী হলেন শূর্পণখা। পুনরায় শূর্পণখার শরীরের বর্ণনা প্রসঙ্গে অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত *বাল্মীকীয় রামায়ণের* স্বয়ংকৃত টিপ্পনীতে বলা হয়েছে— 'দুর্ম্মুখী কুৎসিতমুখা, মহোদরী স্থূলোদরবিশিষ্টা, ভৈরবস্বনা বিকটস্বরা, বামভাষিণী বক্রভাষিণী সা রাক্ষসী'।[৮৭]

দেবতুল্য রামচন্দ্রের শরীর দর্শন করে সেই রাক্ষসী তাঁর প্রতি কামপীড়িতা হয়ে পড়েন। রামের প্রতি কামাভিভূতা শূর্পণখা নামক রাক্ষসী নিজের কুৎসিতরূপ বর্জন করে শ্লাঘ্যরূপ অর্থাৎ যে রূপযৌবন সকলের দ্বারা প্রশংসনীয়, সেইরূপ ধারণ করেন। সেই প্রশংসনীয় রূপের দ্বারা রাক্ষসী শূর্পণখা রামচন্দ্রের সম্মুখে কাম উৎপাদন করার জন্য উদ্যত হন এবং বিবাহের প্রস্তাব দেন। রাক্ষসী শূর্পণখার প্রস্তাব শুনে রামচন্দ্র তার উদ্দেশ্যে বলেন যে, সে বিবাহিত এবং তার স্ত্রী সীতার সঙ্গে সে অত্যন্ত আনন্দের সহিত সময় অতিবাহিত করছেন। রামচন্দ্রের মুখে সীতার প্রশংসা বাক্য শুনে রাক্ষসী শূর্পণখা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রামচন্দ্রের প্রতি বলতে থাকেন যে, সীতা বিকৃতরূপা ও কদর্য্যরূপা। সীতা কখনই রামচন্দ্রের যোগ্য নয়, কিন্তু রূপে গুণে সমন্বিত রাক্ষসী শূর্পণখাই একমাত্র তার ভার্যা হওয়ার যোগ্য। এ প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

বিকৃতেয়ং বিরূপা চ ন চৈব সদৃশী তব।
অহমেবানুরূপা তে ভার্য্যা রূপগুণান্বিতা।।[৮৮]

রাক্ষসী শূর্পণখার মুখে রামচন্দ্র উপর্যুক্ত বাক্য শ্রবণ করে রাক্ষসীর উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন যে, সীতাকে সে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করেছেন। সেইহেতু শূর্পণখার ন্যায় অন্য যে কোন নারীকে বিবাহ করলে সীতা কখনো তা গ্রহণ করতে পারবেন না। অতএব শূর্পণখা যেন লক্ষ্মণ

নামে যে বীর্য্যবান্, চরিত্রবান্, প্রিয়দর্শন, শ্রীমান্, অবিবাহিত রামের অনুজ রয়েছে, তার ভার্যারূপে যেন অভিলাষী হন।

রামের কথানুযায়ী শূর্পণখা তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের সম্মুখে গিয়ে বলতে লাগলেন, লক্ষ্মণ যেন তাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করেন। রাক্ষসীর মুখে লক্ষ্মণ এইরূপ বাক্য শ্রবণ করে তার উদ্দেশ্যে বলেন, লক্ষ্মণ হলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের একজন দাস। কিন্তু শূর্পণখা একজন বিশালাক্ষী, যে স্বেচ্ছারূপধারণে সমর্থ এবং প্রভূত ঐশ্বর্যশালিনী। এমতাবস্থায় শূর্পণখা যদি লক্ষ্মণকে বিবাহ করে, তাহলেও তাকে দাসী হয়ে থাকতে হবে। অতএব শূর্পণখা যেন প্রভূত ঐশ্বর্যশালী, বিদ্বান, পূজনীয় রামচন্দ্রের ভার্যা হন। লক্ষ্মণের মুখে রাক্ষসী শূর্পণখার রামচন্দ্রের ভার্যা হওয়ার কথা শুনে পুনরায় শূর্পণখা সীতাপতি রামচন্দ্রের নিকটে এসে উপস্থিত হন এবং তার উদ্দেশ্যে বললেন যে, শূর্পণখা লক্ষ্মণের পূর্বে রামচন্দ্রকে দর্শন করেছেন। অতএব রামচন্দ্রই যেন তার চিরকালের স্বামী হন, একথা বলেন। পুনরায় রামচন্দ্রের প্রতি সহধর্মিণী সীতার উদ্দেশ্যে শূর্পণখা বলেন যে, যদি রামচন্দ্র তার বৃদ্ধা ভার্যা সীতাকে আশ্রয় করে তাকে ভার্যারূপে গ্রহণ না করেন, তাহলে রাক্ষসী শূর্পণখা রামচন্দ্রের সম্মুখেই সীতাকে ভক্ষণ করবেন।

শূর্পণখার মুখে সীতাভক্ষণের কথা মাত্রই, মহতী উল্কা যেরূপে রোহিণী নক্ষত্রের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপে রাক্ষসী শূর্পণখাও সীতাকে ভক্ষণের নিমিত্ত তার উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়েছেন। শূর্পণখার এই আচরণে রামচন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে বলেন— "হে লক্ষ্মণ, ক্রূরস্বভাব অতি দুষ্ট লোকের সহিত কোনরূপেই পরিহাস করা কর্ত্তব্য নহে; হে সৌম্য, দেখ, বৈদেহী কোনও ক্রমে জীবিতা রহিয়াছেন। হে পুরুষব্যাঘ্র, এই বিরূপা দুর্ব্বৃত্তা অতিমত্তা রাক্ষসীকে তুমি নিবর্ত্তিত কর"।[৮৯]

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের আদেশ অনুযায়ী লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে রাক্ষসী শূর্পণখাকে রামচন্দ্রের সম্মুখেই খড়্গের দ্বারা নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করে দিয়েছেন। লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্পণখার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> ইত্যুক্তো লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধস্তস্য রামস্য পশ্যতঃ।
> খড়্গেন তস্যাশ্চিচ্ছেদ কর্ণনাসং নিগৃহ্য তাম্।।[৯০]

পুনরায় শূর্পণখার নাসিকা ও কর্ণ ছেদনপ্রসঙ্গে M. N. Dutt সম্পাদিত *Rāmāyaṇa of Vālmīki* গ্রন্থে বলা হয়েছে– 'Thus desired the exceedingly strong Lakṣmaṇa, fired with wrath, taking out his sword, in the sight of Rāma, cut off her nose and ears. Her ears and nose cut off, the terrible Śūrpaṇakhā, uttering frightful cries, fied a main into the forest whence she had come'.[৯১]

লক্ষ্মণ কর্তৃক খড়্গের দ্বারা শূর্পণখার নাসিকা-কর্ণ ছেদন হওয়ায়, বিকটস্বরে চিৎকার করতে করতে অবিলম্বেই সে যে পথ ধরে রামের সম্মুখে এসেছিলেন, সেই পথ ধরেই বাহুদ্বয় উৎক্ষেপনপূর্ব্বক বনের মধ্যে দিয়ে গমন করতে লাগলেন। তারপর শূর্পণখা বিরূপিতা হয়ে প্রথমে রাক্ষসগণ পরিবেষ্টিত উগ্রতেজসম্পন্ন ভ্রাতা খর ও দূষণের নিকটে এসে রাম-লক্ষ্মণের দৌরাত্ম্য অর্থাৎ অপমানের কথা জানালেন। শূর্পণখার অপমানের প্রতিকাররূপে উভয়েই (খর ও দূষণ) রাক্ষসসৈন্য সহ রাম-লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে দণ্ডকারণ্যেই যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সেই যুদ্ধে একা রামকর্ত্তৃক খর ও দূষণ সহিত ত্রিশিরাসহ, চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস নিহত হন। খর ও দূষণ একাকী রামকর্ত্তৃক বধ হওয়ার পর রাক্ষসী শূর্পণখা উদ্বিগ্না হয়ে ছিন্ন নাসাকর্ণ নিয়ে লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে দশানন রাবণকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে সুন্দরী সীতাকে অপহরণ করতে উত্তেজিত করেন। শূর্পণখার কথানুযায়ী রাবণ রামপত্নী সীতাকে হরণ করেন। যার ফলস্বরূপ রামের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ হয় এবং শূর্পণখার জন্যই রাবণ সবংশে নিহত হন।

২.২. বৈয়াসিক মহাভারতে চরিত্রসমূহ :

মহাভারত শুধু আয়তনের দৃষ্টিতে মহান্ নয়, বিষয়বস্তুর নিরিখেও গৌরবভার বহন করে বলেই এইরূপ নামকরণ। তাই যথার্থই বলা হয়েছে– 'মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে'।[৯২] *মহাভারত* কথাটির অর্থ হল ভরত বংশের মহান্ উপাখ্যান। ভরতবংশীয়গণের মহাযুদ্ধের সুদীর্ঘ কাহিনীর কাব্যরূপ হল *মহাভারত*। *রামায়ণের* মতো *মহাভারতেও* একাধারে ভারতীয়দের ধর্মগ্রন্থ ও জাতীয় মহাকাব্যরূপে সমাদৃত। কৌরব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ এই কাব্যের মূল আখ্যানভাগ হলেও এর ছত্রছায়ায় মিলিত হয়েছে অজস্র ব্যক্তির কাহিনী। *মহাভারতে* ব্যক্তি কাহিনীগুলির মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কাহিনী হল বিকৃতেন্দ্রীয় কাহিনী। *মহাভারতে* এই বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ হলেন–

ধৃতরাষ্ট্র, দীর্ঘতমস্, অরুণ, অষ্টাবক্র, দ্যুমৎসেন, উপমন্যু, পৌষ্য, একলব্য ও শকুনি। নিম্নে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উপলব্ধ বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হল :

২.২.১. ধৃতরাষ্ট্র :

ধৃতরাষ্ট্র পূর্ববর্তী চন্দ্রবংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় : চন্দ্রবংশীয় শান্তনু নামে এক রাজা ছিলেন। রাজা শান্তনুর দুই পত্নী ছিলেন, প্রথম পত্নী গঙ্গা এবং দ্বিতীয় পত্নী হলেন দাসরাজ কন্যা সত্যবতী। প্রথম পত্নী গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন দেবব্রত নামে এক সন্তান। পরবর্তীকালে এই সন্তানই ভীষ্ম নামে পরিচিত হন। ভীষ্ম বাল্যকাল থেকেই ব্রহ্মচর্য দশায় ব্রতী হন অর্থাৎ তিনি চিরকুমার থাকার সংস্কল্প গ্রহণ করেন। রাজা শান্তনুর দ্বিতীয় পত্নী সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামক দুই সন্তান। জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্রাঙ্গদ ছিলেন বুদ্ধিমান্, তেজস্বী ও মহাপরাক্রমশালী। কনিষ্ঠ্য পুত্র বিচিত্রবীর্য ছিলেন তেজস্বী ও মহাধনুর্দ্ধর। কনিষ্ঠ পুত্র বিচিত্রবীর্যের যৌবন আগমনের পূর্বেই রাজা শান্তনু লোকান্তরে গমন করেন। রাজা শান্তনু স্বর্গারোহণ করলে ভীষ্ম সত্যবতীর অনুমতিক্রমে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদকে পুরুবংশের রাজসিংহাসনে বসান। চিত্রাঙ্গদ আপন রাজনৈতিক শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর সকল রাজাকে পরাস্ত করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ স্বয়ং আত্মবিশ্বাসী হয়ে কোন মানুষকে তিনি বীরত্বে নিজের তুল্য মনে করতেন না। চিত্রাঙ্গদ সর্ব্বদাই আপন বলগর্বে দেবগণ, অসুরগণ এবং মনুষ্যগণকে নিন্দা করতে থাকেন। এমতাবস্থায় কোন একদিন বলবান্ চিত্রাঙ্গদ নামক গন্ধর্বরাজ রাজা শান্তনুর পুত্র চিত্রাঙ্গদের সম্মুখে উপস্থিত হন। গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদ রাজা শান্তনুর পুত্র চিত্রাঙ্গদের উদ্দেশ্যে বলেন, "রাজপুত্র! আপনার নাম আমার নামেরই তুল্য; অতএব আমার সহিত যুদ্ধ করুন; যদি যুদ্ধ না করেন, তবে অন্য নাম গ্রহণ করুন"।[৯৩] উভয়ের মধ্যে হিরণ্মতী নদীর তীরে যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধ তিন বৎসর ব্যাপী হয়। যুদ্ধে গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদের কাছে শান্তনু তনয় চিত্রাঙ্গদ পরাজিত হয়ে প্রাণ হারায়। জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর শান্তনুর অপর পুত্র ভীষ্ম (শান্তনু ও গঙ্গার পুত্র) কাশীরাজের কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দেন। ক্ষয়রোগে অপুত্রক অবস্থায় বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হয়। বংশলোপের আশঙ্কায় সত্যবতী প্রথমে ভীষ্মকে বংশরক্ষার কথা বলেন। তিনি অস্বীকৃত হলে, তিনি তাঁর তপস্বী পুত্র দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে অনুরোধ করেন, ক্ষেত্রজ সন্তান দানের জন্য।

সত্যবতীর পুত্র দ্বৈপায়ন ব্যাস হওয়ার পিছনে রয়েছে একটি পৌরাণিক কাহিনী। পুরাকালে পরাশর নামক এক দিব্যজ্ঞানধারী পুরুষ ছিলেন। কোন একদিন তীর্থ যাত্রাকালে পরাশর মুনি যমুনা নদীতে নৌকার বাহকরূপে এক কুমারী পরমা সুন্দরী সত্যবতীকে দেখেন। সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে পরাশর মুনি কামার্ত হয়ে পড়েন। নৌকার বাহকরূপে সত্যবতীকে দেখে তার উদ্দেশ্যে পরাশর মুনি তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, "সুন্দরী! যে নৌকা বাহিয়া থাকে, সে নাবিক কোথায় গিয়াছে, বল?"।[৯৪] পরাশর মুনির প্রশ্নের উত্তররূপে সত্যবতী জানান যে—

> অনপত্যস্য দাশস্য সুতা তৎপ্রিয়কাম্যয়া।
> সহস্রজনসম্পন্না নৌর্ময়া বাহ্যতে দ্বিজ!।।[৯৫]

অর্থাৎ ধীবররাজের কোন পুত্রসন্তান নেই, সত্যবতীই তার একমাত্র কন্যা। যমুনা নদী দিয়ে প্রতিদিন সহস্র লোক আরোহণ করলেও পিতা ধীবররাজের সন্তোষের জন্যই সত্যবতী নৌবাহকের কাজ করেন। পরাশর মুনি সত্যবতীর মুখে এইরূপ বাক্য শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং ধীবরাজের সন্তোষের নিমিত্ত কন্যার এইরূপ কার্যকে অভিনন্দন জানালেন। পুনরায় পরাশর মুনি সত্যবতীর প্রণয় লাভ করার জন্য তার উদ্দেশ্যে পূর্বজন্মবৃত্তান্ত শোনাতে থাকেন যে, বর্হিষদ নামে সোমপায়ী কতগুলি পির্তৃলোক রয়েছে, সত্যবতী তাদের মানস কন্যা ছিলেন। কন্যাবস্থায় সত্যবতীর নাম ছিল 'অচ্ছোদা'। পিতৃগণের মন থেকে সত্যবতী জন্মগ্রহণ করায় বর্হির্ষদ নামক পিতৃলোককে তিনি পিতা বলে জানতেন না। সেই কারণেই সত্যবতী নিজ পিতাকে পরিত্যাগ করে, বসু নামক স্বর্গীয় মনুর পুত্রকে পিতারূপে স্বীকার করেন। সত্যবতী প্রথমে নিজ পিতৃগণকে চিনতে অসমর্থ হওয়ায়, তিনি অভিশাপপ্রাপ্ত হন যে, তিনি উপরিচর (বসু) রাজা ও মৎসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন। মনু পুত্র বসু সেই সময়ে আকাশে বিমানের অভ্যন্তরে অদ্রি নামক অপ্সরার সহিত বাস করছিলেন। অদ্রিও পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণের অভিশাপে মৎসী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

পরবর্তী সময়ে চেদিরাজ উপরিচর বসু কোন একদিন মৃগয়াকালে তাঁর রূপবতী পত্নী গিরিকাকে স্মরণ করে কামাবিষ্ট হন এবং তাঁর স্খলিত শুক্র এক শ্যেনকে (বাজপাখি) দিয়ে রাজমহিষীর নিকট প্রেরণ করেন। পথে অন্য এক রাজার শ্যেনের আক্রমণের ফলে প্রেরিত বসুর শুক্র যমুনার জলে পড়ে। ব্রাহ্মণপাপে মৎস্যরূপিণী অদ্রি নামক অপ্সরা বসুর শুক্র মিশ্রিত জল পান করে গর্ভবতী হন এবং দশম মাসে এক ধীবর কর্তৃক সেই মৎসী ধৃত হন। ধীবর এই মৎসীর উদরে

একটি পুরুষ ও একটি কন্যাশিশু পান। যার ফলস্বরূপ মৎসী শাপমুক্ত হন। সেই মৎসীর পুত্রের নাম মৎস্য ও কন্যার নাম সত্যবতী। মৎসী কন্যার গাত্রে মৎসের গন্ধ প্রবল ছিল বলে তাঁর নাম 'মৎস্যগন্ধা' রূপে খ্যাত হন।

পরাশর মুনির মুখে মৎস্যগন্ধা সত্যবতী স্বয়ং তার নিজ জন্মবৃত্তান্ত জানার পর মুনির প্রতি আকৃষ্ট হন। সত্যবতীর অপরূপ সৌন্দর্য্যে আসক্ত হয়ে পরাশর মুনি তার কাছ থেকে পুত্র প্রার্থনা করেন। নদী বক্ষেই পরাশর মুনি তপস্যার প্রভাবে নীহার বা কুয়াশার সৃষ্টি করে সত্যবতীর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হন। ফলস্বরূপ পরাশর ও সত্যবতীর মিলনে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্ম হয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এর জন্ম প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উক্ত হয়েছে—

ইতি সত্যবতী হৃষ্টা লব্ধা বরমনুত্তমম্।
পরাশরেণ সংযুক্তা সদ্যো গর্ভং সুষাব সা।।
জজ্ঞে চ যমুনাদ্বীপে পারাশর্য্যঃ স বীর্য্যবান্।
এবং দ্বৈপায়নো জজ্ঞে সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।।[৯৬]

যেহেতু সত্যবতীর পুত্র যমুনা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই দ্বীপেই দীর্ঘকাল অবস্থান করায় নাম হয়েছিল 'দ্বৈপায়ন'। এছাড়াও তিনি কালক্রমে মহাজ্ঞানী হয়েছিলেন। প্রত্যেক যুগের ধর্মের এক এক পাদ হ্রাস হওয়ায় এবং লোকের আয়ু ও শক্তি কম হওয়ায় যুগের অবস্থান দেখে বেদ ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুগ্রহ করে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদকে চার বিভাগে বিভক্ত করেন। সেইজন্য সত্যবতীর কানীন পুত্রের নাম হয় 'ব্যাস'। সত্যবতীর পুত্র দ্বৈপায়ণ-ব্যাস এই নামকরণ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

ন্যস্তো দ্বীপে স যদ্বালস্তস্মাদ্বৈপায়নঃ স্মৃতঃ।
পাদাপসারিণং ধর্ম্মং স তু বিদ্বান্ যুগে যুগে।।
আয়ুঃ শক্তিঞ্চ মর্ত্ত্যানাং যুগাবস্থামবেক্ষ্য।
ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণানাঞ্চ তথানুগ্রহকাঙ্ক্ষয়া।
বিব্যাস বেদান্ যস্মাৎ স তস্মাদ্ব্যাস ইতি স্মৃতঃ।।[৯৭]

পরাশর মুনির বরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে প্রসব করার পরেও সত্যবতী কুমারীই থাকেন। কারণ পরাশর মুনির সঙ্গে সহবাস করলে সত্যবতীর কন্যাত্ব নষ্ট হবে, তিনি সমাজের কাছে নিন্দিত হবেন। সত্যবতীর মুখে কন্যাত্ব নষ্ট হওয়া প্রসঙ্গে পরাশর মুনি তাঁকে বর দেন যে,

> উবাচ মৎ প্রিয়ং কৃতা কন্যৈব ত্বং ভবিষ্যসি।
> বৃণীষ্ব চ বরং ভীরু! যং ত্বমিচ্ছসি ভাবিনি।।[৯৮]

পরাশর মুনি মুখে উপর্যুক্ত বরের কথা শুনে সত্যবতী নিজগাত্রের সৌগন্ধের বর প্রার্থনা করলে, মুনি তাঁকে সেই বরও দেন। পরাশর মুনিকৃত বরের দ্বারা সত্যবতীর দেহ সুগন্ধময় হওয়ায়, তার নাম হয় 'গন্ধবতী'। সত্যবতীর গাত্রের সুগন্ধ এক যোজন দূর থেকে পাওয়া যেত বলে তাঁকে 'যোজনগন্ধা' বলা হয়। এ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> তেন গন্ধবতীত্যেবং নামাস্যাঃ প্রথিতং ভুবি।।
> তস্যাস্তু যোজনাদ্ গন্ধমাজিঘ্রন্ত নরা ভুবি।
> তস্যা যোজনগন্ধেতি ততো নামাপরং স্মৃতম্।।[৯৯]

ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধ হওয়ার কারণ : রাজা শান্তনু ও সত্যবতীর কনিষ্ঠ পুত্র বিচিত্রবীর্য অপুত্রক অবস্থায় ক্ষয়রোগে মৃত্যু হলে, বংশরক্ষার জন্য বিচিত্রবীর্যের মাতা সত্যবতী পরাশরের ঔরসজাত নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র ব্যাসকে নিয়োগ করেন বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা পত্নী কাশীরাজ কন্যা অম্বিকা এবং অম্বালিকার গর্ভে পুত্র উৎপাদনের জন্য।

ধৃতরাষ্ট্র মাতৃগর্ভে আগমনের সময় থেকেই যেন দুর্ভাগ্যের দ্বারা চালিত হচ্ছিল। বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠা মহিষী অম্বিকার গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে, সেই পুত্রই হবে চন্দ্রবংশের চক্রবর্তী রাজা; এমনটায় ভীষ্ম ও সত্যবতী প্রত্যাশা করেছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে পুত্রবধূ অম্বিকাকে সত্যবতী বলেন, বংশরক্ষার হেতু সেই নির্দিষ্ট রাত্রিতে অম্বিকার শয়নকক্ষে তার দেবর উপস্থিত হবেন এবং সেই দেবরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে, সেই পুত্রই হবে চন্দ্র বংশের রক্ষক। *মহাভারতের* যুগে নিয়োগ প্রথার প্রচলন ছিল, বিচিত্রবীর্যের বিধবা পত্নী অম্বিকাকে সত্যবতীর আদেশ অনুসারে নিয়োগ প্রথার দ্বারা পুত্র উৎপাদন করতে হবে এবং পুত্র উৎপাদনের জন্য যিনি নিযুক্ত হয়েছেন তিনি জ্ঞাতী সম্বন্ধে অম্বিকার দেবর। নির্দিষ্ট রাত্রিতে শয়ণকক্ষে কৌতূহল অবস্থায় অম্বিকা চিন্তা

করছিলেন যে, কে হতে পারেন এই দেবর, ভীষ্ম না অন্য কেউ? চিন্তারত অবস্থায় প্রদীপের কৃষ্ণবর্ণ, দীপ্তনয়ন, পিঙ্গল শ্মশ্রুগুম্ফ, পিঙ্গল জটাশ্মশ্রু মহর্ষি ব্যাসকে শয়ণকক্ষে উপস্থিত দেখে আতঙ্কে অম্বিকা চক্ষু মুদ্রিত করে ফেলেন। নিদারুণ আতঙ্কের মধ্যে যে শিশু অম্বিকার গর্ভে সঞ্চারিত হল সে মাতৃগর্ভে এল মাতার ফলভাগীও হয়ে।

গর্ভাধান সম্পন্ন করে ত্রিকালজ্ঞ ব্যাস এলেন মাতা সত্যবতীর কাছে। সত্যবতী তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, অম্বিকার গর্ভে গুণবান রাজপুত্র জন্মাবে কিনা। মাতা সত্যবতীর প্রশ্নের উত্তরে ত্রিকালজ্ঞ ব্যাস বললেন—

নাগাযুতসম প্রাণো বিদ্বান্ রাজর্ষিসত্তমঃ।
মহাভাগো মহাবীর্য্যো মহাবুদ্ধির্ভবিষ্যতি।।
অস্য চাপি শতং পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহাত্মনঃ।
কিন্তু মাতুঃ স বৈগুণ্যাদন্ধ এব ভবিষ্যতি।।[১০০]

অর্থাৎ অম্বিকার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হবে তিনি হবেন, দশহাজার হস্তীর তুল্য বলবান, বিদ্বান্, রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত ভাগ্যবান, অত্যন্ত উৎসাহী এবং বুদ্ধিমান। পুনরায় ত্রিকালজ্ঞ ব্যাস বলেন, এই অম্বিকার গর্ভে জাত সন্তান শতপুত্রের জনক হবেন কিন্তু মাতা অম্বিকা ত্রিকালজ্ঞ ব্যাসের সঙ্গে সঙ্গমের সময়ে ভয় হেতু চোখ বন্ধ রাখার কারণে এই সন্তান নেত্রহীন অর্থাৎ জন্মান্ধ হবেন। অম্বিকার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ প্রসঙ্গে হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য স্বয়ংকৃত *ভারতকৌমুদী* টীকায় উল্লেখ্য করেছেন, 'মাতুরম্বিকায়াঃ, বৈগুণ্যাৎ রমণকালে নয়নমূদ্রণদোষাৎ'।[১০১]

পুনরায় অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধ প্রসঙ্গে M.N. Dutt সম্পাদিত *Mahābhārata* গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে— "The son that will be brought forth by the princess, will be equal to ten thousand elephants in strength. He will be greatly fortunate, greatly powerful and vastly intelligent. The noble prince will have one thousand sons. But for the fault of his mother, he will be blind."[১০২]

ধৃতরাষ্ট্রের নেত্রহীনতার জন্য যে শুধুমাত্র অম্বিকাকে বোধহয় দায়ী করা যায় না। কারণ এইরকম দুর্ঘটনা যে ঘটতে পারে তা উগ্রতপস্বী ব্যাস অনেক আগেই মাতা সত্যবতীকে জানিয়েছিলেন। শুধুমাত্র ব্যাস সত্যবতীকে জানিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন তাই নয়, ব্যাস মাতার কাছে এক বছর সময়ও

চেয়েছিলেন যাতে এই এক বছরে তাঁর এই বিকট উগ্রতপস্বীর চেহারায় খানিকটা সংশোধন করে তোলা যায়, যা খানিকটা হলেও সহনীয় হতে পারে মাতা সত্যবতীর পুত্রবধূদের কাছে। কিন্তু একবছর সময় দিতে মাতা সত্যবতী তপস্বী ব্যাসকে দিতে সম্মত হননি। সেইমুহূর্তে ব্যাস সত্যবতীকে সাবধানও করেছিলেন যে, সত্যবতীর পুত্রবধূরা যেন ব্যাসের বিকৃতরূপ সহ্য করেন। ব্যাস মাতা সত্যবতীর উদ্দেশ্যে আরও বলেন যে, অম্বিকা যদি ব্যাসের শরীরের গন্ধ, রূপ, বেশ এবং এই বিকৃত দেহ সহ্য করতে পারেন, তাহলেই অম্বিকা উৎকৃষ্ট গর্ভ ধারণে সক্ষম হবেন। এ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উক্ত হয়েছে—

যদি মে সহতে গন্ধং রূপং বেশং তথা বপুঃ।
অদ্যৈব গর্ভং কৌশল্যা বিশিষ্টং প্রতিপদ্যতাম্।।[১০৩]

কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল সত্যবতী যখন অম্বিকাকে পুত্র উৎপাদনের কথা জানায়, সেই মুহূর্তেও সত্যবতীর চিন্তা হল না যে, দেবর ব্যাসের বিকৃতরূপ সম্পর্কে একটু মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পরিস্থিতির জটিলতায় মাতৃগর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের আগমনের সময় থেকেই নেত্রহীনতার দুর্ভাগ্য ধৃতরাষ্ট্রের জীবন ও ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে যায়।

ধৃতরাষ্ট্র নামের তাৎপর্য : ত্রিকালজ্ঞ ব্যাসের ঔরসে যথা সময়ে বিচিত্রবীর্যের বিধবা পত্নী অম্বিকা এক জন্মান্ধ রাজপুত্র জন্ম দিলেন এবং জন্মান্ধ রাজপুত্রের নাম হয় ধৃতরাষ্ট্র। জন্মান্ধ রাজপুত্র যে কখনোই রাজসিংহাসনের অধিকারী হতে পারেননা, তবুও অম্বিকার জন্মান্ধ জাত সন্তানের নাম কেন ধৃতরাষ্ট্র রাখা হয়েছে, সে বিষয়ে *মহাভারতকার* সর্বদাই নীরব রয়েছেন। এছাড়াও জন্মান্ধ বালকের নামকরণের সময় রাজপুরোহিতের পরিহাসে ধৃতরাষ্ট্র নাম উচ্চারিত হয় নি তা সর্বজনবিদিত। ধৃতরাষ্ট্র নামের অর্থ হল, 'যিনি রাষ্ট্রকে ধারণ করেছিলেন'।[১০৪]

জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র কখনোই সরাসরি রাজ্যলাভ করেননি কিন্তু বিচিত্রবীর্যের অপর পুত্র পাণ্ডুর বনগমনের সময় থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে পাণ্ডুর প্রতিনিধি হিসেবে আসীন ছিলেন। পরবর্তী সময়ে বনবাসী এবং প্রয়াত রাজা পাণ্ডুর অবর্তমানে রাজ্যভার সামলেছেন অর্থাৎ হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনকে কোনমতে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র

ধারণ করেছেন। হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনকে দীর্ঘকাল ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং ধারণ অর্থাৎ চালনা করার হেতু, তিনি ধৃতরাষ্ট্র নামে খ্যাত হয়েছেন।

ধৃতরাষ্ট্র নামকরণের এই ধারণাটি আমাদের কাছে আরও সত্য বলে মনে হয়েছে কারণ তিনি দীর্ঘকাল কুরু রাজসিংহাসনে আসীন হলেও, *মহাভারতের* 'অংশাবতরণপর্বে' ধৃতরাষ্ট্রের নামের সঙ্গে কোন দেব বা দানব রাজশ্রেষ্ঠের মহিমা আরোপিত হয় নি। এ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে—

> অরিষ্টায়াস্তু যঃ পুত্রো হংস ইত্যভিবিশ্রুতঃ।
> স গন্ধর্ব্বপতির্জজ্ঞে কুরুবংশবিবর্দ্ধনঃ।।[১০৫]

অর্থাৎ অরিষ্টা ঋষির পুত্র হংসনামক গন্ধর্বরাজই পরজন্মে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুত্র কুরুবংশবর্দ্ধন হলেন ধৃতরাষ্ট্র। *বৈয়াসিক মহাভারতে* স্পষ্টতই উল্লিখিত হয়েছে যে, লোকপিতা কশ্যপ ঋষির অন্য নাম অরিষ্টা। অরিষ্টা নাম প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে—

> মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রস্তস্য দ্বে নামনী স্মৃতে।
> অরিষ্টনেমিরিত্যেকে কশ্যপেত্যপরে বিদুঃ।।[১০৬]

অতএব ধৃতরাষ্ট্র সম্পর্কে বলা যায় যে, পিতামহ ভীষ্ম প্রভৃতির দ্বারা কুরুবংশ সুরক্ষিত থাকলেও কুরু রাজবংশে রাজসিংহাসনে যে সুদীর্ঘকাল শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, সেই শূন্যতার মাঝে প্রতিনিধি হিসেবে রাজসিংহাসনে বসে যিনি রাষ্ট্রকে কোনক্রমে রাজাহীন অবস্থার থেকে রক্ষা করেছেন।

জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বীরত্ব : ধৃতরাষ্ট্রের জন্মের কিছুকাল পরে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন হেতু তাঁর ভাইদের সঙ্গে উপনয়ন সংস্কার এবং বিদ্যা-শিক্ষা আরম্ভ করেন। যথাসময়ে ধৃতরাষ্ট্র বেদ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তিনি বেদাঙ্গ, রাজনীতি শাস্ত্র এবং অন্যান্য বিষয়েও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হওয়ায় অস্ত্রচালনা শিখতে পারদর্শী না হলেও, মল্লযুদ্ধ, দৌড়ানো এবং অন্যান্য ব্যায়াম অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের জন্মের সময় ব্যাস বলেছিলেন যে, অন্ধ হলেও তিনি

অতুল বলশালী হবেন, দশ হাজার হাতির মতো শক্তি হবে তাঁর গাত্রে। ধৃতরাষ্ট্র যখন যুবা বয়সে উপনীত হয়েছেন, সেই সময়েও তাঁর গাত্রের বলশালীতার জন্য *মহাভারতকার* উল্লেখ্য করেছেন—

অন্যেভ্যো বলবানাসীদ্ধৃতরাষ্ট্রো মহামতিঃ।[১০৭]

অর্থাৎ বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্রদের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র সব থেকে বেশি শক্তিশালী ছিলেন। পুনরায় অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের বলশীলতা প্রসঙ্গে M.N. Dutt সম্পাদিত *Mahābhārata* গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে— 'The King Dhritarashtra excelled all men in personal strength'.[১০৮]

২.২.২. দীর্ঘতমস্ : *বৈয়াসিক মহাভারতের* 'আদিপর্বে' বর্ণিত হয়েছে দীর্ঘতমস্ ঋষির কাহিনী। চন্দ্রবংশীয় রাজা শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্যের অপুত্রকবস্থায় মৃত্যুর পর বংশলোপের নিমিত্ত মাতা সত্যবতী পুত্র ভীষ্মকে অনুরোধ করেন যে, বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করার জন্য। কিন্তু ভীষ্ম সত্যবতীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং চন্দ্রবংশের রক্ষার্থে দীর্ঘতমস্ ঋষির জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। পুনরায় পুত্রভীষ্ম দীর্ঘতমস্ ঋষির দ্বারা বলি-রাজবংশ সৃষ্টির কাহিনী মাতা সত্যবতীকে চন্দ্রবংশ রক্ষার্থে বলেন।

ঋষি দীর্ঘতমস্ জন্মবৃত্তান্ত ও নামকরণ : দীর্ঘ তামস্ অর্থাৎ অন্ধত্ব থেকে দীর্ঘতমস্ নামকরণ। তিনি ছিলেন ঋষি উতথ্য ও মমতার পুত্র। কোন একদিন ঋষি উতথ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্থাং দেবগুরু বৃহস্পতি কামাচারী হয়ে দীর্ঘতমস্ গর্ভবতী মাতা মমতার নিকট বলপূর্বক সঙ্গমের নিমিত্ত উপস্থিত হলেন। দীর্ঘতমস্ মাতা মমতার সংস্পর্শে বৃহস্পতি এলে তিনি বলেন, "আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারাই আমি গর্ভবতী হয়েছি; সুতরাং আপনি বিরত হউন"।[১০৯] পুনরায় বৃহস্পতির এইরূপ কার্যে উতথ্যপত্নী মমতা তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন যে, মহাত্মা উতথ্যের ঔরসে মমতার গর্ভে যে সন্তান রয়েছেন, সে তার উদরে অবস্থান করে ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করছেন। অতএব বৃহস্পতি যেন মমতার সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত না হন। কারণ মমতার গর্ভে দুইটি সন্তান ধারণের পরিমিত জায়গার অভাব রয়েছে অর্থাৎ মমতা পূর্বেই গর্ভবতী হয়েছেন।

দীর্ঘতমস্ ঋষির মাতা মমতা দেবর কামাতুর বৃহস্পতিকে সঙ্গমে বিরত করার চেষ্টা করলেও তিনি মমতার কোন অনুনয়ে কর্ণপাত করেননি। পুনরায় মমতার গর্ভস্থ সন্তানটি পিতৃস্থানীয় কামাতুর বৃহস্পতির নিকট দয়াভিক্ষা করেন এবং মমতার গর্ভস্থ শিশুরটির দ্বারা কামাতুর

বৃহস্পতির উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল যে, মাতৃ উদরে সে প্রথম জীবন লাভ করেছে। সুতরাং তার জন্মের অধিকার আগে। কিন্তু কামাতুর বৃহস্পতি অব্যর্থবীর্য্য হওয়ার ফলে মাতৃজঠরে দ্বিতীয় সন্তানের উৎপত্তি ঘটবেই। অতএব কামাতুর বৃহস্পতি যেন মাতা মমতার সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত না হন। এভাবে বলে মমতার গর্ভস্থ সন্তান দেবপুরোহিত বৃহস্পতিকে বিরত করার চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে—

ভোস্তাত! মা গমঃ কামং নাস্ত্যন্তরমিহ দ্বয়োঃ।
অল্পোঽবকাশো ভগবন্! পুর্ব্বঞ্চাহমিহাগতঃ।
অমোঘরেতাশ্চ ভবান্ পীড়াং কর্ত্তুং ন মেহর্হতি।।[১১০]

কিন্তু মমতার গর্ভস্থ প্রথম শিশুটির উপর্যুক্ত বাক্য কামাতুর বৃহস্পতি কর্ণপাত না করে পুনরায় মমতার সঙ্গে জোরপূর্বক সঙ্গমে প্রবৃত্ত হন। ক্রোধবশতঃ মমতার জঠরের সন্তানটি বৃহস্পতির বীর্যপাতের সময় নিজের পা দুটি দিয়ে বীর্য প্রবেশের পথ রুদ্ধ করেন। ফলে দেবপুরোহিত বৃহস্পতির বীর্য প্রতিহত হয়ে ভূমিতে পতিত হয়। প্রভাবশালী বৃহস্পতি স্বকৃত বীর্যকে ভূমিতে পতিত হতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উতথ্য পুত্রকে তিরষ্কার করে অভিশাপ প্রদান করেন। মমতার গর্ভস্থ শিশুর প্রতি দেবপুরোহিত বৃহস্পতির অভিশাপ প্রদত্ত বাক্যটি হল নিম্নরূপ—

যন্মাং ত্বমীদৃশে কালে সর্ব্বভূতেপ্সিতে সতি।
এবমাত্থ বচস্তস্মাত্তমো দীর্ঘং প্রবেক্ষ্যসি।।
স বৈ দীর্ঘতমস্ নাম শাপাদৃষিরজায়ত।
বৃহস্পতের্বৃহৎকীর্ত্তের্বৃহস্পতিরিবৌজসা।।[১১১]

অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর কাছে রমণের মুহূর্ত অত্যন্ত অভীষ্ট সময়। কিন্তু উতথ্য পুত্র বৃহস্পতির সঙ্গে মমতার রমণের সময় যে ব্যবহার করেছিলেন। তারই ফলস্বরূপ ক্রুদ্ধ বৃহস্পতি তাকে অন্ধত্বের অভিশাপ দেন। বৃহস্পতির শাপবাক্য অনুসারে সেই উতথ্যপুত্রের নাম হয়েছে দীর্ঘতমস্। দীর্ঘতমস্ নামকরণ প্রসঙ্গে হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত *মহাভারতে* উপলব্ধ স্বয়ংকৃত *ভারতকৌমুদী টীকায়* বলেছেন— 'বৃহস্পতেঃ শাপাৎ শাপবাক্যানুসারাৎ, দীর্ঘতমস্ নামাজায়ত'।[১১২]

পুনরায় দীর্ঘতমস্ নামকরণ প্রসঙ্গে M.N. Dutt সম্পাদিত *Mahābhārata* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে— 'The Rishi Brihaspati, Utathy's son, as illustrious and as effulgent as Brihaspati, was born blind; and he was named Dirghatamas'.[১১৩]

উতথ্য পুত্র দীর্ঘতমস্ অন্ধরূপে জন্মানোর পরবর্তী সময়ে তপস্যার প্রভাবে যশস্বী ঋষি রূপে খ্যাত হয়েছিলেন এবং তিনি দেবপুরোহিত বৃহস্পতির সমতুল্য জ্ঞানী ছিলেন।

বেদে উল্লিখিত দীর্ঘতমস্ ঋষি : মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র ঋষি দীর্ঘতমস্ একধারে বৈদিক ঋষি এবং তিনি বেদের একাধিক সূক্তস্থিত মন্ত্রের দ্রষ্টাও। মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র, উতথ্যের ঔরসে মমতার গর্ভে দীর্ঘতমস্-এর জন্ম। সেই কারণেই *ঋগ্বেদের* একটি মন্ত্রে দীর্ঘতমস্ ঋষিকে 'মামতেয়' বিশেষণে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর এরূপ বিশেষণ প্রসঙ্গে *ঋগ্বেদে* বলা হয়েছে–

> দীর্ঘতমস্ মামতেয়ো জুজুর্বান্দশমে যুগে।
> অপামর্থং যতীনাং ব্রহ্মা ভবতি সারথিঃ।।[১১৪]

ঋষি দীর্ঘতমস্-কে বেদের একাধিক মন্ত্রে পরম জ্ঞানী বলা হয়েছে। *ঋগ্বেদের* একাধিক মন্ত্রের পরম দ্রষ্টা হলেন দীর্ঘতমস্। *ঋগ্বেদের* একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, যাঁরা কর্মফলের বাসনা করেন, দীর্ঘতমস্ তাদের নেতা ও সারথী। এবিষয়ে *ঋগ্বেদে* বলা হয়েছে–

> অপাসর্থং যতীনাং ব্রহ্মা ভবতি সারথি।[১১৫]

মহাকাব্যে ও পুরাণগুলিতে দীর্ঘতমস্ অন্ধত্বের যে কাহিনী পাওয়া যায়, তার প্রাচীনতম উৎস *ঋগ্বেদ*। *ঋগ্বেদের* মন্ত্রে দীর্ঘতমস্-কে জন্মান্ধ বলা হলেও, উল্লিখিত হয়েছে অগ্নির জ্ঞানরূপ রশ্মির প্রভাবে তিনি অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। এবিষয়ে *ঋগ্বেদে* উল্লিখিত হয়েছে–

> যে পায়বে মমতেয়ং তে অগ্নে পশ্যান্তো অন্ধং দুরিতাদরক্ষন্।
> ররক্ষ তান্ত্-সুকৃতো বিশ্ববেদা দিপ্সন্ত ইদ্রিপবো নাহ দেভুঃ।।[১১৬]

অর্থাৎ অগ্নির কৃপায় দীর্ঘতমস্ ঋষির জন্মান্ধ থেকে মুক্তির বিষয়ে H. H. Wilson সম্পাদিত *Ṛgveda Saṁ*hitā- তে বলা হয়েছে– "Your fostering (rays), Agni, beholding the

blind son of Mamatā, relieved him of the affliction; he who knows all things protect the pious, and (their) malevolent enemies are unable to do them harm".[১১৭]

দীর্ঘতমস্ ঋষির চরিত্রের নিরিখে বলি রাজবংশের সৃষ্টির কাহিনী : বেদজ্ঞ পণ্ডিত দীর্ঘতমস্ জন্মান্ধ হলেও বিদ্যার বলে এক সুন্দরী ও যুবতি প্রদ্বেষী নামক ব্রাহ্মণ-কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করেন এবং বেদজ্ঞ দীর্ঘতমস্-এর ঔরসে যথা সময়ে উতথ্যমুনির বংশবৃদ্ধির হেতু প্রদ্বেষীর গর্ভে গৌতমসহ একাধিক পুত্র জন্মলাভ করেন।

ধার্মিক, উদারসম্পন্ন ও বেদ-বেদান্তে পারদর্শী দীর্ঘতমস্ ঋষি সুরভি পুত্রের আশ্রমে গোধর্ম শিক্ষা বহুকাল ধরে গ্রহণ করেছিলেন। গোধর্ম শিক্ষা সমাপ্ত হলে তিনি গোধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। প্রসঙ্গতঃ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর *ভারতকৌমুদী* টীকায় গোধর্মের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন— "দিবা বা রাত্রৌ বা, প্রকাশমপ্রকাশং বা, যস্যাং কস্যাচিৎ স্ত্রিয়াং রমণম্। বিতথমর্য্যাদং মিথ্যাচারম্। ক্রুদ্ধা অত এব মোহেন বিকৃতচিত্তয়া বিদ্বেষেণেতি যাবৎ অভিভূতা আক্রান্তাঃ"।[১১৮] অর্থাৎ গোধর্ম হল, যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রিতে গোপনে বা প্রকাশ্যে রতিক্রিয়ায় মগ্ন থাকেন। পুনরায় জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার সম্পাদিত *A History of Ancient Sanskrit Literature* গ্রন্থে গোধর্ম প্রসঙ্গে বলেছেন— "The word 'godharma', which occurs in the story of Dirghatamas, in the Mahābhārata, and which Prof. Lessen translated by 'pastoral law', must have an opprobious sense, and Indian Pandits explain it by 'open and indiscriminate concupiscence'.[১১৯]

ঋষি দীর্ঘতমস্ উপর্যুক্ত হীন গোধর্ম প্রচারের কারণেই আশ্রমবাসীরা তাকে মিথ্যাচারী প্রতিপন্ন করেন এবং আশ্রমবাসীরা সকলেই দীর্ঘতমস্-কে ত্যাগ করেন। অন্যদিকে পুত্রলাভের পরেও বেদজ্ঞ দীর্ঘতমস্ এইরূপ হীন গোধর্ম প্রচারে মগ্ন হওয়ায় পত্নী প্রদ্বেষী তাঁর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন। প্রদ্বেষী মনে করতেন, ভর্তা (স্বামী স্ত্রীকে ভরণ করে বলে, তাকে ভর্তা বলে) রূপে দীর্ঘতমস্ যে কর্তব্য অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রদের ভরণ-পোষণ, সে কর্তব্য তিনি পালন করেননি। উপরন্তু প্রদ্বেষীকেই সেই ভর্তার গুরুদায়িত্ব বহন করতে হয়েছে। প্রদ্বেষী দীর্ঘতমস্-কে তিরস্কার করে বলেন, স্বামী-পুত্রদের ভরণ-পোষণ করতে করতে তিনি ক্লান্ত। সুতরাং তিনি আর পতি দীর্ঘতমস্-এর ভরণ-পোষণ করতে অসমর্থ। পত্নী প্রদ্বেষীর মুখে উচ্চারিত এইরূপ বাক্য শুনে

দীর্ঘতমস্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু প্রদ্বেষী নিজ সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। এমতাবস্থায় ঋষি দীর্ঘতমস্ পত্নী প্রদ্বেষীর উদ্দেশ্যে বলেন—

> অদ্যপ্রভৃতি মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
> এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্।।
> মৃতে জীবতি বা তস্মিন্ নাপরং প্রাপ্নুয়ান্নরম্।
> অভিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ।।[১২০]

অর্থাৎ দীর্ঘতমস্ স্ত্রীলোকদের প্রতি নিয়ম তৈরি করেছেন যে, এখন থেকে সারাজীবন একমাত্র স্বামীই তাঁর পত্নীর অবলম্বন হবেন। স্বামীর জীবিত বা মৃত অবস্থায় পত্নী অন্য পুরুষ অবলম্বন করতে পারবেন না। পুনরায় স্ত্রী অন্য পুরুষ সংসর্গ করলে পতিত হবে।

ঋষি দীর্ঘতমস্ উপর্যুক্ত রীতি অনুযায়ী, বিধবারা অন্য পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ করলে স্বামীর সমস্ত ধনসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। পতি দীর্ঘতমস্-এর মুখে এইরূপ বাক্য শুনে প্রদ্বেষী ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পুত্রদের নির্দেষ দেন যে, পিতাকে দুই হাত বন্ধন করে একটি ভেলায় উঠিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে। পুত্রগণও মাতার আদেশ অনুযায়ী অন্ধ বৃদ্ধ পিতাকে কলার ভেলায় চাপিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেন।

যথাসময়ে দীর্ঘতমস্ কলার ভেলায় ভাসতে ভাসতে বহু দেশ গমন করার পর বলি নামে সর্বধর্ম নিপুণ একরাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। দীর্ঘতমস্-এর প্রকৃত পরিচয় জেনে অপুত্রক বলিরাজা নিজের পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের জন্য তাকে বরণ করেন। রাজা বলি নিজ ভার্যা সুদেষ্ণাকে ঋষি দীর্ঘতমস্-এর কাছে পাঠালেন। রানী সুদেষ্ণা দীর্ঘতমস্-কে বৃদ্ধ ও অন্ধ জেনে নিজে না গিয়ে ধাত্রীকন্যাকে পাঠিয়ে দেন পুত্র উৎপাদনের জন্য। ধার্মিক ও জিতেন্দ্রিয় দীর্ঘতমস্ সেই শূদ্রা রমনীর গর্ভে কাক্ষীবান সহ এগারোটি পুত্র উৎপাদন করেন। রাজা বলি কাক্ষীবান সহ এগারোটি পুত্রকে নিজের পুত্র বলে দাবী করায় দীর্ঘতমস্ রাজার উদ্দেশ্যে বলেন, এই এগারোটি পুত্র তাঁর ঔরসে শূদ্রা রমনীর গর্ভজাত পুত্র। রাজা বলি পত্নী সুদেষ্ণার এইরূপ কৌশল জানতে পেরে, তিনি পুনরায় তাঁর মহিষীকে দীর্ঘতমস্-এর কাছে পুত্র উৎপাদনের জন্য পাঠালেন। দীর্ঘতমস্ সুদেষ্ণার অঙ্গ স্পর্শ করে বর দিলেন, তাঁর ঔরসে সুদেষ্ণার গর্ভে সূর্যের তুল্য পাঁচটি পুত্রের জন্ম হবে। তাঁদের নাম হবে— অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম। এই পাঁচ সন্তানের নাম

অনুযায়ী প্রত্যেক পুত্র শাসিত দেশের নাম হবে যথাক্রমে অঙ্গের অঙ্গদেশ, বঙ্গের বঙ্গদেশ, কলিঙ্গের কলিঙ্গদেশ, পুণ্ড্রের পুণ্ড্রদেশ এবং সুহ্মের সুহ্মদেশ। এবিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> তাং স দীর্ঘতমস্তেঙ্গষু স্পৃষ্ট্বা দেবীমথাব্রবীৎ।
> ভবিষ্যন্তি কুমারাস্তে তেজসাদিত্যবর্চ্চসঃ।।
> অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
> তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বণামপ্রথিতা ভুবি।।[১২১]

পুনরায় দীর্ঘতমস্-এর ঔরসে বলি রাজার মহিষীর গর্ভে সূর্যের তুল্য পাঁচ সন্তান জন্মায়। দীর্ঘতমস্-এর মাধ্যমে বলি রাজার বংশরক্ষা ও সাম্রাজ্য বিস্তার প্রসঙ্গে M.N. Dutt সম্পাদিত *Mahābhārata* গ্রন্থে বলেছেন— "Dhirghatama touched that lady's (Sudeshna) body and told her, 'You will give birth to sons, as effulgent as the sun. Namely, Anga, Vanga, Kalinga, Pundra and Suhma. Five countries will be named on earth after their names. From Anga a country will be called Anga, from Banga one Banga, from Kalinga one Kalinga, from Pundra one Pundra and from Suhma one Sahma. It was thus the line of Bali was perpetuated by the Rishi".[১২২]

ঋষি দীর্ঘতমস্ পুনরায় দৃষ্টিলাভ : *বৈয়াসিক মহাভারতের* 'শান্তিপর্বে' বলা হয়েছে যে, ঋষি দীর্ঘতমস্ মহর্ষি বৃহস্পতির অভিশাপে অন্ধরূপে জন্মগ্রহণ করলেও, তিনি শিক্ষা কল্প প্রভৃতি অঙ্গশাস্ত্র, পুরাণাদি, চতুর্বেদ অধ্যয়ন করে প্রথমে হরির 'কেশব' নাম নমস্কারপূর্বক জপ করতে থাকেন। ভগবান হরির গোপনীয় 'কেশব' নাম ভক্তিপূর্বক জপ করার ফলে প্রথমে দৃষ্টি ফিরে পেলেও, পুনরায় কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয় 'কেশব' নাম জব করার ফলে অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। এবিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> বেদানবাপ্য চতুরঃ সাঙ্গোপাঙ্গান্ সনাতনান্।
> প্রযোজয়ামাস তদা নামগুহ্যমিদং মম।
> আনুপূর্ব্ব্যেণ বিধিনা কেশবেতি পুনঃ পুনঃ।।
> স চক্ষুষ্মান্ সমভবদ্-গোতমশ্চাভবৎ পুনঃ!।[১২৩]

পুনরায় উপর্যুক্ত শ্লোকের পরিপ্রেক্ষিতে ঋষি দীর্ঘতমস্-এর দৃষ্টিলাভ প্রসঙ্গে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর *ভারতকৌমুদী* টীকায় উল্লেখ করেছেন— "স দীর্ঘতমস্ কেশবনামজপেন চক্ষুষ্মান্ সাধারণ্যেন দৃষ্টিশক্তিমান্, পুনশ্চাধিকজপেন গোতমঃ অসাধারণ্যেন দৃষ্টিশক্তিমান্ অভবৎ। অত্র গোশব্দশ্চক্ষুর্ব্বাচী"।[১২৪]

২.২.৩. অরুণ : অরুণ হলেন কশ্যপ পুত্র গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে প্রজাপতি দক্ষের অষ্টম কন্যা বিনতার গর্ভে জন্ম হয় অরুণের। বিনতার পুত্র বলে ইনি বৈনতেয় নামেও পরিচিত। তপস্যার দ্বারা অরুণ মহাদেবের আরাধনা করে মহেশ্বরের অনুগ্রহে সূর্যের সারথীরূপে নিজ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে—

> সোঽপি তং রথমারুহ্য ভানোরমিততেজসঃ।
> সর্ব্বলোকপ্রদীপস্য হ্যমরোঽপ্যরুণোঽভবৎ।।[১২৫]

অরুণের বিকলাঙ্গরূপে জন্মেরকাহিনী : পূর্বকালে সত্যযুগে দক্ষপ্রজাপতির কদ্রু ও বিনতা নামে দুই সুলক্ষণা ও সুন্দরী কন্যা ছিলেন। তাঁরা দুই ভগিনীই কশ্যপ মুনির পত্নী ছিলেন। একবার কশ্যপ মুনি তাঁর দুই ভার্যা কদ্রু ও বিনতার উপর সন্তুষ্ট হয়ে বরদান করতে চান। পতি কশ্যপের ভার্যাদের প্রতি বরদানের অঙ্গীকারে দক্ষপ্রজাপতির কন্যাদ্বয় অত্যন্ত আনন্দিত হন। প্রথমা পত্নী কদ্রু বররূপে চান, কশ্যপ সদৃশ সমান বলবান সহস্র পুত্রের জননী হতে। দ্বিতীয়া পত্নী বিনতা কশ্যপ মুনির কাছে বররূপে চান, দুই পুত্রের জননী হতে এবং তাঁর এই দুই পুত্র ভগিনী কদ্রুর পুত্র অপেক্ষা বলবান হবে, এমনকি সকলের চেয়ে তেজে, আকৃতিতে ও বিক্রমে শ্রেষ্ঠ হবেন। কশ্যপ মুনি দুই পত্নীকে তাঁদের ইচ্ছানুসারে পুত্রলাভের বর দিয়ে তপস্যা করতে বনে চলে যান।

কশ্যপ মুনির বরদানের বহুকাল পর কদ্রু একহাজার ডিম এবং বিনতা দুটি ডিম প্রসব করেন। কশ্যপ মুনির পত্নীদের প্রসূত ডিমগুলি দেখে দাসীরা আনন্দিত হন এবং দাসীরা ডিমগুলিকে উপযুক্ত উত্তাপযুক্ত পাত্রে রেখে দেন। তারপর পাঁচশো বছর পরে কশ্যপ মুনির প্রথম ভার্যা কদ্রুর ডিমগুলি থেকে সহস্র সর্পের জন্ম হয়। কিন্তু কশ্যপ মুনির দ্বিতীয় ভার্য্যা বিনতার ডিমগুলি একইভাবে পাত্রে পড়ে রয়েছে অর্থাৎ বিনতার প্রসূত ডিম দুইটি থেকে পুত্র বাইরে বেরোইনি। প্রসূত ডিম বহুদিনেও বিদীর্ণ হচ্ছে না দেখে ধৈর্যহীন বিনতা লজ্জিত ও দুঃখিত হয়ে একটি ডিম বিদীর্ণ করেন। সেই বিদীর্ণ ডিমে যে পুত্রটি ছিল তার দেহের উপরের অংশ নির্মিত হয়েছিল।

কিন্তু নীচের অংশ নির্মিত হয়নি অর্থাৎ বিদীর্ণ ডিম থেকে উরুহীন সন্তান জন্মলাভ করে। এ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে—

অণ্ডং বিভেদ বিনতা তত্রপুত্রং দদর্শ চ।
পূর্ব্বার্দ্ধকায়সম্পন্নমিতরেণা পকাশতা।।[১২৬]

অর্দ্ধপুষ্ট ঊরুহীন অবস্থায় বিনতা পুত্র জন্মগ্রহণ করায় তিনি তাঁর মাকে অভিশাপ দেন যে, "তুমি পুত্রলোভে যে হেতু আমাকে এইরূপ অসম্পূর্ণ দেহ করিয়াছ, সেই হেতু তুমি যাঁহার সহিত স্পর্ধা করিয়া থাক, পাঁচ শত বৎসর পর্যন্ত সেই কদ্রূদেবীর দাসী হইয়া থাকিবে"।[১২৭]

পুনরায় বিনতা পুত্র অপর ডিমটিকে দেখিয়ে বলেন যে, এই ডিমটিকে বিনতা যদি পুত্রলোভে অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ না করেন, তবে দ্বিতীয় ডিম থেকে জাত পুত্র কদ্রুদেবীর দাসত্ব থেকে বিনতাকে মুক্ত করবেন। এছাড়াও বিনতা পুত্র আরও বলেন যে, পাঁচশত বছর পর বিনতা প্রসূত দ্বিতীয় ডিম থেকে পুত্র উৎপন্ন হবে। অতএব বিনতা যেন ধীর চিত্তে সেই দ্বিতীয় পুত্রের জন্য প্রতীক্ষা করেন। বিনতার প্রথম বিদীর্ণ ডিম থেকে জাত বিকলাঙ্গ পুত্রের নাম অরুণ। এ প্রসঙ্গে M.N. Dutt সম্পাদিত *Mahābhārata* গ্রন্থে বলেছেন— "Thus cursing his mother Vinata, the child rose to the sky. O Brahmana, Aruna (this child) became the charioteer of the Sun and he is to be seen in the hour of the morning".[১২৮]

অরুণের পত্নীর নাম শ্যেনী। অরুণ ও শ্যেনীর মিলনে মহাপরাক্রমী ও মহাসাহসী সম্পাতি ও জটায়ু নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। এ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লেখ রয়েছে—

অরুণস্য ভার্য্যা শ্যেনী তু বীর্য্যবন্তৌ মহাবলৌ।
সম্পাতিং জনয়ামাস বীর্য্যবন্তং জটায়ুষম্।।[১২৯]

ব্রহ্মা কর্তৃক সূর্যের সারথি প্রাপ্তিতে অরুণের ভূমিকা : অরুণ যেভাবে সূর্য দেবতার সারথী নিযুক্ত হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে অন্য কাহিনীটি হল— রাহু যখন অমৃত পান করতে আরম্ভ করেছেন, তখন চন্দ্র ও সূর্য তা নারায়ণকে বলে দিয়েছিলেন। তাই রাহু চন্দ্র ও সূর্যের সঙ্গে চিরকাল শত্রুতা করে আসছেন এবং এই কারণেই তিনি সূর্যকে গ্রাস করে কষ্ট দিতেন। তাতে সূর্য ভাবলেন যে, তিনি দেবতাদের মঙ্গলের জন্যই রাহুর অমৃতপানের কথা বলে দিয়েছেন। তাই রাহু তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ।

অথচ সূর্য একা সেই কষ্ট ভোগ করছেন এবং দেবতারা সূর্যের কষ্টের পরিণতি দেখেও প্রতিকারের কোন চেষ্টা করেন না, এই ভেবে সূর্য দেবতাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। ক্রুদ্ধ সূর্য দেবতাদের এবং সমগ্র জগতের বিনাশের জন্য তেজবিস্তার করতে লাগলেন। সমগ্র জগৎ সূর্যোদয়ের পূর্বেই উত্তপ্ত হয়ে যায়। জগতের এই পরিণতি দেখে সমাধানের উদ্দেশ্যে দেবতারা ভয় পেয়ে ব্রহ্মার কাছে যান। ব্রহ্মা জগৎ উত্তাপের সমাধানস্বরূপ দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ক্রুদ্ধ সূর্য প্রচণ্ড তেজে উদিত হবেন এবং তার ফলে ত্রিভুবন ভস্মীভূত হবে। কিন্তু এর প্রতিবিধান স্বরূপ কশ্যপ মুনির বিশালদেহী ও মহাতেজস্বী পুত্র অরুণ সূর্যের সম্মুখে থাকবেন এবং তাঁর সারথির কাজ করবেন। বিশালদেহী অরুণ সূর্যের সম্মুখে থাকায় সূর্যের তেজ হ্রাস পাবে এবং জগতের মঙ্গল হবে। যথাসময়ে ব্রহ্মার আদেশে অরুণ সূর্য উদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে আবৃত করলেন এবং অরুণ কর্তৃক সূর্যের আবরণের ফলে জগৎতে তেজ হ্রাস পেল। এই সময় থেকে অরুণ সূর্যের সারথি নিযুক্ত হলেন। এ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> তস্য প্রতিবিধানঞ্চ বিহিতং পূর্ব্বমেব হি।
> কশ্যপস্য সুতো ধীমানরুণেত্যভিবিশ্রুতঃ।।
> মহাকায়ো মহাতেজাঃ স স্থাস্যতি পুরো রবেঃ।
> করিষ্যতি চ সারথ্যং তেজশ্চাস্য হরিষ্যতি।।[১৩০]

২.২.৪. অষ্টাবক্র : *বৈয়াসিক মহাভারতের* 'বনপর্বে' বর্ণিত হয়েছে অষ্টাবক্রের কাহিনী। মহর্ষি উদ্দালকের কহোড় নামে এক বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন। উদ্দালক কহোড়ের সেবায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। এছাড়াও শিষ্য কহোড়ের বিনীত শুশ্রষায় মুনি উদ্দালক অত্যন্ত প্রীত হয়ে নিজকন্যা সুজাতার সঙ্গে তাঁর বিবাহও দিয়েছিলেন। যথাসময়ে বিবাহের পরে উদ্দালক কন্যা সুজাতা গর্ভবতী হয়েছিলেন।

অষ্টাবক্রের বৈকল্যত্ব প্রাপ্তি : *বৈয়াসিক মহাভারতে* বর্ণিত হয়েছে যে, উদ্দালক কন্যা সুজাতার গর্ভে যে সন্তান অবস্থান করছিলেন, সেই সন্তান মাতৃগর্ভে অবস্থানরত অবস্থায় পিতা কহোড়ের মুখ থেকে শুনে শুনে অঙ্গ সহিত বেদ অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর গর্ভস্থ শিশু শ্রুতির দ্বারা সর্ববেদজ্ঞ হয়ে ওঠেন।

একদিন রাত্রে পিতা কহোড়ের অশুদ্ধ বেদপাঠ শুনে গর্ভস্থ শিশু পিতাকে জানায়। গর্ভস্থ পুত্রের বেদপাঠবিষয়ক বচনে পিতা কহোড় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে অভিশাপ দেন, "তুমি যখন উদরে থেকেই আমার নিন্দা করছ, ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই যদি তোমার স্বভাব এত বক্র হয়, তাহলে ভূমিষ্ঠ হবার পরে তোমার দেহের আটটি স্থান অবশ্যই বক্র হবে"।[১৩১] পিতা কহোড়ের অভিশাপে গর্ভাবস্থায় এই ভ্রূণটি বিকৃত হয়ে যায়। যথাসময়ে গর্ভস্থ শিশু বিকলাঙ্গ শরীর নিয়ে জন্মায় এবং তার নাম হয় অষ্টাবক্র। এ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> উপালব্ধঃ শিষ্যমধ্যে মহর্ষিঃ স তং কোপাদুদরস্থং শশাপ।
> যস্মাৎ কুশৌ বর্ত্তমানো ব্রবীষি তস্মাদ্বক্রো ভবিতাস্যষ্টধৈব।।
> স বৈ তথা বক্র এবাভ্যজায়দষ্টাবক্রঃ প্রথিতো বৈ মহর্ষিঃ।[১৩২]

উপর্যুক্ত শ্লোকে অষ্টাবক্রের শারীরিক বক্রতার ভিত্তিতে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর *ভারতকৌমুদী* টীকায় বলেছেন— "উপালব্ধস্তিরস্কৃতঃ, শিষ্যমধ্যে গুরুশিষ্যমধ্যে সতীর্থমধ্য ইত্যর্থঃ। স কহোড়ঃ, তৎ নিজপুত্রম্। অষ্টধৈব দেহস্য অষ্টাভিঃ প্রকারৈরেব। তথা অষ্টধা, বক্র এব, অভ্যজায়ৎ অজায়ত; তেনাষ্টাবক্রঃ প্রথিতঃ"।[১৩৩]

পুনরায় কহোড় মুনির পুত্র অষ্টাবক্রের বিকলতা প্রসঙ্গে M.N. Dutt সম্পাদিত *Mahābhārata* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে— "Through your grace I have become even in my this fatal state learned in all Shastras and in the Vedas and in the Vedangas. But O father, I tell you what proceeds from your lips is not correct. Having been thus insulted before his disciples, the great Rishi cursed in anger the child in the womb. 'As you speak from the womb, so will you be crooked in eight parts of your body. Thus, the child was born crooked and the great Rishi was ever afterwards known by the name of Asthavakra".[১৩৪]

মাতৃগর্ভাবস্থায় অষ্টাবক্রের পিতা কহোড়ের প্রাণনাশের চেষ্টা : অষ্টাবক্রের জন্মের পূর্বেই পত্নী সুজাতা কহোড় মুনিকে কিছু ধনসম্পদ উপার্যনের জন্য অনুরোধ করেন, নবজাতকের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত। পত্নী সুজাতার অনুরোধে কহড় ধন উপার্যনের আশায় জনক রাজার সভায় গেলেন। সেখানে বন্দি নামে এক পণ্ডিত ছিলেন, যিনি তর্কশাস্ত্রীয় বাদবিতণ্ডায় পারদর্শী ছিলেন। পণ্ডিত বন্দি কহোড়কে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন। উক্ত তর্কযুদ্ধের শর্ত ছিল যে, যিনি তর্কযুদ্ধে

পরাজিত হবেন, তাকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হবে। কহোড় মুনিও জনক রাজসভার পণ্ডিত বন্দির কাছে যথাসময়ে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হন এবং তর্কযুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী মুনি কহোড়কে জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। কহোড় মুনির মৃত্যু প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উক্ত হয়েছে—

> উক্তস্ত্বেবং ভার্য্যয়া বৈ কহোড়ো বিত্তস্যার্থে জনকমথাভ্যগচ্ছৎ।
> স বৈ তদা বাদবিদা নিগৃহ্য নিমজ্জিতো বন্দিনেহাপ্সু বিপ্রঃ।।[১৩৫]

অষ্টাবক্র মুনির পাণ্ডিত্যের নিরিখে পিতা কহোড়কে উদ্ধার এবং নিজের স্বাভাবিক দেহ প্রাপ্তি :

কহোড় মুনির মৃত্যুর কিছুদিন পর অষ্টাবক্র যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হয়। অষ্টাবক্রের ভূমিষ্ঠ হওয়ার ফলে, উদ্দালক মুনি জামাতা কহোড়ের পরাজয়ের কথা কন্যা সুজাতাকে বললেন এবং তর্কযুদ্ধে কহোড়ের পরাজিত হওয়ার কথা অষ্টাবক্রের নিকট গোপন রাখতে উপদেশ দিলেন। সুজাতার পিতা উদ্দালকের কথামতো অষ্টাবক্রকে তার পিতার কথা জানতে দেননি। অষ্টাবক্র মাতামহ উদ্দালকের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠতে লাগলেন এবং জন্মের পর থেকেই অষ্টাবক্র মাতামহকেই নিজপিতা বলে মনে করতে লাগলেন। এছাড়াও সমবয়সী মাতুল শ্বেতকেতুকে নিজের ভাই বলে মনে করতেন।

তারপর একদিন শ্বেতকেতু বার বছর বয়সে পিতা উদ্দালোকের ক্রোড়ে উপবিষ্ট অষ্টাবক্রকে টানতে টানতে ক্রন্দনরত অবস্থায় বলেন, 'এ তোমার পিতার কোল নয়'।[১৩৬] অতঃপর মায়ের কাছে অষ্টাবক্র সমস্ত তথ্য জানতে পেরে, মাতুল শ্বেতকেতুর সঙ্গে জনক রাজার যজ্ঞসভায় উপস্থিত হন। সেখানে রাজা জনককে বলেন, আপনার রাজসভায় বন্দি নামে কোন বিজ্ঞ, বিদ্বান্ ও বিচারে নিপুণ ব্রাহ্মণ আছেন, যিনি বহু ব্রাহ্মণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে জলে ডুবিয়ে হত্যা করেছেন। তাই অষ্টাবক্রও বন্দি নামক পণ্ডিতের সহিত তর্কযুদ্ধে অংশগ্রহণের নিমিত্ত এবং তাঁকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করার উদ্দেশ্যেই এখানে উপস্থিত হয়েছেন। পিতা কহোড়ের ন্যায় পরিণতির কথা ভেবে রাজা জনক নিজেই অষ্টাবক্রকে কঠিন কঠিন প্রশ্ন করতে লাগলেন, যাতে ভয় পেয়ে বালক অষ্টাবক্র তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেন। কিন্তু জনক রাজার সমস্ত প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর অষ্টাবক্র দেন। সেইমুহূর্তে জনক রাজা অষ্টাবক্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পণ্ডিত বন্দির সহিত তর্কসভায় অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি দেন। অবশেষে অষ্টাবক্র তর্কযুদ্ধে বন্দিকে পরাজিত করেন। তর্কযুদ্ধে নিয়ম অনুযায়ী বন্দিকেও জলে ডুবে হত্যা করা হবে, যেরূপে বন্দিও পরাজিত ব্রাহ্মণদের

জলে ডুবিয়ে হত্যা করেছেন, একথা অষ্টাবক্র বলেন। অষ্টাবক্রের একথা শুনে বন্দি তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন, "আমাকে জলে ডুবিয়ে মারা সম্ভব নয়। আমি বরুণের পুত্র। আর যাদের আমি জলে ডুবিয়েছিলাম তাঁদেরও মৃত্যু হয়নি। যে সময় জনক রাজার যজ্ঞ আরম্ভ হয়, ঠিক সেই সময় আমার পিতা বরুণদেবও এক দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মণরা সকলেই সেই যজ্ঞ দেখতে গিয়েছেন এবং যথাসময়ে ফিরে আসবেন"।[১৩৭]

জনক রাজার রাজসভায় পণ্ডিত বন্দির কথানুযায়ী যথাসময়ে কহোড় সহ অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা বরুণের যজ্ঞ থেকে স্বশরীরে ফিরে এলেন। এ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

ততস্তে পূজিতা বিপ্রা বরুণেন মহাত্মনা।
উদতিষ্ঠংস্তথা সর্ব্বে জনকস্য সমীপতঃ।।[১৩৮]

অষ্টাবক্রের গুণে ও পাণ্ডিত্য দেখে রাজা জনকও তাঁকে সন্মানিত করলেন। অবশেষে কহোড় মুনিও নিজেকে জল থেকে উদ্ধার করার জন্য অষ্টাবক্রের প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাঁর সহিত আশ্রমে ফিরে আসেন। কহোড় মুনি আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী সময়ে একদিন অষ্টাবক্রকে আশ্রমের নিকটে প্রবাহিত নদীতে স্নান করতে আদেশ দেন। পিতার আদেশে অষ্টাবক্র সেই নদীতে জলে প্রবেশ করা মাত্রই তার শরীরের বক্রতা ঘুঁচে গিয়ে সমতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাঁর দেহ সমান ও স্বাভাবিক হয়। নদীর জলে প্রবেশ করার হেতু অষ্টাবক্রের শরীরের বক্রতা লোপ পাওয়ার কারণেই নদীটি 'সমঙ্গা' নামে খ্যাত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

ততোঽষ্টাবক্রং মাতুরথান্তিকে পিতা নদীং সমঙ্গাং শীঘ্রমিমাং বিশস্ব।
প্রোবাচ চৈনং স তথা বিবেশ সমৈরঙ্গৈশ্চাপি বভূব সদ্যঃ।।
নদী সমঙ্গা চ বভূব পুণ্যা যস্যাং স্নাতো মুচ্যতে কিল্বিষাদ্ধি।[১৩৯]

অষ্টাবক্র মুনির স্বাভাবিক দেহ প্রাপ্তি বিষয়েও হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর *ভারতকৌমুদী* টীকায় উল্লেখ করেছেন— "ততঃ পিতা কহোড়ঃ, মাতুঃ সুজাতায়া অন্তিকে, এনমষ্টাবক্রং প্রোবাচ। কিং প্রোবাচেত্যাহ- নদীমিতি। হে অষ্টাবক্রঃ! ত্বমিমাং সমঙ্গাং সমঙ্গানাম্না এতদাশ্রমমাত্রপ্রসিদ্ধাং নদীং শীঘ্রং বিশস্ব প্রবিশ; বক্রাণামঙ্গানাং সমীকরণার্থমিত্যাশয়ঃ। তথা আদেশেন, সোঽষ্টাবক্রোঽপি বিবেশ, সদ্য সমৈরঙ্গৈর্বিশিষ্টশ্চাপি বভূব। পুন্যা সা নদী, সমঙ্গা এতন্নাম্না জগতি বিখ্যাতা বভূব, সমানি অঙ্গানি যস্যাঃ সকাশাৎ সেতি যোগাদিতি ভাবঃ"।[১৪০]

পুনরায় কহোড় মুনির পুত্র অষ্টাবক্রের স্বাভাবিক শরীর প্রসঙ্গে M.N. Dutt সম্পাদিত *Mahābhārata* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে— "Thereupon in the presence of his mother, his father said, 'Speedily enter into the water of this river Samanga'. Being thus told, he entered and immediately all his (crooked) limbs were made straight. From that day that river became known by the names of Samanga and it became capable of cleansing. He who bathes in it is cleansed of all sins".[১৪১]

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের স্বয়ম্ভূ-সংবাদের কাহিনি অনুসারে সত্যযুগে লক্ষ্মী ও নারায়ণের বিবাহ অনুষ্ঠানে সুব্রত মুনি দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক অপমানিত হন এবং ইন্দ্রদেবের উপর অত্যন্ত ক্রোধিত হয়ে সুব্রত মুনির শরীরের স্নায়ুর আটটি স্থানে বক্রতা প্রাপ্ত হন। কারণ সুব্রত মুনি ও মহর্ষি লোমশ একইসঙ্গে লক্ষ্মী ও নারায়ণের বিবাহের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র শুধুমাত্র লোমশকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে যথোপযুক্ত সম্মান দেখান। ইন্দ্রদেবের এইরূপ কার্যে দারুণ অপমানিত বোধ করেন এবং অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে নিজ শরীরে স্নায়ুর বক্রতা প্রাপ্তি ঘটে। তিনিই পরবর্তীকালে অষ্টাবক্র ঋষি নামে খ্যাত হন। অষ্টাবক্র মুনির জন্মদাতা পিতা কহোড়ের কথানুসারে উপর্যুক্ত সমঙ্গা নদীর তীরে প্রত্যহ স্নান করে মহাদেবের উপাসনা করতেন। তিনি বহু বছর ধরে বক্রনাথরূপ মহাদেবের উপাসনা করে স্বাভাবিক শরীর প্রাপ্ত করেন। সেই থেকেই উক্ত স্থান বক্রেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

২.২.৫. দ্যুমৎসেন : *বৈয়াসিক মহাভারতের* বনপর্বে শাল্বদেশের অধিপতি দ্যুমৎসেন নামে এক ধার্মিক ও ক্ষত্রিয় রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্যুমৎসেনের একমাত্র পত্নী ছিলেন শৈব্যা। দ্যুমৎসেন ও শৈব্যার একমাত্র পুত্র সত্যবান্ অতি ধার্মিক বলে পরিচিত ছিলেন। দ্যুমৎসেন বুদ্ধিমান ও ধার্মিক রাজা ছিলেন। পুত্রের বাল্যকালে তাঁর চোখ দুটি নষ্ট হয়ে যায়। দ্যুমৎসেনের অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে শত্রুরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন এবং তাকে রাজ্যচ্যুত করেন। রাজ্যচ্যুত হয়ে তিনি স্ত্রী-পুত্রসহ অরণ্যে আশ্রম নির্মাণ করে বসবাস ও তপস্যা করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

আসীচ্ছাল্বেষু ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয়ঃ পৃথিবীপতিঃ।
দ্যুমৎসেন ইতি খ্যাতঃ পশ্চাচ্চান্ধো বভূব সঃ।।
বিনষ্টচক্ষুষস্তস্য বালপুত্রস্য ধীমতঃ।
সামীপ্যেন হৃতং রাজ্যং ছিদ্রেঽস্মিন্ পূর্ব্ববৈরিণা।।[১৪২]

পুনরায় দ্যুমৎসেন প্রসঙ্গে M.N. Dutt সম্পাদিত *Mahābhārata* গ্রন্থে বলা হয়েছে– "There was, in Shalya, a pious Kshatriya king, Dyumatsena by name, who lost his eyes in course of time. That intellectual (monarch) who had an only infant son, having lost his eyes, a neighbouring enemy who bore him an old grudge, taking advantage of his blindness, seized his kingdom. (Deprived of his kingdom), he (Dyumatsena) accompanied by his wife with the infant at her breast, retired to the woods. And having gone to a great forest, he, observant of rigid vows, began to practise asceticism".[১৪৩]

রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্রের সত্যবান্ নামকরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, বালকের পিতা ও মাতা সর্বদাই সত্য কথা বলেন। তাই ব্রাহ্মণেরা অন্ধ রাজার পুত্রের নামকরণ এইরূপ করেছেন। সত্যবানের নামকরণ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে–

> সত্যং বদত্যস্য পিতা সত্যং মাতা প্রভাষতে।
> ততোঽস্য ব্রাহ্মণাশ্চক্রুর্নামৈতৎ সত্যবানিতি।।[১৪৪]

<u>সাবিত্রীর সঙ্গে সত্যবানের বিবাহের কারণেই পুনরায় দ্যুমৎসেনের চক্ষু প্রাপ্তি</u> : দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান্ সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান, ইন্দ্রের ন্যায় বীর, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাবান, সঙ্কৃতিপুত্র রন্তিদেবের মতো দাতা, উশনীরপুত্র শিবির ন্যায় হিতৈষী ব্রাহ্মণ ও সত্যবাদী, যযাতির ন্যায় উদারস্বভাব, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মতো রূপবান হলেও, সত্যবানের আয়ু অত্যন্ত স্বল্প সময় রয়েছে (অর্থাৎ একবছরের মধ্যেই দেহত্যাগ করবেন বা মৃত্যু হবে)। কিন্তু সত্যবানের স্বল্প আয়ু স্বত্বেও, মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা সাবিত্রী সত্যবানকে মনে মনে বরণ করেছেন। মদ্ররাজ অশ্বপতির নিষেধ সত্ত্বেও সাবিত্রী সত্যবানকে বিবাহ করতে চান তাঁর গুণাবলীর জন্যই। কন্যা সাবিত্রীর কথাকেই মদ্ররাজ স্বীকৃতি দিয়ে, যথাসময়ে দ্যুমৎসেন পুত্র সত্যবানের হস্তে তাঁর কন্যাকে প্রদান করেন।

সাবিত্রীর সঙ্গে সত্যবানের বিবাহের কিছুদিন পরে পূর্বনির্দিষ্ট অভিশাপের সময় অনুযায়ী তার মৃত্যুর দিন উপস্থিত হল। স্বামী সত্যবানের মৃত্যুর দিনে দুঃখে সাবিত্রী ইষ্টদেবতাদের স্মরণ করতে এবং কঠোর ব্রত কার্য করতে লাগলেন। এমন সময়েই সত্যবান কাঁধে কুঠার নিয়ে বনে যেতে লাগলেন। মৃত্যুর দিনে সত্যবানকে বনে যেতে দেখে সাবিত্রী স্বামীর উদ্দেশ্যে বলেন– "আপনি

একাকী যাইতে পারিবেন না, আমি আপনার সহিত যাইব; আমি আপনাকে ছাড়িতে ইচ্ছা করি না"।[১৪৫]

সাবিত্রীর এই অনুরোধে, সেই দিনে তিনি ও সত্যবান যথাসময়ে বনে গমন করেন। বনে গিয়ে সত্যবান ও সাবিত্রী একসঙ্গে ফল তুলে থলিতে ভর্তি করেন। এরপর সত্যবান্ কুঠার দিয়ে কাঠ কাটতে লাগলেন। কাঠ কাটতে কাটতে সত্যবানের শরীরে ঘাম এবং মস্তকে প্রবল বেদনা জন্মায়। এমতাবস্থায় সত্যবান সাবিত্রীর কোলে মাথা রেখে বিশ্রাম নিতে থাকেন এবং সাবিত্রী পূর্বনির্ধারিত সময়ের কথা দুঃখের সাথে স্মরণ করতে থাকেন।

মুহূর্ত কাল পরে সাবিত্রী দেখলেন যে, ভয়ঙ্কর একটি পুরুষ সত্যবানের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগল। সেই ভয়ঙ্কর পুরুষের পরিধানে ছিল রক্তবর্ণ বস্ত্র, কেশগুচ্ছ ছিল বদ্ধ, বিশাল শরীর, সূর্যের তুল্য তেজ, নির্ম্মল শ্যামবর্ণ, নয়নযুগল রক্তবর্ণ এবং তাঁর হাতে দড়ি রয়েছে। সেই ভয়ঙ্কর পুরুষকে দেখে তৎক্ষণাৎ সাবিত্রী সত্যবানের মস্তকটি ভূতলে রেখে অঞ্জলিভরে কম্পিত হৃদয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন যে, "আমি আপনাকে দেবতা বলিয়া বুঝিতেছি। কেন না, এরূপ দেহ মানুষের হয় না; সুতরাং দেব! আপনি আমার ইচ্ছানুসারে বলুন যে, আপনি কে? এবং কিই বা করিবার ইচ্ছা করিতেছেন?"[১৪৬]

সাবিত্রীর উপর্যুক্ত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ তাঁর উত্তরে বলতে লাগলেন যে, "সাবিত্রি! তুমি পতিব্রতা, বিশেষতঃ তপস্বিনী। এই জন্যই আমি তোমার সহিত আলাপ করিতেছি। কল্যাণি! তুমি আমাকে যম বলিয়া অবগত হও। তোমার পতি এই রাজপুত্র সত্যবানের আয়ু শেষ হইয়াছে; সুতরাং আমি ইহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইব; ইহাই আমি করিতে ইচ্ছা করিয়াছি জানিবে"।[১৪৭]

তারপর যথাসময়ে যম সত্যবানকে বন্ধন করে দক্ষিণমুখে চলতে লাগলেন এবং মহাভাগা ও পতিব্রতা সাবিত্রী দুঃখার্ত্ত হয়ে যমের পিছন পিছন অনুসরণ করতে লাগলেন। যমের পিছন পিছন সাবিত্রীর অনুগমন দেখে, যম তাঁর উদ্দেশ্যে আশ্রমে ফিরে যাওয়ার জন্য এবং আশ্রমে ফিরে শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন করতে বলেন। উক্ত যমের কথানুযায়ী সাবিত্রী তাঁর পশ্চাদ্ধাবন এর পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় বলেন যে—

যত্র মে নীয়তে ভর্ত্তা স্বয়ং বা যত্র গচ্ছতি।
ময়া চ তত্র গন্তব্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।।[১৪৮]

অর্থাৎ স্বামী সত্যবানকে যেখানেই যম নিয়ে যাবেন, সেইস্থানেই সাবিত্রীর যাওয়া উচিত, কারণ এটাই সনাতন ধর্ম। পুনরায় সাবিত্রী যমের উদ্দেশ্যে বলেন, স্বামীহীন পত্নীরা বনে থেকে যজ্ঞ, তীর্থবাস কিংবা ব্রত ধর্ম পালন করতে পারেন না। মুনিরা কিন্তু সেই ধর্মকেই তত্ত্বজ্ঞানের অন্যতম কারণ বলে থাকেন। অতএব সাধুরা কর্ত্তব্যের মধ্যেই ধর্মকেই প্রধান বলেছেন। একের সজ্জনসম্মত ধর্মপথকে দেখে সকলেই সেই পথ অনুসরণ করেন। অতএব সাধুরা গার্হস্থ্য ধর্মকেই প্রধান বলে থাকেন।

সাবিত্রীর মুখে গার্হস্থ ধর্মের কথা শুনে যম তুষ্ট হয়ে সাবিত্রীকে পাঁচটি বর দেন। সাবিত্রী **প্রথম** বররূপে যমের কাছে চান শ্বশুর দ্যুমৎসেনের চক্ষুলাভ, **দ্বিতীয়** বররূপে চান দ্যুমৎসেনের পুনরায় রাজ্যলাভ, **তৃতীয়** বররূপে চান নিজের পিতা মদ্ররাজ অশ্বপতির একশত পুত্র, **চতুর্থ** বররূপে চায় সত্যবান্ ও সাবিত্রীর একশত পুত্র, সর্বশেষ অর্থাৎ **পঞ্চম** বররূপে চান সত্যবানের চারশত বছরের আয়ুলাভ। যম দ্বারা উক্ত সাবিত্রীর প্রতি পাঁচটি বর প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে–

চক্ষুষী চ স্বরাজ্যঞ্চ দ্বৌ বরৌ শ্বশুরস্য মে।
লব্ধং পিতুঃ পুত্রশতং পুত্রাণাঞ্চাত্মনঃ শতম্।।
চতুবর্ষশতায়ুর্মে ভর্ত্তা লব্ধশ্চ সত্যবান্।।[১৪৯]

উপর্যুক্ত যমের প্রেরিত প্রথম বর অনুযায়ী যথাসময়ে দ্যুমৎসেনের চক্ষুলাভ হয় এবং চক্ষুযুগল প্রসন্ন হওয়ায় সমগ্র বিশ্বকে পুনরায় দেখতে লাগলেন। দ্যুমৎসেনের চক্ষুলাভ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে–

এতস্মিন্নেব কালে তু দ্যুমৎসেনো মহাবলঃ।
লব্ধচক্ষুঃ প্রসন্নায়াং দৃষ্ট্যাং সর্ব্বং দদর্শ হ।।[১৫০]

উপর্যুক্ত দ্যুমৎসেনের চক্ষুলাভ প্রসঙ্গে M.N. Dutt সম্পাদিত *Mahābhārata* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে– 'The highly-powerful Dyumatsena, being restored to his sight, could behold everything with a clear vision'.[১৫১]

পুনরায় সাবিত্রীর প্রতি যমের দ্বারা প্রাপ্ত দ্বিতীয় বর অনুযায়ী শাল্বদেশের প্রজারা দ্যুমৎসনের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে বলেন যে, তারা সকলে মিলে তার রাজ্যের মন্ত্রীকে (যে দ্যুমৎসেনের অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে শত্রুরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন এবং তাকে রাজ্যচূত করেন) বধ করেছেন। অতএব দ্যুমৎসেনই একমাত্র যথাযোগ্য শাল্বদেশের রাজা। তাই সকল প্রজারা তাকে পুনরায় সিংহাসনে বসাতে চান। তারপর প্রজাদের কথানুযায়ী পুনরায় রাজা দ্যুমৎসেন সিংহাসন ফিরে পান এবং তাঁর পুত্র সত্যবানকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

তারপর বহুকাল পরে যমের তৃতীয় বর অনুযায়ী, সত্যবান্ ও সাবিত্রীর একশত পুত্র জন্মায়। এছাড়াও যমের চতুর্থ বর অনুযায়ী, সাবিত্রীর স্বপিতা মদ্ররাজ অশ্বপতি ও মাতা মালবীর মিলনে একশত সহোদর ভ্রাতা জন্মায়। সাবিত্রীর সহোদর ভ্রাতাগণও কালক্রমে মহাবলশালী ও বীররূপে খ্যাতিলাভ করেন। এইভাবে সাবিত্রী তার আপন পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুরী এবং স্বামিকুলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন।

২.২.৬. উপমন্যু : *বৈয়াসিক মহাভারতের* আদিপর্বে বর্ণিত হয়েছে আপোদধ্যৌমের শিষ্য উপমন্যুর কাহিনী। ঋষি আপোদধৌম্যের উপমন্যু, আরুণি ও বেদ নামে তিন শিষ্য ছিলেন। এই তিন শিষ্যের মধ্যে আপোদ ধৌম্য উপমন্যুকে গো-সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করেন। গুরুর আদেশনুসারে উপমন্যু প্রতিদিন গোচরণ করেন এবং সন্ধ্যাকালে গুরুগৃহে এসে গুরু আপোদধৌম্যকে প্রণাম করতেন। উপমন্যুর স্থূলদেহ হতে দেখে, গুরু আপোদধৌম্য শিষ্যের স্থূলদেহ হওয়ার কারণ জানতে চাইলেন। গুরু আপোদধৌম্যের প্রশ্নের উত্তরে শিষ্য উপমন্যু বলেন, ভিক্ষালব্ধ অন্নের দ্বারা উপমন্যু জীবিকা নির্বাহ করেন অর্থাৎ ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করেই উপমন্যুর শরীর স্থূল হয়েছে। শিষ্য উপমন্যু মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করে পুনরায় আপোদধৌম্য তাঁর শিষ্যের উদ্দেশ্যে বলেন, ভিক্ষালব্ধ বস্তু গুরুকে প্রদান না করে শিষ্য উপমন্যুর ভিক্ষালব্ধ বস্তুকে গ্রহণ করা উচিত নয়।

গুরু আপোদধৌম্যের আদেশকে শিরোধার্য করে উপমন্যু সকল ভিক্ষালব্ধ বস্তুকে তাঁর গুরুর কাছে নিবেদন করতে লাগলেন। কিন্তু গুরু উপমন্যুর ভিক্ষালব্ধ বস্তুর একটুও ফেরত দিতেন না। পুনরায় একদিন উপমন্যুকে স্থূলদেহ দেখে, গুরু জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি এখন কী দ্রব্যের দ্বারা

জীবিকা নির্বাহ করেন? গুরু আপোদধৌম্যের প্রশ্নের উত্তরে উপমন্যু বলেন যে, গুরুকে দেবার পর তিনি দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। উপমন্যুর দ্বিতীয়বার ভিক্ষার কথা শুনে পুনরায় আপোদধৌম্য বলেন, উপমন্যুর এই অতিরিক্ত উপার্জন ঠিক নয়। এতে অন্য ভিক্ষাজীবি ব্যক্তিদের জীবিকার ব্যাঘাত ঘটে।

উপমন্যু তখন থেকে আর দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করতেন না। এরপরেও একদিন পুনরায় উপমন্যুকে স্থূলাকৃতি দেখে গুরু বলেন যে, উপমন্যু দ্বিতীয়বার ভিক্ষা না করেও কিভাবে এখন কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করেন? গুরু আপোদধৌম্যের প্রশ্নের উত্তরে উপমন্যু নিজ দেহের স্থূলতা বিষয়ে বলেন যে, গুরু আপোদধৌম্য তাঁকে যে গো-সমূহ রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সেই গো-সমূহের দুধ খেয়েই বর্তমানে উপমন্যু জীবিকা নির্বাহ করেন। উপমন্যুর আশ্রমের গাভীগুলির দুগ্ধ পানের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের অনুমতি নেই। গুরু আপোদধৌম্য সেই কথা স্মরণ করে দেন এবং এই ভাবে দুগ্ধপান অনুচিত কার্য্য, শিষ্য উপমন্যুকেও সেকথা বলেন।

উপমন্যু এরপর গুরু আপোদধৌম্যকে কথা দেন যে, তিনি কখনোই আর দুগ্ধপান করবেন না। সেই থেকে উপমন্যু আর দুধও পান করতেন না। কিন্তু কিছুদিন পরেই গুরু আপোদধৌম্য উপমন্যুকে আবারও স্থূলাকৃতি দেখে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি এখন কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করেন? উপমন্যু বলেন, আশ্রমের গোবৎসগুলির মাতৃদুগ্ধ পান করার সময় যে ফেনা উদ্-গিরণ করে, তাই তিনি পান করে জীবনধারণ করেন। উপমন্যু মুখে গরুর স্তনের ফেনা পানের মাধ্যমে জীবন ধারণের কথা শুনে, গুরু আপোদধৌম্য বলেন, আশ্রম গাভীর বাছুরগুলি খুবই দয়ালু এবং উপমন্যুর প্রতি করুণায় তারা বেশি বেশি ফেনা উদ্-গিরণ করে, ফলে বাছুরগুলির জীবিকা নির্বাহে বাধার সৃষ্টি হয়। তাই উপমন্যু ফেনা পান করতে আর কখনোই পারবেন না। এইভাবে গুরু আপোদধৌম্যের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে উপমন্যুর সব কিছুই খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।[১৫২]

উপমন্যুর অন্ধত্ব প্রাপ্তির কারণ : গুরু আপোদধৌম্যের আদেশ অনুযায়ী উপমন্যু ভিক্ষার বস্তু ভোজন করতেন না, দ্বিতীয় বারও ভিক্ষা করতেন না। আশ্রম গাভীগুলির দুগ্ধ পান করতেন না এবং দুধের ফেনাও খেতেন না। এমতাবস্থায় বনের মধ্যে একদিন উপমন্যু গাভীগুলি চরাতে চরাতে ক্ষুধায় কাতর হয়ে আকন্দের পাতা খেয়ে ফেলেন।

আকন্দ পাতার রস কোনভাবেই স্বাদু তো নয় বরঞ্চ নোন্তা, তেতো, কটু (তিক্ত) বিশিষ্ট। এইরকম জাতীয় আকন্দ পাতার রস উপমন্যু পান করার সময় তাঁর উদরে জ্বালা তৈরি করে এবং দুই চোখে পীড়া জন্মাতে জন্মাতে অন্ধ হয়ে যান। সেই সময় অন্ধ অবস্থায় চলতে গিয়ে উপমন্যু এক কুয়োর মধ্যে পড়ে গেলেন। ঘরে শিষ্যের ফেরা না দেখে গুরু তার অন্বেষণে বনে গিয়ে তাকে ডাকতে থাকলে উপমন্যু বলেন যে, সে অন্ধ হয়ে কূপে পড়েছে। গুরু অন্ধ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় উপমন্যু বললেন—

অর্কপত্রাণি ভক্ষয়িত্বাঽন্ধীভূতোঽস্মি, অতশ্চঙ্কম্যমাণঃ কূপে পতিত ইতি।।[১৫৩]

উপর্যুক্ত উপমন্যুর আকন্দ পাতা ভক্ষণের ফলে অন্ধত্ব প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর *ভারতকৌমুদী* টীকায় বলেছেন— "স উপমন্যুঃ বৃক্ষস্য পত্রাণি, অভক্ষয়ৎ। ভক্ষ্যান্তরাপ্রাপ্তেরিতি ভাবঃ। তীক্ষ্ণো বিপাকো যেষাং তৈঃ উদরে জ্বালাজনকৈরিত্যর্থঃ। উপহতঃ পীড়িতঃ ক্রমেণান্ধো বভূব"।[১৫৪]

পুনরায় উপমন্যুর আকন্দ পত্র ভক্ষণের ফলে কূপে পড়ে যাওয়া বিষয়ে M.N. Dutt সম্পাদিত *Mahābhārata* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে— "Thus prevented by his preceptor (from supporting himself,) he did not feed on alms, he did not drink the milk, or taste the froth, he had thus nothing to eat. One day being very much oppressed by hunger he ate the leaves of Arka tree in a forest. His eyes were affected by the pungent, acrimonious, crude and saline qualities of the leaves and he became blind. When he was thus walking about feeling his way he fell into a deep well".[১৫৫]

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তবের মাধ্যমে পুনরায় উপমন্যুর চক্ষুপ্রাপ্তি : উপমন্যুর আশ্রমে ফিরতে দেরী দেখে গুরু আপোদ ধৌম্য অন্যান্য শিষ্যগণকে নিয়ে অন্বেষণে বনে নির্গত হন। বনের মধ্যে উপমন্যুর নাম ধরে ডাকতে এক সময় তাঁর সাড়া মেলে। কুয়োর মধ্যে থেকেই উপমন্যু তার ক্ষুধার্ত অবস্থায় আকন্দ পাতা ভক্ষণের কথা এবং অন্ধ হয়ে কূপের মধ্যে পড়ে যাবার ঘটনা গুরু আপোদ ধৌম্যকে জানায়। তখন গুরু আপোদ ধৌম্য উপমন্যুকে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের স্তব করতে বলেন। গুরুর কথানুযায়ী উপমন্যু অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করতে লাগলেন। উপমন্যুর স্তুতিতে প্রীত হয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে একটি পিঠে খেতে দেন। উপমন্যু

তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলেন, গুরু আপোদ ধৌম্যকে নিবেদন না করে এই পিষ্টক তিনি খেতে পারবেন না। উপমন্যুর গুরুভক্তিতে প্রীত হয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলেন, "তোমার গুরুর দন্তগুলি লোহার মতো কালো আর তোমার দন্তগুলি হবে সোনার মতো। তোমার চোখও ঠিক হয়ে যাবে এবং অশেষ মঙ্গল লাভ হবে।[১৫৬]

উপমন্যুর অন্ধত্ব প্রাপ্তি প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে– "প্রীতৌ স্বস্তবানয়া গুরুভক্ত্যা। উপাধ্যায়স্য তে কার্ষ্ণায়সা দন্তা ভবতোঽপি হিরণ্ময়া ভবিষ্যন্তি, চক্ষুষ্মাংশ্চ ভবিষ্যসি, শ্রেয়শ্চাবাপ্স্যসি ইতি"।[১৫৭]

পুনরায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বরে উপমন্যুর চক্ষুপ্রাপ্তি বিষয়ে M.N. Dutt সম্পাদিত *Mahābhārata* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে— "The Ashvinis said, We are pleased with your this devotion to your preceptor. Your teacher's teeth are of black iron, yours will be those of gold. Your sight will be restored and you will possess good fortune".[১৫৮]

এইভাবে উপমন্যু অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বরে চক্ষুলাভ করে পুনরায় গুরু আপোদ ধৌম্যের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন। গুরু আপোদ ধৌম্য শিষ্যের প্রতি প্রীত হয়ে আশীর্বাদ দেন। এইভাবে উপমন্যু সকল বেদ ও ধর্মশাস্ত্রে কুশল হয়ে ওঠেন।

২.২.৭. পৌষ্য : *বৈয়াসিক মহাভারতের* আদিপর্বে রয়েছে জনৈক ন্যায়পরায়ণ ক্ষত্রিয় রাজার কাহিনী। পৌষ্য রাজার নামানুসারে *বৈয়াসিক মহাভারতের* আদিপর্বের তৃতীয় অধ্যায়টি পৌষ্যপর্ব নামে খ্যাত হয়েছে। আপোদ ধৌম্য নামে একজন গুরু ছিলেন। সেই গুরুর তিনজন শিষ্যের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বেদ। আবার বেদের শিষ্য ছিলেন উতঙ্ক। এই উতঙ্ক পাণ্ডবপ্রপৌত্র পরীক্ষিৎ জনমেজয়ের সমসাময়িক ছিলেন বলে জানা যায়।

যথাসময়ে একদিন উতঙ্কের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে, গুরু বেদ তাঁকে গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু উতঙ্ক সেবাপরায়ণ হয়ে দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বসবাসের পর স্বগৃহে গমনের পূর্বে গুরুকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলেন। শিষ্য উতঙ্কের বারংবার গুরুদক্ষিণার কথা শুনে গুরু বেদ শিষ্যের উদ্দেশ্যে বলেন যে, উতঙ্ক বরং গুরুদক্ষিণার বিষয়ে উপাধ্যায়ানীকে অর্থাৎ গুরুপত্নীকে জিজ্ঞাসা করতে। অর্থাৎ গুরু পত্নী উতঙ্ককে যা এনে দিতে বলবেন, তা এনে দিলেই

তাঁর গুরুদক্ষিণা সম্পন্ন হবে। সেইমুহূর্তে গুরু বেদের কথানুসারে শিষ্য উতঙ্ক গুরুপত্নীকে গুরুদক্ষিণার কথা বললে, গুরুপত্নী বলেন, পৌষ্য নামে যে রাজা আছেন, সেই রাজার পত্নীর একজোড়া কুণ্ডল আছে, উতঙ্ক পৌষ্যরাজমহিষীর নিকটে গিয়ে যেন ঐ দুটি কুণ্ডল প্রার্থনা করেন এবং তাঁর গুরুপত্নীকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ সেই দুটি কুণ্ডল অতিসত্বর প্রদান করেন। কারণ পুণ্যকব্রত উদযাপন অনুষ্ঠানে উতঙ্কের গুরুপত্নী সেই পৌষ্য রাজার পত্নীর কুণ্ডল দুটি পরিধান করে ব্রাহ্মণদের সেবা করার ইচ্ছা করেছেন।

গুরুপত্নীর আদেশে কুণ্ডল দুটি আনয়নের জন্য উতঙ্ক পৌষ্যরাজধানীর উদ্দেশ্যে গমন করেন। উতঙ্ক পথে যেতে যেতে অতি বিশাল একটি বৃষকে এবং সেই বৃষে আরূঢ় একজন বৃহৎ পুরুষকে দেখেন। সেই বৃষে আরূঢ় পুরুষের নির্দেশে উতঙ্ক বৃষের মূত্র ও বিষ্ঠা ভক্ষণ ও দাঁড়িয়ে আচমন করেন অর্থাৎ জল দিয়ে মুখ শুদ্ধ করে উতঙ্ক পৌষ্যরাজার সম্মুখে উপস্থিত হন। উতঙ্ক পৌষ্য রাজার সম্মুখে গিয়ে রাজাকে বলেন যে, তিনি রাজার কবজকুণ্ডলের প্রার্থী হয়ে এই রাজসভায় উপস্থিত হয়েছেন। সেইমুহূর্তে পৌষ্যরাজা উতঙ্ককে যথাযথভাবে নমস্কারের দ্বারা সম্মান প্রদান করেন। রাজা পৌষ্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করে উতঙ্ক তৎক্ষণাৎ রাজার উদ্দেশ্যে বলেন, “গুরুদক্ষিণার জন্য দুইটি কুণ্ডল নিতে আসিয়াছি। আপনার মহিষী যে কুণ্ডল দুইটী পরিধান করেন, আপনি তাহা দান করুন”।[১৫৯]

উতঙ্ক মুখে উপর্যুক্ত বাক্য শ্রবণ করে পৌষ্য তার উদ্দেশ্যে বলেন যে, উতঙ্ক যেন স্বয়ং অন্তঃপুরে প্রবেশ করে রাজমহিষীর নিকট কুণ্ডল দুটি প্রার্থনা করেন।

রাজা পৌষ্যের কথানুসারে উতঙ্ক অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। কিন্তু অন্তঃপুরে উতঙ্ক প্রবেশ করে রাজমহিষীকে দেখতে না পেয়ে, রাজা পৌষ্যকে মিথ্যা বলার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেন। বিনাদোষে দোষী সাব্যস্ত রাজা পৌষ্য তখন উতঙ্ককে বলেন, উতঙ্ক নিশ্চয় উচ্ছিষ্ট রয়েছেন অর্থাৎ উতঙ্ক অশুচি অবস্থায় তাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন। যেহেতু পৌষ্য রাজার পত্নী পতিব্রতা, সেইহেতু উচ্ছিষ্ট অবস্থায় অপবিত্র ব্যক্তি রাজার পত্নীকে চাক্ষুষ দর্শন করতে পারেননি। রাজা পৌষ্যের উচ্ছিষ্ট কথার পরিপ্রেক্ষিতে উতঙ্ক স্মরণ করেন, রাজবাড়িতে আসার পূর্বে দ্রুততার জন্য তিনি রাস্তায় ভোজনের পর দাঁড়িয়ে আচমন অর্থাৎ জল দিয়ে মুখ শুদ্ধ করেছিলেন। কারণ চলমান

অবস্থায় অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় আচমন আচারসম্মত নয়। পরবর্তীসময়ে বৈধ আচমনের পর উতঙ্ক অন্তঃপুরে প্রবেশ করে পৌষ্য রাজার মহিষীকে দেখতে পান। উতঙ্কের সাধুতায় প্রীত হয়ে সানন্দে পৌষ্য রাজ্ঞী কুণ্ডল দুটি দেন এবং বলেন সাবধানে তা নিয়ে যেতে। কারণ নাগরাজ তক্ষক এই কুণ্ডল দুটি বিশেষ প্রার্থী তাই পথি মধ্যে উতঙ্কের কাছ থেকে হরণ না করেন, এ বিষয়ে পৌষ্য রাজ্ঞী উতঙ্ককে সাবধান করেছেন। রাজ্ঞী মুখে সাবধান বাণী শুনে, উতঙ্ক পৌষ্য রাজ্ঞীকে আশ্বস্ত করেছেন যে, তাঁর অর্থাৎ উতঙ্কের কাছ থেকে কুণ্ডল দুটি হরণে নাগরাজ তক্ষক অসমর্থ।

উতঙ্কের শাপে পৌষ্য রাজার অন্ধত্বের কাহিনী : পৌষ্য রাজ্ঞী প্রদত্ত কুণ্ডল দুটিকে সঙ্গে নিয়ে উতঙ্ক অন্তঃপুর থেকে রাজসভায় ফিরে এসে পৌষ্যকে বলেন যে, উতঙ্ক ভিক্ষালাভ করে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়েছেন তাই তিনি এখন গুরুর আশ্রমে ফিরতে চান। উতঙ্ক মুখে গুরুগৃহে ফেরার পর রাজা পৌষ্য তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন, "ভগবন! আপনি গুণবান অতিথি। আর আপনার মতো গুণবান অতিথির দেখা রোজ পাওয়া যায় না। অতএব আমি যথাযথ অতিথি সৎকার করতে চাই, আপনি একটু অপেক্ষা করুন"।[১৬০]

রাজা পৌষ্য মুখে অতিথি আপায়ণের কথা শুনে উতঙ্ক রাজার উদ্দেশ্যে বলেন যে, "আমি বিলম্ব করিতেছি; ঘরে যেমন আছে, তেমন অন্নই আপনি শীঘ্র প্রস্তুত করুন, ইহাই আমি (উতঙ্ক) ইচ্ছা করি"।[১৬১]

উতঙ্ক মুখে উপর্যুক্ত অতিথি সৎকারের সম্মতিক্রমে রাজা পৌষ্যের ঘরে যা অন্ন ছিল, তাই দিয়েই অতিসত্বর উতঙ্কের জন্য ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। রাজগৃহে যেমন অন্ন ছিল তা দ্বারা উতঙ্ক ভোজন করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু উতঙ্কে পরিবেশিত অন্ন যথেষ্ট শীতল ও চুল পড়ায় উতঙ্ক পৌষ্য রাজাকে শাপ দেন— 'যস্মান্মে অশুচ্যন্নং দদাসি, তস্মাদন্ধো ভবিষ্যসি, ইতি'।[১৬২]

অর্থাৎ যেহেতু পৌষ্য উতঙ্ককে অপবিত্র অন্ন পরিবেশন করেছেন, সেইহেতু পৌষ্য অন্ধ হবেন। পৌষ্যের অন্ধত্ব প্রসঙ্গে M.N. Dutt সম্পাদিত *Mahābhārata* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে— "Utanka, seeing that the food that was brought before him was cold and had hair

in it, considers it unclean and said to Paushya, you give me food that is not clean, therefore you will lose your sight".[১৬৩]

অকারণে অভিশপ্ত হয়ে পৌষ্য রাজাও যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হন এবং তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উতঙ্কের প্রতি প্রতিশাপ দেন যে, 'ন যুক্তং ভবতান্নমশুচি দত্ত্বা প্রতিশাপং দাতুম্, তস্মাদন্নমেব প্রত্যক্ষীকুরুষ্ব'।[১৬৪]

অর্থাৎ উতঙ্ক যেহেতু নির্দোষ অন্নকে অকারণে অপবিত্র বলে রাজা পৌষ্যকে অভিশাপ দেন, সেইহেতু বিনাদোষে অভিশাপ দেওয়ায়, রাজা পৌষ্য ক্রোধে পুনরায় উতঙ্ককে নির্বংশ হওয়ার প্রতিশাপ দেন। পৌষ্য প্রদত্ত প্রতিশাপের পরিপ্রেক্ষিতে উতঙ্ক বলেন, অপবিত্র অন্ন দিয়ে প্রতিশাপ দেওয়া রাজার উচিত হয়নি। পুনরায় উতঙ্ক তার ভোজনে পরিবেশিত অপবিত্র অন্নকে রাজাকে স্বচক্ষুতে দেখতে বলেন। রাজা পৌষ্য উতঙ্কের ভোজনে পরিবেশিত অপবিত্র অন্নকে দেখে বলেন যে, 'কোন স্ত্রীলোক চুল খুলিয়া সেই শীতল অন্ন আনিয়াছিল। তাই তাহাতে চুল পড়িয়াছিল বলিয়া তাহা অপবিত্র হইয়াছে'।[১৬৫]

ভোজনে পরিবেশিত অপবিত্র অন্নকে দেখে রাজা পৌষ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে উতঙ্কের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে উতঙ্ক বলেন যে, ''ন মৃষা ব্রবীমি, ভূত্বা ত্বমন্ধো ন চিরাদনন্ধো ভবিষ্যসি, ইতি'।[১৬৬]

অর্থাৎ উতঙ্ক কখনোই মিথ্যা কথা বলেননা, তবে পৌষ্য তার শাপ অনুসারে অন্ধ অবশ্যই হবেন। কিন্তু শীঘ্রই পুনরায় দৃষ্টি ফিরে পাবেন। তবে রাজা পৌষ্য উতঙ্ককে প্রদত্ত প্রতিশাপ প্রত্যাহার করেন নি। পৌষ্যপ্রদত্ত প্রতিশাপ প্রত্যাহার না করার দরুন উতঙ্ক পুনরায় রাজার উদ্দেশ্যে বলেন, যদি সত্যি অন্ন দোষযুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে রাজা পৌষ্য প্রদত্তশাপ সফল হবেনা। এই কথা বলার পর কুণ্ডলদুটি নিয়ে উতঙ্ক পৌষ্য রাজগৃহ থেকে গুরু বেদের আশ্রমে প্রস্থান করলেন।

২.২.৮. একলব্য : নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র হলেন একলব্য। *বায়ু-পুরাণ* ও *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে* অবশ্য বলা হয়েছে যে, বসুদেব ও অশ্মকীর মিলনে একলব্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই একলব্যই নিষাদ সমাজে প্রতিপালিত হন।[১৬৭]

কৌরবদের গৃহে বাস করে দ্রোণাচার্য কুরুবালক ও পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। অস্ত্রশিক্ষার সময় অর্জুনের নিপুণতা ও একাগ্রতা লক্ষ্য করে দ্রোণাচার্য তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন যে, অর্জুনের মতো দ্বিতীয় ধনুর্ধর কেউ এই বিশ্বে হবে না।

দ্রোণাচার্যের অস্ত্র প্রশিক্ষণের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই হস্তিনাপুরের প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে রাজকুমাররা এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করছিলেন। এই সময়ে নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্যও দ্রোণের কাছে গিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন। কিন্তু একলব্য নিষাদপুত্র হওয়ায় দ্রোণাচার্য তাকে শিষ্য হিসেবে মেনে নিতে চাইলেন না। দ্রোণের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে নিষাদপুত্র একলব্য মাথা নত করে দ্রোণাচার্যকে প্রণাম করে চলে যান। গুরু দ্রোণাচার্যের দ্বারা একলব্যকে শিষ্যরূপে গ্রহণ না করার কারণ বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> ন স তং প্রতিজগ্রাহ নৈষাদিরিতি চিন্তয়ন্।
> শিষ্যং ধনুষি ধর্ম্মজ্ঞস্তেষামেবান্ববেক্ষয়া।।[১৬৮]

কিন্তু একলব্য দ্রোণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলেও তিনি পরাজয় স্বীকার করলেন না, অস্ত্রশিক্ষা থেকেও বিরত হলেন না। একলব্য মাটি দিয়ে দ্রোণাচার্যের একটি মূর্তি তৈরি করলেন। গুরু দ্রোণের সেই মৃন্ময় মূর্তিটিকেই তাঁর অস্ত্রশিক্ষার আচার্য হিসেবে মনে মনে স্থির করলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অস্ত্রশিক্ষার সমস্ত কৌশল একলব্য শিখতে আরম্ভ করলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একলব্য সেই কৌশলগুলিতে সিদ্ধিলাভ করলেন।

এরপর একদিন পাণ্ডব-কৌরবরা দ্রোণাচার্যের অনুমতি নিয়ে মৃগয়া করতে গেলেন। একজন অনুচর, বিভিন্ন অস্ত্র, মৃগয়ার সমস্ত উপকরণ এবং একটি শিকারী কুকুর নিয়ে পাণ্ডবরা মৃগয়ায় গিয়েছিলেন। পাণ্ডবরা যখন মৃগের সন্ধান করছিলেন, তখন শিকারী কুকুরটি এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একলব্যের সম্মুখে উপস্থিত হয়। একলব্য তখন বাণাভ্যাস করছিলেন। কৃষ্ণবর্ণ-মৃগচর্ম পরিহিত, জটাধারী ও বাণাভ্যাসে রত একলব্যকে দেখেই শিকারী কুকুরটি ডেকে ওঠলে, সঙ্গে সঙ্গে একলব্য অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় সাতটি বাণ ছুঁড়ে শিকারী কুকুরটির মুখ বন্ধ করে দেন। শিকারী কুকুরটি শররুদ্ধ মুখ নিয়ে পাণ্ডবদের কাছে উপস্থিত হলে, তাঁরা অজানা ধনুর্ধরের অস্ত্রশাতনের

কৌশল বুঝে বিস্মিত হন। পাণ্ডবেরা কুকুরটির মুখটিকে নিপুণভাবে শররুদ্ধ দেখে যতখানি লজ্জিত হলেন, ততখানি প্রশংসা করলেন সেই অজানা ধনুর্ধরের।

তারপর পাণ্ডবরা বনের ভিতরে সেই ধনুর্ধরকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। বনের মধ্যে অজানা ধনুর্ধরের অন্বেষণ করতে করতে হঠাৎ এক কৌপীন পরিহিত, জটাধারী এক যুবককে নিরন্তর ধনুক থেকে তীর ছুড়তে দেখলেন। তারা তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। পাণ্ডবদের প্রশ্নের উত্তরে অজানা ধনুর্ধর তাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে,

> নিষাদাধিপতেবীরাঃ! হিরণ্যধনুষঃ সুতম্।
> দ্রোণশিষ্যঞ্চ মাং বিত্ত ধনুর্ব্বেদকৃতশ্রমম্।।[১৬৯]

অর্থাৎ সেই অজানা ধনুর্ধর হলেন, নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র এবং দ্রোণাচার্যের ভাবশিষ্য একলব্য। একলব্যের প্রকৃত পরিচয় জেনে পাণ্ডবেরা মৃগয়া থেকে হস্তিনাপুরে ফিরে এসে সেই শিকারী কুকুরের মুখে শরভেদের কথা দ্রোণের নিকট বর্ণনা করলেন। একলব্যের শিক্ষা অর্জুনকে অতি বেদনাদায়ক করেছে দেখে অর্জুন পুনরায় গুরুকে আক্ষেপ জানায়। দ্রোণ বিস্মিত হয়ে একলব্যের কাছে উপস্থিত হন।

গুরু দ্রোণাচার্যের প্রতি গুরুদক্ষিণাস্বরূপ একলব্যকর্তৃক অঙ্গুলিছেদন : শিষ্য অর্জুনের মুখে একলব্যের বীরত্বের কথা শুনে দ্রোণাচার্য মুহূর্তের মধ্যে তাঁর কর্তব্য স্থির করে নেন। অর্জুনকে সঙ্গে নিয়েই গুরু দ্রোণাচার্য একলব্যের সম্মুখে উপস্থিত হন। দ্রোণ দেখলেন যে, এক ধূলিধূসর দেহ, জটাধারী এবং কৌপীনপরিধারী এক যুবক অনবরত বাণাভ্যাস করছেন। গুরু দ্রোণকে দেখেই একলব্য প্রণাম করলেন। যেহেতু একলব্য গুরু দ্রোণকে শিক্ষাগুরু হিসাবে মানেন, সেই সুযোগেই ধূর্ত দ্রোণ গুরুদক্ষিণা হিসেবে চেয়ে নেন একলব্যের দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলি। একলব্য অক্লেশে তা ছেদন করে গুরুকে দান করেন। এইভাবে দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেদ করে গুরু দ্রোণকে দক্ষিণা দেন। একলব্যের এই দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেদনের ফলে তিনি পূর্বের মতো বাণ নিক্ষেপে অসমর্থ হয়েছিলেন। একলব্যের অসমর্থ দেখে অর্জুনও সন্তুষ্ট হন। একলব্যের শরক্ষেপণের শ্রেষ্ঠতা নষ্ট করে, ধনুর্বিদ অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করায় ছিল গুরু দ্রোণের প্রধান উদ্দেশ্য। একলব্যের দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেদ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

একলব্যস্ত তচ্ শ্রুত্বা বচো দ্রোণস্য দারুণম্।
প্রতিজ্ঞামাত্মনো রক্ষন্ সত্যে চ নিয়তঃ সদা।।
তথৈব হৃষ্টবদনস্তথৈবাদীনমানসঃ।
ছিত্ত্বাঽবিচার্য্য তং প্রাদাদ্ দ্রোণায়াঙ্গুষ্ঠমাত্মনঃ।।[১৭০]

পুনরায় একলব্যের দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেদ প্রসঙ্গে M.N. Dutt সম্পাদিত *Mahābhārata* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে— "Drona said, give me as Dakshina your right thumb. Ekalavya ever devoted to truth and desirous of keeping his promise, hearing the fearful words of Drona, at once cut of his right thumb with a cheerful face and unruffled heart and gave it to Drona. Thereupon, O king, when the help of his other fingers, he found he had lost his former lightness of hand".[১৭১]

২.২.৯. শকুনি : *বৈয়াসিক মহাভারতের* আদিপর্বের প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল গান্ধাররাজ শকুনি। শকুনির পিতা সুবল ছিলেন গান্ধার প্রদেশের রাজা। দেবতার কোপে সুবলের এই পুত্র ধর্মনাশের কারণ হয়েছিলেন। অর্থাৎ পিতা সুবলের কোন এক পাপের কারণে দেবতাদের অভিশাপে তাঁর বংশে শকুনির জন্ম হয়। গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শকুনির উৎপত্তি দ্বাপরের অংশে। শকুনির উৎপত্তি প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

শকুনির্নাম যস্ত্বাসীদ্রাজা লোকে মহারথঃ।
দ্বাপরং বিদ্ধি তং রাজন্! সম্ভূতমরিমরর্দ্দনম্।।[১৭২]

পুনরায় শকুনির উৎপত্তি প্রসঙ্গে M.N. Dutt সম্পাদিত *Mahābhārata* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে— "O king, that king and great car-warrior, that chastiser of foe, who was known as Shakuni in the world, known him to be the Dvapara himself".[১৭৩]

ভগিনী গান্ধারীর মতো শকুনিও অর্থশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর গবাক্ষ, শরভ, বিভু, সুভগ, ভানুদত্ত, বৃষক ও অচল নামে আরও সাত ভ্রাতা ছিলেন। ভাইদের মধ্যে শকুনি সবার থেকে জ্যেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান ছিলেন।

শকুনির বিকলাঙ্গতার কারণ : শকুনি তাঁর একমাত্র বোন গান্ধারীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি গান্ধারীকে উচ্চবংশে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোন একদিন শকুনি

তাঁর রাজ্য গান্ধার থেকে বর্হিদেশে গমন করেন। বর্হিদেশে শকুনি যাওয়ার পরে হস্তিনাপুরের রাজসভা থেকে ভীষ্ম গান্ধাররাজ সুবলের নিকট দূত পাঠালেন গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ জেনেও, রাজা সুবল নিজ বুদ্ধিতে হস্তিনাপুরের বংশ, যশ ও ব্যবসার বিষয় পর্যালোচনা করে ধর্মপরায়ণ গান্ধারীকে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণ করার অঙ্গীকার করেন। তারপর গান্ধারী জানতে পারলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও গান্ধাররাজ সুবল তাঁর সঙ্গে বিবাহ ঠিক করেছেন। পিতা সুবলের মনোনীত পাত্র ধৃতরাষ্ট্রকেই গান্ধারী পতি হিসেবে মেনে নিয়েছেন। তাই গান্ধারী পতি ধৃতরাষ্ট্রকে অতিক্রম না করার জন্য একটি পট্টবস্ত্র ভাঁজ করে নিজের নয়নযুগলে সারাজীবন পরে থাকার সংকল্প গ্রহণ করলেন।

বর্হিদেশ থেকে ফিরে এসে শকুনি বোন গান্ধারীর সঙ্গে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ সংবাদ শুনে এবং বোনের ভাগ্যের দুর্দশার কথা অনুমান করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। অত্যন্ত ক্রোধে শকুনি তৎক্ষণাৎ নিজের ছুঁরি দিয়ে নিজের পায়ের ঊরুতে আঘাত করেন। যার ফলে সমস্ত জীবন তিনি বিকলাঙ্গ হয়ে কাটান। শকুনির পায়ের বিকলতা প্রসঙ্গে Samyak Lalit সম্পাদিত *Person with Disability in Hindu Mythology* গ্রন্থে বলা হয়েছে– “He (Śakuni) was the brother-in-law of Dhritarashtra who loved his sister Gandhari very dearly. He was so infuriated by the fact that his beautiful sister Gandhari was married off to a blind prince that he dedicated his entire life to plotting against the entire family of his brother-in-law. This common, who in a plotted the entire battle of Mahabharata to take his revenge, if often shown to have a minor locomotor disability. Thus, he walking with a limp”.[১৭৪]

শকুনির রাজনৈতিক কুশলতা : গান্ধারীর বিবাহের পর শকুনি দুর্যোধনের পরামর্শদাতা ও ধৃতরাষ্ট্রের পরিবার ভুক্ত হয়ে বাস করতে থাকেন। শকুনি সর্বদাই দুর্যোধনকে অন্যায় কর্মে প্ররোচিত করতেন। কালকূট বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে কুমারবস্থায় মূর্চ্ছিত ভীমকে লতাপাশে বেঁধে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে হত্যা করার চেষ্টার মতো নানা অপকর্মে শকুনি লিপ্ত ছিলেন। জতুগৃহে পাণ্ডবগণকে পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্রেও শকুনি যোগ দিয়েছেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে দুর্যোধনের সঙ্গে শকুনি কিছুকাল ইন্দ্রপস্থে থেকে যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধি দেখে দুঃখিত হয়েছিলেন। শকুনি এইসময় দুর্যোধনকে সুপরামর্শ দিয়েছেন যে,

যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধনের ঈর্ষা করা অনুচিত। কারণ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আপন ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু এইরকম সুপরামর্শের কথা পরবর্তী সময়ে আর কখনো শোনা যায়নি।

ইন্দ্রপ্রস্থের সমৃদ্ধি দেখার পর শকুনির প্ররোচনায় দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে কপট দ্যুতক্রীড়ায় আহ্বান করেন। শকুনি অতি অভিজ্ঞ দ্যুতক্রীড়ক ছিলেন। কপট ক্রীড়াতেও তার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। এই কপট দ্যুতক্রীড়ার দ্বারাই তিনি পাণ্ডবদের সর্বস্ব জয় করেছিলেন এবং পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর বনবাসের কারণ হন। প্রধানতঃ তাঁরই প্ররোচনায় দ্যুতক্রীড়ার সভাঘরে পাণ্ডব পত্নী দ্রৌপদীর অবমাননা হয়। পাণ্ডবদের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের পর কৃষ্ণ শান্তিস্থাপনের জন্য হস্তিনাপুরে এলে, কৃষ্ণকে বন্দী করার জন্য যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তাতেও শকুনি ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধন শকুনিকে অক্ষৌহিণী সেনার অধ্যক্ষপদে বরণ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শকুনি কৌরবপক্ষে থেকে যথাসাধ্য যুদ্ধ করেন। শকুনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করতে চেষ্টা করলেও অর্জুনের হস্তে পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নে বাধ্য হন। কিন্তু দুর্যোধনাদির আশ্বাস বাক্য দ্বারা শকুনি পুনরায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রবেশ করেন। যুদ্ধের শেষ দিনে ভীম ও সহদেবের সঙ্গে শকুনি ও তাঁর একমাত্র পুত্র উলূকের ঘোর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে শকুনির সামনেই সহদেবের ভল্লের দ্বারা শকুনির পুত্র উলূকের শিরচ্ছেদ হয়। পুত্রকে নিহত দেখে শকুনি সহদেবকে আক্রমণ করেন, কিন্তু কৌরবগণের দুর্নীতির মূল শকুনিকে সহদেব তাঁর ভল্লের দ্বারা শিরচ্ছেদ করেন।[১৭৫]

তথ্যসূত্র :

১. Rāmā., Vol.I, Ed. Ravi Prakash Arya, p. 24.

২. বন., ৯৩।১৮, মহা., সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৩. ...., *তদেব,* সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ৯৫৭।

৪. ব.শব্দ., প্রথম খণ্ড, সম্পা. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪৬২।

৫. বন., ৯৩।১৪-১৫, মহা., সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৬. ...., *তদেব,* সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ৯৫৮।

৭. আদি., ১০।৫-৬, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৮. ...., ৯।৬৪-৬৫, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৯. ...., ১০।১২, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১০. ...., ১১।২, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১১. ...., ১৪।৮, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১২. ...., ১৯।১০, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১৩. অযো.কা., ৬৫।৭, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১৪. ...., ৬৫।২৬, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১৫. ...., *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১৬. ...., *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১৭. ...., ৬৬।৫৪, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১৮. ...., ৬৬।৫৬-৫৭, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১৯. আদি., ৩৫।২, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

২০. ...., ১।৩৫, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর পৃ. ৪০৩।

২১. তত্রৈব।

২২. আদি., ৩৫।১০, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

২৩. ...., ৩৫।১৩-১৪, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

২৪. Rāmā., Vol. I, Ed. Ravi Prakash Arya, P-69.

২৫. আদি., ৩৫।১৩-১৪, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ৪০৬।

২৬. তত্রৈব।

২৭. Rāmā., Vol. I, Ed. Ravi Prakash Arya, P-70.

২৮. আদি., ১।৩৫, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ৪০৬।

২৯. ...., ৩৫।২৫-২৭, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৩০. তত্রৈব।

৩১. তত্রৈব।

৩২. আদি., ৩৫।৩০-৩১, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ৪০৯।

৩৩. তত্রৈব।

৩৪. আদি., ৩৫।৪৫, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৩৫. ...., ৩৫।৪৭-৪৮, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৩৬. Rāmā., Vol. II, Ed. Ravi Prakash Arya, p-71.

৩৭. আদি., ৩৫।৪৯, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ৪১৩।

৩৮. ...., ৩৫।৩৫, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ৪১০।

৩৯. তত্রৈব।

৪০. অযো.কা., ৬।১, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ৮২১।

৪১. তত্রৈব।

৪২. তত্রৈব।

৪৩. অযো.কা., ৬।৬-৭, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৪৪. ...., ৬।১২, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৪৫. ...., ৬।১৮-১৯, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৪৬. ...., ৬।১৯-২১, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ৮২৬।

৪৭. তত্রৈব।

৪৮. অযো.কা., ৬।৩২-৩৩, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৪৯. ...., ৭।৩, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ৮৩২।

৫০. তত্রৈব।

৫১. অযো.কা., ৭।৮, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৫২. ...., ৭।১২, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৫৩. তত্রৈব।

৫৪. অযো.কা., ৭।১৫-১৬, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ৮৩৫।

৫৫. ...., ৭।২৩, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৫৬. ...., ৭।২৫-২৬, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৫৭. ...., ৮।২৪-২৫, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৫৮. ...., ৮।৩৬, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৫৯. ...., ৮।৩৭-৩৮, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৬০. ...., ৮।৩৯, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৬১. তত্রৈব।

৬২. অযো.কা., ৮।৪০-৪১, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৬৩. Rāmā., Vol. II, Ed. Ravi Prakash Arya, p. 26.

৬৪. অযো.কা., ৮।৪২, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৬৫. ...., ৮।৪৫, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ৮৫২।

৬৬. শ্রীমদ্ভগ., সম্পা. নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, ১০।২৩, পৃ. ৭৮৪।

৬৭. উত্তর., ৩।৫-৭, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৬৮. ...., ৩।১৬-১৭, *তদেব*। সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৬৯. বন., ২২৮।১৫, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৭০. উত্তর., রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৭১. ...., ৩।২৫, *তদেব*। সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৭২. দেবী.পু., ৪।১।৩৫-৩৬

৭৩. পু.কো., দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ৩৪৩।

৭৪. স্ক.পু., রেবাখণ্ড-৪১।৫-৬

৭৫. *তদেব,* রেবাখণ্ড, ৪১।৭

৭৬. G.N.B., Ed. Alice Getty, p. 115.

৭৭. H.P., p. 135.

৭৮. বা.পু., ২।৯।৩৯

৭৯. *তদেব,* ২।৯।৩৬-৩৭

৮০. P.E., P.436.

৮১. উত্তর., রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ.৫৫২৪।

৮২. ...., ৯।২২, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৮৩. পু.কো., দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ৫৪২-৫৪৩।

৮৪. উত্তর., ৯।৩৩, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৮৫. ব.শব্দ., দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২০৪১।

৮৬. অ.কা., ২৩।১৫-১৬, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৮৭. ...., *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ২২৫০।

৮৮. ...., ২৩।৩৯, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৮৯. ...., *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ.২২৬৪।

৯০. ...., ২৪।২২, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৯১. Rāmā., Vol. II, Ed. Ravi Prakash Arya, p. 39.

৯২. আদি., ১।২৩৫, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৯৩. ...., ৯৫।৯, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ১১২৯।

৯৪. ...., ৫৮।৮৬, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ৬৮৬।

৯৫. তত্রৈব।

৯৬. আদি., ৫৮।১২৩-১২৪, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৯৭. ...., ৫৮।১২৬-১২৭, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৯৮. ...., ৫৮।১১৮, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৯৯. ...., ৫৮।১২১-১২২, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১০০. ...., ১০০।৯-১০, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১০১. তত্রৈব।

১০২. Mahā., Vol. I, Ed. Ishwar Chandra Sharma & O. N. Bimali, pp. 321-322.

১০৩. আদি., ৯৯।৪৫, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১০৪. পু.কো., তৃতীয় খণ্ড, সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ৪৬৫।

১০৫. আদি., ৬২।৮৪, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১০৬. শান্তি., ২০২।৮, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১০৭. ...., ১০৩।২১, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১০৮. *Mahā.,* Vol. I, Ed. Ishwar Chandra Sharma & O. N. Bimali, p. 327.

১০৯. আদি., ১।৯৮, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ১১৫৫।

১১০. ...., ৯৮।১৬, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১১১. ...., ৯৮।২১-২২, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১১২. তত্রৈব।

১১৩. Mahā., Vol. I, Ed. Ishwar Chandra Sharma & O. N. Bimali, p. 315.

১১৪. Ṛgveda Saṁ., Vol-I, Ed. H. H. Wilson, 1.158.6.

১১৫. পু.কো., তৃতীয় খণ্ড, সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ২১১।

১১৬. Ṛgveda Saṁ., Vol-I, Ed. H. H. Wilson, 1.147.3

১১৭. তত্রৈব।

১১৮. আদি., মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ১১৫৮।

১১৯. A.H.A.S.L., p.58.

১২০. আদি., ৯৮।৩৩-৩৪, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১২১. ...., ৯৮।৫০-৫১, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১২২. Mahā., Vol. I, Ed. Ishwar Chandra Sharma & O. N. Bimali, p. 317.

১২৩. শান্তি., ৩২৭।৫১-৫২, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১২৪. তত্রৈব।

১২৫. আদি., ১২।২৫, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১২৬. ...., ১২।১৭, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১২৭. তত্রৈব।

১২৮. Mahā., Vol. I, Ed. Ishwar Chandra Sharma & O. N. Bimali, p. 80.

১২৯. আদি., ৬১।৭৪, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৩০. ...., ২০।১৬-১৭, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৩১. পু.কো., প্রথম খণ্ড, সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ৪৩১।

১৩২. বন., ১০৮।১১-১২, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৩৩. তত্রৈব।

১৩৪. Mahā., Vol. II, Ed. Ishwar Chandra Sharma & O. N. Bimali, p. 371-372.

১৩৫. বন., ১০৮।১৫, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৩৬. মহা.চ.প., সম্পা. অমল কুমার ঘোষ, পৃ.৪৬।

১৩৭. পু.কো., প্রথম খণ্ড, সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ৪৩২।

১৩৮. বন., ১১০।৩২, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৩৯. ...., ১১০।৩৯-৪০, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৪০. তত্রৈব।

১৪১. Mahā., Vol. II, Ed. Ishwar Chandra Sharma & O. N. Bimali, p. 381.

১৪২. বন., ২৪৮।৭-৮, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৪৩. Mahā., Vol. II, Ed. Ishwar Chandra Sharma & O. N. Bimali, p. 816.

১৪৪. বন., ২৪৮।১২, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৪৫. ...., ২৫০।১৯, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২৪২৭।

১৪৬. ...., ২৫১।১০, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২৪৩৩।

১৪৭. তত্রৈব।

১৪৮. বন., ২৫১।১৯, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২৪৩৫।

১৪৯. ...., ২৫২।৩৮-৩৯, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৫০. ...., ২৫২।১, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৫১. Mahā., Vol. II, Ed. Ishwar Chandra Sharma & O. N. Bimali, p. 832.

১৫২. মহা.চ.প., পৃ. ৭৪-৭৫।

১৫৩. আদি., ৩।৫৯, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৫৪. তত্রৈব।

১৫৫. Mahā., Vol. I, Ed. Ishwar Chandra Sharma & O. N. Bimali, p. 50.

১৫৬. পু.কো., প্রথম খণ্ড, সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ৭২২।

১৫৭. আদি., ৩।৭৮, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৫৮. Mahā., Vol. I, Ed. Ishwar Chandra Sharma & O. N. Bimali, p. 53.

১৫৯. আদি., ৩।১০৮, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২২৬।

১৬০. পু.কো., তৃতীয় খণ্ড, সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ৯২৩।

১৬১. আদি., ১।৩, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২৩০।

১৬২. তত্রৈব।

১৬৩. Mahā., Vol. I, Ed. Ishwar Chandra Sharma & O. N. Bimali, p. 56.

১৬৪. আদি., ১।৩, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২৩০।

১৬৫. ...., ১।৩, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২৩১।

১৬৬. তত্রৈব।

১৬৭. পু.কো., প্রথম খণ্ড, সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ৮০১।

১৬৮. আদি., ১২৮।৪১, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৬৯. ...., ১২৮।৫৪, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৭০. ...., ১২৮।৬৬-৬৭, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ১৪২১।

১৭১. Mahā., Vol. I, Ed. Ishwar Chandra Sharma & O. N. Bimali, p. 391.

১৭২. আদি., ৬২।৭৯, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৭৩. Mahā., Vol. I, Ed. Ishwar Chandra Sharma & O. N. Bimali, p. 199.

১৭৪. P.D.H.M., p.109.

১৭৫. মহা.চ.প., সম্পা. অমল কুমার ঘোষ, পৃ. ৪৬৫-৪৬৬।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়:

বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান

বাল্মীকীয় রামায়ণ ও *বৈয়াসিক মহাভারতের* বর্তমানে প্রাপ্ত রূপাবয়বটি কোন একক ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি নয়। মানুষের মনে লোকত্তর বীর পুরুষ এবং দেবতাদের কাহিনী শোনার শাশ্বত প্রবৃত্তিকে অবলম্বন করে যে সব কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে, তারই মধ্যে *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারত* হল সুসম্পূর্ণ সংকলন। ভারতবাসীদের কাছে এই মহাকাব্যদ্বয় একাধারে ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্যরূপে সর্বদা সমাদৃত হয়েছে। সংকলন, পরিমার্জন, সংযোজন ইত্যাদি ব্যাপারে উক্ত দুই মহাকাব্য স্রষ্টারূপে পরিচিত ও সর্বদা খ্যাতিলাভ করেছে। ভারতীয় ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতের* প্রভাব অপরিসীম। এই দুই মহাকাব্যে চিত্রিত সুমহান চরিত্রগুলির পাশাপাশি ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিও নানা দ্বন্দ্বের মধ্যেও স্বকীয় গৌরবে গরিমাময় এবং এইসকল চরিত্রসমূহ দেশবাসীর চরিত্রগঠনের পক্ষে পরম সহায়ক হয়েছে। নিত্যনৈমিত্তিক বিধিনিষেধ, গুর-শিষ্য, মাতা-পিতা, পতি-পত্নী প্রভৃতি সকলের আচার-ব্যবহার সব কিছুই এই দুই গ্রন্থের অনুশাসনে অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছে। প্রাচীন মহাকাব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, অঙ্গ বিকলতা স্বাভাবিক-জীবনযাপনের কিছু অনিবার্য কষ্ট তৈরি করলেও সমাজে এই শ্রেণির মানুষ তাঁর সামাজিক মর্যদার সঙ্গেই বাঁচতেন, সংসারধর্ম প্রতিপালন করতেন। সম্পত্তি বা রাজ্যপালনেও সর্বদা বাধা হত না। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলে রাজত্ব পাননি। কিন্তু দ্যুমৎসেনের রাজা হওয়ার পরে অন্ধত্ব এসেছে। একই ঘটনা ঘটেছে রাজা পৌষ্যের ক্ষেত্রেও। প্রাচীনতম উদাহরণ বলেই হয়তো কুবের ও শকুনির ক্ষেত্রে রাজত্ব ও অধিকারে বাধা ছিল না। সুতরাং সম্মানের দিক থেকে এশিয়া বা ইউরোপ কোনও ভূখণ্ডেই অতি প্রাচীন যুগে তাঁরা অবমানিত হন নি।

৩.১. পরিবারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিরূপণ : সমাজের মৌলিক ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। এই পরিবার মানব সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই সমাজে বিদ্যমান। তাই পরিবারের সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে। পরিবারের মধ্যেই মানুষের নানারকম সামাজিক

ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয় এবং সকলের মধ্যে এক আত্মিক যোগসূত্র গড়ে ওঠে। তাই পরিবার একটি সার্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থায় পরিবার ছিল একটি গুরত্বপূর্ণ ঐকিক সংগঠন। পরিবারের সাহায্যেই সদস্যগণের আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি ও বর্ণসমূহের অনবছিন্নতা বজায় ছিল। তাছাড়া শিশুদের লালন-পালন, বালক-বালিকার শিক্ষাপ্রণালী, মানবজাতীর ঐতিহ্যরক্ষা ও মনুষ্যত্ববোধের বিকাশ প্রভৃতি গুণাবলী এক একটি পরিবারের সাথে যুক্ত সর্বদায় থাকে। পরিবারের অন্তর্গত পিতা-মাতার আশ্রয়ে ও স্নেহ ভালবাসায় শিশুমনের প্রথম উন্মেষ ও তারপর সমৃদ্ধি হয়। পরিবারের অন্তর্ভুক্ত থেকে শিশু থেকে বালক, বালক থেকে যুবক ইত্যাদি স্তরগুলি অতিক্রম করার সময় তারা উত্তম ব্যবহার, উপযুক্ত আচার-আচরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস, দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য প্রভৃতি ব্যাপারগুলি পরিবারের লোকজনের কাছ থেকেই অধিগত করে। পরিবারের মধ্যে থেকে মানুষ তার প্রথম খাদ্যাভ্যাস, পবিত্রতা-আচরণ, সত্যবাদিত্ব, শোভন পোষাক পরিচ্ছেদের প্রতি স্পৃহা, পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রতি নিজ নিজ কর্তব্য, নৈতিক স্বভাবের বিচার প্রভৃতি আয়ত্ত করে এবং তার ফলে সমাজের উন্নতিসাধনে সহায়ক হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। সৎ-পরিবারের অন্তর্গত মানুষজন সমাজকে সমৃদ্ধ করতে সমর্থ হয় এবং সমাজস্থ লোকদের মধ্যে কর্মোদ্যোগ, স্বার্থহীনতা, পরস্পর ভালবাসা, একে অন্যের সাথে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা সঞ্চারিত করে সমগ্র দেশবাসীর মনোবল দৃঢ় করে। পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী যখন একই পরিবেশে বাস করার সময় একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংস্কৃতির বাতাবরণ সৃষ্টি করে, তখনই সুস্থ পরিবারের জন্ম হয়। একটি সুস্থ পরিবারে স্বামী ও স্ত্রী মুখ্যতম দায়িত্ব পালন করেন। *মনুসংহিতা* গ্রন্থে মনু বলেছেন যে, বিবাহের পর স্ত্রী সর্বদা স্বামীর সঙ্গেই থাকবেন এবং স্বামীরও সর্বপ্রধান কর্তব্য হল স্ত্রীকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করেন বলে স্বামীর অপর একটি নাম 'ভর্তা'। এই ভর্তা যেমন গুণের অধিকারী হবেন, পতিপরায়ণা স্ত্রীও সেইরকম গুণবতী হবেন।

সুতরাং সমাজ বলতে সাধারণতঃ পরিবারের সমষ্টিকে বোঝায়। কারণ মানুষ পরিবারভুক্ত হয়ে বসবাস করে। প্রত্যেক মানুষের নির্দিষ্ট পরিবারে জন্ম হয় এবং সেই মানুষ নির্দিষ্ট পরিবারেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন। সুতরাং সমাজের গঠন ও প্রকৃতি জানতে হলে পরিবারের গঠন ও প্রকৃতি বিশেষভাবে জানা দরকার। কেবলমাত্র বাঁচার তাগিদেই মানুষকে পরিবার গঠন করতে

হয়েছে। ভূমিষ্ঠ হবার পর বেশ দীর্ঘকাল যাবৎ মানবশিশু অসহায় অবস্থায় থাকে। প্রকৃতি প্রদত্ত সহজ প্রবৃত্তি বা এমন কোন ক্ষমতা নিয়ে সে জন্মায় না যার সাহায্যে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। দীর্ঘকাল যাবৎ মানব শিশুকে পরিচর্যা করতে হয় বলে তাকে কেন্দ্র করে পিতা-মাতা এবং অন্যান্য সন্তান-সন্ততির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সময়ের দিক থেকে প্রসারিত হয় এবং উত্তরোত্তর গভীরতা লাভ করে। এইভাবে পরিবার একটি স্বতন্ত্র আচার-ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠেছে। সমাজানুমোদিত পন্থায় বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যখন কোন পুরুষ ও নারী একত্রে বসবাস করে, তখনই পরিবার গঠিত হয়। সন্তান প্রজনন এবং জাত সন্তানদের লালন-পালন, এই দুটি ক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই পরিবারের উদ্ভব হয়। মানব জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে এই দুই ক্রিয়ার সুষ্ঠ সম্পাদনের উপর। সুতরাং পরিবার মানবজাতির উদ্বর্তনের জন্য অপরিহার্য।

মানুষের তিনটি মৌলিক প্রয়োজন চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে পরিবারের উদ্ভব। **প্রথমত,** সমাজানুমোদিত উপায়ে যৌন বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বিবাহের প্রবর্তন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'জীবপ্রকৃতি ও সমাজপ্রকৃতি এই দ্বৈরাজ্যের শাসনে মানুষ চালিত' এবং 'বিবাহ জিনিসটা সভ্যসমাজের অন্যান্য সকল ব্যাপারের মতোই প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের অভিপ্রায়ের সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা'। যৌন বাসনা মানুষের স্বভাব ধর্ম হলেও বিশৃঙ্খলভাবে বা বাছবিচারহীন যৌনসম্ভোগ সমাজ মেনে নিতে পারে না। তাহলে সমাজের শৃঙ্খলা বিপন্ন হবে। বিবাহিত দম্পতির মধ্যে যৌনসম্ভোগ সীমাবদ্ধ করে রাখার ফলে জীবপ্রকৃতির দাবী এবং সমাজের দাবীর মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। **দ্বিতীয়ত,** সন্তান প্রজনন এবং সন্তান প্রতিপালন মানুষের, বিশেষ করে স্ত্রীজাতির স্বভাব ধর্ম। কেবলমাত্র পরিবারের মাধ্যমে এইরূপ কামনা চরিতার্থ হতে পারে বলে মানুষ পরিবার গঠন করেছে। **তৃতীয়ত,** দীর্ঘকাল যাবৎ সন্তানের লালন-পালনের সঙ্গে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, সেবা-সুশ্রুষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। এইজন্য পরিবারের সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব এবং অধিকার সমাজ দ্বারা স্বীকৃত। বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ বিভিন্নভাবে পরিবারকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তার ফলে পরিবারের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে অনেকাংশে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই নিম্নে কয়েকজন বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানীদের মতানুসারে পরিবারের সংজ্ঞা দেওয়া হল—

প্রথমত, অধ্যাপক ম্যাকাইভার প্রদত্ত তার *Society : In Introductory Analysis* শীর্ষক গ্রন্থে পরিবার সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'The family is a group defined by a Sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children'.[১] এই সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পরিবারের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন: i. সমাজ নির্দিষ্ট বিবাহ পদ্ধতি অনুসরণ করে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী হিসেবে সম্বন্ধ স্থাপন। ii. পরিবারের মধ্যে বংশধারা নির্ণয়। iii. শিশুর প্রজনন এবং প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ব্যবস্থা। iv. পরিবারের আশ্রয় ও স্বাতন্ত্র সুনির্দিষ্ট করার জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা।

দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক জিলবার্ট তাঁর *Fundamental of Sociology*[২] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "পরিবার হল একটি একক। সদস্যরা একই আবাসে একত্রে বসবাস করে। এর মাধ্যমেই স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক একটি নিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে এবং এর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যে সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে পুরুষানুক্রম অনুসারে বৈবাহিক সম্পর্ক স্বীকৃত তা নির্ধারিত হয়"।

তৃতীয়ত, অধ্যাপক অগবার্ণ ও নিমকফ তাঁদের *A Handbook of Sociology*[৩] গ্রন্থে পরিবারের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক বলে মনে করা হয়। তাঁরা বলেছেন, "পরিবার হল মোটামুটি স্থায়ীভাবে একত্রে বসবাসকারী স্বামী-স্ত্রী বা নরনারী। এদের সন্তান থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। পরিবারের গুরত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যৌন সম্পর্কযুক্ত নারী পুরুষ ও তাদের সন্তান সন্ততি হল পরিবারের প্রধান অঙ্গ।

অতএব উপর্যুক্ত তিনটি সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, পরিবার হল একটি সার্বজননীন স্থায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে স্বামী-স্ত্রী যৌন সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং রক্ত সম্পর্ক সম্পর্কিত সন্তান-সন্তানাদি সৃষ্টি হতে পারে আবার নাও হতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে দেশ, কাল ও সমাজ নির্বিশেষে পরিবার হল একটি সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান। এবিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। সেই কারণে E. W. Burgess and H. J. Locke স্ববিরচিত *The Family* গ্রন্থে বলেছেন, "Family is a group of persons united by the ties of marriage, blood or adoption; constitution a single household interacting and intercommunicating with each

other in their respective social roles of husbands and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister creating a common culture”.[৪]

৩.১.১. *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক অবস্থান : সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে *রামায়ণের* সুদূরপ্রসারী পারিবারিক প্রভাব লক্ষিত হয়। *বাল্মীকীয় রামায়ণে* উপলব্ধ যেসকল বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ্য রয়েছে, সেইসকল ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক অবস্থান হল নিম্নরূপ—

ক. ঋষ্যশৃঙ্গ : *বাল্মীকীয় রামায়ণে* একজন অতিশয় বিখ্যাত ঋষি হলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। কশ্যপের পৌত্র ও বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মহাতেজস্বী বনবাসী মুনি। পিতা বিভাণ্ডকের সঙ্গে তিনি নির্জন অরণ্যে বসবাস করতেন। সেইহেতু এই মুনির মুখ্য এবং গৌণ দুই প্রকারেই ব্রহ্মচর্য পালন করতেন। ঋষ্যশৃঙ্গের ব্রহ্মচর্যবস্থাতেই অঙ্গরাজ্যের অধিপতি দশরথের সখা লোমপাদ একবার স্বজ্ঞানে এক ব্রাহ্মণের সহিত মিথ্যা আচরণ করেছিলেন। এজন্য সকল ব্রাহ্মণ তাঁকে পরিত্যাগ করেন। লোমপাদ রাজার এই স্বেচ্ছাচারিতার জন্য ইন্দ্রদেব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর রাজ্যে বর্ষণ থেকে বিরত হন এবং সেই রাজ্যের প্রজাগণ কষ্ট পেতে থাকেন। দীর্ঘদিন অঙ্গরাজ্যে অনাবৃষ্টির দরুণ জনৈক মুনির পরামর্শে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মুনিদের প্রসন্ন করে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে তাঁর রাজ্যে আনার চেষ্টা করেন। কারণ ঋষ্যশৃঙ্গের পাদস্পর্শেই তৎক্ষণাৎ তাঁর রাজ্যে মেঘবর্ষণ করবে এবং প্রজারা দুঃখ-কষ্ট থেকে নিবৃত্তি পাবেন। জনৈক মুনিদের পরামর্শে লোমপাদ রাজা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনার জন্য বিভাণ্ডকের আশ্রমে মন্ত্রিদেরকে পাঠালেন এবং বিভাণ্ডকের ভয়ে ভীত হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে সেই রাজ্যে আনতে ব্যর্থ হলে রাজা চিন্তিত হয়ে পড়েন। পরবর্তীসময়ে রাজা বুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক মন্ত্রীদেরকে তৃতীয় দিনে বলেন, মুনিরূপধারী গণিকাগণের দ্বারা নানা উপায়ে বিভাণ্ডক মুনির অবর্তমানে ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করে লোমপাদের রাজ্যে যেন আনা হয়। লোমপাদ রাজার পরামর্শে বিভাণ্ডক মুনির অনুপস্থিতিতে গণিকাগণ নানা উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলোভিত করে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে আসেন। অঙ্গরাজ্যে ঋষ্যশৃঙ্গ আসামাত্রই ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হয়ে বর্ষণ আরম্ভ করেন। অঙ্গরাজ লোমপাদের কামনা এভাবে পূরণ হওয়ার পর তিনি তাঁর পালিতা কন্যা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গের হাতে সম্প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে শান্তা হলেন ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা দশরথের ঔরসজাত কন্যা। কিন্তু অঙ্গরাজ লোমপাদ শান্তাকে লালন-পালন করেন। কারণ অঙ্গরাজ লোমপাদ

ছিলেন রাজা দশরথের পরম মিত্র। লোমপাদ রাজা সন্তানহীন হওয়ায় রাজা দশরথের প্রতি প্রার্থনা জানায় যে, পুত্রফল প্রাপ্তির নিমিত্ত লোমপাদ রাজার হস্তে শান্তা নামক উত্তম কন্যাকে রাজা দশরথ যেন প্রদান করেন। স্বভাবতই করুণ-স্বভাব রাজা দশরথ মিত্র লোমপাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করে, অঙ্গাধিপতি লোমপাদের হস্তেই শান্তাকে দান করেন। রাজা দশরথের কন্যা শান্তাকে লোমপাদরাজার হস্তে প্রদানের কারণবিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> অনপত্যায় মে কন্যাং সখে দাতুং ত্বমর্হসি।
> শান্তাং শান্তেন মনসা পুত্রার্থং বরবর্ণিনীম।।
> শ্রুত্বা দশরথো বাক্যং প্রকৃত্যা করুণাত্মকঃ।
> দাস্যতে তাং তদা কন্যাং শান্তামঙ্গাধিপায় সঃ।।[৫]

শান্তা নামক কন্যাকে গ্রহণ করে সন্তানহীন লোমপাদের সন্তাপ দূর করেন। পরবর্তী সময়ে পালিত কন্যা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির হস্তে প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির হস্তে অঙ্গরাজকন্যা শান্তার বিবাহ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> দদৌ চাস্মৈ তদা কন্যাং ভার্য্যাং কমললোচনাম্।
> শান্তাং শান্তেন মনসা দত্ত্বা হর্ষমবাপঃ সঃ।।
> এবং স ন্যবসত্তত্র তেন রাজ্ঞাভিপূজিতঃ।
> ঋষ্যশৃঙ্গো মহাতেজাঃ শান্তয়া সহ ভার্য্যয়া।।[৬]

শান্তার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ হওয়ার পর লোমপাদ কর্তৃক উভয়েই পূজিত হয়ে অঙ্গরাজ্যেই বাস করতে লাগলেন। তারপর বিভাণ্ডক মুনি নিজ আশ্রমে ফিরে এসে পুত্রকে দেখতে না পেয়ে ক্রোধে বিদীর্ণ প্রায় হয়ে লোমপাদ রাজার রাজ্য নষ্ট করার মানসে চম্পানগরীর দিকে রওনা হলেন। শ্রান্ত ও ক্ষুধিত বিভাণ্ডক এক ঘোষ পল্লীতে এলে ঘোষগণ তাঁকে বিধিপূর্বক পূজা করেন। তাঁদের মিষ্টবাক্য শুনে বিভাণ্ডকের ক্রোধ দূর হল। এরপর অঙ্গাধিপতির কাছে এলে তাঁর দ্বারা পূজিত হলেন এবং পুত্রবধূ শান্তাকে দেখে তুষ্ট হলেন। বিভাণ্ডক মুনি তুষ্ট হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তাকে পুত্রলাভের আশীর্বাদ প্রদান করেন। পিতার আশীর্বাদে ঋষ্যশৃঙ্গের ঔরসে শান্তার গর্ভে চতুরঙ্গ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির বংশতালিকা রেখাচিত্রের মাধ্যমে অঙ্কিত হল—

কশ্যপ

↓

বিভাণ্ডক মুনি + উর্বশী (অপ্সরাশ্রেষ্ঠা)

↓

ঋষ্যশৃঙ্গ + শান্তা (দশরথ কন্যা)

↓

চতুরঙ্গ (পুত্র)

খ. অন্ধকমুনি : *বাল্মীকীয় রামায়ণের* 'অযোধ্যা কাণ্ডে' বর্ণিত হয়েছে বৃদ্ধ অন্ধক মুনি এবং অন্ধ মুনি পত্নীর অরণ্যে কাটানো গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনী। অন্ধক মুনি নিজে বনবাসী ব্রাহ্মণ এবং তাঁর স্ত্রী শূদ্র ছিলেন। সরযূ নদীর তীরে এক আশ্রমে অন্ধক মুনি দম্পতি বসবাস করতেন। এই অন্ধ মুনি দম্পতির একমাত্র পুত্র ছিলেন সিন্ধু। সিন্ধুই বাল্যকাল থেকেই অন্ধ পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাজা দশরথের দ্বারা ভুলক্রমে বাণের দ্বারা মুনিপুত্র সিন্ধু নিহত হলে, সেই মুনি দম্পতির হৃদয়েও এই বাণ বিদ্ধ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> বৃদ্ধস্যান্ধস্য দীনস্য বনে বন্যেন জীবতঃ।
> মুনেঃ পুত্রবধাদেব হৃদি বাণো নিপাতিতঃ।।[৭]

গ. কুশনাভের শতকন্যা : *বাল্মীকীয় রামায়ণ* কৃষিবিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী, এইকারণে উদ্ভিদের আবির্ভাবের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি অবশ্যকর্তব্য হল প্রাকৃতিক পরিবেশ সহজাতভাবে যে শস্যপ্রদায়ী উদ্ভিদ সংশ্লিষ্ট। সেকারণে সৃষ্টির বিবর্তনের ক্রম অনুসারে বর্ণনা না দিয়ে ইক্ষ্বাকু বংশে উদ্ভিদজগতের প্রাথমিক পাঁচটি ধাপ সৃষ্টির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে মাত্র। কুশ বংশে মূলতঃ তৃণগোষ্ঠীর শস্যজাতীয় প্রজাতির পরিচয় রয়েছে। অবশ্য কুশ অর্থে জল এবং কুশ অর্থে যোক্তন, এই দুই স্বতন্ত্র অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়।

রাম ও লক্ষ্মণের সহায়তায় বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রমে সিদ্ধিলাভ করার পর তাঁদের নিয়ে জনক রাজার যজ্ঞে ধনু দেখতে যাওয়ার পথে একদিন তারা সকলে শোণা নদীর তীরে রাত্রিবাস করেন। সমৃদ্ধ

বনে শোভিত সেই দেশ সম্পর্কে রাম কৌতুহল প্রকাশ করলে বিশ্বামিত্র মুনি কুশ বংশের বিবরণ শোনান। *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ* অনুযায়ী রাজর্ষি জহ্নুর বংশধারায় কুশ নামক রাজার জন্ম হয়।[৮] এছাড়াও *ভাগবত পুরাণ* মতে, জহ্নুর বংশধারায় রাজর্ষি অজকের পুত্র কুশ।[৯]

কান্যকুব্জের রাজা তথা বিশ্বামিত্র মুনির প্রপিতামহ কুশ জনৈক বৈদর্ভী রমণীর গর্ভে যে চারটি পুত্র (কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্তরজস্, বসু) উৎপাদন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কুশনাভ একজন। কুশের নির্দেশে ক্ষাত্রধর্ম পালনের জন্য কুশনাভ কন্যকুব্জ নামক একটি নগরী নির্মাণ করেন। প্রসঙ্গতঃ কন্যকুব্জ নগর প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> কুশনাভস্তু ধর্ম্মাত্মা পুরং চক্রে মহোদয়ম্।।[১০]

কুশনাভের ঔরসে ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে একশত কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নে রেখাচিত্রের মাধ্যমে রাজা কুশনাভের বংশতালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হল—

কুশ

↓

কুশনাভ প্রভৃতি চারপুত্র

↓

কুশনাভ + ঘৃতাচী (অপ্সরা)

↓

কুশনাভের শতকন্যা

কুশনাভের এই একশত কন্যাকে বায়ু বিবাহ করতে চাইলে কন্যারা বায়ুকে অপমান করেন। তখন ক্রোধবশতঃ পবনদেব শতকন্যাদের শরীরে প্রবেশ করে তাঁদের শরীর ভগ্ন করে দেন। শতকন্যারা পিতা কুশনাভের কাছে গিয়ে পবনদেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। শতকন্যারা তাদের কুলের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখায় কুশনাভ কন্যাদের ভূয়সী প্রশংসা করে, কন্যাগণকে সৎপাত্রে দানের নিমিত্ত মন্ত্রীগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করেন।

সেই সময় ঊর্দ্ধরেতা, শুদ্ধাচারী, দ্যুতিশালী মহর্ষি চুলী ব্রহ্মবিষয়ক চিত্তৈকাগ্রতারূপ তপস্যা করছিলেন এবং সোমদা নামে ঊর্মিলানন্দিনী গন্ধর্বী তাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিল। কালক্রমে সোমদার সেবায় তুষ্ট হয়ে চুলী বর দিতে চাইলে সোমদা তার উদ্দেশ্যে বলেন যে, তার পতি নাই বা সে কারও স্ত্রী নয়। তথাপি সে চুলীর কাছে ব্রহ্মনিয়মে মহর্ষি সদৃশ একটি পুত্র কামনা করেন। চুলী সোমদার প্রার্থনানুযায়ী ব্রহ্মদত্ত নামে এক তপঃসমন্বিত পুত্র দান করেন। ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্য নামক নগরে বসবাস করছিলেন। কুশনাভ তার শতকন্যা ব্রহ্মদত্তের উপর সমর্পন করেন। ব্রহ্মদত্ত সেই কুশনাভের কন্যাগণের পাণিস্পর্শ করা মাত্র তারা সকলে বিকুব্জা, বিগতজ্বরা ও পরমশোভাসম্পন্ন হয়।

পুনরায় কুশনাভ পুত্র লাভার্থে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে পিতা কুশের বরে গাধি নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। এই গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র, কুশ বংশে জন্ম বলে ‘কৌশিক’ নামে খ্যাত হয়েছেন। এছাড়াও বিশ্বামিত্রের সত্যবতী নামে এক ভগিনীও জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঋচীক নামে মুনির হস্তে সত্যবতীকে সমর্পণ করেন। পতিপরায়ণ সত্যবতী ঋচিক মুনির সহিত দেবলোকে গমন করে ‘কৌশিকী’ নামে মহানদীরূপে খ্যাত হন। বিশ্বামিত্র এই ভগিনীর নিকট বসবাস করেন, কেবলমাত্র নিয়মবশতঃ সিদ্ধাশ্রমে এসে রামের প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করেন। বিশ্বামিত্র মুনির জন্ম প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> স পিতা মম ধর্ম্মাত্মা গাধিঃ সত্যপরাক্রমঃ।
> কুশবংশেঽভবদ্রাজা গাধিজোহহং রঘূত্তম।।
> অনুজা ভগিনী চাপি মম জজ্ঞে শুভব্রতা।
> নাম্না সত্যবতী নাম ঋচীকে প্রতিপাদিতা।।[১১]

ঘ. মন্থরা : মন্থরা পূর্বজন্মে দুন্দুভী নামে একজন গন্ধর্বী ছিলেন। ব্রহ্মার উপদেশে দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য দুন্দুভী নামে গন্ধর্বী মন্থরা নামে কুব্জারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

কৈকেয় রাজ্যকে বর্তমানে ককেশাস বা কাশ্মীর বা আফগানিস্থান ও পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী স্থান বলা হয়। কথিত আছে যে, রাজা অশ্বপতির এক ভাই হলেন বৃহদশ্রভ। এই বৃহদশ্রভের কন্যা ছিলেন রাজকুমারী রেখা। রেখাকে বিশালাক্ষী অর্থাৎ বড় চোখের নারী এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমতী রাজকুমারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজকুমারী রেখা সবসময় তার রূপ ধরে রাখার জন্য অনুপযুক্ত কিছু

খেয়েছিলেন, যার কারণে তার শরীর বিকল হয়ে কুশ্রী হয়ে যায়। কুৎসিত হওয়ার একটি কারণ বলা হয় যে, অনুপযুক্ত শরবত সেবনের কারণে তিনি ত্রিদোষের শিকার হয়েছিলেন। ফলে তাঁর শরীর তিনটি স্থান থেকে তির্যক ছিল। সেই সময় থেকে উক্ত রোগের কারণে রাজকুমারী রেখাকে মন্থরা নামে অভিহিত করা হয়। রাজকুমারী রেখার এইরূপ কুশ্রী শরীর হওয়ার কারণে, তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন এবং তিনি পূর্বের রূপ ফিরে পেতে স্থান পরিবর্তন করেন। ফলে তার আচরণ প্রায়শই খারাপ হয়ে যায়।

প্রকৃতঅর্থে রাজকুমারী রেখার সঙ্গে কেকয়রাজ কন্যা কৈকিয়ীর সহোদরা হলেও, তারা দুজনে ভালো বন্ধু ছিলেন। তাদের দুইজনের বন্ধুত্ব এতটাই গাঢ় ছিল যে, রাজকুমারী রেখা কুৎসিত হওয়ার পরেও কৈকেয়ী বিবাহের সময় অন্যান্য যৌতুকের সঙ্গে রেখাকে অযোধ্যায় নিয়ে গিয়েছিলেন। অযোধ্যায় রেখাকে কদর্যতার কারণে তাকে উপহাস করা হয়েছিল এবং তাকে কৈকেয়ীর দাসী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। ক্রোধে মন্থরা রামের অযোধ্যায় নির্বাসনের জন্য কৈকেয়ীকে প্ররোচনা দেন। মন্থরা নামক দাসীর পিঠে একটি স্থূল মাংসপিণ্ড বা কুঁজ থাকায় তাকে কুব্জা নামেও সম্বোধন করা হয়। প্রসঙ্গতঃ মন্থরার বাল্যকাল প্রসঙ্গে Rishabh Pandey সম্পাদিত *Anylysing different versions of Ramāyaṇa* গ্রন্থে বলা হয়েছে– "According to a story, King of the country 'Kekaya' named Ashwapati has one brother named as Brihadshva. She had a daughter with huge nuns named Rekha, she was a good friend of Kaikeyi since childhood. She was Rajakanya and had intelligence, but she had a disease in childhood. In this disease, his whole body was filled with sweat due to which he felt very thirsty. One day very distraught with thirst, he drank a syrup made from cardamom, sugar, and sandalwood. After drinking that syrup, all the parts of his body stopped working. Immediately his father got his beloved daughter treated by renowned doctors. He survived medical treatment but his spinal cord was crooked forever".[১২]

মন্থরার বংশতালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হল–

বৃহদশ্রভ ⟶ রেখা (কন্যা) = মন্থরা

ঙ. বৈশ্রবণ বা কুবের : কুবের হলেন রাক্ষস এবং যক্ষদের অধিপতি। সনাতন ধর্মাবলম্বিরা তাঁকে ধনসম্পদের দেবতারূপে মানেন। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> ধনানাং রাক্ষসানাঞ্চ কুবেরমপি চেশ্বরম্।[১৩]

কুবের ছিলেন যক্ষদের রক্ষক এবং লোকপাল ও দিকপালদের মধ্যে একজন। *বাল্মীকীয় রামায়ণে* উল্লিখিত হয়েছে যে, কুবের উত্তর দিকের রক্ষক বা দিকপাল ছিলেন—

> ধনেশস্তূত্তরাং দিশম্।[১৪]

বাল্মিকীয় রামায়ণ অনুসারে মহর্ষি পুলস্ত্যের পুত্র হলেন বিশ্রবা মুনি। ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং প্রজাপতি ঋষিদের মধ্যে পুলস্ত্য অন্যতম। সৃষ্টির আদিতে জাত প্রজাপতি ঋষিদের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে মহাকাব্য ও পুরাণে নানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। *বৈয়াসিক মহাভারতে* ব্রহ্মার ছয়জন (মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ এবং ক্রতু) মানসপুত্রের মধ্যে পুলস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার মন থেকে জন্মগ্রহণ করেন। সেই কারণেই তাঁরা সকলেই ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে খ্যাত হয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ ব্রহ্মার মানসপুত্রের সংখ্যা বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে—

> ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রা বিদিতাঃ ষণ্মহর্ষয়ঃ।
> মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।।[১৫]

বৈয়াসিক মহাভারতের শান্তিপর্বে প্রাপ্ত দুই-একটি শ্লোকে দেখা যায় যে, ব্রহ্মার মানসপুত্র ছয়ের পরিবর্তে সাত রয়েছে। এই তালিকায় বশিষ্ঠের নামও ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে সংযুক্ত হয়েছে। আদিতে সৃষ্ট ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি বা প্রজাস্রষ্টা ঋষিরা সংখ্যায় ছয়জন না সাতজন এবিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* ভিন্ন ভিন্ন মতের উল্লেখ থাকলেও, বিবিধ পুরাণগ্রন্থ ও লোকমুখে সপ্তর্ষির ভাবনাই বহুলভাবে প্রচলিত রয়েছে।

বিবিধ পুরাণেও পুলস্ত্যের নাম উল্লিখিত হয়েছে লোকপিতামহ ব্রহ্মার মানসপুত্র হিসেবেই। *বায়ু-পুরাণে* বর্ণিত উপাখ্যান থেকে জানা যায় যে, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের সূচনাকালে ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগু, অঙ্গিরা প্রমুখের সঙ্গেই পুলস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন। সৃষ্টির আদিতে পঞ্চবায়ুর একতর উদান থেকে

পুলস্ত্যের উৎপত্তি হয়েছিল বলে পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পুলস্ত্য দক্ষপ্রজাপতির কন্যা প্রীতিকে বিবাহ করেন। কিন্তু দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের ঘটনা ঘটলে ভগবান শিব দক্ষের যজ্ঞে পৌরোহিত্য করার অপরাধে পুলস্ত্য প্রভৃতি সপ্তর্ষিকে ক্রোধানলে ভস্মীভূত করেন। এরপর পুলস্ত্য প্রভৃতি সপ্তর্ষির পুনর্জন্ম হয় চাক্ষুষ মন্বন্তরের শেষে, বৈবস্বত মন্বন্তরের সূচনায়। এই সময় লোকপিতামহ ব্রহ্মা, বরুণ দেবতার এক যজ্ঞে পৌরোহিত্য করছিলেন। সে সময় যজ্ঞসভায় উপস্থিত দেবকন্যাদের দেখে ব্রহ্মার চিত্ত চঞ্চল হয়, তেজ স্খলিত হয়। ব্রহ্মা তখন প্রজাসৃষ্টির ভাবনায় নিজের সেই তেজবিন্দু যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেন। তার ফলে যজ্ঞকুণ্ড থেকে প্রথমে উঠে আসেন ভৃগু, তারপর একে একে অঙ্গিরা, অত্রি, মরীচি, ক্রতু যজ্ঞকুণ্ড থেকে উঠে আসেন। এরপর *বায়ু-পুরাণে* উল্লিখিত যিনি যজ্ঞকুণ্ড থেকে উঠে আসেন তাঁর মাথার চুলগুলি ধারালো এবং তরবারির মতো তীক্ষ্ণ রয়েছে। সেই তীক্ষ্ণধার বিশিষ্ট কেশরাশির কারণেই তাঁর নাম হয়েছে পুলস্ত্য। এবিষয়ে *বায়ু-পুরাণে* উল্লিখিত হয়েছে—

> কেশৈশ্চ নিশিতৈর্ভূতঃ পুলস্ত্যস্তেন স স্মৃতাঃ।।[১৬]

মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত বরুণের যজ্ঞে সপ্তর্ষিদের পুনর্জন্মের কাহিনীটি একইরকম বর্ণিত হলেও সেখানে বলা হয়েছে, যজ্ঞাগ্নির কেশভাগ অর্থাৎ অগ্নিশিখার উপরিভাগ থেকে জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর নাম হয় পুলস্ত্য। অগ্নিশিখার মতোই পিঙ্গলবর্ণ কেশরাশির কারণেই এরূপ নামকরণ হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা হয়েছে—

> কেশস্তু কপিশো জাতঃ পুলস্ত্যশ্চ মহাতপাঃ।[১৭]

ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার কান থেকে পুলস্ত্যের উৎপত্তি হয়। বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রজাপতি কর্দমের কন্যা হবির্ভুর সঙ্গে পুলস্ত্যের বিবাহ হয়। পুলস্ত্য ও হবির্ভুর মিলনে অগস্ত্য ও বিশ্রবা নামে দুই পুত্র সন্তানের জন্ম দেন।[১৮]

বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুসারে সুমেরু পর্বতে পুলস্ত্যের তপোবন ছিল। পুলস্ত্যের আশ্রমের কাছেই ছিল রাজর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রম। রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা ও তাঁর সখীরা এবং অন্যান্য অপ্সরাদের সঙ্গে ক্রীড়া ও নৃত্যগীত করতেন এই বনে, কখনও কখনও পুলস্ত্যের তপোবনেও তারা পৌঁছে যেতেন। তার ফলে পুলস্ত্যের তপস্যার বিঘ্ন হত। তাই তিনি একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন,

যে আমার দৃষ্টিপথে আসবে, সে গর্ভবতী হবে। রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা এই অভিশাপের কথা জানতেন না। ফলে একদিন তিনি খেলতে খেলতে নির্ভয়ে পুলস্ত্যের আশ্রমে প্রবেশ করে মহর্ষি পুলস্ত্যকে দেখছেন এবং তাঁর বেদপাঠ শোনেন। এমন সময় পুলস্ত্যের সেই অভিশাপের প্রভাবে তৃণবিন্দুর কন্যার গর্ভসঞ্চার হয়। নিজের শরীরের আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা ভীত হয়ে পিতার আশ্রমে ফিরে আসেন। রাজর্ষি তৃণবিন্দু কন্যার অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে তার দুর্দশার কথা জানতে চান। রাজকন্যা তখন হাতজোড় করে পিতার উদ্দেশ্যে বললেন, “বাবা! আমি কিছুই জানি না, সখীদের খুঁজতে খুঁজতে আমি মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে গিয়েছিলাম, সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে আমি মহর্ষির বেদপাঠ শুনছিলাম, এমন সময় হঠাৎ আমার এই পরিবর্তন হল”।[১৯] কন্যার মুখে এইরূপ বাক্য শুনে রাজর্ষি তৃণবিন্দু ধ্যানস্থ হয়ে তপোবনের সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে পারলেন। তারপর কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পুলস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে করজোড়ে পুলস্ত্যকে তাঁর কন্যার পতিরূপে গ্রহণ করার জন্য নিবেদন করেন। এছাড়াও তার কন্যা চিরকাল পুলস্ত্যের সেবা শুশ্রুষা করবেন বলে তৃণবিন্দু আশ্বস্ত করেন। পুলস্ত্য রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কথায় সম্মত হয়ে তার কন্যাকে বিবাহ করেন। কিছুকাল পরে মহর্ষি পুলস্ত্য পত্নীর গুণ ও আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন—

> যস্মাত্তু বিশ্রুতো বেদস্ত্বয়েহাধ্যয়তো মম।
> তস্মাৎ স বিশ্রবা নাম ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।।[২০]

অর্থাৎ তৃণবিন্দুর কন্যা গর্ভে জাত পুত্র পুলস্ত্যের ন্যায় তেজস্বী হবে এবং পৌলস্ত্য নামে খ্যাত হবে। যেহেতু পৌলস্ত্যের আশ্রমে তৃণবিন্দুর কন্যা বেদপাঠ শ্রবণ করতে করতে গর্ভধারণ করেন, সেই কারণে এই গর্ভজাত সন্তান বিশ্রবা নামে খ্যাত হয়েছেন।

অনন্তর পুলস্ত্য পুত্র বিশ্রবা কিছুকালের মধ্যে পিতার ন্যায় তপস্যায় নিরত থাকতেন। বিশ্রবা ছিলেন সত্যবাদী, চরিত্রবান, জিতেন্দ্রিয় ও স্বাধ্যায়পরায়ণ। সেই কারণে মহামুনি ভরদ্বাজ ও সুশীলা নিজের সুন্দরী একমাত্র কন্যা দেববর্ণিনীকে বিশ্রবার হাতে অর্পন করেন। বিশ্রবা মুনি ও ভরদ্বাজমুনির কন্যা দেববর্ণিনীর পুত্র হলেন কুবের। পিতামহ পুলস্ত্য নিজ পুত্রের সাথে সদৃশ্যবশতঃ নিজ পৌত্রের বৈশ্রবণ নাম রাখেন। বৈশ্রবণ নামকরণ প্রসঙ্গে *বাল্মিকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> যস্মাদ্বিশ্রবসোঽপত্যং সাদৃশ্যাদ্বিশ্রবা ইব।
> তস্মাদ্বৈশ্রবণো নাম ভবিষ্যত্যেষ বিশ্রুতঃ।।[২১]

কুবেরের বংশতালিকা নিম্নে রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হল—

মহর্ষি পুলস্ত্য

↓

বিশ্রবা মুনি + দেববর্ণিনী (ভরদ্বাজ মুনির কন্যা)

↓

বৈশ্রবণ বা কুবের

কুবেরের সেবায় তুষ্ট হয়ে পিতামহ ব্রহ্মা তাঁকে পুষ্পক রথ দান করেন এবং তাঁর সঙ্গে মহাদেবের সখ্যতা সৃষ্টি করলেন। কিন্তু ব্রহ্মা তাঁর বাসস্থান নির্দেশ না করায়, নিজ পিতা বিশ্রবাকে তিনি বাসস্থান নির্দেশ করতে বলেন। বিশ্রবা বিশ্বকর্মা নির্মিত ত্রিকুঠশিখরস্থ লঙ্কাপুরীতে কুবেরের বাসস্থান স্থির করে দেন। কুবেরের লঙ্কাপুরীতে বাসস্থান ছিল। প্রসঙ্গতঃ এবিষয়ে *বাল্মিকীয় রামায়ণ* থেকে জানা যায়—

> এতচ্ছ্রুত্বা তু ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মিষ্ঠং বচনং পিতুঃ।
> নিবেশয়ামাস তদা লঙ্কাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি।।[২২]

কিন্তু কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ লঙ্কাপুরী অধিকার করতে চাইলে কুবের পিতৃ উপদেশে লঙ্কা পরিত্যাগপূর্বক কৈলাসে প্রস্থান করেন। পুনরায় কৈলাস পর্বতে কুবেরের অবস্থান বিষয়ে *বাল্মিকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> ধনেশ্বরোঽপ্যথ পিতৃবাক্যগৌরবান্ন্যবেশয়চ্ছশিবিমলে গিরৌ পুরীম্।
> স্বলঙ্কৃতৈর্ভবনবরৈর্ব্বিভূষিতাং পুরন্দরঃ স্বপুরমিবামরাবতীম্।।[২৩]

চ. শূর্পণখা : ঋষি বিশ্রবা ও তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী নৈকসীর মিলনে শূর্পণখা জন্মগ্রহণ করেন। নৈকসী ছিলেন রাক্ষসকুলে জাত সুমালী ও মাল্যবানের সন্তান। একসময়ে রাক্ষসকুলের রাজা মাল্যবান বিষ্ণুর প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করে এবং বিষ্ণুকে বধ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। মাল্যবান তার সর্বশক্তি দিয়ে বিষ্ণুকে প্রহার করেন। কিন্তু বিষ্ণুর দূত গরুড় মাল্যবানকে যুদ্ধে পরাস্ত

করেন। যুদ্ধে পরাস্ত্র হয়ে স্বপত্নী মাল্যবান প্রথমে লঙ্কায় প্রবেশ করেন। পরবর্তী সময়ে পাতালে প্রবেশ করেন। কিন্তু বিষ্ণু মাল্যবানকে খুঁজে বের করে তাকে হত্যা করেন। কিছুদিন পর দুঃখে সুমালী কন্যা নৈকসীকে নিয়ে মর্ত্যলোকে গমন করেন। মর্ত্যলোকে বিচরণ করতে করতে সুমালী বিশ্রবার পুত্র কুবেরকে দেখলেন এবং রাক্ষসগণের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করতে লাগলেন। মঙ্গলের কথা চিন্তা করে সুমালী নিজ কন্যা নৈকসীকে বিশ্রবার হাতে সম্প্রদান করার জন্য মনোস্থির করলেন। মাতা সুমালীর মনোবাসনা অনুযায়ী নৈকসী পুলস্ত্য পুত্র বিশ্রবার নিকট গমন করেন এবং তাকে পতি রূপে বরণ করেন। নৈকসী ও বিশ্রবার সন্তানগণ হলেন রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পণখা ও বিভীষণ।

রাবণ ও কুম্ভকর্ণ শূর্পণখার অগ্রজ ভ্রাতা এবং বিভীষণ অনুজ ভ্রাতা। এছাড়া বৈমাত্রেয় অগ্রজ ভ্রাতা হলেন কুবের। *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে যে, কুবের পিতামহ পুলস্ত্য ও পিতা বিশ্রবাকে সেবা শুশ্রূষার জন্য পুষ্পোৎকটা, রাকা এবং মালিনী নামে তিন সুন্দরী রাক্ষসী দাসী নিয়োগ করেন। পুষ্পোৎকটা দাসীর গর্ভে বিশ্রবার ঔরসে রাবণ ও কুম্ভকর্ণের জন্ম হয়। রাকার গর্ভে জন্ম নেন খর এবং কন্যা শূর্পণখা। এছাড়াও মালিনীর গর্ভে জন্ম নেয় ধর্মাত্মা বিভীষণ। প্রসঙ্গতঃ, এবিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে—

> পুষ্পোৎকটায়াং জজ্ঞাতে দ্বৌ পুত্রৌ রাক্ষসেশ্বরৌ।
> কুম্ভকর্ণদশগ্রীবৌ বলেনাপ্রতিমৌ ভুবি।।
> রাকায়া মিথুনং জজ্ঞে খরঃ শূর্পণখা তথা।
> মালিনী জনয়ামাস পুত্রমেকং বিভীষণম্।।[২৪]

শূর্পণখার বাল্যকালে মীনাক্ষী এবং দীক্ষা নামে পরিচিত ছিলেন। তার নখের আকৃতি চাঁদের ন্যায় হওয়ায় তিনি চন্দ্রনখা নামেও পরিচিতা ছিলেন। শূর্পণখা তার মাতা নৈকষী এবং মাতামহী কেতুমতির মতোই সুদর্শনা ছিলেন। তিনি উপযুক্ত বয়সে কালকেয় বংশীয় দানবরাজ বিদ্যুৎজিহ্বকে গোপনে বিবাহ করেন। স্বভাবতঃ শূর্পণখার বিবাহ দানবকুলে হওয়ার ফলে তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। কারণ দানবেরা ছিল নীতিগতভাবে রাক্ষসদের বিপক্ষে। তাই রাক্ষসেরা তাদের শত্রু বলে মনে করতেন। বিদ্যুৎজিহ্বকে বিবাহ করায় রাবণ শূর্পণখাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে চাইলে রাবণপত্নী মন্দোদরী তাকে বাঁধা দেন। মন্দোদরী তার পতি

রাবণের উদ্দেশ্যে শূর্পণখার ইচ্ছাকে সম্মতি জানিয়ে তার সন্মানরক্ষার্থে মন্দোদরীর পতি রাবণকে অনুরোধ জানান। মন্দোদরীর কথানুসারে রাবণ শূর্পণখার সঙ্গে বিদ্যুৎজিহ্বের বিবাহ দিতে এবং সমগ্র দানবকুলকে নিজের আত্মীয় মেনে নিতে রাজী হন।

রাবণের দিগ্বিজয়কালে তিনি তার নববিবাহিতা ভগিনী শূর্পণখার সঙ্গে দানবপুরীতে দেখা করতে যান। দানবপুরীতে গিয়ে রাবণ নিজ দানব ভগিনীপতি বিদ্যুৎজিহ্বকে শূর্পণখা বিবাহ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করেন। রাবণকে বধ করায় ছিল বিদ্যুৎজিহ্বের মূল উদ্দেশ্য। শূর্পণখার অনুপস্থিতিতে বিদ্যুৎজিহ্ব রাবণের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু আত্মরক্ষা করতে গিয়ে রাবণ স্বয়ং বিদ্যুৎজিহ্বকে হত্যা করেন। এইভাবে রাবণ কালকেয় বংশকে নিধন করে মর্মাহত হয়ে নিজ লঙ্কাপুরীতে ফিরে আসেন। ভগিনী শূর্পণখা যখন জানতে পারেন যে, রাবণ তাঁর পতি বিদ্যুৎজিহ্বকে হত্যা করেছেন, সেই মুর্হূতেই লঙ্কাপুরীতে কাঁদতে কাঁদতে এসে উপস্থিত হয়ে রাবণের উদ্দেশ্যে বলেন—

> সা বাষ্পপরিরুদ্ধাক্ষী রক্তাক্ষী বাক্যমব্রবীৎ।
> কতাস্মি বিধ্বা রাজংস্ত্বয়া বলবতা বলাৎ।।
> যে তে রাজংস্ত্বয়া বীর্য্যাদ্দৈত্যা বিনিহতা রণে।
> কালকঞ্জা ইতিখ্যাতাঃ শতানি চ সহস্রশঃ।।
> প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়ান্ মে তত্র ভর্ত্তা মহাবলঃ।
> সোঽপি ত্বয়া হতস্তাত রিপুণা ভাতৃগন্ধিনা।।[২৫]

অর্থাৎ শূর্পণখা ক্রন্দরত অবস্থায় রাবণের উদ্দেশ্যে বলেন, বলশালী রাবণ ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে বিধবা করেছেন। কারণ রাবণ তাঁর নিজ শক্তিবলে কালকঞ্জনামে বিখ্যাত যে শত সহস্র দৈত্যকে হত্যা করেছেন, তার মধ্যে মহাবলশালী শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুৎজিহ্বও ছিলেন এবং তাকেও রাবণ বধ করেছেন। অতএব বিদ্যুৎজিহ্বের হত্যার দিন থেকে শূর্পণখা রাবণের সম্বন্ধে ভ্রাতা হলেও কার্যত তিনি শত্রুও হয়েছেন।

ভগিনী শূর্পণখার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করে অনুতপ্ত রাবণ বিধবা ভগিনীকে দণ্ডকারণ্যে ইচ্ছামত বিহারের অনুমতি দিয়ে সেনাপতি ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা খর ও দূষণকে তার রক্ষার্থে নিয়োগ করেন।

অনুতপ্ত ভ্রাতা রাবণের কথানুযায়ী সেই সময় থেকেয় শূর্পণখা দণ্ডকারণ্যে বসবাস করতে লাগলেন। এবিষয়ে *বাল্মিকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> স তত্র কারয়ামাস রাজ্যং নিহতকণ্টকম্।
> সা চ শূর্পণখা তত্র ন্যৱসদ্দণ্ডকে বনে।।[২৬]

গর্ভবতী অবস্থায় শূর্পণখা দণ্ডকারণ্যে বসবাস করতেন। তখন তিনি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। যার নাম ছিল শম্বুক। যদিও পরবর্তীকালে শম্বুক লক্ষ্মণের হাতে নিহত হন। নিম্নে শূর্পণখার বংশচিত্র প্রদর্শিত হল—

মহর্ষি পুলস্ত্য

↓

বিশ্রবা মুনি + নৈকসী রাক্ষসী অথবা রাকা নামক দাসী (*বৈয়াসিক মহাভারত* অনুযায়ী)

↓

শূর্পণখা + দানবরাজ বিদ্যুৎজিহ্ব

↓

শম্বুক (পুত্র)

৩.১.২. *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক অবস্থান : *বৈয়াসিক মহাভারত* প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্য, যা একটি জটিল পারিবারিক শ্রেণিবিন্যাসে বৈশিষ্ট্যযুক্ত। শ্রেণিবিন্যাসের শীর্ষে রয়েছে দুই পরিবার, পাণ্ডব এবং কৌরব। পাণ্ডবদের নেতৃত্বে ছিলেন রাজা পাণ্ডু এবং তাঁর পাঁচ পুত্র। কৌরবদের নেতৃত্বে ছিলেন রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর শত পুত্র। এই দুই কেন্দ্রীয় পরিবারের মধ্যে কয়েক প্রজন্মের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জড়িত, যাদের মধ্যে কিছু বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রের সমন্বয় রয়েছে। *বৈয়াসিক মহাভারতে* যেসকল বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ্য রয়েছে, সেই সকল ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক অবস্থান নিম্নে বর্ণিত হল—

ক. ধৃতরাষ্ট্র : ভরত রাজা নিজ নামের গৌরবে ভারতবর্ষ ও ভারত বংশকে চির বন্দিত করেছেন। ভরত কুলের আদি পুরুষ ছিলেন রাজা যজাতি। যদিও যজাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু পিতার অসন্তোষভাজন হওয়ায় রাজ্যচ্যুত হন। সেই কারণে তাঁর বংশ যাদব এই ভিন্ননামে বিশেষ

খ্যাতিলাভ করে। এই বংশে ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক প্রভৃতি বীরগণ জন্মগ্রহণ করে নিজ নিজ নামের মহিমা আরোপিত করেন। পরিশেষে সকল লোকের চিত্তহননকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই বংশে অবতীর্ণ হওয়ায় ক্ষত্রিয়কুল অপেক্ষা যদুবংশের মর্যাদা হ্রাস পায়নি।

পরবর্তীসময়ে যজাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুই যজাতির সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েছিলেন। ফলে তাঁর বংশও শৌর্যে বীর্যে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই বংশেই খ্যাতনামা ভরত রাজা জন্মগ্রহণ করে এক অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেন। পরবর্তী সময়ে মহাবলশালী কুরু এই বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ করে কৌরব নামে আখ্যাত করেন।

দ্বাপরযুগের শেষভাগে কুরবংশজাত শান্তনু নামে এক বালক জন্মগ্রহণ করেন। শান্তনুর যৌবন প্রাপ্ত হতেই তাঁর পিতা প্রতীপ রাজা তাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে বিবিধ উপদেশ প্রদানপূর্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। রাজা শান্তনু প্রথমে গঙ্গাকে বিবাহ করেন এবং পরবর্তী সময়ে ধীবর কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নী গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে দেবব্রত নামে সদগুণে গুণান্বিত এক পুত্র সন্তান, যিনি পরবর্তী সময়ে ভীষ্ম নামে খ্যাত হয়েছেন। এছাড়াও দ্বিতীয়া পত্নী সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্র সন্তান। শান্তনুর প্রথম পুত্র দেবব্রত বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত স্বয়ং রাজ্য ও মৈথুন উভয় পরিত্যাগ করে ঊর্ধ্বরেতা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য হন। এই বিস্ময়কর ত্যাগে দেবগণ তাঁকে 'ভীষ্ম' উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজা শান্তনুও ভীষ্মের এই অসাধারণ ত্যাগের জন্য পুত্রকে যুদ্ধে অজেয় ও স্বেচ্ছামৃত্যুর বর প্রদান করেন।

সত্যবতীর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য এই দুই পুত্র হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই শান্তনু ইহলোক পরিত্যাগ করে স্বর্গে গমন করেন। প্রথমে মাতা সত্যবতীর সম্মতিক্রমে ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু মাত্র তিন বৎসর রাজত্ব করার পর চিত্রাঙ্গদ নামে অপর এক গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিহত হন। এরপর সত্যবতীর আদেশে অন্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে ভীষ্মই রাজ্যশাসন করতে থাকেন। প্রাপ্তবয়সে বিচিত্রবীর্যকে বিয়ে দেবার জন্য ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে হরণ করেন। সমাগত শল্যসহ নৃপতিগণ তাঁকে বাধা দিলে ভীষ্ম তাদের পরাজিত করেন। বিবাহের উদ্যোগের সময় কাশীরাজের

জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা বলেন, সে শল্য রাজার প্রতি অনুরক্তা এবং তাঁকেই সে পতিত্বে বরণ করেছেন। ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য শল্যরাজার কাছে পাঠিয়ে দেন। এরপর কাশীরাজের অন্য দুই কন্যার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দেন। মাত্র সাত বৎসরের মধ্যেই একান্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু হয়।

চন্দ্রবংশীয় রাজা শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্য অপুত্রক অবস্থায় অকালে প্রয়াত হলে বংশ রক্ষার্থে বিচিত্রবীর্যের মাতা সত্যবতী পরাশরের ঔরসজাত নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র মহর্ষি ব্যাসকে নিয়োগ করেন। বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা পত্নী কাশীরাজ কন্যা অম্বিকা এবং অম্বালিকার গর্ভে পুত্র উৎপাদনের জন্য ব্যাসকে নিয়োগ করেন। ব্যাসের ঔরসে কুরু রাজবংশে রাজা বিচিত্রবীর্যের দুই ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নী অম্বিকা এবং অম্বালিকার গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়া অম্বিকা নামক দাসীর গর্ভে ব্যাস কর্তৃক জন্মগ্রহণ করেন বিদুর। এই তিন ক্ষেত্রজ পুত্রের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র হলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র।

ধৃতরাষ্ট্রের মাতৃগর্ভে আগমনের সময় থেকেই তার জীবন দুর্ভাগ্যের দ্বারা চালিত হয়েছিল। বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠা মহিষী অম্বিকা তাঁর গর্ভে যে জ্যেষ্ঠপুত্র জন্মায়, সেই পুত্রই হবে চন্দ্রবংশের ভাবী চক্রবর্তী রাজা এমনটাই সকলে প্রত্যাশিত করেছিল। ব্যাসকে নিয়োগ করার সময় ধৃতরাষ্ট্রের পিতামহী সত্যবতী কিংবা জ্যেষ্ঠ তাত ভীষ্মও এমন ভাবনা করেছিল। নির্দিষ্ট দিনে পুত্রবধূ অম্বিকাকে সত্যবতী বলেন যে, আজ রাত্রে তোমার কোন দেবর তোমার শয়নকক্ষে আসবেন এবং তাঁর থেকেই তুমি পুত্রলাভ করবে। আর সেই পুত্রই হবে কুরু রাজবংশের রক্ষক। *মহাভারতের* সময়ে নিয়োগ প্রথার প্রচলন ছিল, সেই কারণে বিচিত্রবীর্যের বিধবা পত্নী অম্বিকা বুঝলেন যে, তাকে নিয়োগ প্রথায় পুত্র উৎপাদন করতে হবে। পুত্র উৎপাদনের জন্য যিনি নিযুক্ত হয়েছেন তিনি তার দেবর, একথা শুনে অম্বিকা একটু কৌতুহলও বোধ করলেন। শয়ন কক্ষে অম্বিকা ভাবছিলেন যে, সত্যবতী ভীষ্ম না অন্য কোন দেবরকে নিয়োগ করেছেন কুরু রাজবংশের রক্ষার্থে। এমন সময় শয়নকক্ষে প্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, দীপ্তচক্ষু, পিঙ্গল শ্মশ্রুগম্ফ, পিঙ্গল জটাভারযুক্ত মহর্ষি ব্যাসের প্রবেশ এবং মিলনের সময় তার উগ্রতপস্বী রূপ দেখে ভয়ে অম্বিকা চোখ বন্ধ করে ফেলেন। নিদারুণ আতঙ্কের মধ্যে যে শিশু অম্বিকার গর্ভে সঞ্চারিত হয়,

সেই শিশু মাতার আতঙ্কের ফলগামী হয়। অম্বিকার গর্ভাধান সম্পন্ন করে ত্রিকালজ্ঞ ব্যাস মাতা সত্যবতীর কাছে এসে বলেন—

নাগাযুতসমপ্রাণো বিদ্বান্ রাজর্ষিসত্তমঃ।
মহাভাগো মহাবীর্য্যো মহাবুদ্ধির্ভবিষ্যতি।।
অস্য চাপি শতং পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহাত্মনঃ।
কিন্তু মাতুঃ স বৈগুণ্যাদন্ধ এব ভবিষ্যতি।।[২৭]

অর্থাৎ অম্বিকার গর্ভজাত সন্তান দশহাজার হস্তীর তুল্য বলবান, বিদ্বান, ভাগ্যবান, রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান এবং শতপুত্রের জনক হবেন। কিন্তু মিলনের সময় মাতার ভয়ের দোষে দুষ্ট হবে অর্থাৎ জন্মান্ধ হবেন।

উপর্যুক্ত ব্যাস মুখে অম্বিকার গর্ভজাত অন্ধ শিশুর কথা শুনে সত্যবতী হতাশ হয়ে পড়লেন। কারণ অন্ধ সন্তান কখনোই রাজসিংহাসনের অধিকারী হতে পারবে না। অতএব কুরু রাজবংশের রাজসিংহাসন শূন্য না থাকে, সেই কারণে মহর্ষি ব্যাস অম্বালিকার গর্ভে সুস্থ শরীর সম্পন্ন রাজা উৎপাদনের জন্য নিযুক্ত হন। কিন্তু ব্যাসের উগ্রতপস্বী রূপ দেখে অম্বালিকা পাণ্ডুবর্ণ হয়েছিল, সেই কারণে অম্বালিকার গর্ভজাত সন্তান পাণ্ডু নামে খ্যাত হবেন। অম্বালিকার গর্ভজাত সন্তানের জন্মবৃত্তান্ত মহর্ষি ব্যাস সত্যবতীর নিকট প্রকাশ করলে, সত্যবতী অম্বিকার কাছ থেকে আরও একটি নিয়োগপ্রথায় একটি সুস্থ সন্তান দাবী করেন। কিন্তু অম্বিকা পুনরায় উগ্রতপস্বী ব্যাসের নিকট যেতে অসম্মত হন এবং মাতা সত্যবতীর অলক্ষেই নিজের অলঙ্কার দিয়ে সজ্জিত আপন দাসীকেই ব্যাসের সামনে উপস্থিত করেন। মহর্ষি ব্যাস ও অম্বিকার দাসীর মিলনে বিদুরের জন্ম হয়।

তবে ধৃতরাষ্ট্রের নেত্রহীনতার জন্য শুধুমাত্র অম্বিকাকে দায়ী করা চলেনা কারণ এইরকম দুর্ঘটনা যে ঘটতে পারে উগ্রতপস্বী ব্যাস সেই কথা আগেই বিবেচনা করেছিলেন। সেই কারণে একবছর সময় চেয়েছিলেন মাতা সত্যবতীর কাছে, যাতে করে একবছরের মধ্যে তাঁর বিকট উগ্রতপস্বী চেহারায় খানিকটা সংশোধন করতে পারেন। কিন্তু মাতা সত্যবতী মহর্ষি ব্যাসকে উগ্রতপস্বীর রূপ সংশোধনের কোন সময় দিতে সম্মত হননি। মহর্ষি ব্যাস বারংবার সত্যবতীকে সাবধান করেছিলেন যে, তার পুত্রবধূরা যেন ব্যাসের বিকৃতরূপ সহ্য করেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল

সত্যবতী যখন অম্বিকাকে পুত্র উৎপাদনের কথা বলতে গেলেন, তখন তিনি চিন্তাও করলেন না যে, ব্যাসের বিকৃতরূপ সম্পর্কে অম্বিকারও একটু মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন ছিল। এই জটিল পরিস্থিতির কারণে মাতৃগর্ভে আগমনের সময় থেকেই নেত্রহীনতার দুর্ভাগ্য ধৃতরাষ্ট্রের জীবন ও ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে যায়।

মহর্ষি ব্যাসের কথানুযায়ী যথাসময়ে রানী অম্বিকা ধৃতরাষ্ট্র নামে এক জন্মান্ধ সন্তান প্রসব করেন। ধৃতরাষ্ট্র অর্থাৎ যিনি রাষ্ট্রকে ধারণ করেন। যদিও জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র সরাসরি রাজ্যলাভ করেননি, কিন্তু পাণ্ডুর বনগমনের সময় থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় ধরে পাণ্ডুর প্রতিনিধি হিসাবে ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে আসীন ছিলেন।

অম্বালিকার পুত্র পাণ্ডুর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হওয়ার পর কুরুবংশীয় প্রবীণ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বিবাহের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। সত্যবতীর দুই পুত্রের অকাল মৃত্যু এবং দীর্ঘদিন রাজসিংহাসনের শূন্যতা ভীষ্ম দেখেছেন। সেই কারণে এইরূপ রাজবংশের শূন্যতা তিনি কখনোই চান নি। তাই তিনি বিদুরের সঙ্গে কুরুরাজকুমারের বিবাহ বিষয়ে আলোচনা করলেন যে, এই বিবাহ এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে করে কুরুবংশের বৃদ্ধি সাগরের মতো হয়, এমন উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করছেন। ভীষ্মের কানে পৌঁছেছে যে, গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা গান্ধারী মহাদেবের কাছ থেকে শতপুত্রের জননী হওয়ার বর পেয়েছেন। ভীষ্ম সেই কারণে অনেক বিবেচনা করে গান্ধারীকেই ধৃতরাষ্ট্রের উপযুক্ত পত্নী হিসাবে মনোনিত করলেন। কিন্তু ভীষ্মের মনে চিন্তা ছিল যে, রূপে গুণে এবং বংশমর্য্যাদায় ধৃতরাষ্ট্র উপযুক্ত পাত্র হলেও, তার জন্মান্ধ হওয়ায় গান্ধাররাজ সুবল তাঁর কন্যাকে অন্ধ পাত্রের হাতে তুলে দিতে সম্মত নাও হতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে গান্ধাররাজ সুবল ধৃতরাষ্ট্রের বংশমর্য্যাদা, গুণ ও যশ এইসব বিচার করে গান্ধারীকে ধৃতরাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করবেন বলে সঙ্কল্প করলেন।

পিতৃমনোনীত ধৃতরাষ্ট্রকেই ধর্মচারিণী গান্ধারী স্বামী হিসেবে স্বীকার করেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর মিলনে একশত পুত্রের এবং একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়।[২৮] তাঁরা হলেন—

১. দুর্যোধন, **২.** যুযুৎসু **৩.** দুঃশাসন **৪.** দুঃসহ **৫.** দুঃশল **৬.** দুর্ম্মুখ **৭.** বিবিংশতি **৮.** বিকর্ণ **৯.** জলসন্ধ **১০.** সুলোচন **১১.** বিন্দ **১২.** অনুবিন্দ **১৩.** দুর্দ্ধর্ষ **১৪.** সুবাহু **১৫.** দুষ্প্রধর্ষন **১৬.** দুর্ম্মর্ষণ

১৭. দুর্ম্মুখ **১৮.** দুষ্কর্ণ **১৯.** কর্ণ **২০.** চিত্র **২১.** উপচিত্র **২২.** চিত্রাক্ষ **২৩.** চারুচিত্র **২৪.** অঙ্গদ **২৫.** দুর্ম্মদ **২৬.** দুষ্প্রহর্ষ **২৭.** বিবিৎসু **২৮.** বিকট **২৯.** সম **৩০.** ঊর্ণনাভ **৩১.** পদ্মনাভ **৩২.** নন্দ **৩৩.** উপনন্দ **৩৪.** সেনাপতি **৩৫.** সুষেণ **৩৬.** কুণ্ডোদর **৩৭.** মহোদর **৩৮.** চিত্রবাহু **৩৯.** চিত্রবর্ম্মা **৪০.** সুবর্ম্মা **৪১.** দুর্ব্বিরোচন **৪২.** অয়োবাহু **৪৩.** মহাবাহু **৪৪.** চিত্রচাপ **৪৫.** সুকুণ্ডল **৪৬.** ভীমবেগ **৪৭.** ভীমবল **৪৮.** বলাকী **৪৯.** ভীমবিক্রম **৫০.** উগ্রায়ুধ **৫১.** ভীমশর **৫২.** কনকায়ু **৫৩.** দৃঢ়ায়ুধ **৫৪.** দৃঢ়বর্ম্মা **৫৫.** দৃঢ়ক্ষত্র **৫৬.** সোমকীর্ত্তি **৫৭.** অনূদর **৫৮.** জরাসন্ধ **৫৯.** ধৃঢ়সন্ধ **৬০.** সত্যসন্ধ **৬১.** সহস্রবাক্ **৬২.** উগ্রশ্রবা **৬৩.** উগ্রসেন **৬৪.** ক্ষেমমূর্ত্তি **৬৫.** অপরাজিত **৬৬.** পণ্ডিতক **৬৭.** বিশালাক্ষ **৬৮.** দুরাধন **৬৯.** দৃঢ়হস্ত **৭০.** সুহস্ত **৭১.** বাতবেগ **৭২.** সুবর্চ্চা **৭৩.** আদিত্যকেতু **৭৪.** বহ্বাশী **৭৫.** নাগদত্ত **৭৬.** অনুযায়ী **৭৭.** নিষঙ্গী **৭৮.** কবচী **৭৯.** দণ্ডী **৮০.** দণ্ডাধার **৮১.** ধনুর্গ্রহ **৮২.** উগ্র **৮৩.** ভীমরথ **৮৪.** বীর **৮৫.** বীরবাহু **৮৬.** অলোলুপ **৮৭.** অভয় **৮৮.** রৌদ্রকর্ম্মা **৮৯.** দৃঢ়রথ **৯০.** চয় **৯১.** অনাধৃষ্য **৯২.** কুণ্ডভেদী **৯৩.** বিরাবী **৯৪.** দীর্ঘলোচন **৯৫.** দীর্ঘবাহু **৯৬.** (দ্বিতীয়) মহাবাহু **৯৭.** ব্যূঢ়োরু **৯৮.** কনকাঙ্গদ **৯৯.** কুণ্ডজ **১০০.** চিত্রক এবং **১০১.** দুঃশলা (একমাত্র কন্যা)।

ধৃতরাষ্ট্রের উপরিউক্ত একশত পুত্রই বীরযোদ্ধা এবং যুদ্ধকার্যে নিপুণ পারদর্শী ছিলেন। এছাড়াও সকলেই বেদবিৎ এবং দণ্ডনীতি শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। *বৈয়াসিক মহাভারতে* ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে বিবাহ করলেও এবং গান্ধারী যখন গর্ভবতী হয়েছিলেন সেই সময় তার বৈশ্যা দাসী সুগধাকে ধৃতরাষ্ট্রের ভোগ্যা হয়েছিল। যারফলস্বরূপ যুযুৎসু নামে বৈশ্যা দাসীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এছাড়াও ধৃতরাষ্ট্র তার একমাত্র কন্যা দুঃশলাকে শকুনির মতানুসারে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের হাতে দান করেন। ধৃতরাষ্ট্রের বংশচিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হল—

পুরু + কৌশল্য (পত্নী)
↓
মনস্যু
↓
নিলীল + রথন্দরী (পত্নী)
↓
দুষ্মন্ত
↓
ভরত
↓
ভূমন্যু
↓
সুহোত্র
↓
হস্তী (হস্তিনাপুরের নির্মাতা)
↓
বিকাঞ্চ
↓
অজমীঢ়
↓
২০০০ পুত্র ঋষ
↓
সংবরণ
↓
কুরু
↓
বিধুরথ
↓
পৌত্র
↓
প্রতীপ + সুনন্দা (পত্নী)
↓
শান্তনু + সত্যবতী (পত্নী) = চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য।

বিচিত্রবীর্য + অম্বালিকা (প্রথম পত্নী) + অম্বিকা (দ্বিতীয় পত্নী)
↓ ↓
পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্র + গান্ধারী (পত্নী) + গান্ধারীর বৈশ্য দাসী (দ্বিতীয় পত্নী)
↓ ↓
দুর্যোধন প্রভৃতি ৯৯ পুত্র এবং দুঃশলা (একমাত্র কন্যা) যুযুৎসু

খ. দীর্ঘতমস্ : *বৈয়াসিক মহাভারতে* ঋষিকুলের মধ্যে অগ্রগণ্য ঋষি হলেন দীর্ঘতমস্। মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র ঋষি দীর্ঘতমস্ বৈদিক ঋষি এবং বেদের একাধিক মন্ত্রের দ্রষ্টাও ছিলেন। অঙ্গিরা ছিলেন সৃষ্টির আদিতে জাত ব্রহ্মার ছয় মানসপুত্রের মধ্যে একজন। ব্রহ্মার ছয় মানসপুত্র বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে–

মরীচিরঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ষড়েতে ব্রহ্মণঃ পুত্রা বীর্যবন্তো মহর্ষয়ঃ।।[২৯]

বিবিধ পুরাণ গ্রন্থে অঙ্গিরার জন্ম বিষয়ে একাধিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। *বায়ু-পুরাণে* বর্ণিত উপাখ্যান থেকে জানা যায় যে, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের সূচনাকালে ব্রহ্মার মানসপুত্ররা জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষযজ্ঞে সতীর মৃত্যুর পর ক্রুদ্ধ শিব তাদের অভিশাপ দেন। অভিশপ্ত ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ চাক্ষুষ মন্বন্তরে ব্রহ্মার পুত্ররূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। একসময় চাক্ষুষ মন্বন্তরে বরুণ দেবতার যজ্ঞে ব্রহ্মা পৌরোহিত্য করছিলেন। সে সময় যজ্ঞসভায় উপস্থিত দেবকন্যাদের দেখে ব্রহ্মার চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং তাঁর তেজ স্খলিত হয়। ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির ভাবনা করে সেই তেজবিন্দু যজ্ঞাগ্নিতে আহূতি দেন। তেজবিন্দু যজ্ঞাগ্নিতে আহূতির ফলস্বরূপ প্রথমে উঠে আসেন ভৃগু। তারপর উঠে আসেন অঙ্গিরা। যজ্ঞের অঙ্গার থেকে উৎপত্তি হয়েছিল বলেই, তিনি অঙ্গিরা নামে খ্যাত হন।[৩০]

বৈয়াসিক মহাভারত এবং বিবিধ পুরাণ অনুযায়ী অঙ্গিরার বিবাহ বিষয়ে একাধিক তথ্য পাওয়া যায়। দক্ষ প্রজাপতির দুই কন্যা স্বধা এবং সতী মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁদের গর্ভজাত পুত্ররা হলেন পিতৃগণ এবং অথর্বাঙ্গিরস্। *বৈয়াসিক মহাভারতে* সুভানাম্নী অঙ্গিরার পত্নীর উল্লেখ মেলে। এছাড়াও *বৈয়াসিক মহাভারত* অনুযায়ী অঙ্গিরা ঋষির বৃহস্পতি, উতথ্য এবং সংবর্ত্ত নামে তিন পুত্রের উল্লেখ রয়েছে। এবিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারত* বলা হয়েছে–

ত্রয়স্ত্বঙ্গিরসঃ পুত্রা লোকে সর্ব্বত্র বিশ্রুতাঃ।
বৃহস্পতিরুতথ্যশ্চ সংবর্ত্তশ্চ ধৃতব্রতাঃ।।[৩১]

বায়ু-পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, মহর্ষি অঙ্গিরার তিনজন পত্নী ছিলেন, তাঁরা হলেন– মরীচির কন্যা সুরূপা, কর্দম প্রজাপতির কন্যা স্বরাট্ এবং মনুর কন্যা পথ্যা। তাঁদের মধ্যে সুরূপার গর্ভে বৃহস্পতি, স্বরাটের গর্ভে গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় পত্নী পথ্যার গর্ভে চার পুত্র জন্মায়।

তারা হলেন অবন্ধ্য, বামদেব, উতথ্য এবং উশিজ। তবে *ভাগবত পুরাণ* এবং *বিষ্ণু পুরাণে* কর্দম প্রজাপতির কন্যা তথা অঙ্গিরার পত্নী স্বরাটের পরিবর্তে শ্রদ্ধা নামে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়াও *বৈয়াসিক মহাভারতে* ও পুরাণে অঙ্গিরার কন্যাসন্তানের নামরূপে ভানুমতী, রাকা, সিনীবালী, অর্চিস্মতী, হবিষ্মতী, মহিষ্মতী, মহামতী এবং কুহূদের নাম পাওয়া যায়।[৩২]

অঙ্গিরার জ্যেষ্ঠপুত্র হলেন দেবগুরু বৃহস্পতি। বিদ্বান্ বুদ্ধিমান বৃহস্পতির ব্যক্তিগত জীবন জটিলতায় পরিপূর্ণ ছিল। দেবগুরু বৃহস্পতির সঙ্গে ছোট ভাই সংবর্ত, উতথ্য প্রভৃতির সম্পর্ক ভাল ছিল না। বিশেষত সংবর্ত সবসময়েই বৃহস্পতির থেকে বেশি প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু অপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্য বা উশিজের পত্নী মমতার সঙ্গে বৃহস্পতির ব্যবহারের একটি অন্য চরিত্রের দিক উন্মোচিত হয়।

উতথ্যের পত্নী মমতা গর্ভবতী ছিলেন, সেই সময় বিশেষ কাজে উতথ্য আশ্রমের বাইরে গেলে, তার অনুপস্থিতির সুযোগে বৃহস্পতি ভাতৃবধূ মমতার সঙ্গে বলপূর্বক মিলিত হন। সেই সময় মমতার গর্ভস্থ শিশুটি বৃহস্পতিকে বাধা দিলেও, বৃহস্পতির প্রয়াসে ফলে তার স্খলিত তেজ থেকে সেই মুহূর্তেই ভরদ্বাজ নামে এক শিশুপুত্রের জন্ম হয়। যেহেতু মমতার গর্ভস্থ শিশুটি বৃহস্পতিকে রমণের মুহূর্তে বাঁধা দেন সেই কারণে দেবগুরু উতথ্যপুত্র দৃষ্টিহীন হবার অর্থাৎ তমোরাশির মধ্যে বাস করার অভিশাপ দেন। সেই থেকে উতথ্য পুত্র দীর্ঘতমস্ নামে পরিচিত হন। দীর্ঘতমস্ ঋষির বংশচিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হল—

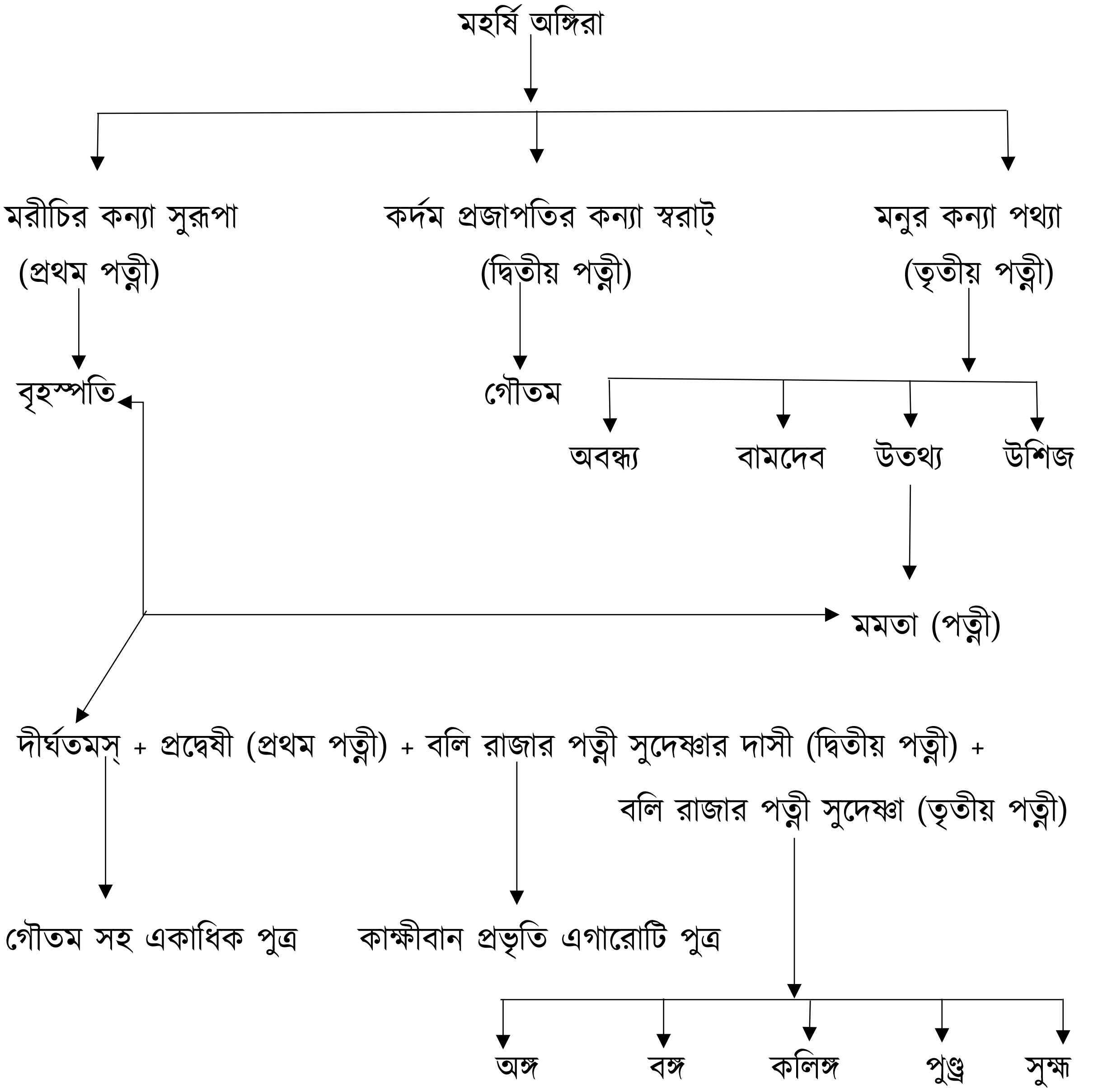

দীর্ঘতমস্ অন্ধরূপে জন্মগ্রহণ করলেও তপস্যার প্রভাবে বৃহস্পতির সমতুল্য ঋষিরূপে খ্যাতি লাভ করেন। এছাড়াও বেদজ্ঞ পণ্ডিত দীর্ঘতমস্ বিদ্যার বলে প্রদ্বেষী নামে এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেন। উতথ্য মুনির বংশবৃদ্ধির কারণে গৌতমসহ একাধিক পুত্রের জন্ম হয়।

জন্মান্ধ দীর্ঘতমস্ পুত্রলাভের পরেও আশ্রমের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে অর্থাৎ ভ্রাতৃপত্নীদের সঙ্গে অনবরত গোধর্ম বা রমণে সর্বদা মগ্ন থাকতেন। সেই কারণে পত্নী প্রদ্বেষী ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গায় ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য পুত্রদেরকে আদেশ দেন। গৌতম প্রভৃতি পুত্রগণ মাতৃ প্রদ্বেষীর আদেশ যথাযথভাবে পালন করেন।

কলার ভেলায় ভাসতে ভাসতে দীর্ঘতমস্ বহুদেশ অতিক্রম করলেন। একদিন বলি নামক অপুত্রক রাজা গঙ্গায় স্নান করতে এসে দীর্ঘতমস্-কে ভেলায় ভাসতে দেখেন। দীর্ঘতমস্-কে দেখে ও তার পরিচয় পেয়ে নিজের পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু রাজা বলির পত্নী সুদেষ্ণা দীর্ঘতমস্-কে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখে নিজের পরিবর্তে এক ধাত্রীকন্যাকে পুত্র উৎপাদনের জন্য দীর্ঘতমস্-এর কাছে পাঠান। দীর্ঘতমস্ সেই শূদ্রা রমণীর গর্ভে কাক্ষীবান প্রভৃতি এগারোটি পুত্র উৎপাদন করেন। কিন্তু রাজা বলি কাক্ষীবান প্রভৃতিকে নিজ পুত্র বলে দাবী করলে, দীর্ঘতমস্ তাঁকে সুদেষ্ণার প্রকৃত অভিসন্ধি জানান। সুদেষ্ণার অভিসন্ধি জানতে পেরে বলি রাজা পুনরায় নিজ মহিষীকে দীর্ঘতমস্ কাছে পুত্র উৎপাদনের জন্য পাঠান। দীর্ঘতমস্ ও বলি রাজার মহিষী সুদেষ্ণার মিলনে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম নামে পাঁচ সন্তানের জন্ম হয়। এছাড়াও দীর্ঘতমস্ বলী রাজাকে আশীর্বাদ দেন যে, সুদেষ্ণার গর্ভজাত পাঁচ সন্তানের নাম অনুসারে পাঁচটি দেশের নাম হবে এবং বলি রাজবংশের বংশরক্ষা এবং সাম্রাজ্য বিস্তার করবে। প্রসঙ্গতঃ এবিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উক্ত হয়েছে—

> অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
> তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামপ্রথিতা ভুবি।।[৩৩]

গ. অরুণ : মহামুনি কশ্যপের ঔরসে প্রজাপতির দক্ষের অষ্টম কন্যা বিনতার গর্ভে অরুণ জন্মগ্রহণ করেন। মহামুনি কশ্যপ ছিলেন সৃষ্টির আদিপর্যায়ের অন্যতম কিংবা সর্বাধিক বিখ্যাত ঋষিসমূহের মধ্যে একজন। *ঋগ্বৈদিক* যুগ থেকেই প্রজাপতি ঋষি হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও, কশ্যপের প্রকৃত স্বরূপ কী- এবিষয়েও সুপ্রাচীন কাল থেকে আলোচনার বিষয় হয়েছে। *শতপথ ব্রাহ্মণে* বর্ণিত হয়েছে যে, প্রজাপতি কশ্যপ প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে কূর্মরূপ ধারণ করেছিলেন। সেই কূর্মরূপ থেকে বিভিন্ন প্রাণীদের জন্ম হয়। কূর্ম রূপধারী কশ্যপের দ্বারা সৃষ্ট সন্তান বা প্রজারাও কূর্ম বা কশ্যপ নামে পরিচিত। বস্তুতঃ 'কূর্ম' বলতে শুধুমাত্র কশ্যপকে বোঝায় না। কূর্ম শব্দের উৎপত্তি 'কর্ম' অর্থ বোধক 'কৃ' ধাতু থেকে। যিনি কর্ম করেন, তিনি কূর্ম। প্রজাসৃষ্টির ন্যায় বৃহৎ কর্ম কশ্যপ সম্পাদন করেন বলেই তিনি কূর্ম নামে খ্যাত হয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ কশ্যপের কূর্ম নাম বিষয়ে *শতপথ ব্রাহ্মণে* বলা হয়েছে—

"স যৎ কূর্মো নাম। এতদ্বৈ রূপং ধৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত অকরোত্তৎ। যদকরোত্তস্মৎ কূর্মঃ। কশ্যপো বৈ কূর্মঃ। তস্মাদাহু সর্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপাঃ ইতি"।[৩৪]

ঋগ্বেদের পরবর্তী বৈদিক সংহিতাগুলিতে কশ্যপের নাম অসংখ্যবার উল্লিখিত হলেও *সামবেদে* প্রথমবার খুবই স্পষ্টভাবে কশ্যপকে ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি এবং কদর্মপ্রজাপতির কন্যা কলার গর্ভজাত সন্তানরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। *বায়ু পুরাণে* কশ্যপের জন্ম সম্পর্কে একটি নতুন তথ্য পাওয়া যায়। *শতপথ ব্রাহ্মণে* কশ্যপের যে কূর্মরূপের বর্ণনা পাওয়া যায় এবং পণ্ডিতেরা যাকে জীবসৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের উভচর প্রাণীর প্রতীক হিসেবে মনে করেছেন। *বায়ু-পুরাণে* বর্ণিত হয়েছে যে, কশ্যপের পিতা প্রজাপতি মরীচি প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে প্রথমে জল বা অপ্-কে কামনা করেন। তারপর মরীচি সুদীর্ঘকাল জলেই বসবাস করলেন। জলের মধ্যেই জন্ম নেয় পুত্র কশ্যপ এবং এই কশ্যপই পরবর্তীকালে সমস্ত প্রাণীজগতের সৃষ্টি করেন। কশ্যপের এই জন্মবৃত্তান্ত হতে জলজ প্রাণী থেকে উভচর এবং উভচর থেকে অন্য প্রাণীর উৎপত্তির আভাস পাওয়া যায়। এই মারীচ অরিষ্টনেমীই পরবর্তীকালে কশ্যপ প্রজাপতিরূপে প্রসিদ্ধ হন। প্রসঙ্গতঃ কশ্যপের উৎপত্তি বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে—

মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রঃ কশ্যপাত্তু ইমাঃ প্রজাঃ।[৩৫]

প্রজাপতি কশ্যপ প্রজাস্রষ্টা হিসেবে এতটাই মহত্বলাভ করেছিলেন যে *বায়ু পুরাণে* তাঁকে ব্রহ্মার সমতুল্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি মন্বন্তরে যখন প্রলয়ের পর পুনরায় নতুন সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়, তখন প্রজাসৃষ্টির জন্য স্বয়ং ব্রহ্মার অংশে কশ্যপ মর্ত্যে পুনরায় অবতীর্ণ হন। প্রসঙ্গতঃ এবিষয়ে বলা হয়েছে—

কশ্যপঃ সবিতুর্বিদ্বাংস্তেন স ব্রহ্মণঃ সমঃ।
মন্বন্তরেষু সর্বেষু ব্রহ্মণোহংশেন জায়তে।।[৩৬]

জীবকুলের পিতা মহর্ষি কশ্যপ জীবনবৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, দক্ষ নিজের ত্রয়োদশ কন্যার সঙ্গে কশ্যপের বিবাহ দিয়েছিলেন।[৩৭] কিন্তু *বায়ু-পুরাণ* অনুযায়ী দক্ষ প্রথমে কশ্যপের সঙ্গে তার কন্যাদের বিবাহ দিতে সম্মতি প্রকাশ করেননি। এছাড়াও বিবাহে ইচ্ছুক কশ্যপ, দক্ষ প্রজাপতির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। এই ঘটনায় প্রজাপতি কশ্যপ ক্রুদ্ধ এবং দুঃখিত হয়ে 'কশ্য' বা

'সুরা' পান করে দক্ষের প্রতি বিস্তর চিৎকার করেন। সেই কারণেই তাঁর নামকরণ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দক্ষ প্রজাপতির ত্রয়োদশ কন্যার সঙ্গে কশ্যপের বিবাহ হয় এবং তাদের অসংখ্য পুত্র-পৌত্রের জন্ম হয়। *বৈয়াসিক মহাভারত* অনুযায়ী নিম্নে কশ্যপের সঙ্গে বিবাহিত ত্রয়োদশ দক্ষকন্যার নাম এবং তাদের সন্তানগণের নাম আলোচিত হল—

১. কশ্যপের প্রথম মহিষীরূপে উল্লিখিত হয়েছে দক্ষ কন্যা অদিতির নাম। কশ্যপ পত্নী অদিতি ছিলেন দ্বাদশ আদিত্য তথা দেবকুলের মাতা। এই দ্বাদশ আদিত্যরা হলেন— ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা এবং বিষ্ণু। এই দ্বাদশ আদিত্যগণ সকলেই কশ্যপ এবং দক্ষকন্যা অদিতির পুত্র।

২. কশ্যপের দ্বিতীয় পত্নীরূপে বর্ণিত হয়েছে দক্ষ কন্যা দিতির নাম। *বৈয়াসিক মহাভারত* অনুযায়ী কশ্যপ ও দিতির একমাত্র পুত্র হিসেবে হিরণ্যকশিপুর নাম উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন পুরাণ অনুযায়ী কশ্যপ ও দিতির পুত্ররূপে হিরণ্যাখ এবং হিরণ্যকশিপু নামে দুই পুত্র সন্তান এবং সিংহিকা নামে এক কন্যা সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। দিতির পুত্ররা অসুরকুলের অধিপতি এবং দৈত্য নামে পরিচিত হন।

পুনরায় *বৈয়াসিক মহাভারত* অনুযায়ী দিতি পুত্র হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি এবং বাস্কল নামে পাঁচ সন্তানের জন্ম হয়। হিরণ্যকশিপুর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রহ্লাদের বিরোচন, কুম্ভ ও নিকুম্ভ নামে তিন পুত্র ছিল। বিরোচন পুত্র বলি অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন এবং বলির পুত্র বাণ মহাসুর বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৩. *বৈয়াসিক মহাভারতের* প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী কশ্যপের ঔরসে তৃতীয়া পত্নী দক্ষকন্যা দনুর চল্লিশটি পুত্র জন্মায়। কশ্যপ ও দনুর পুত্রগণ হলেন— বিপ্রচিত্তি, মহাযশ, শম্বর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জয়, দানব, অয়ঃশির, অশ্বশির, অশ্বশঙ্কু, বীর্য্যবান্, গগনমূর্দ্ধা, বেগবান্, কেতুমান্, চস্, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুহুণ্ডু, মহাবল, একপাৎ, একচক্র, বিরূপ, অক্ষ, হর, আহর, নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য্য এবং চন্দ্রমা।

এছাড়াও কশ্যপ ও দনুর দানব বংশের প্রবর্ত্তকরূপে দশ সন্তানের নাম পাওয়া যায়, তারা হলেন— একাক্ষ, অমৃতপ, প্রলম্ব, নরক, বাতাপি, শত্রুতপন, শঠ, গবিষ্ঠ, বনায়ু এবং দীর্ঘজিহ্ব।

৪. *বৈয়াসিক মহাভারত* অনুযায়ী কশ্যপ ঋষির চতুর্থ পত্নীরূপে দক্ষকন্যা সিংহিকার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কশ্যপ ও সিংহিকার চার পুত্র জন্মায়, তারা হলেন— রাহু, সুচন্দ্র, চন্দহন্তা এবং চন্দ্রপ্রমর্দন।

৫. মহর্ষি কশ্যপের পঞ্চম পত্নীরূপে দক্ষকন্যা ক্রোধার নাম পাওয়া যায়। কশ্যপ ও ক্রোধার মিলনে অসংখ্য পুত্র-পৌত্রের জন্ম হয়। তার মধ্যে প্রধান চার পুত্র হলেন— গণ, ক্রোধবশ, ক্রূরকর্ম্মা ও অরিমর্দ্দন।

৬. *বৈয়াসিক মহাভারত* অনুযায়ী কশ্যপ ঋষির ষষ্ঠ পত্নীরূপে দক্ষকন্যা দনায়ুর নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। দনায়ুও কশ্যপের ঔরসে অসুরজাতীয় পুত্র লাভ করেন। দক্ষকন্যা দনায়ু ও কশ্যপের চার অসুর পুত্রের নাম পাওয়া যায়, তারা হলেন— বিক্ষর, বল, বীর এবং বৃত্র।

৭. সপ্তম দক্ষকন্যা কালা বা কালকা কশ্যপের ঔরসে কালকেয় অসুরদের পুত্ররূপে লাভ করেন। তাদের মধ্যে চারজন প্রধান ছিলেন, তারা হলেন— বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা ও ক্রোধশত্রু।

৮. কশ্যপের অষ্টম পত্নীরূপে দক্ষকন্যা বিনতার নাম পাওয়া যায়। দক্ষকন্যা বিনতা হলেন পক্ষীকুলের জন্মদাত্রী। মহর্ষি কশ্যপ ও দক্ষকন্যা বিনতার মিলনে পক্ষীরাজ গরুড় এবং সুর্যের সারথি অরুণ জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়াও তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, আরুণি ও বারুণির নাম বিনতার পুত্ররূপে উল্লিখিত হয়েছে।

৯. কশ্যপের নবম পত্নীরূপে দক্ষকন্যা কদ্রুর নাম পাওয়া যায়। কশ্যপ ও কদ্রুর মিলনে নাগ বা সর্পকুলের উৎপত্তি হয়, সেইকারণে কদ্রুর পুত্রদের সংখ্যা গণনা করা যায় না। তবে সর্পকুলের অধীশ্বর শেষ বা অনন্ত নাগ, বাসুকি, তক্ষক, কূর্ম্ম ও কুলিক প্রমুখের পৌরাণিক গুরুত্ব অপরিসীম।

১০. মহর্ষি কশ্যপের দশম পত্নীরূপে দক্ষকন্যা মুনির নাম পাওয়া যায়। দক্ষকন্যা মুনি হলেন গন্ধর্বকুলের জননী। মুনির পুত্রগণ হলেন— ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চ, সুন্দরনয়ন, বহুবাহনশালী অর্ক, কাশীপতি, সত্যবাদী, যোগী অর্কপর্ণ, ভীম, চিত্ররথ, শালিশির, পর্জ্জন্য, কলি এবং নারদ। দক্ষকন্যা মুনির পুত্ররূপে বরুণ, পর্জ্জন্য, কলি ও নারদ ছিলেন দেবতা, এছাড়া সকলেই গন্ধর্ব্ব ছিলেন।

১১. *বৈয়াসিক মহাভারত* অনুযায়ী কশ্যপ ঋষির একাদশ পত্নীরূপে দক্ষকন্যা প্রধার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কশ্যপ ও প্রাধার আট কন্যা ছিল, তারা হলেন— অনবদ্যা, মনু, বংশা, অসুরা, মার্গণপ্রিয়া, অনূপা, সুভগা এবং ভাসী। এছাড়াও কশ্যপ ও প্রাধার দশটি পুত্র সন্তান ছিল, তারা হলেন— সিদ্ধ, পূর্ণ, বর্হি (এই তিনজন দেবতা); পূর্ণায়ু, ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সুপর্ণ, বিশ্ববসু, ভানু এবং সুচন্দ্র (এই সাতজন গন্ধর্ব্ব)। পুনরায় দেবর্ষি কশ্যপ ও দক্ষকন্যার মিলনে অনে অপ্সরার সৃষ্টি হয়। অপ্সরাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলেন— অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা এবং সুপ্রিয়া। এছাড়াও অতিবাহু, হাহা, হুহূ এবং তুম্বুরু এই চারজন গন্ধর্ব ছিলেন প্রাধার পুত্র।

১২. কশ্যপের দ্বাদশ পত্নীরূপে দক্ষকন্যা কপিলার সন্তানদের তালিকাটি প্রজাতিগতভাবে বিচিত্র। কারণ *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে যে, অমৃত, ব্রাহ্মণ, গো অর্থাৎ এক শ্রেণীর গবাদি পশু এবং এক শ্রেণীর গন্ধর্ব এবং অনেক অপ্সরাও কপিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

১৩. কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীরূপে *বৈয়াসিক মহাভারতে* দক্ষ কন্যা বিশ্বার নাম উল্লিখিত হলেও তার সন্তানদের সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

- অরুণের মাতা বিনতা ছিলেন দক্ষপ্রজাপতির অষ্টম কন্যা। তবে *বাল্মিকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে যে, কশ্যপ প্রজাপতির পত্নী দক্ষকন্যা তাম্রার গর্ভে কাকী, শ্যেনী, ভাসী, ধৃতরাষ্ট্রী এবং শুকী নামে পাঁচ কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। এই পাঁচ সন্তানের মধ্যে শুকী নামক কন্যা নতা নামে এক কন্যার জন্ম দেয়। এই নতার কন্যাই হলেন বিনতা। বিনতার জন্মপ্রসঙ্গে *বাল্মিকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> শুকী নতাং বিজজ্ঞে তু নতায়া বিনতাসুতা।
> বিনতা চ শুকীপৌত্রী কদ্রুশ্চ সুরসাস্বসা।।
> দ্বৌ পুত্রৌ বিনতায়াস্তু গরুড়োঽরুণ এব চ।[৩৮]

অরুণ ছিলেন গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তপস্যার দ্বারা মহাদেবের আরোধনা করে মহেশ্বরের অনুগ্রহে তিনি সূর্যের সারথি নিযুক্ত হন। অরুণের পত্নীর নাম শ্যেণী। অষ্টম দক্ষকন্যা বিনতাপুত্র অরুণের

ঔরসে শ্যেনীর গর্ভে মহাপরাক্রমী মহাসাহসী সম্পাতি ও জটায়ু নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। অরুণের পত্নী ও পুত্রদ্বয় সম্পর্কে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে—

> অরুণস্য ভার্য্যা শ্যেনী তু বীর্যব্যন্তৌ মহাবলৌ।
> সম্পাতিং জনয়ামাস বীর্য্যবন্তং জটায়ুষম্।।[৩৯]

অরুণের বংশচিত্র নিম্নে বর্ণিত হল—

ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি + কলা (কদর্মপ্রজাপতির কন্যা)

↓

কশ্যপ ও অষ্টম দক্ষ কন্যা (পত্নী)

↓

অরুণ + শ্যেনী (পত্নী)

↓

সমাপ্তি (প্রথম পুত্র) | জটায়ু (দ্বিতীয় পুত্র)

ঘ. অষ্টাবক্র : মহর্ষি উদ্দালোকের কহোড় নামে এক শিষ্য ছিলেন। উদ্দালক ছিলেন জনৈক মহর্ষি অরুণের পুত্র ছিলেন। তাই অরুণের পুত্রের অপর নাম আরুণি। *বৈয়াসিক মহাভারতের* কাহিনী অনুযায়ী অরুণের পুত্র প্রথমে আরুণি নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু উদ্দালক নাম তার অনেক পরে হয়েছে।

বৈয়াসিক মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আরুণি মহর্ষি আপোদ্ধৌম্যের শিষ্য ছিলেন। আপোদ্ধৌম্যের প্রধান তিন শিষ্যের মধ্যে আরুণি ছিলেন অন্যতম। একদিন আপোদ্ধৌম্য তার প্রধান তিন শিষ্যের মধ্যে আরুণিকে ডেকে কৃষিজমির ভাঙা আলে বাঁধ দিতে আদেশ করেন। গুরুর আদেশ অনুযায়ী আরুণি কৃষিজমির ভাঙা আলের নিকটে পৌঁছলেন। কিন্তু কৃষিজমির আল দিয়ে ক্রমাগত জল বেরিয়ে যাচ্ছে। আরুণি কৃষিজমির ভাঙা আল মেরামত করার জন্য চেষ্টা করলেও, কোন চেষ্টাতেই জল আটকাতে পরাছিলেন না। সেই সময় দুঃখিত মনে আরুণি চিন্তা করতে লাগলেন, যেকোন উপায়ে গুরুর শষ্যক্ষেত্র রক্ষা করতে হবে। সেই মূহুর্তেই নিরুপায় আরুণি গুরুর শষ্যক্ষেত্র রক্ষা করার জন্য কৃষিজমির ভাঙা আলে শুয়ে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ আশ্রমে আরুণিকে ফিরতে না দেখে গুরু স্বয়ং সেই কৃষিজমির ভাঙা আলের কাছে পৌঁছান। কৃষিজমির

আলের কাছে গিয়ে আরুণির দ্বারা কৃষিজমিতে জল না বের হওয়ার উপায় দেখে আপোদ্ধৌম্য অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আশীর্বাদ করেন এবং তখন থেকেই তার নাম হয় উদ্দালক। উদ্দালক নাম প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

যস্মাদ্ ভবান্ কেদারখণ্ডং বিদার্য্য উত্থিতস্তস্মাদুদ্দালক এব নাম্না ভবান্ ভবিষ্যতীত্যুপাধ্যায়েনানু গৃহীতঃ।[৪০]

এরপর উদ্দালক নাম ধারণ করে তিনি বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন করে এবং তিনি নিজের আশ্রমে বেদ পাঠের ব্যবস্থা করেন। উদ্দালকের পত্নীর নাম *মহাভারতে* উল্লেখ নেই। কিন্তু *বৈয়াসিক মহাভারতে* উদ্দালকের শ্বেতকেতু নামে এক পুত্র এবং সুজাতা নামে এক কন্যা সন্তানের উল্লেখ রয়েছে।

উদ্দালকের তিনজন যাজ্ঞবল্ক্য, জনক এবং কহোড় নামে জনপ্রিয় শিষ্য ছিলেন। উদ্দালক তাঁর প্রিয় তিন শিষ্যের মধ্যে কহোড়ের সেবায় তুষ্ট ছিলেন এবং তাকে বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। শিক্ষান্তে কহোড়ের সেবায় উদ্দালক তুষ্ট হয়ে নিজ কন্যা সুজাতার সঙ্গে বিবাহ দেন।

কহোড় ও সুজাতার মিলনে অষ্টাবক্র নামে এক ঋষির জন্ম হয়। অষ্টাবক্রের বংশচিত্র নিম্নে বর্ণিত হল—

আপোদ্ধৌম্যের শিষ্য আরুণি → উদ্দালক (নামান্তর)

↓

যাজ্ঞবল্ক্য, জনক ও কহোড় (তিন শিষ্য) + শ্বেতকেতু (পুত্র) + সুজাতা (কন্যা)

↓

অষ্টাবক্র + সুপ্রভা (পত্নী)

পরিণত বয়সে অষ্টাবক্র ঋষি বদান্যের কন্যা সুপ্রভার রূপে মুগ্ধ হন এবং ঋষি বদান্যের কাছে গিয়ে সুপ্রভার পাণি প্রার্থনা করেন। ঋষি বদান্য অষ্টাবক্রকে বলেন, তিনি সুপ্রভার সঙ্গে বিবাহ দেবেন, যদি তিনি উত্তরদিকে গমন করেন। সেখানে হিমালয় পর্বত কুবেরের অলকাপুরী অতিক্রম করে প্রভু মহাদেবের বাসভূমি। মহাদেবের বাসভূমির উত্তরে এক নীলবর্ণ বন, সেখানে এক বৃদ্ধা

তপস্বিনী বাস করেন। সেই বৃদ্ধার দর্শন ও পূজা দিয়ে ফিরে এলেই তবেই ঋষি বদান্য তার কন্যা সুপ্রভার সঙ্গে অষ্টাবক্রের বিবাহ হবে।

ঋষি বদান্যের কথানুসারে অষ্টাবক্র উত্তরদিকে যাত্রা করেন। হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে তিনি কুবের শাসিত অলকাপুরীতে পৌঁছলেন। কুবের মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। অষ্টাবক্রের সন্মানে কুবেরের সভায় বিশিষ্ট অপ্সররা নৃত্য গীত করতে লাগলেন। অষ্টাবক্র অলকাপুরীতেই এক বছরের বেশি সময় কাটিয়ে দেন। পুনরায় তিনি বদান্যের আদেশ পালন করার জন্য অলকাপুরীর উত্তরে গমন করেন। অষ্টাবক্র একসময় হিমালয়, কৈলাস, মন্দর পর্বত অতিক্রম করতে করতে তিনি মন্দর পুষ্প পরিপূর্ণ মন্দাকিনী নদী এবং সেই নদীর তীরে অপূর্ব ঐশ্বর্য্যময় একটি প্রাসাদ দেখতে পান। প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হয়ে অষ্টাবক্র জানায়, তিনি অতিথিরূপে এই প্রাসাদে থাকতে চান। তখন সেই প্রাসাদের ভেতর থেকে সাতটি পরমাসুন্দরী কন্যা অষ্টাবক্রের আতিথেয়তা স্বীকার করে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। সেই সাতটি পরমারূপবতী কন্যাদের দেখে অষ্টাবক্র মুগ্ধ হলেও তিনি তার মনকে সংযত করলেন। অট্টালিকায় অষ্টাবক্র প্রবেশ করে তিনি দেখতে পান, সুসজ্জিত কক্ষে নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত এক জরাজীর্ণা বৃদ্ধা এক বহুমূল্যের পালঙ্কে উপবেশন করছেন। সেই বৃদ্ধা কখনও বৃদ্ধার মূর্তিতে কখনও বা অল্পবয়স্কা কন্যার রূপ ধারণ করে সর্বক্ষণ অষ্টাবক্রের সেবা করে, তাঁকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু অষ্টাবক্রের মন পরনারী সম্ভোগ থেকে অনাসক্ত হয়ে রইল। এই বৃদ্ধা প্রকৃতপক্ষে মূর্তিমতী উত্তর দিক। অষ্টাবক্রের ইন্দ্রিয় সংযম দেখে জরাজীর্ণা বৃদ্ধা মুগ্ধ হয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন ও পুত্র লাভের বর দেন। জরাজীর্ণা বৃদ্ধাকে প্রণাম করে অষ্টাবক্র ঋষি বদান্যের কাছে ফিরে আসেন। অষ্টাবক্রের মতো সচ্চরিত্র উপযুক্ত পাত্র পেয়ে মহর্ষি বদান্যও অত্যন্ত খুশি হন এবং কন্যা সুপ্রভার সঙ্গে প্রশস্ত নক্ষত্র প্রভৃতিযুক্ত শুভদিনে অষ্টাবক্রের বিবাহ দেন। প্রসঙ্গতঃ ঋষি বদান্যের কন্যা সুপ্রভার বিবাহ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

তমুবাচ তদা বিপ্রঃ সুতাং প্রতিগৃহাণ মে।
নক্ষত্রবিধিযোগেন পাত্রং হি পরমং ভবান্।।
অষ্টাবক্রস্তথেত্যুক্ত্বা প্রতিগৃহ্য চ তাং প্রভো! ।
কন্যাং পরমধর্ম্মাত্মা প্রীতিমাংশ্চাভবত্তদা।।[৪১]

ঙ. দ্যুমৎসেন : *বৈয়াসিক মহাভারতে* বনপর্বে সত্যবান ও সাবিত্রীর উপাখ্যান উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছে। সত্যবানের পিতা দ্যুমৎসেন এবং পত্নীরূপে সাবিত্রীর নাম পাওয়া যায়। দ্যুমৎসেন ছিলেন শাল্বদেশের এক ধার্মিক ক্ষত্রিয় রাজা। দ্যুমৎসেনের পত্নীর নাম ছিল শৈব্যা। দ্যুমৎসেন বুদ্ধিমান ও ধার্মিক হলেও, একসময় তাঁর প্রাসাদে আকস্মিক রাত্রে বর্হিশত্রুর দ্বারা আগুন লাগানো হয়। প্রাসাদে আগুন লাগায় তিনি প্রাণে বাঁচলেও, আগুনের তাপে তার চোখদুটো নষ্ট হয়ে যায়। দ্যুমৎসেনের অন্ধত্বের সুযোগে তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রী তাঁর রাজ্য দখল করে নেন। তখন দ্যুমৎসেন পত্নী শৈব্যা ও পুত্র সত্যবানকে নিয়ে বনে বসবাস করতে শুরু করেন। কিন্তু পরবর্তীসময়ে পুত্রবধূ সাবিত্রীর পুণ্যবলে দ্যুমৎসেন অন্ধ হয়েও পুনরায় দৃষ্টিশক্তি এবং রাজ্য ফিরে পান। দ্যুমৎসেনের দৃষ্টিশক্তি ও রাজ্য পুনরূদ্ধার বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উক্ত হয়েছে—

> চক্ষুষী চ স্বরাজ্যঞ্চ দ্বৌ বরৌ শ্বশুরস্য মে।[৪২]

সাবিত্রী ছিলেন মদ্র দেশের রাজা অশ্বপতি ও মালতীর কন্যা। সন্তানোৎপত্তির পূর্বকালে মালতীর নানা প্রতিবন্ধকতা থাকায় তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠের উপদেশে দেবী সাবিত্রীর আরাধনা করেন। সাবিত্রী এই একই নামে পরিচিত হলেও, দুইজনের কথা বলা হয়েছে। একজন হলেন দেবী সাবিত্রী ও অন্যজন হলেন মানবী সাবিত্রী। দেবী সাবিত্রী মদ্র অধিপতি অশ্বপতির আরাধনায় প্রসন্ন হয়ে মালতীকে সন্তানোৎপত্তি বিষয়ে বর দেন। দেবী সাবিত্রীর বরে রাজা অশ্বপতি এক কন্যা সন্তান লাভ করেন। দেবী সাবিত্রীর নামানুসারে রাজা অশ্বপতি নিজ কন্যার নাম সাবিত্রী রাখেন।

অশ্বপতির কন্যা সাবিত্রী বিবাহযোগ্য হয়ে উঠলে, নারদের মুখে শাল্ব দেশের রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানের রূপগুণের প্রশংসা শুনে, মদ্র অধিপতী অশ্বপতি দ্যুমৎসেন পুত্র সত্যবানের হাতেই কন্যা সাবিত্রীকে সম্প্রদান করেন।

চ. উপমন্যু : মহর্ষি আপোদধৌম্যের তিন শিষ্যের মধ্যে অন্যতম শিষ্য হলেন উপমন্যু। জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বীতমন্যু ও আত্রেয়ীর গর্ভজাত পুত্র হলেন উপমন্যু। বীতমন্যু বেদ ও বেদাঙ্গ বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। দারিদ্রতার কারণে উপমন্যুর পিতা-মাতা তাঁকে বাল্যকালে দুধ খাওয়াতে পারতেন না। দুধের পরিবর্তে পিটুলি গোলা করে উপমন্যুকে খাওয়াতেন। একদিন উপমন্যু পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মণের বাড়িতে নিমন্ত্রণে অন্যান্য আহার্য্যের সঙ্গে প্রকৃত দুধ পান করেন। উপমন্যু

সেদিনই দুধের স্বাদ জানতে পারলেন। সেই দিন থেকেই উপমন্যু মাতা আত্রেয়ীর কাছে খাঁটি দুধ পাওয়ার জন্য কাঁদতে থাকে। সেই সময় মাতা আত্রেয়ী উপমন্যুকে মহাদেবের আরাধনা করতে বলেন। উপমন্যু মাতা আত্রেয়ীর কথানুযায়ী মহাদেবের আরাধোনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত মহাদেবের বরে উপমন্যুর দরিদ্রতা দূর হয়, তিনি দুধ ও অন্যান্য সুস্বাদু ভোজনের অধিকারী হন। পরবর্তীসময়ে উপমন্যু ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য পাণ্ডবগণের পুরোহিত আপোদধৌম্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

এছাড়াও *বায়ু পুরাণে* বসুর পুত্ররূপে উপমন্যুর উল্লেখ রয়েছে। বসু ছিলেন মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র। *বায়ু পুরাণেও* উপমন্যুকে বেদজ্ঞ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপমন্যু ঋষির বংশধররা 'ঔপমন্যব' নামে খ্যাত হয়েছেন।[৪৩]

পুনরায় মহর্ষি বশিষ্ঠের বংশজাত ব্যাঘ্রপাদ নামে একজন বংশপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। এই ব্যাঘ্রপাদ নামক ঋষির বৈয়াঘ্রপদ্য নামে পরম্পরায় একটি গোত্র প্রচলিত হয়েছে। *বৈয়াসিক মহাভারতে* হিমালয় পর্বতে অবস্থিত আশ্রমে জনৈক উপমন্যু ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। যিনি কৃষ্ণকে মহর্ষি তণ্ডীকৃত শিবসহস্রনাম স্তোত্র শুনিয়েছিলেন। উপমন্যুকে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বৈয়াঘ্রপদ্য-গোত্রীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও উপমন্যু নিজেকে এবং মহর্ষি ধৌম্যকে ব্যাঘ্রপাদের পুত্ররূপে উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ এবিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে—

> ব্যাঘ্রপাদ ইতি খ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
> তস্যাহমভবং পুত্রো ধৌম্যশ্চাপি মমানুজঃ।।[৪৪]

চ. পৌষ্য : *বৈয়াসিক মহাভারতে* আদিপর্বের তৃতীয় অধ্যায়টি জনৈক ন্যায়পরায়ণ ক্ষত্রিয় রাজা পৌষ্যের নামানুসারে পৌষ্যপর্ব নামে খ্যাত হয়েছে। আপোদধৌম্যের তিন শিষ্যের মধ্যে অন্যতম শিষ্য হলেন বেদ। পরবর্তী সময়ে বেদ ঋষিত্ব লাভ করলে তাঁর নিকট 'উতঙ্ক' নামে এক শিষ্য শিষ্যত্ব লাভ করেন। যথাসময়ে উতঙ্কের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে গুরু বেদ তাঁকে গৃহে ফিরে গিয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করার অনুমতি দেন। কিন্তু শিষ্য উত্তঙ্ক গুরুদক্ষিণা না দিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য সম্মত হননি। গুরুদেবের উপাধ্যায়ানীর আদেশে উতঙ্ক গুরুদক্ষিণাস্বরূপ পৌষ্য রাজার

মহিষীর একজোড়া কুণ্ডল প্রার্থনা করেন। গুরুপত্নীর আদেশে যথাসময়ে উতঙ্ক বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে পৌষ্যরাজ মহিষীর দুটি কুণ্ডল গুরুদক্ষিণা স্বরূপ উপহার দেন।

মৎস্য পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার বংশধারায় যেসকল গোত্রপ্রবর্তক ঋষির নাম উল্লেখ্য রয়েছে পৌষ্য তাঁদের মধ্যে একজন।[৪৫] পুরু রাজবংশেই পৌষ্য জন্মগ্রহণ করেন। পুরু ছিলেন চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির ঔরসে দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত কনিষ্ঠ সন্তান। রাজর্ষি পুরুর বংশধরদের সম্পর্কে *বৈয়াসিক মহাভারতে* দুটি ভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। *বৈয়াসিক মহাভারতে* আদিপর্বের চুরানব্বইতম অধ্যায়ে পুরুর পত্নীরূপে বর্ণিত হয়েছে কৌশল্যা। পুরু ও কৌশল্যার মিলনে জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়াও *বৈয়াসিক মহাভারতে* একাশিতম অধ্যায়ে পুরুর পত্নীর নামরূপে পৌষ্টীর উল্লেখ রয়েছে। পুরু ও পৌষ্টীর মিলনে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন— প্রবীর, ঈশ্বর ও রৌদ্রাশ্ব। পুরুর প্রথম পুত্র প্রবীর ও শূরসেনীর মিলনে মনুস্যনামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই মনুস্যই সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন। পুরুর তৃতীয় পুত্র রৌদ্রাশ্বের সঙ্গে অপ্সরা মিশ্রকেশীর বিবাহ হয়েছিল। রৌদ্রাশ্ব ও মিশ্রকেশীর মিলনে মহাজ্ঞানী এবং মহাধনুর্ধর দশটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। তাঁরা হলেন— পৌষ্যেয়ু, কক্ষেয়ু, কৃকণেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, বনেয়ু, জলেয়ু, তেজেয়ু, সত্যেয়ু, ধর্ম্মেয়ু ও সন্নতেয়ু। প্রসঙ্গতঃ রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্র বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উক্ত হয়েছে—

> পৌষ্যেয়ুরথ কক্ষেয়ুঃ কৃকণেয়ুশ্চ বীর্য্যবান্।
> স্থণ্ডিলেয়ুর্বনেয়ুশ্চ জলেয়ুশ্চ মহাযশাঃ।।
> তেজেয়ুর্ব্বলবান্ ধীমান্ সত্যেয়ুশ্চেন্দ্রবিক্রমঃ।
> ধর্ম্মেয়ুঃ সন্নতেয়ুশ্চ দশমো দেববিক্রমঃ।।[৪৬]

রৌদ্রাষ্যের দশ পুত্রসন্তানের মধ্যে একমাত্র পৌষ্য দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় বিক্রমশালী, বিদ্বান এবং পৃথিবীর অদ্বিতীয় রাজা হয়েছিলেন। পৌষ্য রাজা যেহেতু সমগ্র পৃথিবী রাজত্ব করেছিলেন, সেই কারণে 'অনাধৃষ্টি' নামে খ্যাতিলাভ করেন। পৌষ্য রাজা প্রীতি নামক অপ্সরাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে বিবাহ করেছিলেন। পৌষ্য ও প্রীতির মিলনে মতিনার নামক এক রাজপুত্রের জন্ম হয়। পরবর্তীসময়ে রাজা হয়ে মতিনার প্রথম পুরুবংশে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন।

ছ. একলব্য : *বৈয়াসিক মহাভারতের* যুগে শ্রিংভারপুর নামে প্রয়াগ (এলাহাবাদ) উপকূলীয় অঞ্চলে বহুদূর বিস্তৃত একটি রাজ্য ছিল। এই রাজ্য ছিল অন্ত্যজ জাতির এলাকা। নিষাদরাজ হিরণ্যধনু ছিল সেই এলাকার রাজা। গঙ্গার তীরে অবস্থিত শ্রিংভারপুর ছিল সেই রাজ্যের শক্তিশালী রাজধানী। সেই সময় মগধ, হস্তিনাপুর, মথুরা, চেদি ও চান্দেরি প্রভৃতি বড় রাজ্যের মতন শ্রিংভারপুর রাজ্যের ক্ষমতা প্রবল ছিল।

শ্রিংভারপুর রাজ্যের রাজা নিষাদরাজ হিরণ্যধনু এবং রানী সুলেখা সমস্ত প্রজাদের নিয়ে সুখী ও সমৃদ্ধশালী ছিলেন। নিষাদরাজ হিরণ্যধনু ও সুলেখার মিলনে অভিদ্যুম্ন নামে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। শৈশবে অভিদ্যুম্ন অভয় নামে পরিচিত ছিলেন। শৈশবে অভয় যখন শিক্ষার জন্য গুরুকুলে যান, সেই সময় গুরু অভয়ের অস্ত্রশাস্ত্রে নিষ্ঠা ও সততা দেখে 'একলব্য' নামে সম্বোধন করেন। একলব্য তার নিজ ধনুর্বিদ্যায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই ধনুর্বিদ্যায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য গুরু দ্রোণাচার্যের আশ্রমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ *বৈয়াসিক মহাভারতের* যুগে গুরু দ্রোণ একমাত্র ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। একলব্যের পিতা হিরণ্যধনু জানতেন যে, গুরু দ্রোণাচার্য শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান করেন। এবিষয়ে হিরণ্যধনু পুত্র একলব্যকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু একলব্য আবেগ তাড়িত হয়ে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষার জন্য পিতার কথাকে অমান্য করে গুরু দ্রোণের নিকট গেলে, গুরু দ্রোণ নিষাদপুত্র একলব্যকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দেন। সেই সময় একলব্য নিজের রাজ্যে ফিরে এসে পিতা হিরণ্যধনুর নিষাদ বন্ধুর কন্যা সুনীতার সঙ্গে বিবাহ করেন।[৪৭]

বায়ু-পুরাণে একলব্যের জন্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বসুদেবের ঔরসে অশ্মকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[৪৮] একলব্যের বংশপরিচয় নিম্নে প্রদর্শিত হল—

নিষাদরাজ হিরণ্যধনু + সুলেখা (পত্নী)

↓

অভিদ্যুম্ন বা অভয়

↓

একলব্য (নামান্তর) + সুনীতা (পত্নী)

জ. শকুনি : গান্ধাররাজ সুবলের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শকুনি। তিনি *মহাভারতের* প্রধান খলনায়ক ছিলেন। সুবল কোন এক পাপের কারণে দেবতাদের কোপের ফলে সুবল রাজমহিষী সুধর্মার গর্ভে অধার্মিক শকুনির জন্ম হয়। শকুনির পিতামহের নাম ছিল নগ্নজিৎ। শকুনির জন্ম সম্পর্কে *বৈয়াসিক মহাভারতের* অংশাবতারণ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

> শকুনির্নাম যস্ত্বাসীদ্ রাজা লোকে মহারথঃ।
> দ্বাপরং বিদ্ধি তং রাজন্! সম্ভূতমরিমর্দ্দনম্।।[৪৯]

শকুনি ছিলেন গান্ধাররাজ সুবলের একশত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং সুবল কন্যা গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সেই কারণে শকুনি 'শৌবলা' নামে খ্যাত হন। শকুনির ভাইদের মধ্যে গবাক্ষ, শরভ, বিভু, সুভগ, ভানুদত্ত, বৃষক ও অচল প্রভৃতির নাম উল্লেখ্যযোগ্য। শকুনির ভাইদের মধ্যে প্রথম পাঁচজন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীম কর্তৃক নিহত হন এবং অপর দুইজন অর্জুনের বাণের দ্বারা নিহত হন।

প্রথমদিকে শকুনি ছিলেন গান্ধার রাজ্যের রাজকুমার। পরবর্তীসময়ে পিতা সুবলের মৃত্যুর পর তিনি গান্ধার রাজ্যের রাজা হন। ভগিনী গান্ধারীর বিবাহের কিছুকাল পর থেকেই শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের পরিবারভুক্ত হয়ে হস্তিনাপুরেই বসবাস করতে শুরু করেন। তার শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। শকুনির দাম্পত্য সঙ্গী হিসেবে অর্ষি নাম পাওয়া যায়। এছাড়াও শকুনি ও অর্ষির পুত্ররূপে উলূকের নাম *মহাভারতে* পাওয়া যায়। শকুনির বংশপরিচয় নিম্নে বর্ণিত হল—

নগ্নজিৎ

↓

সুবল + সুধর্মা (পত্নী)

↓

শকুনি প্রভৃতি শত পুত্র ও গান্ধারী (একমাত্র কন্যা)

↓

শকুনি + অর্ষি (পত্নী) ⟶ উলূক (একমাত্র পুত্র)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অন্তিম দিনে ভীম ও সহদেবের সহিত শকুনি ও তার পুত্র উলুকের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সহদেব শকুনির সাক্ষাতেই ভল্লের দ্বারা উলুকের শিরচ্ছেদ করেন। এরপর

পুত্র উলূককে নিহত দেখে শকুনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে সহদেবকে আক্রমণ করেন। সহদেব ও শকুনির মধ্যে যুদ্ধে শকুনির শির ভূপতিত হয়। শকুনির মৃত্যু বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উক্ত হয়েছে—

> মাদ্রীসুতস্তস্য সমুদ্যতং তং প্রাসং সুবৃত্তৌ চ ভুজৌ রণাগ্রে।
> ভল্লৈস্ত্রিভির্যুগপৎ সঞ্চকর্ত্ত ননাদ চোচ্চৈস্তরসাজিমধ্যে।।
> তস্যাশুকারী সুসমাহিতেন সুবর্ণপুঙ্খেন দৃঢ়ায়সেন।
> ভল্লেন সর্ব্বাবরণাতিগেন শিরঃ শরীরাৎ প্রমমাথ ভূয়ঃ।।[৫০]

৩.২. সমাজের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিরূপণ : সমাজ বলতে সাধারণত পরিবারের সমষ্টিকে বোঝায়। কারণ, মানুষ পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করে। সুতরাং সমাজের গঠন ও প্রকৃতি জানতে হলে পরিবারের গঠন ও প্রকৃতি জানা বিশেষ দরকার। সমাজ বলতে মূলতঃ এমন এক ব্যবস্থা বোঝায়, যেখানে একাধিক চরিত্র একত্রে কিছু নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করে একত্রে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলে। মানুষের ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি একত্র হয়ে লিখিত কিংবা অলিখিত নিয়ম-কানুন তৈরি করে, এরকম একত্র বসবাসের অবস্থাকে সমাজ বলে।

সমাজ শব্দটির প্রকৃতি প্রত্যয় হল সম্ + অজ্-ঘঞ্ নিষ্পন্ন শব্দ। অর্থাৎ সমাজ বলতে বোঝায় একসাথে যাতায়াত করা, একসাথে বসবাস ইত্যাদি। বর্ণে বর্ণে মিলনের ফলে যেমন সন্ধি হয়, তেমনি মানুষে মানুষে একসাথে যাতায়াত, একসাথে বসবাসের ফলে সৃষ্টি হয় সমাজ।

ইংরেজিতে ‘Society’ শব্দের বাংলা পরিভাষা হল সমাজ। ‘Society’ শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘Societus’ থেকে।[৫১] ‘Societus’ শব্দের অর্থ হল বন্ধুত্ব বা সঙ্গ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সমাজ বলতে যা বোঝায় তা হল সমান আচরণের ভিত্তিতে একত্রে গমন, একত্রে বসবাস ইত্যাদি। সাধারণভাবে নিবিড় পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে মানুষ যখন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় বা নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করে, তখন তাকে সমাজ বলা হয়। সমাজ বলতে সমস্বার্থ ও সমান উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ জনসমষ্টিকে বোঝায়, যাদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সামাজিক ক্রিয়াসমূহ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস তাঁর *The Psychology of Society* গ্রন্থে সমাজের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'Society is a number of like-minded individuals who know and enjoy their like mindness and therefore able to work together for common ends'.[৫২]

পুনরায় R. M. Maclver C. H. Page তাঁর *Society an Introductory Analysis (1950)* গ্রন্থে সমাজের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, "Society is a system of social relationships in and through whice we live. Society is the web of social relationship and it is always changing".[৫৩]

পুনরায় অধ্যাপক জিসবার্ট তাঁর *Fundamentals of Sociology* গ্রন্থে সমাজের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছে 'Society is general consists in the complicated network of social relationship by which every human being is inter connected with his fellowmen'.[৫৪]

উপর্যুক্ত তিন সমাজবিজ্ঞানীর সমাজের সংজ্ঞার ভিত্তিতে বলা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসরত এবং সামাজিক চাহিদা পূরণে একে অপরের সহযোগী হিসেবে কাজ করে এমন সংগঠিত জনসমষ্টিই হল সমাজ।

প্রাচীন ভারতে প্রকল্পিত সমাজের প্রধান ভিত্তি ছিল বর্ণ ও আশ্রম। বর্ণাশ্রমের অস্তিত্ব বহুকাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। বর্ণ বলতে সাধারণত আমরা রং বুঝি। কিন্তু প্রাচীন ভারতে বর্ণ বলতে জাতি (Caste) কে বোঝানো হয়েছে। সাধারণত বর্ণ চারপ্রকার, যথা— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এদের মধ্যে প্রথম তিন বর্ণকে 'দ্বিজাতি' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য জাতির দুইবার জন্ম হয়। প্রথম জন্ম হয় মাতৃগর্ভ থেকে এবং দ্বিতীয় জন্ম উৎপাদক উপনয়ন বিধি এই তিন বর্ণের পক্ষে শাস্ত্রবিহিত। এছাড়াও চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ শূদ্ররা হল 'একজাতি' কারণ এদের উপনয়নরূপ দ্বিতীয় জন্ম নেই। চতুবর্ণ প্রসঙ্গে *মনুসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।।[৫৫]

কিন্তু প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণাদি চার প্রকার মানুষের সূক্ষ্ম শরীরের রং ভিন্ন ভিন্ন ছিল, তাই তাদের পরিচয় হয়েছিল বর্ণ। যেমন ব্রাহ্মণের বর্ণ সাদা, ক্ষত্রিয়ের লোহিত, বৈশ্যের পীত এবং শূদ্রের কালো। সূক্ষ্মদর্শী ঋষিরা তাঁদের দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের সূক্ষ্মদেহের বর্ণ নির্ণয়ে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীসময়ে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ জাতিতে বিভক্ত হয়। চতুর্বর্ণ প্রসঙ্গে *পদ্ম পুরাণে* বলা হয়েছে–

> ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাং চ লোহিতঃ।
> বৈশ্যানাং পীতকশ্চৈব শূদ্রাণামসিতস্তথা।।[৫৬]

তৎকালীন সমাজে চারটি বর্ণের পাশাপাশি চারটি আশ্রমের অস্তিত্ব ছিল। মনুর ব্যবস্থায় বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। বর্ণধর্মের দ্বারা ব্যক্তির সংহতি যে জাতি, সেই জাতির জীবন নিয়মিত অতিবাহিত হত এবং আশ্রমধর্ম দ্বারা জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন সুনির্দিষ্ট হয়। এই চার প্রকার আশ্রম বিষয়ে বলা হয়েছে–

> ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
> এতে গৃহস্থপ্রভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ।।[৫৭]

বর্ণ ও আশ্রমকে ভিত্তি করে তৎকালীন যুগে সমাজব্যবস্থা নির্মিত হয়। স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ সকলেই এই চতুরাশ্রমের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একমত ছিলেন। আশ্রম ব্যবস্থায় নিজ নিজ কর্তব্যরূপ তপশ্চর্যা করা হয় বলেই এদের নাম হয়েছে 'আশ্রম'। আশ্রম প্রসঙ্গে *শব্দকল্পদ্রুম* গ্রন্থে বলা হয়েছে–

> আশ্রাম্যন্তি স্বং স্বং তপশ্চরন্তি অত্র ইতি আশ্রমঃ।[৫৮]

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই সকল মানুষের দ্বিজাতির জীবন যে চারটি আশ্রমের মধ্যে সুবিন্যস্ত ছিল, তার প্রথম পর্ব 'ব্রহ্মচর্য' অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষার কাল। মনু বলেছেন, দ্বিজাতি তাঁর জীবনের এক চতুর্থভাগ অর্থাৎ সমগ্র জীবনের চারভাগের একভাগ ব্রহ্মচর্য পালন করবেন। কিন্তু মানুষের আয়ুর কোন নির্দিষ্ট বয়স হয় না, তাই ব্রহ্মচর্য আশ্রমের কালরূপে জীবনের প্রথম এক-চতুর্থাংশকে নির্দিষ্ট করায় ঠিক কত বৎসর বিদ্যাশিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে, সে বিষয়ে একটু সন্দেহ থেকে যায়। তবে মনু অন্যত্র বলেছেন, ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে প্রত্যেক বেদের জন্য ১২ বৎসর অর্থাৎ ছত্রিশ

বৎসর কাল সময় ধরে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনটি বেদ অধ্যয়ন করার জন্য ব্রত গ্রহণ করবেন। তবে দীর্ঘ সময় বেদাধ্যয়নের জন্য ব্যয় করা সম্ভব না হলে, মোট আঠার বা নয় বৎসর বেদের অংশবিশেষ অধ্যয়ন করা যেতে পারে। বেদ বা বিদ্যাশিক্ষার সময় বিষয়ে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে—

ষট্-ত্রিংশদাব্দিকং চর্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা।।[৫৯]

সাধরণভাবে ব্রহ্মচারী দুই প্রকার, **১.** নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী **২.** উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলতে সাধরণত যে ব্যক্তি শরীর নাশ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত গুরুর শুশ্রষা করে আজীবন ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন করেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বিষয়ে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে—

যদি ত্বাত্যন্তিকং বাসং রোচয়েত্ গুরোঃ কুলে।
যুক্তঃ পরিচরেদেনমাশরীরবিমোক্ষণাৎ।।
আ সমাপ্তেঃ শরীরস্য যস্তু শুশ্রষতে গুরুম্।
স গচ্ছত্যঞ্জসা বিপ্রো ব্রহ্মণঃ শাশ্বতম্।।[৬০]

পুনরায় উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী বিষয়ে বলা হয়েছে, যে ব্রহ্মচারী সমাবর্তনকাল পর্যন্ত গুরুগৃহের নিয়ম পালন করে এবং পরে সময়মতো দার পরিগ্রহ করে গৃহস্থ ধর্মের কল্যাণকর ব্রতে নিজেকে নিয়োজিত করবেন। উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী বিষয়ে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে—

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাঽপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্যো গৃহস্থাশ্রমাবসেৎ।।[৬১]

৩.২.১. *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বর্ণনা : আদিকবি বাল্মীকি প্রণীত *রামায়ণ* ভারতবর্ষের রমণীয় সম্পদ এবং ভারতীয়দের পরম শ্রদ্ধার বস্তু। আদিকবি তাঁর হৃদয়ের অপূর্ব মাধুরী দিয়ে এই মহাকাব্যকে বিচিত্রতায় পূর্ণ করে তুলেছেন। *বাল্মীকীয় রামায়ণ* সমগ্র জাতি ও মানুষের কাছে সঠিক, উচ্চ, আদর্শের পরিপূর্ণ জীবন্ত এক চিত্রকল্প বা বিচারধারার দর্পণরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। সেই কারণে গরিবের জীর্ণ কুটীর থেকে শুরু করে ধনীর রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত রামায়ণ পাঠ করা হয়। সেই কারণেই ভারতীয় সমাজে জাগরণে

মূল্যবোধ ও লোকাচারের নিমিত্ত সর্বদা *রামায়ণের* প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আদিকবি বাল্মীকি তাঁর প্রণীত *রামায়ণে* যে চরিত্রগুলির বর্ণনা করেছেন, তা যেন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার আদর্শের এক জ্বলন্ত উদাহরণ। বাল্মীকির *রামায়ণের* ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ চরিত্রসমূহের প্রভাব সমাজ জীবনে কীভাবে পড়েছে, তার সুস্পষ্ট বর্ণনা বাল্মীকির *রামায়ণের* টীকাকাররা করেছেন বর্ণ ও আশ্রমের ভিত্তিতে। তেমনি *বাল্মীকীয় রামায়ণের* প্রতিফলিত বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রসমূহ সমাজ-জীবনকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে। *রামায়ণ* সমকালীন সমাজে অঙ্গবিকল ব্যক্তিরা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মাধ্যমে কীভাবে কখনো ঋষি বা মুনিতে, কখনও সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ, কখনো বা দেবত্বে উন্নীত হয়েছিল তা ক্রমন্বয়ে নিম্নে আলোচিত হল–

১. ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি : ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ছিলেন কশ্যপের পৌত্র ও বিভাণ্ডক মুনির পুত্র। দেবতুল্য মহর্ষি বিভাণ্ডক দীর্ঘকাল তপস্যা করে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় কোন মহাহ্রদে স্নানরতা অপ্সরা উর্বশীকে দেখে তিনি কামবিষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর বীর্য স্খলিত হয়ে সেই মহাহ্রদের জলে পড়ে। সেই সময় তৃষিতা এক ঋতুমতী হরিণী হ্রদের জলের সঙ্গে বিভাণ্ডক মুনির শুক্রপান করে গর্ভিণী হয়ে পড়েন। সেই গর্ভিণী হরিণী পূর্বজন্মে দেবকন্যা উর্বশী নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু দেবতাদের অভিশাপে হরিণীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু হরিণীরূপি দেবকন্যা যদি কোন মুনিকে প্রসব করেন, তবেই সে হরিণীরূপ থেকে পুনরায় দেবকন্যা উর্বশীর নিজ রূপ ফিরে পাবেন। যথাসময়ে বিভাণ্ডক মুনির শুক্র পান করায়, গর্ভবতী হরিণীরূপি দেবকন্যা ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এক পুত্র সন্তান জন্ম দেন। ঋষ্যশৃঙ্গ পুত্র জন্মানোর পর হরিণী পুনরায় নিজের দেবকন্যা রূপ ধারণ করে পুত্রকে বিভাণ্ডক মুনির কাছে রেখে স্বর্গে ফিরে যান। পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে একা ফেলে রেখে গেলে বিভাণ্ডক মুনির মনে অত্যন্ত ক্রোধ জন্মায়। তাই সে নিজপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে নারীদের সংশ্রব থেকে দূরে রাখার জন্য এক নির্জন ও গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। সেই থেকেই ঋষ্যশৃঙ্গ একা বেড়ে ওঠে প্রকৃতির কোলে। ঋষ্যশৃঙ্গ বাল্যকাল থেকেই অরণ্যে বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমেই তপস্যা করতে করতে জগৎখ্যাতিলাভ করেছিলেন। পিতা বিভাণ্ডকের আশ্রম গভীর অরণ্যে অবস্থিত হওয়ায় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি জন্ম থেকেই তাঁর পিতা বিভাণ্ডকেই জানতেন এবং ব্রহ্মচর্য দশায় বিভাণ্ডক আশ্রম ব্যতীত বর্হিজগতের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক ছিলনা। প্রসঙ্গতঃ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির ব্রহ্মচর্যদশা বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উক্ত হয়েছে–

ন তেন দৃষ্টপূর্ব্বোঽন্যঃ পিতুরন্যত্র মানুষঃ।
তস্মাত্তস্য মনো নিত্যং ব্রহ্মচর্য্যেঽভবন্নৃপ ! ।।[৬২]

পুনরায় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির ব্রহ্মচর্য বিষয়ে *Puranic Encyclopedia : a comprehensive dictionary with special reference to the epic and Puranic literature* গ্রন্থে বলা হয়েছে– 'Vibhāṇḍaka and Ṛṣyaśṛṅga lived together in the āśrama. Ṛṣyaśṛṅga grew up into a youth, but he had never seen anyone expect his father Vibhāṇḍaka'.[৬৩]

২. অন্ধক মুনি : বৃদ্ধ অন্ধক মুনি এবং অন্ধ মুনি পত্নী সরযূ নদীর তীরে এক আশ্রমে বসবাস করতেন। বৃদ্ধ মুনি দম্পতি এবং তাদের একমাত্র পুত্র সিন্ধু বাল্যকাল থেকেই সেই সরযূ নদীর নিকটবর্তী আশ্রমে উভয়েই ব্রহ্মচর্য্য পালন করতেন। অন্ধ মুনি ছিলেন বনবাসী ব্রাহ্মণ এবং মুনি পত্নী ছিলেন শূদ্রা। প্রসঙ্গতঃ *বাল্মীকীয় রামায়ণের* টিপ্পনিতে পুত্র সিন্ধুর মুখে অন্ধক মুনি দম্পতির রাত্রিতে শাস্ত্র চর্চা শ্রবণ বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে– "অপররাত্রে অর্দ্ধরাত্রাদূর্দ্ধভাগে। বনে স্বাধ্যায়ং পুরাণাদিশাস্ত্রপাঠং কুর্ব্বতঃ ব্রাহ্মণাচ্ছূদ্র্যাং জাতত্বেন পারশবত্বাত্তস্য বেদপ্রসঙ্গাভাবাৎ। শাস্ত্রং জিঘৃক্ষতোঽভাস্যতঃ কস্য মধুরং শব্দং শ্রোষ্যামি। কস্য বাপররাত্রেঽহং শ্রোষ্যামি হৃদয়ঙ্গমম্। অধীয়ানস্য মধুরং শাস্ত্রং বান্যদ্বিশেষতঃ"।[৬৪]

৩. কুশনাভের শতকন্যা : কুশনাভের শতকন্যারা ছিলেন রাজর্ষি কুশ ও ঘৃতাচী নামক অপ্সরার সন্তান। কুশনাভের একশত কন্যার ব্রহ্মচর্য আশ্রম বিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। *বায়ু-পুরাণের* বিবরণ অনুযায়ী রাজা কুশনাভ তাঁর একশত কন্যাকে কান্যকুব্জ নগরেই প্রাথমিক ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দান করেন।[৬৫]

৪. মন্থরা : রাজা বৃহৎশ্রভের কন্যা ছিলেন রেখা। রাজকুমারী রেখাই কুৎসিত হয়ে যাওয়ার পর মন্থরা নামে খ্যাতিলাভ করেন। কিন্তু মন্থরার ব্রহ্মচর্য বিষয়ে কোনরূপ তথ্যই *বাল্মীকীয় রামায়ণে* পাওয়া যায় না।

৫. কুবের : *বাল্মীকীয় রামায়ণ* অনুসারে কুবের ছিলেন পুলস্ত্য ঋষির পুত্র বিশ্রবা ও ভরদ্বাজ ঋষির একমাত্র কন্যা দেববর্ণিনীর সন্তান। পিতামহ পুলস্ত্য নিজ পুত্র বিশ্রবার সাথে সাদৃশ্যবশতঃ নিজ পৌত্রের বৈশ্রবণ নাম রাখেন। সেই বৈশ্রবণ বাল্যকাল থেকেই বিশ্রবার তপোবনে অবস্থান

করেন এবং সেই তপোবনেই বাল্যকাল থেকেই এক এক সহস্র বর্ষ ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালন করেন। প্রসঙ্গতঃ বৈশ্রবণের ব্রহ্মচর্য পালন বিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

স তু বৈশ্রবণস্তস্য তপোবনগতস্তথা।
ব্যবর্দ্ধত মহাতেজা হুতাহুতিরিবানলঃ।।
তস্যাশ্রমপদস্থস্য বুদ্ধির্জজ্ঞে মহাত্মনঃ।
চরিষ্যে নিয়তো ধর্ম্মং ধর্ম্মো হি পরমা গতিঃ।।[৬৬]

৬. শূর্পণখা : ঋষি বিশ্রবার দ্বিতীয় পত্নী নৈকষীর গর্ভে শূর্পণখা জন্মগ্রহণ করেন। শূর্পণখাকে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* কুৎসিত মহিলা বলে উল্লেখ্য করা হয়েছে। সেই কারণেই শূর্পণখা বাল্যজীবন লঙ্কায় দশানন রাবণের সঙ্গেই অতিবাহিত করেন এবং মাতা নৈকষীর আদেশে লঙ্কাতেই অন্য দুই ভাই কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণের সহিত প্রাথমিক শাস্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন করেন। পরবর্তী সময়ে শূর্পণখা তপস্যার দ্বারা অভিষ্ট লাভের জন্য রমণীয় গোকর্ণ আশ্রমে যান এবং সেই আশ্রমেই তার ব্রহ্মচর্যাশ্রম দশা অতিবাহিত করেন। প্রসঙ্গতঃ শূর্পণখার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

প্রাপ্স্যামি তপসা কামমিতি কৃত্বাধ্যবস্য চ।
অগচ্ছদাত্মসিদ্ধ্যর্থং গোকর্ণস্যাশ্রমং শুভম্।।[৬৭]

এছাড়াও শূর্পণখা সিদ্ধপুরুষগণের বিঘ্নকারিণী ও রৌদ্রমূর্ত্তি ছিলেন। শূর্পণখা সহ তাঁর সকল ভ্রাতারা পিতার নিকট গন্ধমাদনপর্বতে অবস্থান করে যথানিয়মে ব্রতচারী ও পিতার অনুরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা সকলেই যথাসময়ে বেদবিৎ এবং বীর যোদ্ধা হয়ে উঠেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ এবিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

সিদ্ধবিঘ্নকরী চাপি রৌদ্রা শূর্পণখা তথা।
সর্ব্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্ব্বে সুচরিতব্রতাঃ।
ঊষুঃ পিত্রা সহ রতা গন্ধমাদনপর্ব্বতে।।[৬৮]

৩.২.২. *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বর্ণনা : *বৈয়াসিক মহাভারতে* ব্রহ্মচর্য দশাকে ব্রাহ্মণপ্রদত্ত জ্ঞান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। একজন ব্রহ্মচর্যদশাগ্রস্ত ছাত্র পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়ে ইচ্ছাকে বশীভূত করে, আত্মসংযমের অনুশীলন শেখায়, কথায় ও

কাজের মাধ্যমে গুরুর প্রতি ছাত্র মনোযোগ দেওয়ার ফলে বেদ ও উপনিষদের মূর্ত সত্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। ব্যাসদেব তাঁর হৃদয়ের অপূর্ব মাধুরী দিয়ে এই মহাকাব্যকে বিচিত্রতায় পূর্ণ করে তুলেছেন। *বৈয়াসিক মহাভারত* সমগ্র জাতি ও মানুষের কাছে সঠিক, উচ্চ, আদর্শের পরিপূর্ণ জীবন্ত এক চিত্রকল্প বা বিচারধারার দর্পণরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। *বৈয়াসিক মহাভারতে* ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ চরিত্রসমূহের প্রভাব সমাজ জীবনে কীভাবে পড়েছে, তার সুস্পষ্ট বর্ণনা *বৈয়াসিক মহাভারতের* টীকাকাররা করেছেন বর্ণ ও আশ্রমের ভিত্তিতে। তেমনি *বৈয়াসিক মহাভারতে* প্রতিফলিত বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রসমূহ সমাজ-জীবনকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে। *বৈয়াসিক মহাভারত* সমকালীন সমাজে অঙ্গবিকল ব্যক্তিরা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মাধ্যমে কীভাবে কখনো ঋষি বা মুনিতে, কখনও সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ, কখনো বা দেবত্বে উন্নীত হয়েছিল তা ক্রমন্বয়ে নিম্নে আলোচিত হল—

ক. ধৃতরাষ্ট্র : চন্দ্রবংশীয় রাজা শান্তনু পুত্র বিচিত্রবীর্য এবং অম্বিকার সন্তান হলেন ধৃতরাষ্ট্র। যদিও বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বেদব্যাসের সহায়তায় অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্রের জন্মের পর নিষ্ক্রমণাদি সংস্কার কার্য করা হলে হস্তিনাপুরবাসী বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন। তারপর ভীষ্ম যথাযথ সময়ে ধৃতরাষ্ট্রকে হস্তিনাপুরেই উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করান। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধরূপে জন্মগ্রহণ করলেও ভীষ্ম ও বংশগুরু কৃপাচার্য তাকে অন্যান্য দুই ভ্রাতার সঙ্গেই পিতার ন্যায় ও গুরুর ন্যায় হস্তিনাপুরেই ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দান করেছিলেন। যথাসময়ে ধৃতরাষ্ট্র পিতামহ ভীষ্মের কাছ থেকে বেদ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন। এছাড়াও বেদাঙ্গ, রাজনীতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ধনুর্বেদ এবং অন্যান্য বিষয়েও পাণ্ডিত্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি অন্ধ হওয়ার কারণে অন্যান্য অস্ত্রচালনা শিখতে না পারলেও মল্লযুদ্ধ, দৌড়ানো, অশ্বযুদ্ধ, হস্তিযুদ্ধে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র শারীরিক দিক দিয়ে সব থেকে বেশি শক্তিশালী ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ ধৃতরাষ্ট্রের ব্রহ্মচর্য শিক্ষা এবং বীরত্বের বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে—

> ধনুর্ব্বেদহশ্বপৃষ্ঠে চ গদাযুদ্ধেঽসিচর্ম্মণি।
> তথৈব গজশিক্ষায়াং নীতিশাস্ত্রে চ পারগাঃ।।
> ইতিহাসপুরাণেষু নানাশিক্ষাসু বোধিতাঃ।
> বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞাঃ সর্ব্বত্র কৃতনিশ্চয়াঃ।।
> অন্যেভ্যো বলবানাসীদ্ধৃতরাষ্ট্রো মহামতিঃ।[৬৯]

প্রসঙ্গতঃ ধৃতরাষ্ট্রের ব্রহ্মচর্য শিক্ষা ও বীরত্বের বিষয়ে *ভারতকৌমুদী* টীকায় বলা হয়েছে— "সংস্কারৈরিতি। সংস্কারৈরুপনয়নাদিভিঃ। ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যম্। শ্রমো ধাবনাদ্যায়াসঃ ব্যায়ামো বাহুযুদ্ধাদ্যভ্যাসঃ মল্লযুদ্ধাদ্যায়াসশ্চ তাভ্যাং কুশলাস্তেষ্বেব বিষয়েষু নিপুণাঃ। অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বপৃষ্ঠারোহণপূর্ব্বকযুদ্ধে। গজশিক্ষায়াং হস্তিযুদ্ধে। ইতিহাসা রামায়ণাদয়ঃ পুরাণানি চ মার্কণ্ডেয়াদীনি তেষু, বোধিতাঃ শিক্ষকৈঃ শিক্ষিতাঃ। সর্ব্বত্র উক্তেতরেষু স্মৃত্যাদিষু, কৃতনিশ্চয়াঃ শিক্ষয়া অর্জ্জিতজ্ঞানাঃ। বলবান্ দৈহিকশক্তিশালী ইতি"।[৭০]

পুনরায় ধৃতরাষ্ট্র জন্মগ্রহণের পর থেকে ভীষ্মকর্তৃক নানা সংস্কার ও প্রাথমিক ব্রহ্মচর্য শিক্ষা বিষয়ে *Puranic Encyclopedia : a comprehensive dictionary with special reference to the epic and Puranic literature* গ্রন্থে বলা হয়েছে— "After the birth of Dhṛtarāṣṭra Vyāsa returned to forest and since then Bhīṣma stood in place of father to the children. Bhīṣma performed 'Upanayana' (investiture with Brahma-string) and other rites of the children. Dhṛtarāṣṭra, Pāṇḍū and Vidura had their education in Hastinapura. Dhṛtarāṣṭra, Pāṇḍū and the wise Vidura the three were brought up as sons by Bhīṣma, they became well educated, cultured and devotional, respectful towards vows and fasts, and of good physique, earnest in work and they became valiant youths. Learned the Vedas and Veda of archery, Clubbing, shield and swords play, Elephant-keeping, laws of chastisement, Veda Ŝāstras, allied works and epics and the Purāṇas, Pāṇḍu came out expert archer, Dhṛtarāṣṭra the strongest of all".[৭১]

খ. দীর্ঘতমস্ : মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র ঋষি দীর্ঘতমস্ ছিলেন বৈদিক ঋষি এবং বেদের একাধিক মন্ত্রের দ্রষ্টা। দেবগুরু বৃহস্পতির সঙ্গে উতথ্য পত্নী মমতার রমণের সময় গর্ভস্থ শিশু বাঁধা দেন। ফলে দেবগুরু বৃহস্পতি গর্ভস্থ শিশুটিকে জন্মান্ধ হওয়ার শাপ প্রদান করেন। প্রসিদ্ধ দেবগুরু বৃহস্পতির অভিশাপের ফলে তিনি দীর্ঘতমস্ অর্থাৎ জন্মান্ধরূপে জন্মগ্রহণ করেন। অন্ধ দীর্ঘতমস্ বাল্যকাল থেকেই পিতা উতথ্যের আশ্রমেই ব্রহ্মচর্য পালন করতেন এবং সর্বদা কঠোর তপস্যায় রত থাকতেন। কঠোর তপস্যার ফলে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই দেবগুরু বৃহস্পতির সমতুল্য ঋষিরূপে খ্যাতি লাভ করেন। প্রসঙ্গতঃ উক্ত বিষয়ে বলা হয়েছে—

> স বৈ দীর্ঘতমস্ নাম শাপাদৃষিরজায়ত।
> বৃহস্পতের্বৃহৎকীর্ত্তির্বৃহস্পতিরিবৌজসা।।[৭২]

ঋষি দীর্ঘতমস্ মহর্ষি বৃহস্পতির অভিশাপে অন্ধরূপে জন্মগ্রহণ করলেও বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য দশাতে শিক্ষা-কল্প ইত্যাদি অঙ্গশাস্ত্র, চতুর্বেদ, পুরাণাদি প্রত্যহ অধ্যয়ন করতেন। প্রসঙ্গতঃ দীর্ঘতমস্ অধ্যয়ন বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে–

> বেদানবাপ্য চতুরঃ সাঙ্গোপাঙ্গান্ সনাতনান্।
> প্রযোজয়ামাস তদা নামগুহ্যমিদং মম।।[৭৩]

প্রসঙ্গতঃ দীর্ঘতমস্ ঋষি ব্রহ্মচর্য দশাতে নানা শাস্ত্র জ্ঞান বিষয়ে *ভারতকৌমুদী* টীকায় বলা হয়েছে– "অবাপ্য অধীত্য, অঙ্গৈঃ শিক্ষাদিভিঃ, উপাঙ্গৈঃ পুরাণাদিভিশ্চ সহেতি তান্, সনাতনান্ নিত্যান্, প্রযোজয়ামাস জজাপ। আনুপূর্ব্ব্যেণ পূর্ব্বানুষ্ঠেয়গুর্ব্বাদিনমস্কারাদিনা"।[৭৪]

পুনরায় দীর্ঘতমস্-এর মাতৃগর্ভে অবস্থানরত থেকেই বিবিধ শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করা বিষয়ে *Puranic Encyclopedia : a comprehensive dictionary with special reference to the epic and Puranic literature* গ্রন্থে বলা হয়েছে– 'The child in my womb, born from Utathya's semen has alredy mastered Vedas and Vedāṁgas'.[৭৫]

গ. অরুণ : কশ্যপ প্রজাপতির অষ্টম পত্নী বিনতার গর্ভে পক্ষিরাজ গরুর এবং সূর্যের সারথি অরুণ জন্মগ্রহণ করেন। বিনতা পক্ষিকুলের জন্মদাত্রী হওয়ায়, অরুণের ব্রহ্মচর্য বিষয়ে কোনরূপ তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু *বৈয়াসিক মহাভারতে* অরুণের জন্মকালে তাঁর শারীরিক আকৃতি দেখে দেবতাগণ ভীত সন্ত্রষ্ট যাতে না হয়, সেই কারণে অরুণের স্তব করতে লাগলেন। দেবতাগণ মনে করেছিলেন যে, অরুণ জন্মকাল থেকেই ঋষি, মহাভাগ্যবান্, দেবতা (ইন্দ্র, বিষ্ণু, মহাদেব, ব্রহ্মা), পক্ষিরাজ, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও বায়ুর ন্যায় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ অরুণের বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে–

> ত্বমৃষিস্ত্বং মহাভাগস্ত্বং দেবঃ পতগেশ্বরঃ।
> ত্বং প্রভুস্তপনঃ সূর্য্যঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ।।
> ত্বমিন্দ্রস্ত্বং হয়মুখস্ত্বং শর্বস্ত্বং জগৎপতিঃ।
> ত্বং মুখঃ পদ্মজো বিপ্রস্ত্বমগ্নিঃ পবনস্তথা।।[৭৬]

ঘ. অষ্টাবক্র : কহোড় মুনির পুত্র ছিলেন অষ্টাবক্র। মহর্ষি উদ্দালকের কহোড় নামে এক শিষ্য ছিলেন। উদ্দালক কহোড়ের সেবায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং শিক্ষান্তে নিজের কন্যা সুজাতার সঙ্গে তাঁর বিবাহও দিয়েছিলেন। *বৈয়াসিক মহাভারতে* বর্ণিত হয়েছে যে, অষ্টাবক্র মাতৃগর্ভে থেকেই পিতা কহোড়ের মুখ থেকে শুনে শুনে সাঙ্গ বেদ অধ্যায়ন করেন। একদিন রাত্রে কহোড়ের মুখে বেদ পাঠ শুনে মাতৃগর্ভে অবস্থিত শিশুটি পিতার বেদপাঠ সমীচীন না হওয়ার কথা বলেন। গর্ভস্থ শিশুর দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে কহোড় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে এবং ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে জন্মানোর পর শরীরের আটটি স্থান বক্র হওয়ার অভিশাপ দেন। পিতা কহোড়ের অভিশাপে শিশুটি বক্র দেহ নিয়ে মহর্ষিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গতঃ বলা হয়েছে—

> স বৈ তথা বক্র এবাভ্যজায়দষ্টাবক্রঃ প্রথিতো বৈ মহর্ষিঃ।[৭৭]

অষ্টাবক্র জন্মগ্রহণের পর থেকেই মাতুল শ্বেতকেতুর সঙ্গেই উদ্দালক আশ্রমেই প্রতিনিয়ত শাস্ত্রচর্চা করতেন।

ঙ. দ্যুমৎসেন : *বৈয়াসিক মহাভারতের* বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল শাল্ব দেশের অন্ধ রাজা দ্যুমৎসেন। *বৈয়াসিক মহাভারতে* রাজা দ্যুমৎসেনের উল্লেখ থাকলেও তাঁর ব্রহ্মচর্য দশা বিষয়ে কোনরূপ তথ্য উল্লিখিত হয়নি।

চ. উপমন্যু : মহর্ষি আপোদধৌম্যের তিন শিষ্যের মধ্যে উপমন্যু ছিলেন উল্লেখ্যযোগ্য। ব্রহ্মচর্য দশাতে উপমন্যু গুরুভক্তি এবং নির্বিচারে গুরুবাক্য পালনের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। গুরু আপোদধৌম্য উপমন্যুকে আশ্রমের গরুগুলিকে রক্ষা করা এবং চরানোর দায়িত্ব দেন। গুরুর আদেশ অনুযায়ী উপমন্যু প্রত্যেকদিন দিনের বেলাতে আশ্রমের গরু চরাতেন এবং সন্ধ্যাকালে গুরুগৃহে গরুগুলিকে রেখে গুরুকে প্রণাম করতেন। প্রসঙ্গতঃ উপমন্যুর গুরুর আদেশ পালন বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে—

> স উপাধ্যায়বচনাদরক্ষদ্গাঃ ! স চাহনি গা রক্ষিত্বা দিবসক্ষয়ে গুরু-গৃহমাগম্যোপাধ্যায়স্যাগ্রতঃ স্থিত্বা নমশ্চক্রে।।[৭৮]

এছাড়াও উপমন্যু আপোদধৌম্যের আশ্রমে প্রত্যহ বেদাদি শাস্ত্র এবং লৌকিক শাস্ত্র পাঠ করতেন। তারও প্রমাণ মেলে যখন তিনি অন্ধ অবস্থায় গুরুর আদেশে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করেছিলেন এবং তাঁদেরকে বৈদিক ও লৌকিক বাক্যদ্বারা সন্তুষ্ট করেছিলেন।

ছ. পৌষ্য : *বৈয়াসিক মহাভারতের* বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল পুরু বংশের ন্যায়পরায়ণ ক্ষত্রিয় রাজা পৌষ্য। *বৈয়াসিক মহাভারতে* রাজা পৌষ্যের উল্লেখ থাকলেও তাঁর ব্রহ্মচর্য দশা বিষয়ে কোনরূপ তথ্য উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু পৌষ্য বাল্যকাল থেকেই দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় বিক্রম, বিদ্বান্ এবং পৃথিবীর অদ্বিতীয় রাজা হয়ে 'অনাধৃষ্টি' ও 'অন্বগ্-ভানু' নাম ধারণ করেন। এবিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে—

> অনাধৃষ্টিরভূত্তেষাং বিদ্বান্ ভুবি তথৈকরাট্।
> পৌষ্যেয়ুরথ বিক্রান্তো দেবানামিব বাসবঃ।।[৭৯]

জ. একলব্য : *বৈয়াসিক মহাভারতের* বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্র সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল শ্রিংহবেরপুরের নিষাদরাজ হিরণ্যধনু ও সুলেখার একমাত্র সন্তান একলব্য। শৈশবে একলব্য অভিদ্যুম্ন ও অভয় নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু শৈশবে অভয় যখন ব্রহ্মচর্য পালনের উদ্দেশ্যে নিষাদরাজ্যেই গুরুকুলে যান, সেই সময় গুরু অভয়ের অস্ত্রশাস্ত্রে নিষ্ঠা ও সততা দেখে 'একলব্য' নামে সম্বোধন করেন। একলব্য তাঁর নিজ অস্ত্রশাস্ত্রে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই অস্ত্রবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য গুরু দ্রোণাচার্য্যের আশ্রমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ *বৈয়াসিক মহাভারতের* যুগে গুরু দ্রোণ একমাত্র অস্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং পাণ্ডব-কৌরবদের কুলগুরু হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিল। সেই কারণে একলব্য আবেগ তাড়িত হয়ে অস্ত্রশিক্ষা লাভের জন্য গুরু দ্রোণের আশ্রমে যান। কিন্তু গুরু দ্রোণ নিষাদপুত্র হওয়ার কারণেই তাঁকে শিষ্যরূপে স্বীকার না করে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু বালক একলব্য দ্রোণকেই গুরু মেনে গহন বনে দ্রোণাচার্যের মৃণ্ময় মূর্তি তৈরি করে একমনে অস্ত্রশিক্ষা শিখতে থাকেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত গুরু দ্রোণ দিনের বেলাতে পাণ্ডব-কৌরবদের যেসকল অস্ত্রশিক্ষার কৌশল শেখাতেন, সেই সকল অস্ত্রশিক্ষা সবার অলক্ষ্যে শিখে নিয়ে রাত্রিতে একলব্য গহন বনে তা রপ্ত করেন। খুব অল্পসময়ের মধ্যে একলব্য গুরু দ্রোণের সকল অস্ত্রশিক্ষার কৌশলগুলিতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এইভাবেই

একলব্যের ব্রহ্মচর্য দশা বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ গুরু দ্রোণের প্রতি একলব্যের অত্যন্ত নিষ্ঠা ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বর্ণিত হয়েছে—

> স তু দ্রোণস্য শিরসা পাদৌ গৃহ্য পরন্তপ! ।
> অরণ্যমনুসম্প্রাপ্য কৃত্বা দ্রোণং মহীময়ম্।।
> তস্মিন্নাচার্য্যবৃত্তিঞ্চ পরমামাস্থিতস্তদা।
> ইষ্বস্ত্রে যোগমাতস্থে পরং নিয়মমাস্থিতঃ।।
> পরয়া শ্রদ্ধয়োপেতো যোগেন পরমেণ চ।
> বিমোক্ষাদানসন্ধানে লঘুত্বং পরমাপ সঃ।।[৮০]

ঋ. শকুনি : গান্ধাররাজ সুবলের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন শকুনি। শকুনির জন্ম দ্বাপর যুগের অংশে হয়েছিল। তিনি বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত ধূর্ত ও কপট ছিলেন। শকুনি বাল্যকাল থেকেই গান্ধার প্রদেশেই নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং সেখানেই ব্রহ্মচর্যকাল অতিবাহিত করেন।

৩.৩. গার্হস্থ্যদশা : স্নাতক ব্রহ্মচারী তাঁর জীবনের প্রথম পর্বে গুরুগৃহে বেদ ও তার শাখাগুলি অধ্যয়নের পর সমাবর্ত শেষ করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করতেন। জীবনের এই দ্বিতীয়ভাগে ব্রহ্মচারী সবর্ণা সুলক্ষণা নারীকে বিবাহ করে গৃহস্থ হতেন। মনুর মতে, চারটি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ গৃহস্থই অন্য তিন আশ্রমের ধারক ও পোষক। এবিষয়ে *মনুসংহিতায়* উদ্ধৃত হয়েছে—

> সর্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।
> গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্তি হি।।[৮১]

অর্থাৎ গৃহস্থ জ্ঞানের দ্বারা ও অন্নের দ্বারা অপরাপর আশ্রমগুলিকে পোষণ করে। ব্রহ্মচর্য অবস্থার পর গার্হস্থ্য অবস্থায় যাওয়াটাই বিধি, এর অন্যথা করলে প্রত্যবায় হয়। গার্হস্থ্য আশ্রম সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করতে হলে উপযুক্ত সহধর্মিণী আবশ্যক। সমাজে সবর্ণা অর্থাৎ সমানজাতীয় নারীর বিবাহে প্রশস্ত ছিল এবং দ্বিজাতিগণ তাঁদের প্রথম বিবাহ অর্থাৎ অন্য জাতীয় নারীকে বিবাহের পূর্বে সবর্ণা নারীকেই বিবাহ করতেন। প্রসঙ্গতঃ সবর্ণা নারীকে বিবাহ বিষয়ে *মনুসংহিতায়* ব্যাখ্যাত হয়েছে—

সবর্ণাঽগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ।।[৮২]

কিন্তু কোন কারণবশত যদি সেই নারীর উপর প্রীতি না জন্মায় বা পুত্রোৎপাদনরূপ ব্যাপার নিষ্পন্ন না হয় এবং তারপর কামপ্রযুক্ত স্ত্রী বিষয়ে অভিলাষ জন্মালে উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের নারীদের গ্রহণ করতে পারতেন। যেমন ব্রাহ্মণ পুরুষ, ক্ষত্রিয়া কন্যা বা বৈশ্যা কন্যাকে বিবাহ করতে পারতেন। এই রকম বিবাহকে অনুলোম বিবাহ বলা হয়। শূদ্রের পক্ষে উচ্চজাতীয় নারীকে ভার্যারূপে গ্রহণ করার নিষেধ ছিল। এইরকম বিবাহ প্রতিলোম নামে পরিচিত হলেও খুবই নিন্দিত ছিল। ব্রাহ্মণের দ্বারা ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রী; ক্ষত্রিয়ের দ্বারা বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রী এবং বৈশ্যের দ্বারা শূদ্রা স্ত্রী গ্রহণ করা যেত। কামপ্রযুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শূদ্রা নারীকে বিবাহ করতে পারতেন। কিন্তু শূদ্রা স্ত্রী গ্রহণ শাস্ত্রানুমোদিত নয় এবং মনুর মতে এইরকম বিবাহ খুবই নিন্দিত ছিল। এইসকল নিন্দাস্পদ বাদ কথা থেকে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রা কন্যার বিবাহ ব্যাপারে প্রবল আপত্তি ছিল। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই রকম বিবাহ ব্যাপারে কিছুটা আপত্তি থাকলেও, বৈশ্যের পক্ষে এই রকম বিবাহ সম্বন্ধে আপত্তি ততটা প্রবল নয়।

মনু স্ত্রীলাভের উপায়স্বরূপ আট প্রকার বিবাহের কথা বলেছেন। প্রসঙ্গতঃ *মনুসংহিতায়* ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারবর্ণের ইহলোকে ও পরলোকে ভার্যালাভের উপায়স্বরূপ যে আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ রয়েছে তা হল—

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ।।[৮৩]

আট প্রকার বিবাহ হল— **১. ব্রাহ্ম বিবাহ :** শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও চরিত্রবান্ পাত্রকে আহ্বান করে, যথোচিত অভ্যর্থনাপূর্বক কন্যাকে সুচারু বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও অলঙ্কারে ভূষিত করে পূজা ও মন্ত্রপাঠ সহকারে যথাবিধ পাত্রের হাতে যদি সম্প্রদান করা হয়, তবে সেইরূপ বিবাহকে ব্রাহ্ম বলা হয়। **২. দৈব বিবাহ :** কোন যজ্ঞে বৃত ঋত্বিককে অলংকারাদি দ্বারা ভূষিত করে কন্যাদান প্রথাকে দৈব বিবাহ বলা হয়। **৩. আর্ষ বিবাহ :** ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুসারে বরের কাছ থেকে এক জোড়া গরু নিয়ে উক্ত বরকে কন্যাদান করা হয় যে বিবাহে, সেই বিবাহকে আর্ষ বিবাহ বলা হয়। **৪.**

প্রাজাপত্য বিবাহ : বরের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে, যথাবিধি অলঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা সমাদর করে, বরের হাতে যথাবিধ কন্যা সম্প্রদানকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলা হয়। **৫. আসুর বিবাহ :** কন্যাকে এবং কন্যার পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে যথাসম্ভব ধনদানপূর্বক স্বেচ্ছানুসারে কন্যাগ্রহণ করার প্রথাকে বলে আসুর বিবাহ। **৬. গান্ধর্ব বিবাহ :** বর ও কন্যার পরস্পর অনুরাগবশতঃ যে সংযোগ বা মিলন হয় তাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে। **৭. রাক্ষস বিবাহ :** বাধাপ্রদানকারী কন্যাপক্ষীয়গণের আত্মীয়স্বজনকে বিনাশ করে বা কোন যুদ্ধে জয়লাভ করে, ক্রন্দনরতা কন্যাকে গৃহ থেকে বলপূর্বক অপহরণ করে বিবাহ করার প্রথাকে রাক্ষস বিবাহ বলা হয়। **৮. পৈশাচ বিবাহ :** নিদ্রাভিভূতা, মদ্যপানের ফলে বিহ্বলা বা রোগাদির দ্বারা উন্মত্তা কন্যার সাথে যদি গোপনে বা প্রকাশ্যে সম্ভোগ করা হয়, তাহলে তা পৈশাচ বিবাহ নামে অভিহিত হবে। আট প্রকার বিবাহের মধ্যে পৈশাচ বিবাহ সর্বাপেক্ষা অধম বলে গণ্য হত। ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্ম বিবাহ, দৈব বিবাহ, আর্ষ বিবাহ, প্রাজাপত্য বিবাহ, আসুর বিবাহ এবং গান্ধর্ব বিবাহ প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আসুর বিবাহ, গান্ধর্ব বিবাহ, রাক্ষস বিবাহ এবং পৈশাচ বিবাহ বিহিত ছিল। বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর বিবাহ, গান্ধর্ব বিবাহ এবং পৈশাচ বিবাহ বিহিত ছিল।

পিতা-মাতাকে সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধাকে সন্তানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা মহৎ কাজ বলে স্মৃতিকারগণ ঘোষণা করেছেন। পুত্র পিতা-মাতাকে যদি ভরণ-পোষণ না করেন এবং পিতামাতাও যদি পুত্রের রক্ষা-বিধানে যত্নবান্ না হন, তাহলে উভয়েই নিন্দনীয় হবেন। পরিবারের মধ্যে যদি কেউ জাতিভ্রষ্ট বা চরিত্রভ্রষ্ট হয়, তাহলে তাকে সমাজ থেকে ত্যাগ করার বিধান *মনুসংহিতায়* উল্লেখ রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ এবিষয়ে বলা হয়েছে—

> ন মাতা ন পিতা ন স্ত্রী ন পুত্রস্ত্যাগমর্হতি।
> ত্যজন্নপতিতানেতান্ রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্।।[৮৪]

৩.৩.১. *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের উপর্যুক্ত বিবাহের বর্ণনা : বিবাহ ঈশ্বর সৃষ্ট একটি সামাজিক বন্ধন। বিবাহ মানে দার পরিগ্রহ, পরিণয় ইত্যাদি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ একটি নারীর সঙ্গে একটি পুরুষের শাস্ত্রনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বৈধ মিলনই বিবাহ। বিবাহ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়— বি পূর্বক বহ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়ের দ্বারা। যার অর্থ বিশেষ ভাবেবহন করা। একজন নারী ও একজন পুরুষের সর্বাত্ম মিলনে গঠিত হয় একটি

পরিবার, কয়েকটি পরিবার নিয়েই হয় একটি সমাজ। জীবনের একটা শ্রেষ্ঠতম ঘটনা হল বিবাহ। বিবাহই একটা সুস্থ এবং বিধিসম্মত সমাজ গঠন করতে সক্ষম। সমাজ গঠনে একটি সুন্দর বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের বিবাহচিত্র কীরূপ ছিল তা নিম্নে আলোচিত হল—

১. ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি : ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি পিতা বিভাণ্ডক মুনির সঙ্গে নির্জন অরণ্যের আশ্রমেই বসবাস করতে করতে তপস্যার দ্বারা খ্যাতিলাভ করেন। এক সময় অঙ্গদেশে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হয়। অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণদেরকে অনাবৃষ্টি নিবারণের প্রতিকার করতে বলেন। ব্রাহ্মণগণ তখন লোমপাদ রাজাকে উপদেশ দেন, যেকোন উপায়ে বিভাণ্ডক মুনির পুত্র বেদ ও তর্কশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং স্থিরচিত্তে কন্যা শান্তার সঙ্গে বিবাহ দিলেই অঙ্গরাজ্যে বৃষ্টি হবে। যদিও অঙ্গরাজ লোমপাদ প্রকৃতপক্ষে সন্তানহীন ছিলেন। সেই কারণেই লোমপাদের সন্তাপ নিবারণের জন্য অঙ্গরাজের পরমমিত্র রাজা দশরথ তাঁর উত্তমা কন্যা শান্তাকে লালন-পালন করার জন্য তাঁকে দান করেন। সেই কারণে অঙ্গরাজ লোমপাদ ছিলেন শান্তার পালিত পিতা। দশরথ কন্যা শান্তাকে সন্তানহীন লোমপাদের হস্তে দান বিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> শ্রুত্বা দশরথো বাক্যং প্রকৃত্যা করুণাত্মকঃ।
> দাস্যতে তাং তদা কন্যাং শান্তামঙ্গাধিপায় সঃ।।
> প্রতিগৃহ্য চ তাং কন্যাং স রাজা বিগতজ্বরঃ।[৮৫]

অঙ্গরাজ্যের পুরোহিত ও অমাত্যরা ঋষ্যশৃঙ্গকে লোমপাদের রাজ্যে আনার কথা বললেও, বিভাণ্ডক মুনির ভয়ে কেউই ঋষ্যশৃঙ্গকে আনার দায়িত্ব নিতে চাইলেন না। অবশেষে মন্ত্রীদের পরামর্শে লোমপাদ রাজা একদল বারাঙ্গনাকে দায়িত্ব দিলেন বনেচর ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে আসার। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি নারী বিষয়ে কিছুই জানতেন না, সেই কারণে ছলনাময়ী বারাঙ্গনারা তাঁকে প্রতারণা করে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে আসেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি অঙ্গরাজ্যে প্রবেশ করা মাত্রই ইন্দ্রদেব প্রসন্ন হয়ে বৃষ্টি দান করলেন। লোমপাদ রাজা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সঙ্গে কন্যা শান্তার শাস্ত্রবিহিত দৈব পদ্ধতিতে বিবাহ দেন। 'দৈব' শব্দের অর্থ দেবসম্বন্ধী বা দেবভাবসম্পন্ন। কারণ রাজা লোমপাদের কাছে দৈব বিধান আসে যে, তিনি যেন তাঁর কন্যা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সঙ্গে বিবাহ দেন।

প্রসঙ্গতঃ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সঙ্গে লোমপাদ কন্যা শান্তার দৈব বিবাহ বিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> দদৌ চাস্মৈ তদা কন্যাং ভার্য্যাং কমললোচনাম্।
> শান্তাং শান্তেন মনসা দত্ত্বা হর্ষমবাপঃ সঃ।।
> এবং স ন্যবসত্তত্র তেন রাজ্ঞাভিপূজিতঃ।
> ঋষ্যশৃঙ্গো মহাতেজাঃ শান্তয়া সহ ভার্য্যয়া।।[৮৬]

ঋষ্যশৃঙ্গ বিবাহের পর পত্নী শান্তার সঙ্গে অঙ্গদেশেই বসবাস করতে লাগলেন। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা সনৎকুমার উপর্যুক্ত ঘটনাবলী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

২. অন্ধক মুনি : *বাল্মীকীয় রামায়ণের* 'অযোধ্যা কাণ্ডে' বর্ণিত হয়েছে বৃদ্ধ অন্ধক মুনি এবং অন্ধ মুনি পত্নীর অরণ্যে কাটানো গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনী। অন্ধক মুনি নিজে বনবাসী ব্রাহ্মণ এবং তাঁর স্ত্রী শূদ্রা ছিলেন। উভয়ের মধ্যে অনুলোম বিবাহ সম্পন্ন হয়। সরযূ নদীর তীরে এক আশ্রমে অন্ধ মুনি দম্পতি বসবাস করতেন। অন্ধ মুনি দম্পতির বিবাহের পরবর্তী সময়ে সরযূ নদীর তীরে নির্জন আশ্রমে বসবাস প্রসঙ্গে অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত *বাল্মীকীয় রামায়ণের* টিপ্পনীতে বলা হয়েছে—

> অমূ হি কৃপণাবন্ধাবনাথৌ বিজনে বনে।
> মদীয়ৌ পিতরৌ বৃদ্ধৌ প্রতীক্ষেতে মমাশয়া ।।[৮৭]

৩. কুশনাভের শতকন্যা : রাজা কুশনাভ ও ঘৃতাচী নামক অপ্সরার মিলনে একশত কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাজা কুশনাভের এই একশত কন্যা পরিণত বয়স প্রাপ্ত হলে পবন দেবতা তাদের শারীরিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করতে চান। বায়ু দেবতা কর্তৃক এইরূপ বিবাহে কুশনাভের কন্যাগণ অসম্মতি প্রকাশ করেন। সেইমূর্হুতেই ক্রোধবশতঃ বায়ুদেব রাজা কুশনাভের শতকন্যাদের শরীরে প্রবেশ করে তাঁদের শরীর ভগ্ন করে দেন। কন্যারা রাজা কুশনাভের কাছে গিয়ে বায়ুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। শতকন্যারা তাদের কুলের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখায় কুশনাভ কন্যাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং শতকন্যাদের যোগ্যপাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবেন বলে মনোস্থির করে বিবাহ বিষয়ে অমাত্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে থাকেন। অমাত্যদের পরামর্শে সেই সময় চূলী নামক ঊর্দ্ধরেতা এক মহান ঋষিপুত্রের সন্ধান পান।

সেই সময় চূলী নামে এক ঋষি কুশনাভের রাজ্যেই কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করছিলেন। সেই দুশ্চর তপশ্চর্য্যারত চূলী ঋষিকে ঊর্ণায়ুকন্যা সোমদা নামক গন্ধর্বী পুত্রলাভার্থে কঠোর নিয়মে পরিচর্য্যা করতেন। বহুকাল চূলী ঋষির পরিচর্যার কারণে সোমদাকে ঋষি প্রসন্ন হয়ে অভিলাষিত ব্রহ্মদত্ত নামে এক পুত্র প্রদান করেন।

ব্রহ্মদত্ত ছিলেন ইন্দ্রের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন কাম্পিল্য নগরের রাজা। সেই কাম্পিল্য নগরের রাজা ব্রহ্মদত্ত নামক রাজার হাতে ব্রাহ্ম বিবাহ অনুযায়ী কুশনাভ শতকন্যা দান করেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত কন্যাগণের পাণিস্পর্শ করামাত্রই পুনরায় তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ব্যথামুক্ত, রূপ-ঔদার্য্য প্রভৃতি ফিরে পেলেন। প্রসঙ্গতঃ এবিষয়ে বলা হয়েছে—

> স তমাহূয় ধর্ম্মজ্ঞো ব্রহ্মদত্তং মহীপতিম্।
> দদৌ কন্যাশতং তস্মৈ সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা।।
> যথাক্রমং স সর্ব্বাসাং তাসামনুপমদ্যুতিঃ।
> জগ্রাহ বিধিবৎ পাণীন্ ব্রহ্মদত্তো নরাধিপঃ।।[৮৮]

রাজা কুশনাভ সেই কন্যাগণের দোষ নির্মুক্ত দেখে পরম বিস্ময় প্রকাশ করলেন এবং আনন্দে কন্যাগণকে অভিনন্দন জানালেন। তারপর রাজা কুশনাভ ব্রহ্মদত্তকে বিবাহিত পত্নীগণের সঙ্গে সংস্কারপূর্বক কাম্পিল্য নগরে প্রেরণ করেন। অনুরূপ পত্নীগণের সঙ্গে পুত্র ব্রহ্মদত্তকে দেখে মাতা সোমদা অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁদের আশীর্বাদস্বরূপ অভিনন্দন জানালেন।

৫. কুবের : কুবের হলেন পুলস্ত্য ঋষির পুত্র বিশ্রবা ও ভরদ্বাজ ঋষির কন্যা দেববর্ণিনীর পুত্র। বাল্যকাল থেকে কুবের কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। পরিণত বয়সে কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে পিতামহ ব্রহ্মা তাঁকে পুষ্পক রথ দান করেন এবং মহাদেবের সঙ্গে সখ্যতা সৃষ্টি করেন। কুবেরের বসবাসের জন্য ব্রহ্মা বাসস্থান নির্দেশ না করায়, পিতা বিশ্রবাকে তিনি বাসস্থান নির্দেশ করতে বলেন। বিশ্রবা বিশ্বকর্মা নির্মিত ত্রিকূট পর্বতের শিখরে লঙ্কানগরী রাজধানী হিসেবে দান করেন। পিতা বিশ্রবার ধর্মসঙ্গত বচন শুনে কুবের ত্রিকূট পর্বতশীর্ষে নির্মিত লঙ্কায় বসবাস করতে লাগলেন এবং সেই সময় থেকে লঙ্কার অধিপতিরূপে কুবের আনন্দিতচিত্তে আসীন ছিলেন। লঙ্কায় অধিপতি আসীন থাকাকালীন যক্ষদের অধিপতি ঈশ্বরীকে বিবাহ করেন। কুবের ও ঈশ্বরীর মিলনে 'কুণ্ড' নামে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে *স্কন্দ পুরাণে* বলা হয়েছে—

তস্য ভার্যা মহারাজ ঈশ্বরীতি চ বিশ্রুতা।
যক্ষো যক্ষাধিপঃ শ্রেষ্ঠস্তস্য কুণ্ডোঽভবৎ সুতঃ।।[৮৯]

আবার *বৌদ্ধতন্ত্রে* কুবেরের পত্নীরূপে বসুধারার নাম পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ বসুধারা সম্বন্ধে বলা হয়েছে– "Vasudhārā, Goddess of Abundance, is the Śakti of Kubera, god of wealth. She is always represented as having one head, but may have from two to six arms, and wears all the Bodhisattva ornaments. When she has but two arms, the left hand holds a spike of grain, while the right holds a vase out of which pours a quantity of jewels".[৯০]

পুনরায় *বায়ু-পুরাণ* অনুযায়ী কুবেরের পত্নীর নাম হল ঋদ্ধি। এই ঋদ্ধির গর্ভে কুবেরের একটি 'নলকূবর' নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

যেহেতু কুবেরের অর্দ্ধদেহ পুলস্ত্যের ন্যায় ছিল, সেই কারণে পিতা বিশ্রবা কুবেরের উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন। তাই পিতাকে তুষ্ট করার জন্য কুবের পুষ্পোৎকটা, রাকা ও মালিনী এই তিন অপ্সরাকে পরিচারিকারূপে বিশ্রবার কাছে পাঠান। বিশ্রবার ঔরসে পুষ্পোৎকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, রাকার গর্ভে খর ও শূর্পণখা এবং মালিনীর গর্ভে বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন।[৯১]

রাবণ পরবর্তীকালে লঙ্কার অধিকার প্রার্থনা করেন এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরের কাছে তাঁর দূত প্রহস্তকে পাঠান। কুবের প্রহস্তকে বলেন, তাঁর যা কিছু রয়েছে ভাই হিসেবে রাবণও তাঁর অধিকারী। পরে তিনি তাঁর পিতার কাছে এই বিষয়ে পরামর্শ চাইলে, বিশ্রবা কুবেরকে কৈলাস পর্বতের কাছে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে বাস করার পরামর্শ দেন। সেই সময় থেকেই স্বপত্নী সহ কুবের কৈলাস পর্বতের কাছে গন্ধমাদন পর্বতে বসবাস করতে থাকেন।

৬. <u>শূর্পণখা</u> : শূর্পণখা বাল্যকালে মীনাক্ষী এবং দীক্ষা নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর নখের আকৃতি চাঁদের ন্যায় হওয়ায় তিনি 'চন্দ্রনখা' নামে পরিচিত ছিলেন। পরিণত বয়সে শূর্পণখা তাঁর মাতা নৈকষী এবং মাতামহী কেতুমতির মতোই সুদর্শনা ছিলেন। অভিষিক্ত রাক্ষসরাজ রাবণ ভাতৃদ্বয়ের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে বিবাহযোগ্যা রাক্ষসী ভগিনী শূর্পণখার বিবাহের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। পরবর্তী সময়ে রাক্ষসরাজ রাবণ ভগিনী শূর্পণখাকে কালকাসুর পুত্র দানবরাজ বিদ্যুদ্-জিহ্বের

সঙ্গে বিবাহ দেন। প্রসঙ্গতঃ রাবণ কর্তৃক দানবরাজ বিদ্যুদ্-জিহ্বের হাতে শূর্পণখার সম্প্রদান বিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

স্বসারং কালকেয়ায় দানবেন্দ্রায় রাক্ষসীম্।
দদৌ শূর্পণখাং রাজা বিদ্যুজ্জিহ্বায় নামতঃ।।[৯২]

৭. ধৃতরাষ্ট্র : পাণ্ডুর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হবার পর কুরু প্রবীন ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বিবাহের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। সত্যবতীর দুই পুত্রের অকাল মৃত্যুতে এবং হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনের শূন্যতা ভীষ্ম দেখেছেন। সেই কারণে এইরূপ রাজবংশের শূন্যতা তিনি কখনোই চাননি। তাই তিনি বিদুরের সঙ্গে কুরুরাজকুমারের বিবাহ বিষয়ে আলোচনা করলেন যে, এই বিবাহ এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে করে কুরুবংশের বৃদ্ধি সাগরের মতো হয়, এমন উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করছেন। ভীষ্মের কানে পৌঁছেছে যে, গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা গান্ধারী মহাদেবের কাছ থেকে শতপুত্রের জননী হওয়ার বর পেয়েছেন। ভীষ্ম সেই কারণে অনেক বিবেচনা করে গান্ধারীকেই ধৃতরাষ্ট্রের উপযুক্ত পত্নী বলে মনোনীত করলেন। কিন্তু ভীষ্মের মনে চিন্তা ছিল যে, রূপে, গুণে এবং বংশমর্য্যাদায় ধৃতরাষ্ট্র উপযুক্ত পাত্র হলেও, তার জন্মান্ধ হওয়ায় গান্ধাররাজ সুবল তাঁর কন্যাকে অন্ধ পাত্রের হাতে তুলে দিতে সম্মত নাও হতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে গান্ধাররাজ সুবল ধৃতরাষ্ট্রের বংশমর্য্যাদা, গুণ, যশ ও ব্যবসার বিষয় পর্যালোচনা করে গান্ধারীকে ধৃতরাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করবেন বলে সঙ্কল্প করলেন—

কুলং খ্যাতিঞ্চ বৃত্তঞ্চ বুদ্ধ্যা তু প্রসমীক্ষ্য সঃ।
দদৌ তাং ধৃতরাষ্ট্রায় গান্ধারীং ধর্মচারিণীম্।।[৯৩]

তারপর গান্ধারী শুনলেন পিতা সুবল তাঁর জন্য যে স্বামী মনোনীত করেছেন তিনি জন্মান্ধ। ধর্মচারিণী গান্ধারী পিতামাতার মতের বিরুদ্ধচারণ করলেন না। উপরন্তু ভাবী স্বামীর প্রতি সহানুভূতিতে সমবেদনায় তাঁর মন ভরে উঠেছিল। কারণ যাঁর সঙ্গে গান্ধারীর বিবাহ হবে সেই ব্যক্তি কখনোই এই সুন্দর পৃথিবীর রূপ-রস সহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কিছুই চক্ষু দিয়ে অনুভব করতে পারবেন না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের সহধর্মিনী হয়ে গান্ধারী জগৎকে দুচোখ দিয়ে দেখবেন এমন বিষয়টি তিনি কখনোই চাননি। সেই কারণে গান্ধারী একটি পট্টবস্ত্র অনেকগুলি ভাঁজ করে সেই

কাপড়খানি দিয়ে নিজের চোখ বেঁধে ফেলে কৃত্রিম অন্ধত্ব স্বীকার করলেন। বিবাহের পূর্বে স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের ব্যথার ব্যথী হবার গান্ধারী চেষ্টা করেন। সেই কারণে সারাজীবন তিনি তপস্বিনীর মতো ধৃতরাষ্ট্রের নেত্রহীনতার সহচরী হয়ে রইলেন। প্রসঙ্গতঃ গান্ধারীর কৃত্রিম অন্ধত্ব স্বীকার বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

ততঃ সা পট্টমাদায় কৃত্বা বহুগুণং শুভা।
ববন্ধ নেত্রে স্বে রাজন্! পতিব্রতপরায়ণা।
নাতিশিষ্যে পতিমহমিত্যেবং কৃতনিশ্চয়া।।[৯৪]

তারপর যথাসময়ে গান্ধার রাজ সুবলের পুত্র শকুনি পরমসুন্দরী ভগিনী গান্ধারীকে বিবাহের উপযুক্ত সাজে সাজিয়ে, যৌতুক উপহার সঙ্গে নিয়ে হস্তিনাপুরে পৌঁছলেন। শকুনি অত্যন্ত আদরপূর্বক ভগিনীকে ধৃতরাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করলেন এবং ভীষ্মের অনুমতিক্রমে মহাসমারোহে ব্রাহ্ম বিবাহ পদ্ধতি অনুযায়ী ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারীর বিবাহ বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

তাং ততো ধৃতরাষ্ট্রায় দদৌ পরমসৎকৃতাম।
ভীষ্মস্যানুমতে চৈব বিবাহং সমকারয়ৎ।।[৯৫]

পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারীর ভীষ্মের অনুমতিক্রমে মহাসমারোহে বিবাহ সম্পন্ন হওয়া বিষয়ে *Puranic Encyclopedia : a comprehensive dictionary with special reference to the epic and Puranic literature* গ্রন্থে বলা হয়েছে— "Dhṛtarāṣṭra came of marriageable age. Bhīṣma had heard about Gāndhārī, daughter of Subala, the king of Gāndhāra, as a beautiful damsel of good qualities. Moreover, she had acquired a boon from Śiva that hundred sons would be born to her. Bhīṣma sent a messenger to Subala with a request to give Gāndhārī as wife to Dhṛtarāṣṭra. Subala was not much pleased at the aspect of getting a blind man as son-in-law. Still, he thought of the prestige his family would get by a marriage alliance with the kings of the Pūru Dynasty, and finally agreed. Gāndhārī submitted to the will of her father, and to live with a husband who was blind. She tied her eyes with a cloth. Śakuni the son of Subala brought Gāndhārī to Hastināpura, and gave her to Dhṛtarāṣṭra. With the sanction of Bhīṣma their marriage took place".[৯৬]

পুনরায় গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বিবাহ করে শুধু যে স্বামীকে অতিক্রম করলেন না বা স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের ব্যাথার ব্যথী হলেন তাই নয়, বরং স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্র এবং মনস্তত্ত্বও দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারী বুঝলেন অত্যন্ত ভালোভাবে। গান্ধারীর স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি নিষ্ঠা এবং আচার-ব্যবহার শ্বশুরালয়ের সকলকে যেমন মুগ্ধ করে দিলেন, তেমনই ধৃতরাষ্ট্র হয়তো স্বামী হিসেবে স্ত্রীর এই নিষ্ঠায় খুশিই হয়েছিলেন বলে আমরা ধারণা করতে পারি। কারণস্বরূপ বল যায় যে, অন্ধ বলে তিনি রাজ্য লাভ করেননি, এমন অবস্থায় তাঁর পত্নী গান্ধারী যদি চক্ষুষ্মতী হয়ে জগতের রূপ-রস অনুভব করার অবস্থায় থাকতেন তাহলে তাঁর মানসিক জটিলতা কিছু কম হতনা, বরং আরও বাড়ত। এমতাবস্থায় যিনি স্বামীর ব্যথার ব্যথী হয়ে স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব বরণ করে নিয়েছেন, তাঁকে অনেক সহজে সাদরে গ্রহণ করে ধৃতরাষ্ট্র জীবনে স্বাগত জানাতে পেরেছিলেন।

• পুনরায় *বৈয়াসিক মহাভারতে* গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের বর্ণনা পাওয়া গেলেও, গান্ধারীর বৈশ্যা দাসীও ধৃতরাষ্ট্রের ভোগ্যা ছিলেন সে বিষয়েও স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র একাধিক বিবাহ করেছিলেন বা গান্ধারী ছাড়াও ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য বহু পত্নী ছিলেন একথা *বৈয়াসিক মহাভারতে* তেমনভাবে উল্লেখিত হয়নি। তবে বিস্তারিতভাবে আলোচিত না হলেও *বৈয়াসিক মহাভারতের* সভাপর্বে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন যুধিষ্ঠির যখন পাশা খেলায় দ্রৌপদীকে পণ রাখলেন এবং পরাজিত হলেন। তখন দুঃশাসন দাসী দ্রৌপদীকে ভ্রাতা দুর্যোধনের আদেশে সভাকক্ষে আনার জন্য রাজঅন্তঃপুরে যান এবং রজস্বলা, একবস্ত্র পরিহিতা অবস্থাতেই দ্রৌপদীকে কেশ আকর্ষণ করে দুঃশাসন সভায় টেনে আনার চেষ্টা করতে থাকেন। সেই সময় দুঃশাসনের হাত থেকে বাঁচার জন্য দ্রৌপদী ছুটে গিয়েছিলেন অন্তঃপুরের সেই স্থানে যেখানে গান্ধারী বাদে ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য পত্নীরা ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ এবিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> ততঃ সমুত্থায় সুদুর্ম্মনাঃ সা বিবর্ণমামৃজ্য মুখং করেণ।
> আর্ত্তা প্রদুদ্রাব যতঃ স্ত্রিয়স্তা বৃদ্ধস্য রাজ্ঞঃ কুরুপুঙ্গবস্য।।[৯৭]

কিন্তু বৃদ্ধ রাজার অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী শব্দে বহুবচন ব্যবহৃত হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের একাধিক পত্নী ছিলেন কিংবা রাজ অন্তঃপুরে ধৃতরাষ্ট্রের ভোগ্যা বেশ কয়েকজন নারী ছিলেন এবিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ *বৈয়াসিক মহাভারতে* রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ এবিষয়ে হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য রচিত

ভারতকৌমুদী টীকায় বলা হয়েছে— "স্ত্রিয়ো গান্ধরীতরা বোদ্ধব্যাঃ, পরত্র গান্ধধার্য্যা বিমতপ্রকাশনেনাত্রাপি তথাত্বসম্ভবাৎ। যতো যস্মিন্ স্থানে স্থিতা ইতি শেষঃ"।[৯৮]

৮. দীর্ঘতমস্ : দীর্ঘতমস্ অন্ধরূপে জন্মগ্রহণ করলেও তপস্যার প্রভাবে বৃহস্পতির সমতুল্য ঋষিরূপে খ্যাতি লাভ করেন। এছাড়াও বেদজ্ঞ পণ্ডিত দীর্ঘতমস্ বিদ্যার বলে প্রদ্বেষী নামে এক সুন্দরী ও যুবতি ব্রাহ্মণ কন্যাকে দৈব বিবাহ প্রদ্ধতিতে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গতঃ দীর্ঘতমস্-এর বিবাহ বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

জাত্যন্ধো বেদবিৎ প্রাজ্ঞঃ পত্নীং লেভে স বিদ্যয়া।
তরুণীং রূপসম্পন্নাং প্রদ্বেষীং নাম ব্রাহ্মণীম্।।[৯৯]

৯. অরুণ : অরুণ ছিলেন গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তপস্যার দ্বারা মহাদেবের আরাধোনা করে মহেশ্বরের অনুগ্রহে তিনি সূর্যের সারথীরূপে নিযুক্ত হন। অরুণের পত্নীর নাম শ্যেনী। শ্যেনী ছিলেন কশ্যপ ও তাম্রাদেবীর পাঁচ সন্তানের মধ্যে একজন। কশ্যপ ও তাম্রাদেবীর পরামর্শেয় অরুণের সঙ্গে শ্যেনীর প্রাজাপত্য বিবাহ পদ্ধতিতেই গাহর্স্থ্য ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে কন্যাকে সম্প্রদান করেন। অরুণের পত্নী সম্পর্কে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে—

অরুণস্য ভার্য্যা শ্যেনী তু বীর্য্যবন্তৌ মহাবলৌ।[১০০]

১০. অষ্টাবক্র : মহর্ষি অষ্টাবক্র পরিণত বয়সে ঋষি বদান্যের কন্যা সুপ্রভার রূপে মুগ্ধ হন এবং ঋষি বদান্যের কাছে গিয়ে সুপ্রভার পাণি প্রার্থনা করেন। কারণ বসন্তকালে ফুলে ভরা বনশ্রেণির মতো আয়তলোচনা সুপ্রভাকে দেখেই মহর্ষি অষ্টাবক্র মোহিত হয়ে পড়েন। রূপে অদ্বিতীয়া সুপ্রভা চরিত্রেও শোভনা ছিলেন। ঋষি বদান্য অষ্টাবক্রকে বলেন, তিনি সুপ্রভার সঙ্গে বিবাহ দেবেন, যদি তিনি উত্তরদিকে গমন করেন। সেখানে হিমালয় পর্বত কুবেরের অলকাপুরী অতিক্রম করে প্রভু মহাদেবের বাসভূমি। মহাদেবের বাসভূমির উত্তরে এক নীলবর্ণ বন, সেখানে এক বৃদ্ধা তপস্বিনী বাস করেন। সেই বৃদ্ধার দর্শন ও পূজা দিয়ে ফিরে এলেই তবেই ঋষি বদান্য তার কন্যা সুপ্রভার সঙ্গে অষ্টাবক্রের বিবাহ হবে।

ঋষি বদান্যের কথানুসারে অষ্টাবক্র উত্তরদিকে যাত্রা করেন। হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে তিনি কুবের শাসিত অলকাপুরীতে পৌঁছলেন। কুবের মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। অষ্টাবক্রের সম্মানে কুবেরের সভায় বিশিষ্ট অপ্সররা নৃত্য গীত করতে লাগলেন। অষ্টাবক্র অলকাপুরীতেই এক বছরের বেশি সময় কাটিয়ে দেন। পুনরায় তিনি বদান্যের আদেশ পালন করার জন্য অলকাপুরীর উত্তরে গমন করেন। অষ্টাবক্র একসময় হিমালয়, কৈলাস, মন্দর পর্বত অতিক্রম করতে করতে তিনি মন্দর পুষ্প পরিপূর্ণ মন্দাকিনী নদী এবং সেই নদীর তীরে অপূর্ব ঐশ্বর্য্যময় একটি প্রাসাদ দেখতে পান। প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হয়ে অষ্টাবক্র জানায়, তিনি অতিথিরূপে এই প্রাসাদে থাকতে চান। তখন সেই প্রাসাদের ভেতর থেকে সাতটি পরমাসুন্দরী কন্যা অষ্টাবক্রের আতিথেয়তা স্বীকার করে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। সেই সাতটি পরমারূপবতী কন্যাদের দেখে অষ্টাবক্র মুগ্ধ হলেও তিনি তার মনকে সংযত করলেন। অট্টালিকায় অষ্টাবক্র প্রবেশ করে তিনি দেখতে পান, সুসজ্জিত কক্ষে নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত এক জরাজীর্ণা বৃদ্ধা এক বহুমূল্যের পালঙ্কে উপবেশন করছেন। সেই বৃদ্ধা কখনও বৃদ্ধার মূর্তিতে কখনও বা অল্পবয়স্কা কন্যার রূপ ধারণ করে সর্বক্ষণ অষ্টাবক্রের সেবা করে, তাঁকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু অষ্টাবক্রের মন পরনারী সম্ভোগ থেকে অনাসক্ত হয়ে রইল। এই বৃদ্ধা প্রকৃতপক্ষে মূর্তিমতী উত্তর দিক। অষ্টাবক্রের ইন্দ্রিয় সংযম দেখে জরাজীর্ণা বৃদ্ধা মুগ্ধ হয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন ও পুত্র লাভের বর দেন। জরাজীর্ণা বৃদ্ধাকে প্রণাম করে অষ্টাবক্র ঋষি বদান্যের কাছে ফিরে আসেন। অষ্টাবক্রের মতো সচ্চরিত্র উপযুক্ত পাত্র পেয়ে মহর্ষি বদান্যও অত্যন্ত খুশি হন এবং কন্যা সুপ্রভাকে প্রশস্ত নক্ষত্রপ্রভৃতিযুক্ত শুভদিনে প্রাজাপত্য বিবাহ পদ্ধতিতে অষ্টাবক্রের হাতে সম্প্রদান করেন। প্রসঙ্গতঃ ঋষি বদান্যের কন্যা সুপ্রভার বিবাহ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> তমুবাচ তদা বিপ্রঃ সুতাং প্রতিগৃহাণ মে।
> নক্ষত্রবিধিযোগেন পাত্রং হি পরমং ভবান্।।
> অষ্টাবক্রস্তথেত্যুক্ত্বা প্রতিগৃহ্য চ তাং প্রভো! ।
> কন্যাং পরমধর্ম্মাত্মা প্রীতিমাংশ্চাভবত্তদা।।[১০১]

পুনরায় মহর্ষি অষ্টাবক্রের সঙ্গে ঋষি বদান্যের কন্যা সুপ্রভার বিবাহ বিষয়ে *Puranic Encyclopedia : a comprehensive dictionary with special reference to the epic and*

Puranic literature গ্রন্থে বলা হয়েছে— "Aṣṭāvakra wanted to marry Suprabhā, the daughter of a sage named Vadānya. When Vadānya was approached for this the Sage decided to test the love which Aṣṭāvakra had towards his daughter and said : 'I am going to test you. You go to the north to the Himālayas. Pay homage to Śiva and Pārvati and go further north. There you will find a very beautiful damsel. You talk to her and return and when you come back, I shall give you, my daughter.'

Accepting this challenge Aṣṭāvakra went north. When he went to the Himālayas Kubera entertained him. He remained there for a year enjoying the dances of celestial maidens and then, after worshipping Śiva and Pārvatī went further north. There he came across seven very attractive women. At the command of Aṣṭāvakra the eldest of the lot, Uttarā, remained with him; all the rest left the place immediately she started making love with him and requested him to marry her. But Aṣṭāvakra did not yield and told her about his promise to Vadānya. Pleased at this reply Uttarā revealed that she was the queen of the north in disguise and was testing him. She then blessed Aṣṭāvakra who fulfilling his mission successfully, returned and married the girl he wanted".[১০২]

১১. দ্যুমৎসেন : দ্যুমৎসেন ছিলেন শাল্ব দেশের একজন ধার্মিক ক্ষত্রিয় রাজা। দ্যুমৎসেনের পত্নীর নাম ছিল শৈব্যা। দ্যুমৎসেন ও শৈব্যার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ব্রাহ্ম বিবাহ অনুসারে হয়েছিল। কিন্তু দ্যুমৎসেন বুদ্ধিমান ও ধার্মিক হলেও পূর্বশত্রুদের আক্রমণে অর্থাৎ তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রী তাকে রাজ্যচ্যুত করায় পত্নী শৈব্যাকে সঙ্গে নিয়ে বনে বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করে স্বস্ত্রীক তপস্যায় রত হন। প্রসঙ্গতঃ দ্যুমৎসেন বিবাহের পরে পত্নী শৈব্যাকে নিয়ে তপস্যায় রত হওয়া বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> স বালবৎসয়া সার্দ্ধং ভার্য্যয়া প্রস্থিতো বনম্।
> মহারণ্যগতশ্চাপি তপস্তেপে মহাব্রতঃ।।[১০৩]

পুনরায় দ্যুমৎসেনের সঙ্গে শৈব্যার বিবাহ বিষয়ে *Puranic Encyclopedia : a comprehensive dictionary with special reference to the epic and Puranic literature* গ্রন্থে বলা হয়েছে— "A king. He was the father of Satyavān. He ruled over the Sālva country.

Śaibyā was his wife. By and by he lost his eye-sight. Then another king conquered his country”.[১০৪]

১২. পৌষ্য : রাজা রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্রসন্তানের মধ্যে পৌষ্য একমাত্র পরাক্রমী, যিনি দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় বিক্রমশালী, বিদ্বান এবং পৃথিবীর অদ্বিতীয় রাজা হয়েছিলেন। পৌষ্য রাজা যেহেতু সমগ্র পৃথিবী রাজত্ব করেছিলেন, সেই কারণে তিনি ‘অনাধৃষ্ট’ ও ‘অন্বগ্-ভানু’ নামে খ্যাতিলাভ করেন। পৌষ্য রাজা প্রীতি নামক অপ্সরাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে শাস্ত্রসম্মত গন্ধর্ব বিবাহ অনুযায়ী বিবাহ করেন। পৌষ্য রাজা বিবাহের সময় দুইটি মহামূল্যবান কুণ্ডল পত্নী প্রীতিকে উপহার দেন। সেই মহামূল্যবান কুণ্ডল দুটি সবসময় প্রীতি ধারণ করে থাকতেন। প্রসঙ্গতঃ পৌষ্য পত্নীর কুণ্ডল ধারণ প্রসঙ্গে হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য রচিত *ভারতকৌমুদী* টীকায় বলা হয়েছে— “তস্য পৌষ্যস্য, ক্ষত্রিয়া ভার্য্যয়া, ন পুনঃ শূদ্রয়া, তদ্দানস্যাগ্রাহ্যত্বাদিতি ভাবঃ। পিনদ্ধে পরিহিতে”।[১০৫]

১৩. একলব্য : *বৈয়াসিক মহাভারতের* খিল *হরিবংশ পুরাণ* অনুযায়ী একদিন একলব্য যখন গভীর বনে গুরু দ্রোণের মৃন্ময় মূর্তির সামনে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অস্ত্রশিক্ষার অভ্যাস করছিলেন, সেই সময় দানবরাজ অবন্তীর রাজকন্যা সুবর্ণাকে হরণ করে সেই বনের মধ্যে দিয়ে নিজ রাজ্যে বিবাহের নিমিত্ত অগ্রসর হতে থাকে। সেই সময় অবন্তীর রাজকন্যা সুবর্ণা নিজেকে দানবরাজের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আর্তনাদ করতে থাকেন। অবন্তীর রাজকন্যা সুবর্ণার আর্তনাদ যথাসময়ে একলব্যের কানে পৌঁছায়। একলব্য অবন্তীর রাজকন্যা সুবর্ণাকে দানবরাজের হাত থেকে রক্ষার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। একলব্য ও দানবরাজের মধ্যে যুদ্ধে দানবরাজ পরাজিত হন এবং অবন্তীর রাজকন্যা সুবর্ণাকে বনে রেখেই দানবরাজ পালিয়ে যান। অবশেষে এক নির্জন দ্বীপের মধ্যে একলব্য ও অবন্তীর রাজকন্যা সুবর্ণা প্রবেশ করেন এবং উভয়ের মধ্যে অনুরাগ জন্মায়। একলব্য ও অবন্তীর রাজকন্যা সুবর্ণা পরস্পর অনুরাগবশতঃ শাস্ত্রসম্মত গান্ধর্ব বিবাহ করেন। প্রসঙ্গতঃ একলব্য ও অবন্তীর রাজকন্যা সুবর্ণার বিবাহ বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> সা সমীক্ষ্য তু তান্ সর্ব্বাংস্তুল্যরূপধরান্ স্থিতান্।
> নিশ্চিত্য মনসা বুদ্ধ্বা দেবী বব্রে স্বকং পতিম্।।[১০৬]

পুনরায় একলব্য ও অবন্তীর রাজকন্যা সুবর্ণার বিবাহ প্রসঙ্গে একলব্যের ইংরেজী *Wikipedia* তে বলা হয়েছে— "Ekalavya later married Suwarna, the princess of Avanti after he saved her from a demon king. He had two children Ketuman (a son) and Avantika (a daughter) with Suwarna".[১০৭]

পরবর্তীসময়ে হিরণ্যধনু পুত্র একলব্য গুরু দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে প্রত্যাখিত হয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এসে নিজপিতার নিষাদ বন্ধুর কন্যা সুনীতার সঙ্গে শাস্ত্রসম্মত প্রাজাপত্য বিবাহ করেন। কারণ হিরণ্যধনুর নিষাদ বন্ধু গার্হস্থ্ ধর্ম পালনের ন্যায় একলব্যের সঙ্গে সুনীতার বিবাহ দেন।

১৪. শকুনি : শকুনির দাম্পত্য সঙ্গী হিসাবে অর্ষির নাম পাওয়া যায়। তিনি 'আরশ' এবং 'চারুলতা' নামেও পরিচিত ছিলেন। অর্ষি ছিলেন কোশলের রাজকন্যা। কোশলরাজের কন্যা অর্ষি বিবাহযোগ্যা হলে তাঁর দুই পুত্র কেতুরাজ ও কেতুসেন উপর দায়িত্ব দেন যে ভগিনীর জন্য উপযুক্ত পাত্র সন্ধান করবার জন্য। পিতার আদেশ অনুযায়ী কেতুরাজ ও কেতুসেন কোশলরাজের ঘনিষ্ট বন্ধু গান্ধাররাজ সুবলের জ্যেষ্ঠ পুত্র শকুনির সঙ্গে অর্ষির বিবাহ স্থির করেন। কারণ সুবলের অনুপস্থিতিতে শকুনি গান্ধারের রাজা হবেন এবং শকুনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান চতুর ব্যক্তিত্ব ও মায়াবাদী, তাছাড়া তার একটি আশ্চর্য প্রতিভা ছিল। এছাড়াও শকুনির একমাত্র ভগিনী গান্ধারী কুরু রাজবংশের রানী হওয়ায়, কোশল রাজ্যের সঙ্গে হস্তিনাপুরের সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোশল পুত্র দ্বয় কেতুরাজ ও কেতুসেন ভগিনী অর্ষির সঙ্গে শকুনির শাস্ত্রসম্মত ব্রাহ্ম বিবাহ দেন। প্রসঙ্গতঃ শকুনির দাম্পত্য সঙ্গী এবং দুই শ্যালক বিষয়ে *Indian Myth and Legend* গ্রন্থে বলা হয়েছে— "Shakuni's wife was 'Arshi'. She was also known as 'Arsh' and 'Chārulatā'. Drupada fights on the side of the Pandavas in the Kurukṣétra War. He killed Śhakuni's brothers-in-law Kéturājā and kétuséna of Kōśala on 11th day of war".[১০৮]

৩.৩.২. <u>পুত্রোৎপত্তি ও তার শ্রেণীবিভাগ</u> : স্ত্রী-পুরুষের মিলনকে সামাজিক বৈধতা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বিবাহের সূত্রপাত ঘটে। তবে বিবাহের নানারকমের উদ্দশ্যের মধ্যে সবথেকে মূল উদ্দেশ্য হল পুত্রলাভ, ব্যাপক অর্থে সন্তানলাভ। পুত্রলাভ বিষয়ে *মহাভারতের* আদিপর্বে ও শান্তিপর্বে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ পুত্রলাভ বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উদ্ধৃত হয়েছে—

বহুকল্যাণমিছন্ত ঈহন্তে পিতরঃ সুতান্।
ভার্য্যায়াং জনিতঃ পুত্রমাদর্শোধিব চাননম্।
অনপত্যঃ শুভাল্লোকান্ন প্রাপ্সামীতি চিন্তয়ন্।[১০৯]

পুত্র পিতাকে ‘পুৎ’ নামক নরক থেকে ত্রাণ করে। পুত্র হল সবংশ শুদ্ধিকারক। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* আম্নাত হয়েছে— ‘স (পিতা) যদ্যনেন কিঞ্চিদক্ষয়াহকৃতং ভবতি তস্মাদেনং সর্বস্মাৎ পুত্রো’।[১১০]

পুত্র লাভ হল বিবাহের মূল লক্ষ্য। ইহকালে ও পরকালে সমস্ত অশুভ থেকে ত্রাণ করে বলে পুত্রের পুত্রত্ব। কুল-বংশ প্রতিষ্ঠা নিমিত্ত পুত্রলাভ আবশ্যক। *মনুসংহিতায়* বিভিন্ন প্রকারের উক্তি থেকে একথা পরিষ্কার হয় যে, সমসাময়িককালে পুত্র এবং বিশেষভাবে জ্যেষ্ঠপুত্র পরিবারের গৌরববৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক ছিল। মহাভারতকার ও মনু দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ করেছেন। *মনুসংহিতায়* এবিষয়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে—

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢোৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্।।
কানীন সহোঢশ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষডদায়াদবান্ধবাঃ।।[১১১]

অর্থাৎ মনু দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা হলেন— **i. ঔরসপুত্র (Legitimate son of the body) :** বিবাহিত পত্নীতে নিজ স্বামীর দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করা হয়, সেই পুত্রকে ঔরসপুত্র বা স্বয়ংজাত পুত্র বলা হয়। এই ঔরসপুত্রই সকল পুত্রদের মুখ্য পুত্র। **ii. ক্ষেত্রজপুত্র (Son begottlen on a wife of another) :** অপুত্র ব্যক্তির অথবা নপুংসক কিংবা দুরারোগ্য রোগগ্রস্থ ব্যক্তির ভার্যা শাস্ত্রোক্ত নিয়মে গুরুজনদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে অন্য উত্তম পুরুষের মাধ্যমে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাকে ক্ষেত্রজপুত্র বা প্রণীত বলে। **iii. দত্তকপুত্র (Adopted Son) :** কোনও স্বামী-স্ত্রীর পুত্র না থাকলে তারা যদি অন্য বংশের পিতা-মাতার উপযুক্ত পুত্রকে দানরূপে পায়, তাহলে সেই পুত্রকে দত্তক বা দত্রিমপুত্র বলা হয়। **iv. কৃত্রিমপুত্র (A Son made) :** যে পিতামাতাহীন বালক পুত্রের কর্তব্য-অকর্তব্য জানে, উপযুক্ত পুর্ণসমন্বিত, তাকে অর্থাদির দ্বারা ক্রয় করলে সেই পুত্রকে কৃত্রিমপুত্র বলা হয়। **v. গূঢ়োৎপন্নপুত্র (Son Secretly born) :** স্বামীর নিজ ভার্যাতে গোপনে অন্যপুরুষকর্তৃক উৎপন্ন পুত্রকে

'গূঢ়োৎপন্ন' বলা হয়। এই পুত্রের মাতা যে ব্যক্তির ভার্যা, পুত্রটি তার হবে। **vi. অপবিদ্ধপুত্র (A Son cast off) :** মাতা-পিতা উভয়ে বা তাদের মধ্যে কোনও একজন যে পুত্রকে পরিত্যাগ করে, তাকে যদি অন্য কেউ পুত্ররূপে গ্রহণ করে, তাহলে এই পুত্রকে অপবিদ্ধ বলা হয়। **vii. কানীনপুত্র (Son of an unmarried damsel) :** পিতৃগৃহে বাসকালে যে অবিবাহিতা কন্যা গোপনে পুত্র উৎপাদন করে, যে ব্যক্তি ঐ কন্যাকে বিবাহ করে, পুত্রটি তারই হবে। এই রকম পুত্রকে কানীনপুত্র বলা হয়। **viii. সহোঢ়পুত্র (Son receivd with the wife) :** কোনও ব্যক্তি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোনও গর্ভবতী নারীকে যদি বিবাহ করে, তাহলে সেই গর্ভজাত পুত্রটি বিবাহকারী ব্যক্তিরই হবে, এইজাতীয় পুত্রকে সহোঢ়পুত্র বলে। **ix. ক্রীতকপুত্র (The son bought from his parents) :** পুত্রলাভের অভিলাষে কোনও ব্যক্তি যদি মাতা-পিতার কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে পুত্র ক্রয় করে, তাহলে সেই পুত্রটি ক্রীতক নামে অভিহিত হয়। **x. পৌনর্ভবপুত্র (The son begotten on a re-married woman) :** যদি কোনও নারী পতির দ্বারা পরিত্যক্তা হয়ে কিংবা বিধবা হয়ে নিজের ইচ্ছায় পুনরায় অন্য পুরুষের ভার্যা হয়ে পুত্র উৎপাদন করে, তাহলে সেই পুত্রকে পৌনর্ভবপুত্র বলে। **xi. স্বয়ংদত্তপুত্র (self-given son) :** কোনও মাতা-পিতাহীন পুত্র অথবা পিতামাতাকর্তৃক অকারণে পরিত্যক্ত পুত্র যদি নিজেয় নিজেকে অন্যের কাছে দান করে, তাহলে তাকে গ্রহীতার 'স্বয়ংদত্তপুত্র' বলা হয়। **xii. পারশবপুত্র (The son of a sudra female) :** ব্রাহ্মণ কামবশতঃ শূদ্রা নারীতে যে পুত্র উৎপাদন করবে, তাকে 'পারশব' বা 'শৌদ্র' বলা হয়।

৩.৩.২.১. *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পুত্রোৎপত্তি বর্ণনা : পুত্র শব্দটি পুৎ শব্দপূর্বক ত্রৈ ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় যোগে সাধিত হয়। পুত্র জন্মালে স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হয়। পুত্রের পুত্র অর্থাৎ পৌত্র জন্মালে উক্ত স্বর্গলোকে অনন্তকাল বসবাস করা যায় এবং পরে যদি প্রপৌত্র জন্মায় তাহলে আদিত্যলোক প্রাপ্ত হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা হয়েছে–

> পুত্রেন লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
> অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি বিষ্টপম্।।[১১২]

স্বয়ং ব্রহ্মা বলেছেন, সুত পিতাকে পুনামক নরক থেকে উদ্ধার করেন বলে পুত্র নামে অভিহিত হয়। প্রসঙ্গতঃ পুত্র বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে–

পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।।[১১৩]

অর্থাৎ যে পুত্র পিতা-মাতার আদেশ পালন করে, তাঁদের হিতৈষী ও অনুকূলে থাকে এবং পিতা-মাতার নিকটে থেকে পুত্রের ন্যায় আচরণ করেন, সে পুত্রই বাস্তবিক পুত্র।

পুনরায় *বাল্মীকীয় রামায়ণে* পুত্র শব্দটি 'পিতৃন্ পাতি' অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। কারণ পুত্র 'পুৎ' নামক নরক থেকে পিতাকে উদ্ধার করে বলে স্বয়ং ব্রহ্মা তাকে পুত্র নামে অভিহিত করেছেন। 'পুৎ' শব্দের অর্থ হল উৎপত্তি। পুত্র জন্মালে পিতাকে তা থেকে পরিত্রাণ করে অর্থাৎ যার কারণে পিতা পৃথিবীতে পুনর্জন্ম গ্রহণ না করে দেবলোক প্রাপ্ত হন, তিনিই হলেন 'পুত্র'। প্রসঙ্গতঃ পুত্রের উৎপত্তি বিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৃন্ যঃ পাতি সর্ব্বতঃ।[১১৪]

পুনরায় পুত্র পদটির অর্থ বিষয়ে লোকনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত *মনোহরা টীকায়* বলা হয়েছে—

"পিতৃন্ পাতি ইত্যর্থে পুত্রস্য পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুত্বম্। পিতৃমুদ্দিশ্য কৃতেষ্টাপূর্ত্তাদিনা স্বর্গলোকপ্রাপণেন তেষাং রক্ষণমিত্যাহুঃ"।[১১৫]

বাল্মীকীয় রামায়ণ ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* পুত্র উৎপাদন বিষয়ে নানারকম মতভেদ থাকলেও, সমাজে যে পুত্র উৎপাদনের আবশ্যকতা অবসম্ভাবি সেই বিষয়ে কোনরূপ মতভেদ নেই। প্রত্যেক পিতা-মাতা নিজ বংশের কল্যাণের জন্যই গুণবান্ পুত্র উৎপাদনের জন্য করে থাকেন। কখনো কখনো এই সকল পুত্র সমাজের ব্যতিক্রম কাজ করে নিজ বংশের নাম ক্ষুন্ন করে থাকেন। তেমনি *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* যেসকল বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই সকল চরিত্রসমূহের কীভাবে পুত্র উৎপাদন করেছিলেন এবং উপর্যুক্ত দ্বাদশ পুত্র সমূহের মধ্যে তাঁরা কী জাতীয় পুত্র সে বিষয়ে নিম্নে আলোচিত হল—

ক. ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পুত্র চতুরঙ্গ : লোমপাদরাজার অভিলাষ পূরণের জন্য পালিত কন্যা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির হস্তে প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির হস্তে অঙ্গরাজকন্যা শান্তার বিবাহের কারণ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

অন্তঃপুরে তং তু নিবেশ্য রাজা বিভাণ্ডকস্যাত্মজমেকপুত্রম্।
দদর্শ দেবং সহসা প্রবৃষ্টমাপূর্য্যমাণঞ্চ জগজ্জলেন।
স লোমপাদঃ পরিপূর্ণকামঃ সুতাং দদাবৃষ্যশৃঙ্গায় শান্তাম্।।[১১৬]

শান্তার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ হওয়ার পর লোমপাদ কর্ত্তৃক উভয়েই পূজিত হয়ে অঙ্গরাজ্যেই বাস করতে লাগলেন। তারপর বিভাণ্ডক মুনি নিজ আশ্রমে ফিরে এসে পুত্রকে দেখতে না পেয়ে ক্রোধে বিদীর্ণ প্রায় হয়ে লোমপাদ রাজার রাজ্য নষ্ট করার মানসে চম্পানগরীর দিকে রওনা হলেন। শ্রান্ত ও ক্ষুধিত বিভাণ্ডক এক ঘোষ পল্লীতে এলে ঘোষগণ তাঁকে বিধিপূর্বক পূজা করেন। তাঁদের মিষ্টবাক্য শুনে বিভাণ্ডকের ক্রোধ দূর হল। এরপর অঙ্গাধিপতির কাছে এলে তাঁর দ্বারা পূজিত হলেন এবং পুত্রবধূ শান্তাকে দেখে তুষ্ট হলেন। বিভাণ্ডক মুনি তুষ্ট হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তাকে পুত্রলাভের আশীর্বাদ প্রদান করেন। পিতার আশীর্বাদে ঋষ্যশৃঙ্গের ঔরসে শান্তার গর্ভে চতুরঙ্গ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রবধূ শান্তার প্রতি বিভাণ্ডক মুনির আশীর্বাদ প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

স তত্র নিক্ষিপ্য সুতং মহর্ষিরুবাচ সূর্য্যাগ্নিসমপ্রভাবঃ।
জাতে তু পুত্রে বনমেবাব্রজেথা রাজ্ঞঃ প্রিয়াণাস্য সর্ব্বাণি কৃত্বা।।[১১৭]

খ. <u>অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু</u> : *বাল্মীকীয় রামায়ণের* 'অযোধ্যাকাণ্ডে' বর্ণিত হয়েছে বৃদ্ধ অন্ধক মুনি এবং অন্ধ মুনি পত্নীর অরণ্যে কাটানো গার্হস্থ জীবনের কাহিনী। অন্ধক মুনি নিজে বনবাসী ব্রাহ্মণ এবং তাঁর স্ত্রী শূদ্র ছিলেন। সরযূ নদীর তীরে এক আশ্রমে অন্ধক মুনি দম্পতি বসবাস করতেন। এই অন্ধ মুনি দম্পতির একমাত্র পুত্র সিন্ধু ছিলেন পারশবপুত্র। কারণ সিন্ধু হলেন বনবাসী ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত সন্তান। সিন্ধুই বাল্যকাল থেকেই অন্ধ পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাজা দশরথের দ্বারা ভুলক্রমে বাণের দ্বারা মুনিপুত্র সিন্ধুর হৃদয়ে বাণ বিদ্ধ হওয়ার ফলে সেই বাণ থেকে নিজে প্রাণে বাঁচার জন্য দশরথকে বাণ উদ্ধৃত করতে বলেন। রাজা দশরথ যাতে বাণবিদ্ধ সিন্ধুকে উদ্ধার করতে পাপের ভাগী হতে না হয়, সেই জন্য মুনিকুমার বলেন, সে ব্রাহ্মণ নয়। অতএব দশরথ যেন ব্রাহ্মণহত্যাজনিত ভয় পরিত্যাগ করেন। এ প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

সশল্যো মরণং নাহমাপ্পুয়াং শল্যমুদ্ধর।
ন দ্বিজাতিরহং শঙ্কাং ব্রহ্মহত্যাকৃতাং ত্যজ।।
ব্রাহ্মণেণ ত্বহং জাতঃ শূদ্রায়াং বসতা বনে।[১১৮]

অন্ধ মুনি দম্পতির একমাত্র পুত্র সিন্ধু প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় নিজ আশ্রমে হোমযজ্ঞ করতেন এবং রাত্রিশেষে নিজ আশ্রমে প্রত্যহ পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠ করে অন্ধ পিতা-মাতাকে শ্রবণ করাতেন। এছাড়াও মুনি পুত্র প্রত্যেকদিন বন্য ফলমূল সংগ্রহের দ্বারা অন্ধ পিতা-মাতার ক্ষুধার নিবারণ করতেন। পরিশেষে মুনি কুমার দিব্য শরীর ধারণপূর্বক কাতর হৃদয়ে নিজ অন্ধ জনক-জননীর উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনাদের পরিচর্য্যা করিয়া আমি শ্রেষ্ঠ পুণ্যগতি লাভ করিয়াছি; আপনারাও অবিলম্বে অভিলাষিত স্থানে গমন করিবেন"।[১১৯] অতএব মুনি দম্পতি যেন পুত্র শোক নিবৃত করেন। এছাড়া রাজা দশরথ অপরাধী নয়, অতএব তাঁরা যেন তাকে কোনরূপ অভিশাপ সম্পাত না করেন। এই কথা বলে সিন্ধু দেবলোকে গমন করেন।

গ. বৈশ্রবণ বা কুবেরের পুত্র কুণ্ড ও নলকূবর : *স্কন্দ পুরাণ* অনুযায়ী কুবের ও ঈশ্বরীর মিলনে কুণ্ড নামক ঔরসজাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

এছাড়াও *বৈয়াসিক মহাভারত* অনুযায়ী স্বয়ং ব্রহ্মা বৈশ্রবণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দেবতা, ধনপতি, লোকপাল, মহাদেবের সখা ও নলকূবর নামে একটি পুত্র সন্তান দান করেন এবং পুত্র নলকূবরকে নিয়ে রাক্ষসপূর্ণ লঙ্কানগরীতে বসবাস করতে লাগলেন। প্রসঙ্গতঃ ব্রহ্মা প্রদত্ত বৈশ্রবণের দত্তক পুত্র নলকূবর বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

পিতামহস্তু প্রীতাত্মা দদৌ বৈশ্রবণস্য হ।
অমরত্বং ধনেশত্বং লোকপালত্বমেব চ।।
ঈশানেন তথা সখ্যং পুত্রঞ্চ নলকূবরম্।
রাজধানীনিবেশঞ্চ লঙ্কাং রক্ষোগণান্বিতাম্।।[১২০]

পুনরায় *বৈয়াসিক মহাভারতের* সভাপর্বে কুবের সভার যে বিবরণ পাওয়া যায় সেখানেও বৈশ্রবণের দত্তক পুত্ররূপে নলকূবরের উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

গ. শূর্পণখার পুত্র শম্বুক : রাক্ষসরাজ রাবণ ভগিনী শূর্পণখাকে কালকাসুরের পুত্র দানবরাজ বিদ্যুদ্-জিহ্বের হাতে সম্প্রদান করেছিলেন। দানবরাজ বিদ্যুদ্-জিহ্বের ঔরসে শূর্পণখার গর্ভে শম্বুক নামে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গতঃ শূর্পণখার পুত্র বিষয়ে *Puranic Encyclopedia : a comprehensive dictionary with special reference to the epic and Puranic literature* গ্রন্থে বলা হয়েছে– "Śūrpaṇakhā was married to the Rākṣasa, Vidyujjihva. The son who was born to the couple was named Śambhukumāra".[১২১]

ঘ. ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ : ধৃতরাষ্ট্র শধুমাত্র পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তিনি হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনের জন্য উত্তরাধিকারী চক্রবর্তী পুত্রের জন্ম দিতে চান। ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে চেয়েছিলেন তাঁর পুত্ররা যেন হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসন থেকে বঞ্চিত না হন। কারণ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হওয়ার দরুণ তিনি রাজা হতে পারেন নি। আর জ্যেষ্ঠ কুরু রাজকুমার ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর মিলনেই জন্মলাভ করুক– ধৃতরাষ্ট্রের এমন মনের আশাও গান্ধারীর অজানা নয়। তাই স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের মনস্কামনা পূরণের জন্য গান্ধারীর আন্তরিক প্রয়াস দেখা যায়। কারণ শত পুত্রলাভের বর তিনি পূর্বেই কুমারীবস্থাতেই মহাদেবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

এরপর একদিন শ্বশুরপ্রতিম মহর্ষি ব্যাসদেব ক্ষুধা তৃষ্ণায় শ্রান্ত হয়ে হস্তিনাপুরের আসেন। গান্ধারী অতিরিক্ত সেবা শুশ্রষা করে তাঁকে তুষ্ট করলে, ব্যাসদেব পুত্রবধূকে বর দিতে চাইলেন। গান্ধারী মহাদেবের কাছ থেকে যে বর প্রার্থনা করেছিলেন, পুনরায় সেই বর চাইলেন মহর্ষি ব্যাসের কাছ থেকে এবং ব্যাসদেব সেই শতপুত্রলাভের গান্ধারীকে বর দেন। এরপর যথাসময়ে ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারী গর্ভধারণ করেন। কিন্তু গান্ধারী দুই বৎসর পর্যন্ত সেই গর্ভ উদরে ধারণ করে রাখলেও, সন্তান প্রসব করেননি। গান্ধারী মনোদুঃখে কর্তব্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লে, ধৃতরাষ্ট্র অজ্ঞাতভাবে গান্ধারীর গর্ভ পাত ঘটান। গান্ধারীর গর্ভ থেকে লোহার মতো কঠিন মাংসপিণ্ড জন্মালে, দুঃখে গান্ধারী সেই মাংসপিণ্ডটিকে ফেলে দিতে উদ্যত হন। মহর্ষি বেদব্যাস গান্ধারীর কঠিন মাংসপিণ্ডের গর্ভপাত ঘটানোর কাহিনী ধ্যানের মাধ্যমে জানতে পেরে সত্ত্বর হস্তিনাপুরে রাজমহলে এসে উপস্থিত হন। বেদব্যাসের কৃপায় সেই কঠিন মাংসপিণ্ড থেকে একশত একটি সন্তান বীজের উৎপত্তি হয়। সেই একশত একটি সন্তান বীজকে একবছর সযত্নে রক্ষা করা হয় ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে। এরপর একবৎসর পর যথাসময়ে সেই ঘৃতপূর্ণ কুম্ভগুলির মধ্যে একটি থেকে দুর্দ্ধর্ষ

দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করেন এবং অন্যান্য সকল কুম্ভগুলি থেকে একমাসের মধ্যে অন্যান্য নিরানব্বইটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গতঃ ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র ও একটি কন্যার উৎপত্তি বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> ততঃ পুত্রশতং পূর্ণং ধৃতরাষ্ট্রস্য পার্থিব।
> মাসমাত্রেণ সংজজ্ঞে কন্যা চৈকা শতাধিকা।।[১২২]

যদিও ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র কন্যা দুঃশলার উৎপত্তির বিষয়ে একটি ভিন্ন *বৈয়াসিক মহাভারতে* কাহিনী রয়েছে; তা হল— মহর্ষি ব্যাস যখন গান্ধারীর গর্ভ থেকে উৎপন্ন কঠিন মাংসপিণ্ডটিকে শীতল জলে সিক্ত করতে থাকেন এবং ধীরে ধীরে সেটি একশত সন্তান বীজে বিভক্ত হয়। গান্ধারী ততক্ষণে বুঝে গেছেন যে, এই মাংসপিণ্ড থেকে শতপুত্রের জন্ম হবে, তৎসত্বেও একশটি পুত্র অধিক একটি কনিষ্ঠা কন্যা সন্তানেরও সৃষ্টি হবে। কারণ নারীগণের পুত্র অপেক্ষা জামাতাকে নিয়ে অধিক আনন্দ হয়ে থাকে।

গান্ধারীর মাতৃহৃদয়ে কন্যাসন্তান লাভের আকুতি ছিল, তাও সেই মুহূর্তে ধ্যানযোগে ব্যাসদেব জানতে পারেন। তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আনন্দ সংবাদ শোনালেন যে, মাংসপিণ্ডটি শতভাগে বিভক্ত হয়েছে, অতএব তা থেকে একশটি পুত্রের জন্মগ্রহণ করবেন। কিন্তু মাংসপিণ্ডটির একশত খণ্ড হলেও, দৈববশতঃ একশতের অধিক এক ভাগ অবশিষ্ট রয়েছে, এই অবশিষ্ট এক ভাগ মাংসপিণ্ড থেকে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর একটি ভাগ্যবতী দুঃশলা নামক কনিষ্ঠ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গতঃ ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র কন্যার উৎপত্তি বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> এষা তে সুভগা কন্যা ভবিষ্যতি যথেপ্সিতা।
> ততোঽন্যং ঘৃতকুম্ভঞ্চ সমানায্য মহাতপাঃ।।
> তঞ্চাপি প্রাক্ষিপত্তত্র কন্যাভাগং তপোধনঃ।
> সম্ভূতা চৈব কালেন সর্ব্বেষাঞ্চ যবীয়সী।।[১২৩]

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর উপর্যুক্ত দুর্যোধন প্রভৃতি একশটি পুত্র ও দুঃশলা নামক একমাত্র কন্যা ছিলেন শাস্ত্রসম্মত ঔরসজাত সন্তান। কারণ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে বিবাহ সংস্কারের মাধ্যমে তাঁর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন।

পুনরায় *বৈয়াসিক মহাভারতে* ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে বিবাহ করলেও এবং গান্ধারী যখন গর্ভবতী ছিলেন, সেই সময় তাঁর বৈশ্যা দাসী সুগধা ধৃতরাষ্ট্রের সেবা শুশ্রষা করতেন। ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে সেই বৈশ্যা যুবতী দাসী নিজ গর্ভেই দুর্যোধন প্রভৃতি সন্তান জন্মানোর বৎসরেই যুযুৎসু নামে একটি বুদ্ধিমান, তেজঃশালী ও প্রতাপশালী পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। কারণ গান্ধারীর বৈশ্যা দাসী ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের রক্ষিতা এবং তাঁর গর্ভজাত সন্তান যুযুৎসু ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পুত্র। প্রসঙ্গতঃ বৈশ্যা দাসীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র উৎপাদন বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> গান্ধার্য্যাং ক্লিশ্যমানায়ামুদরেণ বিবর্দ্ধতা।
> ধৃতরাষ্ট্রং মহারাজং বৈশ্যা পর্য্যচরৎ কিল।।
> তস্মিন্ সংবৎসরে রাজন্! ধৃতরাষ্টান্মহাযশাঃ।
> জজ্ঞে ধীমাংস্ততস্তস্যাং যুযুৎসুঃ করণো নৃপ! ।।[১২৪]

ঘ. <u>দীর্ঘতমস্ ঋষির পুত্রগণ</u> : উতথ্য মুনির পুত্র মহর্ষি দীর্ঘতমস্ বংশবৃদ্ধির জন্য যথাসময়ে নিজ ব্রাহ্মণ পত্নী প্রদ্বেষীর গর্ভে গৌতমসহ একাধিক পুত্রের জন্ম দেন। গৌতম প্রভৃতি পুত্রগণ ছিলেন শাস্ত্রসম্মত ঔরসপুত্র কারণ সমানবর্ণা ভার্যা প্রদ্বেষীর গর্ভে বিবাহ সংস্কারের মাধ্যমে মহর্ষি দীর্ঘতমস্ সন্তান উৎপাদন করেছিলেন।

পুনরায় জন্মান্ধ দীর্ঘতমস্ পুত্রলাভের পরেও আশ্রমের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে অর্থাৎ ভাতৃপত্নীদের সঙ্গে অনবরত গোধর্ম বা রমণে সর্বদা মগ্ন থাকতেন। সেই কারণে পত্নী প্রদ্বেষী ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গায় ভেলায় তাঁকে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য পুত্রদেরকে আদেশ দেন। পুত্র গৌতম প্রভৃতি পুত্রগণ মাতৃ প্রদ্বেষীর আদেশ যথাযথভাবে পালন করেন।

কলার ভেলায় ভাসতে ভাসতে দীর্ঘতমস্ বহুদেশ অতিক্রম করলেন। একদিন বলি নামক অপুত্রক রাজা গঙ্গায় স্নান করতে এসে দীর্ঘতমস্-কে ভেলায় ভাসতে দেখেন। দীর্ঘতমস্-কে দেখে ও তাঁর পরিচয় পেয়ে নিজের পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু রাজা বলির পত্নী সুদেষ্ণা দীর্ঘতমস্-কে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখে নিজের পরিবর্তে এক ধাত্রীকন্যাকে পুত্র উৎপাদনের জন্য দীর্ঘতমস্-এর কাছে পাঠান। দীর্ঘতমস্ সেই শূদ্রা রমণীর গর্ভে কাক্ষীবান্ প্রমুখ এগারোটি পুত্র উৎপাদন করেন। কিন্তু রাজা বলি কাক্ষীবান্ প্রভৃতিকে নিজ পুত্র বলে দাবী করলে, দীর্ঘতমস্ তাঁকে সুদেষ্ণার প্রকৃত অভিসন্ধি জানান। সুদেষ্ণার অভিসন্ধি জানতে পেরে

বলি রাজা পুনরায় নিজ মহিষীকে দীর্ঘতমস্ ঋষির কাছে পুত্র উৎপাদনের জন্য পাঠান। দীর্ঘতমস্ ও বলি রাজার মহিষী সুদেষ্ণার মিলনে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম নামে পাঁচ সন্তানের জন্ম হয়। এছাড়াও দীর্ঘতমস্ বলী রাজাকে আশীর্বাদ দেন যে, সুদেষ্ণার গর্ভজাত পাঁচ সন্তানের নাম অনুসারে পাঁচটি দেশের নাম হবে এবং বলি রাজবংশের বংশরক্ষা এবং সাম্রাজ্য বিস্তার করবে। যদিও দীর্ঘতমস্-কৃত বলিরাজার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভজাত সন্তানেরা ছিলেন শাস্ত্রসম্মত ক্ষেত্রজ সন্তান কারণ বলি রাজা উৎকৃষ্ট ধার্ম্মিক পুত্র লাভের জন্যই মহর্ষি দীর্ঘতমস্-কে নিয়োগ করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ এবিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উক্ত হয়েছে—

জগ্রাহ চৈনং ধর্মাত্মা বলিঃ সত্যপরাক্রমঃ।
জ্ঞাত্বা চৈনং স বব্রেহথ পুত্রার্থং মনুজেশ্বরঃ।।[১২৫]

ঙ. অরুণের পুত্র সম্পাতি ও জটায়ু : অষ্টম দক্ষকন্যা বিনতার পুত্র অরুণের ঔরসে শ্যেনীর গর্ভে মহাপরাক্রমী মহাসাহসী সম্পাতি ও জটায়ু নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। মহাপরাক্রমী সম্পাতি ও জটায়ু হলেন শাস্ত্রসম্মত ঔরসপুত্র। কারণ অরুণ ও শ্যেণী সমানবর্ণা বিবাহসংস্কারের দ্বারা পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ অরুণের পুত্ররূপে সম্পাতি ও জটায়ু বিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* উল্লিখিত হয়েছে—

তস্মাজ্জাতোঽহমরুণাৎ সম্পাতিশ্চ মমাগ্রজঃ।
জটায়ুরিতি মাং বিদ্ধি শ্যেনীপুত্রমরিন্দম।।[১২৬]

চ. রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান : শাল্ব দেশের ধার্মিক রাজা দ্যুমৎসেন ও শৈব্যার মিলনে সত্যবান্ নামক এক ধার্মিক পুত্রের জন্ম হয়। রাজা দ্যুমৎসেন স্বয়ং বিবাহিতা পত্নী শৈব্যার গর্ভে স্বাভাবিক পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, এইভাবে জাত পুত্রকে শাস্ত্রসম্মত ঔরসজাত পুত্র বা স্বয়ংজাত পুত্র বলা হয়। সত্যবানের পিতা দ্যুমৎসেন ও মাতা শৈব্যা সর্বদা সত্যকথা বলেন বলে ব্রাহ্মণেরা পুত্রের এরূপ নামকরণ করেছেন। এছাড়াও সত্যবান্ শৈশব অবস্থা থেকে অশ্ব প্রিয় ছিল বলে তাঁকে কোন কোন ব্রাহ্মণ চিত্রাশ্বও নামকরণ করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ রাজা দ্যুমৎসেনের একমাত্র পুত্রের নামকরণ বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে—

সত্যং বদত্যস্য পিতা সত্যং মাতা প্রভাষতে।
ততোঽস্য ব্রাহ্মণাশ্চক্রুর্নামৈতৎ সত্যবানিতি।।
বালস্যাশ্বাঃ প্রিয়াশ্চাস্য করোত্যশ্বাংশ্চ মৃন্ময়ান্।
চিত্রেঽপি বিলিখত্যশ্বাংশ্চিত্রাশ্ব ইতি চোচ্যতে।।[১২৭]

চ. রাজা পৌষ্যের পুত্র মতিনার : রাজা পৌষ্য প্রীতি নামক অপ্সরাকে শাস্ত্রসম্মত গান্ধর্ব বিবাহ পদ্ধতিতে বিবাহ করে মতিনার নামক এক রাজপুত্রের জন্ম দেন। রাজপুত্র মতিনার ছিলেন পৌষ্যের শাস্ত্রসম্মত ঔরসপুত্র বা স্বয়ংজাত পুত্র। পৌষ্য বা অনাধৃষ্টির অবর্তমানে মতিনার রাজা হয়ে প্রথমেই পুরুবংশে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। প্রসঙ্গতঃ মতিনার বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে–

অনাধৃষ্টিসুতস্ত্বাসীদ্রাজসূয়াশ্বমেধকৃৎ।
মতিনার ইতি খ্যাতো রাজা পরমধার্মিকঃ।।[১২৮]

ছ. একলব্যের সন্তানযুগল কেতুমান ও অবন্তিকা : একলব্য ও অবন্তীর রাজকন্যা সুবর্ণা পরস্পর অনুরাগবশতঃ শাস্ত্রসম্মত গান্ধর্ব বিবাহ করলেও পূর্বে সুবর্ণার দুই সন্তান ছিল। এক সন্তান কেতুমান (পুত্র) নামে এবং অপর সন্তান অবন্তিকা (কন্যা) নামে খ্যাত হন। সুবর্ণার বিবাহের পর একলব্য কেতুমান ও অবন্তিকাকে নিজ সন্তানরূপে মেনে নেন। শাস্ত্রসম্মত এই জাতীয় অন্যের সন্তানকে নিজ সন্তানরূপে মেনে নেওয়াকে অপবিদ্ধ পুত্র বলা হয়।

প্রসঙ্গতঃ একলব্য ও অবন্তীর রাজকন্যা সুবর্ণার সন্তান প্রসঙ্গে একলব্যের ইংরেজী *Wikipedia* তে বলা হয়েছে– "Ekalavya later married Suwarna, the princess of Avanti after he saved her from a demon king. He had two children Ketuman (a son) and Avantika (a daughter) with Suwarna".[১২৯]

জ. শকুনির পুত্র উলূক : গান্ধাররাজ শকুনি ও কোশল রাজকন্যা অর্ষির একমাত্র শাস্ত্রসম্মত ঔরসপুত্র উলূক জন্মগ্রহণ করেন। শকুনির একমাত্র পুত্রের উল্লেখ সর্বপ্রথম *বৈয়াসিক মহাভারতের* দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত থাকার প্রমাণ মেলে। ধূর্ত, খলস্বভাব দ্যূতকার শকুনির পুত্র উলূক বহুক্ষেত্রে কৈতব্য নামে চিহ্নিত হয়েছেন। পিতা শকুনির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁকে সারাজীবন নিজের পরিচয় হিসেবে বহন করতে হয়েছে।

৩.৪. বানপ্রস্থদশা : ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন দ্বিজাতি যথাশাস্ত্র গৃহস্থাশ্রমের ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করে জিতেন্দ্রিয় ভাবে বিধিমতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবে অর্থাৎ বনে বাস করবে। যে ব্যক্তির বিষয়ভোগতৃষ্ণা দূর হয়ে, তিনিই বানপ্রস্থের অধিকারী হবেন। *মনুসংহিতা* অনুযায়ী, গৃহস্থ যখন লক্ষ্য করেন নিজের শরীরের চামড়ার শিথিলতা, চুলের পক্কতা জন্মেছে এবং যখন পুত্রেরও পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে অর্থাৎ এইরকম একটা বিশেষ বয়স যখন উপস্থিত হবে, তখন তিনি বনবাস অবলম্বন করবেন। জীবনের অপরাহ্নকালে গৃহীকে গৃহ পরিত্যাগ করে অরণ্যে গিয়ে আরণ্যক হতে হয়। গৃহস্থ গৃহ ত্যাগ করে বনে প্রস্থান করতেন বলেই তাঁকে ‘বানপ্রস্থ’ বলা হত। গৃহস্থ সাধারণত গ্রামে থাকতেন কারণ তখন নগরের বাহুল্য ছিল না। গৃহস্থ শ্রৌত অগ্নি, গৃহ্য অগ্নি এবং অগ্নিহোত্রের উপকরণগুলি অর্থাৎ স্রুক্, শ্রুব প্রভৃতি দ্রব্যগুলি সঙ্গে নিয়ে গ্রাম থেকে অরণ্যে গিয়ে সেখানে সংযতেন্দ্রিয় হয়ে বাস করতে হবে। বানপ্রস্থ বিষয়ে *যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে* উল্লিখিত হয়েছে—

> সুতবিন্যস্তপত্নীক স্তয়া বানুগতো বনম্।
> বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী সাগ্নিঃ সোপাসনো ব্রজেৎ।।[১৩০]

৩.৪.১. *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের বানপ্রস্থদশা বর্ণনা : গৃহী যখন পুত্রপৌত্রপরিবেষ্টিত হয়ে আনন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন, তখনই তাঁকে সংসারে নিঃস্পৃহ হতে হয়। জীবনের তৃতীয় ভাগে অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর বানপ্রস্থ আশ্রমের কার্য্যকলাপ শুরু হয়। শরীরে বার্দ্ধক্যের সূচনা হলে গৃহী সংসার সম্পত্তি পুত্রদের হাতে সমর্পণ করে সংসারের সহিত সম্পর্কশূন্য করে জীবনযাপন করবেন। ঈশ্বরচিন্তায় কাল কাটানোর জন্য গৃহী অরণ্যে বসবাস করবেন। গৃহ ত্যাগ করে বনে বসবাস করতে হয় বলে এই আশ্রমের সংজ্ঞা বানপ্রস্থ। প্রসঙ্গতঃ *বৈয়াসিক মহাভারতের* শান্তিপর্বে বানপ্রস্থের সংজ্ঞা করা হয়েছে—

> জটাধরণসংস্কারং দ্বিজাতিত্বমবাপ্য চ।
> আধানাদীনি কর্ম্মাণি প্রাপ্য বেদমধীত্য চ।।
> সদারো বাপ্যদারো বা আত্মবান্ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
> বানপ্রস্থাশ্রমং গচ্ছেৎ কৃতকৃত্যো গৃহাশ্রমাৎ।।[১৩১]

পুনরায় পত্নীও যদি পতির সঙ্গে বনগমনে ইচ্ছুক হন, তবে পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে গৃহী বনে প্রস্থান করবেন, তা নাহলে পত্নীকে পুত্রের নিকট রেখে যাবেন। বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ তীর্থক্ষেত্রে অথবা নদী সংলগ্ন অরণ্যে তপশ্চর্য্যায় কালযাপন করবেন। সাধারণ জনসমাজের সঙ্গে চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের মিল ছিল না। বন্যঔষধি, অযত্নলভ্য ফলমূল পভৃতি খেয়ে তাঁরা ক্ষুধা নিবারণ করতেন। তাঁরা নদী ও ঝরনার জল ব্যবহার করতেন। ভূমি, শিলাতল, বালুকা এবং ভস্মরাশি তাঁদের শ্রেষ্ঠ শয্যা। কাশ, কুশ, চর্ম্ম এবং বল্কল তাঁদের পরিধেয় পোষাক ছিল। একমাত্র ধর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই তাঁরা শরীর ধারণ করতেন।

বানপ্রস্থ আশ্রমেও চারপ্রকার বৃত্তির কথা বলা হয়েছে। যেমন— **i.** সদ্যঃ বা প্রাত্যহিক সঞ্চয়, **ii.** মাসিকসঞ্চয়, **iii.** বার্ষিকসঞ্চয় ও **iv.** দ্বাদশ বার্ষিক সঞ্চয়। একবৎসর বা বার বৎসর উপযোগী খাদ্য যারা সংগ্রহ করতেন, তাদের উদ্দেশ্য ছিল অতিথিসেবা এবং যজ্ঞানুষ্ঠান। তেমনভাবেই *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* সমকালীন সমাজে অঙ্গবিকল ব্যক্তিরা বানপ্রস্থদশার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করেছেন তা ক্রমন্বয়ে নিম্নে আলোচিত হল—

i. ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি : ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি স্বস্ত্রীক বানপ্রস্থ অবলম্বন করে রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞভূমি সরয়ু নদীর উত্তরে যজ্ঞভূমি নির্মাণের আদেশ দেন। যথাসময়ে ঋষ্যশৃঙ্গ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রের মাধ্যমে ইন্দ্রাদি দেবতাদের যজ্ঞস্থানে আহ্বান করলেন এবং যথাবিধি আহূতি দিলেন। রাজা দশরথ যজ্ঞের শেষে যে দক্ষিণা দিলেন, ঋষ্যশৃঙ্গ তা সমস্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। রাজা দশরথ তাঁর কাছে আশীর্বাদ চাইলে, ঋষ্যশৃঙ্গ আশীর্বাদস্বরূপ চার পুত্রের জনক হওয়ার জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার আদেশ দেন। দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের কথাকে সম্মতি জানিয়ে *অথর্ববেদের* মন্ত্র অনুযায়ী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন এবং ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি নিজেই এই যজ্ঞ পরিচালনা করেছিলেন। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সমাপ্ত হলে সস্ত্রীক অঙ্গদেশের আশ্রমে ফিরে যান। প্রসঙ্গতঃ ঋষ্যশৃঙ্গের বনগমন বিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> সোঽনুজ্ঞাপ্য ততঃ শান্তাং রাজানশ্চৈব যোষিতঃ।
> প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কৃতবান্ পুত্রস্য দ্বিজসত্তমঃ।
> মহর্ষিভিঃ পূজ্যমানঃ সসুতশ্চ বনং যযৌ।।[১৩২]

ii. অন্ধক মুনি : বৃদ্ধ অন্ধক মুনি স্বস্ত্রীক এবং তাঁদের একমাত্র পুত্র সিন্ধুকে নিয়ে সরযূ নদীর তীরে এক আশ্রমে বন্যফলমূল দ্বারা জীবন ধারণ করতেন। প্রতিদিন তাঁরা আশ্রমে পুরাণাদি এবং বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্রপাঠ করতেন। প্রসঙ্গতঃ বৃদ্ধ অন্ধ দম্পতির বনের আশ্রমে জীবন ধারণ বিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

> বৃদ্ধস্যান্ধস্য দীনস্য বনে বন্যেন জীবতঃ।[১৩৩]

iii. কুবের : কুবেরের বানপ্রস্থ বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মার বরে শক্তিশালী রাবণ কুবেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং কুবেরের পুষ্পকরথ হরণ করেন। কুবের তখন লঙ্কা পরিত্যাগ করে যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর ও গন্ধর্বদের সঙ্গে গন্ধমাদন পর্বতের আশ্রমে প্রবেশ করেন এবং সেই আশ্রমেই থাকতে শুরু করেন। প্রসঙ্গতঃ কুবেরের বানপ্রস্থ বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> হিত্বা স ভগবাল্লঙ্কামাবিশদগন্ধমাদনম্।
> গন্ধর্ব্বযক্ষানুগতো রক্ষঃকিম্পুরুষৈঃ সহ।।[১৩৪]

iv. ধৃতরাষ্ট্র : কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পনেরো বছর পর ধৃতরাষ্ট্র সংসার ত্যাগ করে বনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বনে যাওয়ার আগে ধৃতরাষ্ট্র পিতৃপুরুষের ও পুত্রদের শ্রাদ্ধ করেন। এরপর নিজের ও পত্নী গান্ধারীরও শ্রাদ্ধ করেন। তারপর একদিন প্রজাসাধারণের কাছে হাতজোড় করে বনে যাবার অনুমতি চাইলেন। তারপর হস্তিনাপুরের নগরদ্বার দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র বল্কল ও অজিন পরিধানপূর্বক অগ্নিহোত্র হোমের অগ্নি এবং গান্ধারীকে সঙ্গে নিয়ে বনে প্রস্থান করেছিলেন। প্রথমদিন ভাগীরথী নদীর তীরবর্তি অরণ্যে তপস্বিপরিবৃত ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বিগণ কুশশয্যায় শয়ন করলেন। পরদিন গঙ্গা পার হয়ে ধৃতরাষ্ট্র পৌঁছলেন মহর্ষি শতযূপের আশ্রমে। মহর্ষি ব্যাসের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে বানপ্রস্থের অধিক সময় ধৃতরাষ্ট্র শতযূপের আশ্রমেই কাল অতিবাহিত করেন। প্রসঙ্গতঃ ব্যাসদেবের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের শতযূপের আশ্রমে বানপ্রস্থদশায় অবতীর্ণ হওয়া বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> স দীক্ষাং তত্র সম্প্রাপ্য রাজা কৌরবনন্দনঃ।
> শতযূপাশ্রমে তস্মিন্নিবাসমকরোত্তদা।।[১৩৫]

এরপর অস্থিচর্মসার, শুষ্ক মাংস, জটা ও মৃগচর্মধারী বল্কলপরিধায়ী রাজা ধৃতরাষ্ট্র জগৎ সংসারের মোহ পরিত্যাগ করে মহর্ষির ন্যায় কঠিন তপস্যায় রত হন।

৩.৫. সন্ন্যাসদশা : তিন আশ্রমের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে দ্বিজ সকলের শেষে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করবেন। যখন কোন দ্বিজ গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ উভয় আশ্রমে থাকার ফলে হোমক্রিয়া নিষ্পাদন করে, ইন্দ্রিয়দমনে অভিজ্ঞ হয়ে এবং ভিক্ষা ও বলি প্রদানের কাজে দীর্ঘদিন লিপ্ত থাকায় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে, নিজেকে সন্ন্যাস নামক চতুর্থ আশ্রমের অধিকারী হন। সন্ন্যাসীর অপর দুটি নাম ‘পরিব্রাজক’ ও ‘মুনি’। সন্ন্যাসী সাধারণতঃ সর্বভুতে অভয় দান করতে করতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি পবিত্র দণ্ড, কমণ্ডলু, কৃষ্ণাজিন সঙ্গে নিয়ে, কোনও কামনার বস্তু সামনে থাকলেও তাতে নিরপেক্ষ হয়ে, মৌন ব্রত অবলম্বনপূর্বক পরিব্রাজক ধর্মের আচরণ করে, তিনি নিজের সিদ্ধিলাভের জন্য সকল সহায়-রহিত হয়ে একাকী বিচরণ করবেন; এই অবস্থায় কোনও আর্থিক দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করে না। সন্ন্যাসী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে কাউকে আশ্রয় করবেন না, কাউকে বর্জনও করবেন না। সন্ন্যাসী দ্বিজ লৌকিক অগ্নির স্পর্শ বর্জন করেন। অহিংসা, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াসক্তির পরিহার, বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং উগ্র তপশ্চর্যা প্রভৃতির মাধ্যমে সন্ন্যাসী ব্রহ্মপদ লাভ করতে পারেন।

ব্রহ্মচর্যের বিশেষ ধর্ম হল স্বাধ্যায়, গৃহস্থের ইষ্টাপূর্ত, বানপ্রস্থের তপস্যা এবং চতুর্থ শ্রেণীর আশ্রমের বিশেষ ধর্ম হল ন্যাস। ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস— এই চারটি আশ্রমীর মধ্যে গৃহস্থকেই মনু শ্রেষ্ঠ বলেছেন। কারণ গৃহস্থাশ্রমই অন্য তিনটি আশ্রমকে ধারণ করে। এইভাবে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত বর্ণ ও আশ্রম প্রথার মাধ্যমে সুষ্ঠ ও স্বাভাবিক বৃহৎ সমাজ গড়ে উঠেছিল।

৩.৫.১. *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের সন্ন্যাসদশা বর্ণনা : জীবনের শেষ ভাগে নিরন্তর বানপ্রস্থ আশ্রম যাপন করে সন্ন্যাস গ্রহণের বিধান ছিল। শরীর যখন নিতান্ত জরাগ্রস্ত, নানাপ্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত, তখন প্রাজাপত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা সমস্ত ত্যাগ করার বিধান রয়েছে। শাস্ত্রীয় বিধানে বিহিত সকল কর্ম ত্যাগ করার নামই হল সন্ন্যাস। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে নিজের শ্রাদ্ধাদি নিজেকেই সম্পন্ন করতে হয়।

সন্ন্যাসাশ্রমে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন কাউকেও সঙ্গে রাখতে নেই এবং কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডন করার নিয়ম রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ সন্ন্যাসীর প্রাথমিক কর্ত্তব্য বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

জরয়া চ পরিদ্যূনো ব্যাধিনা চ প্রপীড়িত।
চতুর্থে চায়ুষঃ শেষে বানপ্রস্থাশ্রমং ত্যজেৎ।।[১৩৬]

গার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থ এই উভয় আশ্রমের সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিজেকে সন্ন্যাসের উপযুক্ত করে তোলা একরকমের বিশেষ সাধনার সমান। যথার্থ আশ্রমকর্মের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানের দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি জন্মে, চিত্তশুদ্ধিই পরম তত্ত্ব সাক্ষাৎকারে প্রধান সহায়ক। ভিক্ষুর ধর্মাচরণে অন্যের সহায়তার আবশ্যক হয়না। বিধিপূর্বক অগ্নি পরিত্যাগ করে সর্বত্যাগী যোগী অল্পমাত্রায় নিজের ক্ষুধা নিবারণের জন্য গৃহস্থের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। ভিক্ষাপাত্র ও গৈরিক বসন তাঁদের একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান নেই এবং মান-আপন সকলই তাদের পক্ষে সমান। একমাত্র ঈশ্বরচিন্তা ভিন্ন সমস্ত বিষয়ে উদাসীনতাই ভিক্ষুর যথার্থ লক্ষণ। প্রসঙ্গতঃ সন্ন্যাসীর লক্ষণ বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* সন্ন্যাসীর লক্ষণ বিষয়ে বলা হয়েছে—

নিস্তুতির্নির্নমস্কারঃ পরিত্যজ্য শুভাশুভে।
অরণ্যে বিচরৈকাকী যেন কেনচিদাশিতঃ।।[১৩৭]

সর্বভূতে সমভাব ও মৈত্রী সন্ন্যাসীর হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠ থাকে। আত্মচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী সর্বভূতের কল্যাণচিন্তা করবেন। হৃদয় অশুচি থাকলে দণ্ডধারণ, মুণ্ডন, উপবাস, অগ্নিহোত্র, ব্রহ্মচর্য্য, বনবাস প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়। সন্ন্যাসীগণকে তাঁদের কর্মের ভিত্তিতে চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ *বৈয়াসিক মহাভারতে* সন্ন্যাসীদের বিভাগ বিষয়ে বলা হয়েছে—

চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবস্তে কুটীচকবহূদকৌ।
হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ।।[১৩৮]

অর্থাৎ উপর্যুক্ত চার প্রকার সন্ন্যাসী হল—

i. কুটীচক : এই জাতীয় সন্ন্যাসিগণ একস্থানে বসে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকে। আপন স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি ব্যক্তিদের কাছ থেকে ভিক্ষাগ্রহণ করতে এইজাতীয় সন্ন্যাসীদের কোন বাঁধা নেই। কুটীচক জাতীয় সন্ন্যাসীগণ ত্রিদণ্ড ধারণ করেন।

ii. বহূদক : এই জাতীয় সন্ন্যাসীগণ সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, দণ্ড, কমণ্ডলু, শিখা, যজ্ঞোপবীত কাষার বস্ত্র প্রভৃতি কখনই ত্যাগ করেন না। বহূদক জাতীয় সন্ন্যাসীগণ তীর্থে তীর্থে গমন করে সাধনা করেন। এই জাতীয় সন্ন্যাসীগণও ত্রিদণ্ড ধারণ করেন।

iii. হংস : এই জাতীয় সন্ন্যাসিগণও শিখাদি রাখেন কিন্তু কোথাও এক রাত্রির অধিক কাল বাস করেন না। হংস জাতীয় সন্ন্যাসীগণও একটি মাত্র দণ্ড ধারণ করেন।

iv. পরমহংস : সকল জাতীয় বিধিনিষেধের ঊর্দ্ধে রয়েছে পরমহংস সন্ন্যাসীগণ। এদের শৌচাশৌচ বিচার না থাকলেও কোন বাঁধা নেই, এরাও একদণ্ডধারী হন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ এদের বশ্যতা স্বীকার করেছে, এরাও নিস্ত্রৈগুণ্য সম্পন্য সন্ন্যাসী হন।

অতএব শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাস আশ্রমের ধর্ম পালনের ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। প্রসঙ্গতঃ শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের মাধ্যমে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> নিরাশী স্যাৎ সর্ব্বসমো নির্ভোগো নির্ব্বিকারবান্।
> বিপ্রঃ ক্ষেমাশ্রমং প্রাপ্তো গচ্ছত্যক্ষরসাত্মতাম্।।[১৩৯]

৩.৬. *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের বিবিধ সংস্কারবিধি বর্ণনা : প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় বিবাহ ছাড়া আরও কয়েকটি সংস্কার পালনের বিধি ছিল এবং সেগুলির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংসার-জীবন উজ্জ্বল হয়ে উঠত বলে মনে করা হত। সংস্কারের দ্বারা শরীর পবিত্র হত বলে বিশ্বাস ছিল। *মনুসংহিতায়* উল্লিখিত প্রধান কয়েকটি সংস্কার হল, গর্ভধান, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, মাঙ্গলিক আচার, চূড়াকর্ম, উপনয়ন, কেশান্ত, সমাবর্তন প্রভৃতি। বর্ণাশ্রমিসমাজে এইজাতীয় সংস্কার অতি প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মের অন্যতম অঙ্গরূপে পালন করা হয়। উপনয়ন শুধুমাত্র দ্বিজাতির পক্ষে বিহিত ছিল। কিন্তু অন্যান্য সকল সংস্কার শূদ্রেরাও পালন করতেন। একসময় সমাজে কন্যাদেরও উপনয়ন সংস্কার প্রচলন ছিল,

কিন্তু কালক্রমে তা রহিত হয়ে যায়। *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিস্তৃতভাবে সকল সংস্কারের বর্ণনা পাওয়া যায় না। যেসকল দুই চারটি সংস্কারের বর্ণনা পাওয়া যায়, তা নিম্নে আলোচিত হল—

i. গর্ভধান বা ঋতুসংস্কার : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত সিদ্ধ রীতি-নীতি অবলম্বন করে মিলনের ফলে কল্যাণজনক সন্তান জন্ম সম্ভব হয়। স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্যজীবনে যাতে বড়ো বিপর্যয় না ঘটে, সেই কারণে মনু কয়েকটি বিধিনিষেধ রচনা করেছেন। যেমন ঋতুকালে স্ত্রীগমন, ঋতুকাল উল্লঙ্ঘন না করা, ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়েও স্ত্রীসম্ভোগ করা, স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ঋতুকাল, স্ত্রীগমনের পক্ষে নিন্দিত ছয়টি ও প্রশস্ত দশটি রাত্রি, ঋতুকালমধ্যে যুগ্মরাত্রিতে স্ত্রীসম্ভোগের সুফল, পুরুষের বীর্যাধিক্যে পুত্র সন্তানের এবং স্ত্রীলোকের বীর্যাধিক্যে কন্যাসন্তানের জন্ম, গর্ভসঞ্চার না হওয়ার কারণ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করে সেই সময়ে 'শরীরবিজ্ঞানসম্মত প্রজননতত্ত্বের' উপদেশসমূহ গর্ভধান সংস্কারের অন্তর্গত। গর্ভধান সংস্কার বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতের* অনুশাসন পর্বে বলা হয়েছে—

> হোমকালে যথা বহ্নিঃ কালমেব প্রতীক্ষতে।
> ঋতুকালে তথা নারী ঋতুমেব প্রতীক্ষতে।।[১৪০]

অর্থাৎ হোমের সময় বহ্নি যেমন কালের প্রতীক্ষা করেন, সেইরূপ ঋতুকালে স্ত্রীগণ পুরুষকে কামনা করেন। অতএব ঋত্বভিগমন প্রত্যেক বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে গণ্য। কেবলমাত্র ঋতুকালে যারা সন্তান কামনায় প্রবৃত্ত হন, সেই সকল দম্পতীর সন্তানগণ বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবী, ধার্মিক ও সত্যপরায়ণ হয়ে থাকেন। সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ধর্মপত্নীসম্ভোগ গৃহস্থের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেই কারণে ঋতুকালে স্ত্রীকে উপেক্ষা করলে পাপ হয়। একটি পুত্রের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত এই বিধান। ঋত্বভিগমনে ব্রহ্মচর্যব্রত স্খলিত হয়না। গৃহীদের মধ্যেও যারা ব্রহ্মচারী তাঁরা দীর্ঘায়ু লাভ করে আনন্দে জীবন অতিবাহিত করেন। ঋতুমতী পত্নীকে তিন রাত্রি সর্বতোভাবে বর্জনীয়। চতুর্থ রাত্রি থেকে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত গর্ভাধান বিহিত। অযুগ্ম রাত্রিতে গর্ভধান হলে সাধারণত কন্যার এবং যুগ্ম রাত্রিতে গর্ভাধানে পুত্রের জন্ম হয়ে থাকে। প্রসঙ্গতঃ গর্ভধানের সময় বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

স্নাতাং চতুর্থদিবসে রাত্রৌ গচ্ছেদ্বিচক্ষণঃ।
পঞ্চমে দিবসে নারী ষষ্ঠেঽহানি পুমান্ ভবেৎ।।[১৪১]

পুনরায় অতিশয় নির্জন স্থানে গোপনে মিলনের নিয়ম। সভ্য সমাজে এইসকল নিয়ম স্থান বা কালের দ্বারা পরিচ্ছন্ন হয় নি, ভবিষ্যতেও হবে না। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী এবং রবিসংক্রান্তিতে সর্বতভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, কারণ এইসকল সময়কে পর্বকাল বলে। পর্বকালে স্ত্রী সহবাসে পাপ হয়, এছাড়াও দিনের বেলা ও রজোদর্শনের প্রথম তিন রাত্রিতে সহবাস একান্ত নিষিদ্ধ। এই সকল নিষেধকে উপেক্ষা করলে নানাবিধ রোগ জন্মায় এবং অকালমৃত্যু হয়ে থাকে। প্রসঙ্গতঃ *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

ন দিবা মৈথুনং গচ্ছেন্ন কন্যাং ন চ বন্ধকীম্।
ন চাস্নাতাং স্ত্রিয়ং গচ্ছেত্তথায়ুর্বিন্দতে মহৎ।।[১৪২]

অতএব স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই উৎকৃষ্ট সন্তান লাভের সর্বদা কামনা করে থাকেন। সহবাসের সময় এই জাতীয় কামনা করা একান্ত প্রয়োজন। সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা সমধিক। কারণ গর্ভাধানের পর গর্ভিণী সর্বদাই গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন। তপস্যা, দেবতার্চনা, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, বন্দনা, তিতিক্ষা, ব্রহ্মচর্য, উপবাস, ব্রত প্রভৃতি সৎকার্য্যের দ্বারা জনক-জননী ধার্মিক, সুশ্রী এবং দীর্ঘায়ু সন্তান লাভ করতে পারেন। অতএব মিলনের সময় পিতা-মাতার মানসিক অবস্থা দ্বারা সন্তানের মানসিকভাব গঠিত হয়। সুতরাং জনক জননীর রমণের সময় শুচিতা খুবই আবশ্যক। গর্ভাধানের শুচিতা বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

সুক্ষেত্রাচ্চ সুবীজাচ্চ পুণ্যো ভবতি সম্ভবঃ।[১৪৩]

ii. জাতকর্ম : নবজাতক সন্তানের নাভিচ্ছেদের পূর্বে প্রাঙ্ নাভিবর্দ্ধনাৎ অর্থাৎ জাতকর্ম নামক সংস্কার করা হয়। জাতকর্ম সংস্কারের সময় মন্ত্রপাঠপূর্বক সন্তানের দেহে সোনা ছোঁওয়ানো এবং তার মুখে মধু ও ঘি দেওয়া হয়। নবজাতক সন্তানের মেধা ও আয়ু বৃদ্ধির জন্যই এই সংস্কার করা হয়। প্রসঙ্গতঃ জাতকর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্য বিষয়ে *পারস্করগৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে—

জাতস্য কুমারস্যাচ্ছিন্নায়াং নাড্যাং মেধানজনায়ুষ্যে করোতি।[১৪৪]

সন্তান জন্মানোর পর যে বৈদিক সংস্কার করার নিয়ম শাস্ত্রে রয়েছে তার নাম জাতকর্ম। পুত্র সন্তান জন্মালে জাতকর্মের যেরূপ বিধান রয়েছে, সেইরূপ একই বিধান কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রেও রয়েছে। *বৃহদারণ্যক উপনিষদের* (৬.৪.২৪.২৮) সংখ্যক মন্ত্রে নবজাতক সন্তানের জাতকর্মের যে বিধান রয়েছে, তার প্রধান অঙ্গগুলি হল—

ক. দধি-ঘৃত সহযোগে একটি সমন্ত্রক হোম।

খ. নবজাতক সন্তানের পিতা তিনবার 'বাক্' শব্দটি উচ্চারণ করতেন। জন্মলগ্নেই এই শব্দ তিনবার উচ্চারণ করে পিতা সন্তানের অন্তরে তিন বেদ অর্থাৎ জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করতেন।

গ. একটি সোনার অঙ্গুরীর সাহায্যে পিতা দই-ঘি মধুর মিশ্রণ পুত্রের মুখে দিতেন তার মেধা এবং আয়ুবৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে।

ঘ. জন্মলগ্নেই সন্তানের একটি গুপ্ত নাম দেওয়া হত।

ঙ. এরপর শিশুকে মাতৃস্তন্য পানে সমন্ত্রে প্রবৃত্ত করতেন পিতা।

চ. স্বামী স্বয়ং বীরপুত্রপ্রসবিণী জননীকে সমন্ত্রক অভিনন্দন জানাতেন।

মহাকাব্যে-পুরাণে বহুবার বহু নবজাতকের জাতকর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। *বাল্মীকীয় রামায়ণের* উত্তরকাণ্ডে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে সীতার পুত্রজন্মের উল্লেখ করেছেন এবং বাল্মীকি কর্তৃক যথাসময়ে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সীতাদেবীর যমজপুত্রদের অশুভ নিবারণ এবং তাদের দুষ্টগ্রহের হাত থেকে রক্ষার যথাবিধ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং যমজপুত্রদের নামকরণ জাতকর্ম সংস্কারের মাধ্যমে করেন। অতএব *বাল্মীকীয় রামায়ণের* সময়েও সমাজে এই প্রথার উল্লেখ রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ *বাল্মীকীয় রামায়ণে* লব ও কুশের জাতকর্ম সংস্কার বিষয়ে বলা হয়েছে—

> কুশমুষ্টিমুপাদায় লবণং চাভিরক্ষিণম্।
> বাল্মীকিঃ প্রদদৌ তাভ্যাং রক্ষাং ভূতবিনাশিনীম্।।[১৪৫]

পুনরায় *বৈয়াসিক মহাভারতেও* বিভিন্ন বিখ্যাত চরিত্রের জন্ম এবং জাতকর্ম সংস্কারের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে জাতকর্মের বিধি-বিধান সংক্রান্ত কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। জাতকর্ম

বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে— **ক.** মহারাজ শান্তনু বন থেকে কৃপ ও কৃপীকে কুড়িয়ে পেয়ে নিজের রাজপ্রাসাদে আনয়ন করেন এবং উভয়ের জাতকর্ম সংস্কার করা হয়। **খ.** রাজা অশ্বপতি কন্যা সাবিত্রীর জাতকর্মাদি সংস্কার করেছিলেন। **গ.** শিখণ্ডীরও জাতকর্মাদি সংস্করণ হয়েছিল। এছাড়াও নবজাতক সন্তান জন্মালে তার কল্যাণ কামনায় নানাবিধ দান-দক্ষিণা দেওয়ার রীতি প্রচলন ছিল। প্রসঙ্গতঃ দান-দক্ষিণা বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত হয়েছে—

যস্মিন্ জাতে মহাতেজাঃ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরঃ।
অযুতং গা দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদান্নিষ্কাংশ্চ ভারত।।[১৪৬]

iii. নামকরণ : শিশুদের নামকরণও একটি বৈদিক সংস্কার। জন্মের একাদশ বা দ্বাদশ দিনে পিতা স্বয়ং নামকরণ এইরূপ সংস্কারের বিধান রয়েছে। *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* নামকরণ এইরূপ সংস্কার বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়নি, শুধুমাত্র দুই এক স্থানে অতি সংক্ষিপ্তরূপে বলা হয়েছে।

iv. নিষ্ক্রমণ : ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুকে তিন মাস সূতিকা ঘরে রাখা হয়। চতুর্থ মাসে ভূমিষ্ঠ নবজাতক শিশুকে সূতিকাঘর থেকে বাইরে এনে সূর্য দেখানো হয়, এই সূর্য দেখানোর বিষয়কে নিষ্ক্রমণ বলা হয়। অতএব নিষ্ক্রমণ সম্বন্ধে *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লেখ না থাকলেও, জাতকর্মাদি সংস্কারে 'আদি' শব্দের দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

v. অন্নপ্রাশন : নবজাতক শিশুর জন্ম থেকে ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন নামক সংস্কার করতে হয়। শাস্ত্রকারদের মতে পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে ছয় বা আট মাস এবং কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে পাঁচ বা সাত মাসকে অন্নপ্রাশনের প্রশস্ত কাল ধরা হয়েছে। অন্নপ্রাশন সংস্কারে প্রথমে নান্দীশ্রাদ্ধ, হোম প্রভৃতি সংস্কার করতে হয়। হোমের পর শিশুর অধিবাস তারপর স্নানান্তে শিশুকে বসনভূষণে সাজানো হয়। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা* অনুসারে মন্ত্রপাঠ সহকারে পিতা পুত্রের মুখে অন্ন তুলে দেন। প্রসঙ্গতঃ অন্নপ্রাশন বিষয়ে *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতে* বলা হয়েছে—

অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ।
প্র প্রদাতারং তারিষ ঊর্জং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে।।[১৪৭]

মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর *রামায়ণে* দশরথের চার পুত্র যথাক্রমে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের অন্নপ্রাশনের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। মহামুনি বশিষ্ঠ চার রাজকুমারকে শুভক্ষণে তাঁদের অন্নপ্রাশন করিয়েছিলেন। পুনরায় *বৈয়াসিক মহাভারতে* অন্নপ্রাশন নামক সংস্কারের উল্লেখ না থাকলেও, জাতকর্মাদি সংস্কারে 'আদি' শব্দের দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

vi. মাঙ্গলিক আচার : সন্তান যে বংশে জন্মগ্রহণ করে, সেই বংশের যে সকল মাঙ্গলিক আচার প্রচলিত থাকে। যেমন পূতনা, শকুনিকা, বৃক্ষকে উপহার দেওয়া প্রভৃতি লোকপ্রসিদ্ধ অনুষ্ঠান ষষ্ঠমাসে কর্তব্য। *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* বৃহৎ চরিত্রসমূহের মধ্যে এই জাতীয় মাঙ্গলিক সংস্কারের উদাহরণ পাওয়া যায়।

Vii. চূড়াকর্ম : চূড়ার অর্থ শিখা বা একরাশি চুল, এজন্য এইজাতীয় সংস্কার চূড়াকর্ম নামে খ্যাত। মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ স্থানে যত্নের সঙ্গে চুলের বিন্যাস হল চূড়াকরণের নিকৃষ্ট অর্থ। শিশুর জন্মের তৃতীয় বৎসরে চূড়াকরণ সংস্কার করণীয়। প্রসঙ্গতঃ চূড়াকরণ বিষয়ে *গোভিলগৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে— 'তৃতীয়ে বর্ষে চূড়াকরণম'।[১৪৮] চূড়াকর্ম নামক সংস্কার *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিস্তৃত বর্ণনা নেই, শুধুমাত্র নাম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ চূড়াকর্ম বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উক্ত হয়েছে—

> জাতকর্ম্মানুপূর্ব্ব্যাৎ চূড়োপনয়নাদি চ।
> চকার বিধিবদ্ ধৌম্যস্তেষাং ভরতসত্তম।।[১৪৯]

viii. উপনয়ন : উপনয়ন শব্দের অর্থ হল আচার্যের কাছে বিদ্যার্থীকে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া। আট বছর বয়সে ব্রাহ্মণের, একাদশ বৎসরে ক্ষত্রিয় এবং দ্বাদশ বৎসর বয়সে বৈশ্যের উপনয়ন সংস্কার বিধেয়। উপনয়ন সংস্কারও *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিস্তৃত বর্ণনা নেই, শুধুমাত্র নাম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উপনয়ন সংস্কার বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উক্ত হয়েছে—

> জাতকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি ব্রতোপনয়ননানি চ।[১৫০]

ix. কেশান্ত : ব্রাহ্মণ সন্তানের ষোল বৎসর বয়সে, বাইশ বৎসর বয়সে ক্ষত্রিয়ের এবং চব্বিশ বৎসর বয়সে বৈশ্যের কেশান্ত সংস্কার অর্থাৎ চুল দাড়ি কাটা হয়। *বাল্মীকীয় রামায়ণে* কেশান্ত

সংস্কার 'গোদান' নামেও এই সংস্কার প্রসিদ্ধ হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ গোদান বিষয়ে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> কেশান্তঃ সংস্কারঃ, গোদানাখ্যাং কর্ম ইত্যর্থঃ।[১৫১]

এছাড়াও *বৈয়াসিক মহাভারতে* কুরু ও পাণ্ডব রাজকুমারদের যথাসময়ে পিতামহ ভীষ্ম ও কৃপাচার্য কর্তৃক কেশান্ত সংস্কার করা হয়েছে।

x. সমাবর্তন : বিদ্যাশিক্ষা সমাপনান্তে ব্রহ্মচর্যের শিক্ষায় ও ব্রতে কৃতকৃত্য হয়ে গুরুগৃহ থেকে স্বগৃহে ফিরে আসার পর ব্রহ্মচারী পুত্রকে তার পিতা মাল্য ও অলঙ্কার ভূষিত করে, উচ্চাসনে বসিয়ে মধুপর্কদ্বারা সম্মানিত করেন, এই জাতীয় সংস্কারকে সমাবর্তন উৎসব বলা হয়। মহাভারতকারের মতে বেদসম্বন্ধী ব্রত ও উপবাস করতে করতে আয়ুর চারভাগের একভাগ অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর যখন অতিক্রান্ত হবে তখনই কেবল যথাবিধি গুরুকে দক্ষিণা দান করে সমাবর্তন সংস্কার সম্পন্ন হয়। প্রসঙ্গতঃ সমাবর্তন বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতের* শান্তিপর্বে হয়েছে—

> স এবং গুরবে প্রীতিমুপহৃত্য যথাবলম্।
> অপ্রমাদাশ্রমেষ্বেব শিষ্যো বর্তেত কর্মণা।।
> বেদব্রতোপবাসেন চতুর্থে চায়ুষো গতে।
> গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা সমাবর্তেদ্ যথাবিধি।।[১৫২]

কিন্তু সমাবর্তন সংস্কারের কথা *বাল্মীকীয় রামায়ণ* বিস্তৃত বর্ণনা হয় নি, শুধুমাত্র নাম গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৭. <u>বিকৃতেন্দ্রিয়দিগের রাজনৈতিক অবস্থান</u> : রাজনীতি বলতে বোঝায় রাজার নীতি ও রাজধর্ম। রাজনীতি শব্দটি বহু ও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ রাজনীতির অর্থ সম্পর্কে ব্যাপক মতানৈক্য রয়েছে। 'রাজনীতি' বা 'Politics' শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে গ্রীক শব্দ 'পোলিশ' (Polis) এবং 'পলিটেজ' (Polites) শব্দ থেকে।[১৫৩] সাধারণভাবে রাজনীতি কথাটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সাধারণতঃ নির্বাচন, আইনসভা, মন্ত্রিসভা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতি কথাটি প্রয়োগ করা হয়। রাজনীতিক দলীয় মতবাদ, রাজনীতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই, দলীয় নেতাদের কৌশল প্রভৃতির সঙ্গে রাজনীতিকে একীভূত করে ভাবা হয়। অর্থাৎ নিছক দলীয় রাজনীতির

সঙ্গে রাজনীতির ধারণাকে গুলিয়ে ফেলা হয়। এ প্রসঙ্গে জয়ারাম (N. Joyaram) তাঁর *Introductory Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, "In everyday popular usage, politics is seen as being about 'Parliament', 'the Government', 'the Parties', 'Elections', 'Voting', and endless debates and arguments which produce more yawns than excitements".[১৫৪] রাজনীতির অর্থ সম্পর্কিত এই সংকীর্ণ সাধারণ ধারণা বিভ্রান্তিমূলক। সাধারণত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের স্থিতিশীল উদারনীতিক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় 'রাজনীতি' প্রসঙ্গে এই ধারণার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। রাজনীতি সম্পর্কিত এই ধারণার সীমাবদ্ধতার কথা বলতে গিয়ে জয়ারাম আরও বলেছেন যে, "But purely on a factual level, it is ethnocentric and lacking in historical perspective...."।[১৫৫] কেবলমাত্র রাজনীতিবিদদের আচরণ বা কার্যকলাপই হল রাজনীতি, এই ধারণা সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট এবং বিভ্রান্তিমূলক।

প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা নৃপতিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। চারটি বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয়রাই রাজা হওয়ার অধিকারী ছিল। মনুর মতে রাজা, অমাত্য, পুর, রাষ্ট্র, কোষ, দণ্ড এবং সুহৃৎ— এই সাতটি হল রাজ্যের অঙ্গ। এই সাতটি অঙ্গের মধ্যে যদি প্রত্যেকটি অঙ্গ পরস্পরের সাহায্যকারী না হয়, তাহলে প্রকৃত রাষ্ট্রব্যবস্থা কখনোই গড়ে ওঠা সম্ভপর নয়।[১৫৬]

রাজার শাসন ব্যবস্থা মূলতঃ গ্রাম কেন্দ্রিক হলেও প্রাচীন ভারতে অনেক নগরের অস্তিত্ব ছিল। মনু প্রত্যেক নগরের জন্য একজন উচ্চপদস্থ, প্রতাপশালী, সর্বকার্যদর্শক নিযুক্ত করার কথা বলেছেন। সেই নগরাধ্যক্ষ পূর্বোক্ত গ্রামাধিপতি প্রভৃতিকে প্রয়োজন হলে নিজের সৈন্য সামন্ত দিয়ে পরিপূর্ণ শক্তিশালী করে রাখতেন এবং সেই সেই জায়গায় নিযুক্ত গুপ্তচরদের দ্বারা তাদের রাজানুগত্য প্রভৃতি আচরণ বিশেষভাবে অবগত হতেন।

প্রাচীন ভারতে গ্রামই ছিল জাতীয় জীবনের কেন্দ্র। সম্পূর্ণ রাজ্য সাধারণতঃ 'রাষ্ট্র' নামে অভিহিত হত, আবার রাষ্ট্র সপ্তাঙ্গ রাজ্যের একটি অঙ্গ বলেও অভিহিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র শব্দের অর্থ 'জনপদ'। রাষ্ট্রের অধিবাসীদের 'রাষ্ট্রিক' নামে অভিহিত করা হয়, এরা রাজার সম্পর্কে সকলেই ছিল প্রজা। রাজ্যকে 'বিষয়' নামেও অভিহিত হতে দেখা যায়।[১৫৭]

কিন্তু প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সংগঠন ছিল। দূরবর্তী অতীতের সহস্র বৎসরের সভ্যতাসমূহের যে সব সুফল বর্তমানেও আমরা ভোগ করে চলেছি, যেসব সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ঘটলে বিবিধ তথ্য পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে যে, বিস্মৃত যুগসমূহের মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রচিন্তা ও ধারণার আশ্চর্যজনক প্রাচুর্য ছিল। প্রাচীন মানুষেরা রাজনৈতিক ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে ধারণা সমূহের সূত্রবদ্ধকরণ ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বপ্রয়োগকে প্রয়োগকে প্রণালীবদ্ধ করবার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ধর্মীয় নৈতিকতার আড়ালে অবগুণ্ঠিত ছিল। প্রকৃত রাষ্ট্রচিন্তা হিসাবে দাবী জোরদার না হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয় ঘটেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে *বাল্মীকি রামায়ণের* অযোধ্যাকাণ্ড, *বৈয়াসিক মহাভারতের* শান্তি পর্ব, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*, *মনুসংহিতা* অর্থাৎ মনুর বিধিসমূহ যাকে বলা হয় হিন্দু আইনশাস্ত্রের বাইবেল। এই সব শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত উপাদানই প্রকৃত রাষ্ট্রচিন্তা হিসেবে গণ্য হতে পারে। এইগুলি সাধারণভাবে দর্শন থেকে স্বতন্ত্র। প্রাচীন রাষ্ট্রচিন্তার বিষয় পরিধি বিস্তৃত। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উৎপত্তি, রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ, রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক, রাজতন্ত্রের উদ্ভব, সরকারের প্রকারভেদ, রাজকীয় কর্তৃত্ব ও তার সীমাবদ্ধতা এবং এই তালিকার সঙ্গে আরও যুক্ত হতে পারে প্রকৃতির রাজ্য সংক্রান্ত তত্ত্ব, সামাজিক চুক্তি মতবাদ, সার্বভৌমিকতা, এমনকি আন্তর্জাতিক আইনও।[১৫৮]

৩.৭.১. *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক অবস্থান

: রাজ্য-শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়। স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোশ, রাষ্ট্র, দুর্গ এবং বল এই সাতটি অঙ্গের সমষ্টির নাম রাজ্য।[১৫৯] কিন্তু সপ্তাঙ্গক রাজ্যের পঞ্চমস্থানীয় রাষ্ট্রশব্দের অর্থ প্রজামণ্ডলী ও তাদের বাসস্থান-জনপদ। রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, প্রজাপালন প্রভৃতি রাষ্ট্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে আলোচ্য হলেও স্বামী ও অমাত্যের আলোচনাতেই প্রসঙ্গতঃ তা বলা হয়েছে। শত্রু ও মিত্রের পরিচয় এবং তাদের প্রতি কর্তব্য, সন্ধিবিগ্রহ, চরনিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ও রাষ্ট্রীয় আলোচনার অন্তর্গত। তারপর দুর্গ, রাজপুর এবং শাসনপ্রণালী বিষয়ও এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

মানুষের শত্রু পদে পদে কথাটি অতি সত্য। জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে মানবের শত্রুর শেষ নেই। শত্রুপ্রবল পৃথিবীতে বাঘ, ভালুক, কুমীর, সাপ প্রভৃতি প্রাণীকে তাদের আকৃতি দ্বারা সহজেই পরিচয় করা যায়। কিন্তু ভদ্রবেশধারী মানুষকে পরিচয় করা সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। সেইহেতু নিপুণভাবে শত্রু ও মিত্র স্থির করবার জন্য রাজাদেরকে বিবিধ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রবলপ্রতাপান্বিত নরপতিও শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হয়ে চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছেন, এরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ পুরাণ ও ইতিহাসে রয়েছে।

শত্রু কেবল পরিবারের বাইরেই অবস্থান করে না, অনেকক্ষেত্রে বহু নরপতি প্রিয়তমা মহিষী, পরম স্নেহাস্পদ সহোদর এবং প্রাণোপম পুত্রের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন বা চিরতরে কুলক্ষয় হয়েছে। সুতরাং এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা রাজাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন।

জগতে শত্রুহীন মানব একজনও নেই। এমন কি, অরণ্যচারী সন্ন্যাসী স্বয়ং কারও সহিত শত্রুতা না করলেও তার সহিত শত্রুতা করিবার লোকের অভাব হয় না। যে অরণ্যচারী মুনি শুধু আপনার কাজ নিয়েই কালাতিপাত করেন, জগতের কল্যাণই যার ধ্যান, তারও শত্রু, মিত্র এবং উদাসীন (শত্রুও নয়, মিত্রও নয়), এই তিন শ্রেণীর লোক থাকেন। লুব্ধগণ শুচিস্বভাব পুরুষকে হিংসা করে থাকে, কাতর ভীরু পুরুষ তেজস্বী পুরুষকে ঈর্ষা করে, মূর্খেরা পণ্ডিতের সহিত শত্রুতা করে, দরিদ্রেরা ধনীকে শত্রু বলিয়া মনে করে, ধার্মিকগণ অধার্মিক পাপাচারীদের চক্ষুঃশূল, সুন্দর পুরুষ সকল সময়েই কুৎসিত পুরুষদের দ্বারা দ্বেষ্যের স্বীকার হয়ে থাকে। সুতরাং জগতে শত্রুহীন একজন মানুষও নেই।

শত্রুমিত্র পরিজ্ঞানের সাধারণ কয়েকটি নিয়ম থাকলেও, অনেক সময় সেইসকল বাহ্যিক লক্ষণের দ্বারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি শত্রুকে ধরা যায় না। তারা বাইরে মিত্রের মত আচরণ করলেও হৃদয়সঞ্চিত হলাহলের তীব্র আক্রোশকে সফল করবার নিমিত্ত প্রতি মুহূর্তে সুযোগ খুঁজতে থাকেন। অতিশয় নিপুণতার সহিত শত্রুমিত্রের পরীক্ষা করতে হয়। "যিনি আমার সুখে সুখ এবং দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন, তিনিই প্রকৃত মিত্র। যাঁহার অনুভব বিপরীত, অর্থাৎ যিনি আমার সুখে দুঃখী এবং দুঃখে সুখী হন, তিনিই শত্রু"। এই একটিমাত্র লক্ষণের দ্বারাই শত্রু ও মিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁদের একশ্রেণীর জীবিকা দ্বারা সংসার চালাতে হয়, তাদের মধ্যে শত্রুতা প্রায় লেগেই

থাকে। এজন্যই রাজার শত্রু রাজা, ব্রাহ্মণের শত্রু ব্রাহ্মণ, চিকিৎসকের শত্রু চিকিৎসক। এইরূপে প্রায়ই সমব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি শত্রুতাতে সর্বদা নিহিত থাকে। এই কারণেই জ্ঞাতিকে 'সহজ শত্রু' আখ্যা দেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ সহজ শত্রু বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতের* সভাপর্বে বলা হয়েছে—

> নাস্তি বৈ জাতিতঃ শত্রুঃ পুরুষস্য বিশাম্পতে।
> যেন সাধারণী বৃত্তিঃ স শত্রুর্নেতরো জনঃ।।[১৬০]

অতএব শত্রু অতি ক্ষুদ্র হলেও তাকে উপেক্ষা করা কখনোই উচিত নয়। অগ্নি এবং বিষের সহিত শত্রুর উপমা দেওয়া হয়েছে। স্বল্পমাত্র অগ্নিও প্রকাণ্ড গ্রামকে ভস্মস্তূপে পরিণত করতে পারে, বিষ পরিমাণে নিতান্ত অল্পমাত্রায় সেবিত হলেও তাহার পরিণাম অতি ভয়ানক।

শত্রুতার যথোচিত প্রতীকারের নিমিত্ত নিয়ত পৌরুষের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। উদ্যোগবিহীন অলস ব্যক্তি অতি সহজেই শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। শত্রুদের অগোচরে নরপতি সর্ব্বদা প্রতীকারের চেষ্টা করবেন, খুব ক্ষিপ্রতার সহিত শত্রুপক্ষের চেষ্টাচরিত্র জানতে হয়।

প্রাচীনকালে যে মুহূর্ত থেকে রাষ্ট্রের ভাবনা চালু হয়েছিল অথবা সেই রাষ্ট্রকে ধারণ পালন করার জন্য যখন থেকে রাজনীতির ভাবনা চালু হয়েছিল, সেই দিন থেকেই রাজনীতির সঙ্গে ধর্মনীতি, সমাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি সবই জড়িয়ে পড়েছে। সেইহেতু *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* আমরা এমন কিছু সাধারণ চরিত্র দেখতে পাই, যাঁরা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ হলেও তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত কুটবুদ্ধির দ্বারা কখনো রাজাকে সিংহাসন ছাড়তে হয়েছে, কখনোবা সমগ্র কুলের বিনাশ ঘটেছে। এই সকল ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত কূটনৈতিক অবস্থাকেই 'রাজনীতি বা রাজনৈতিক বিচক্ষণতা' নামে আখ্যাত হয়েছে। কারণ পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্য ও স্বার্থ থাকলে যেকোন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনীতি থাকা অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন ভারতীয় বিবিধ রাজনৈতিক প্রথার বিশ্লেষণ করে ম্যাকেঞ্জী ব্রাউন তাঁর *Indian Political Thought* গ্রন্থে রাজনীতি কি সে বিষয়ে বলেছেন— "Coronation by priest was a necessary prerequisite to the exercise of royal power. In that ceremony the *sveta-chhartra* the white umbrella with jewelled handle, symbolised sovereignty or political power and was held over the

head of the ruler as he took his place upon the throne".[১৬১] অতএব এই সকল ব্যক্তিদের মস্তিষ্কপ্রসূত শাস্ত্রসম্মত রাজনৈতিক কুশলতা কীরূপ ছিল, তা নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হল:

ক. মন্থরার রাজনৈতিক কুশলতা : *বাল্মীকি রামায়ণে* মন্থরাকে রামচন্দ্রের বনবাসের মূল কারণ এবং একটি কপট চরিত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। রাজা দশরথের পত্নী কৈকেয়ী বিবাহের সময় অন্যান্য যৌতুকের সঙ্গে মন্থরা নামে এক দাসীকে অযোধ্যায় নিয়ে এসেছিলেন। এই মন্থরা একদিন কৈকেয়ীর প্রাসাদের ছাদ থেকে অযোধ্যার আনন্দ উৎসবের বাতাবরণ দেখে খুব অবাক হন। সাধারণ প্রজাদের কাছে উৎসব আনন্দের কারণ জানতে পারে যে, পুষ্যা নক্ষত্রযোগে দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত হবেন। অযোধ্যার প্রজাদের মুখে কৌশল্যা পুত্র রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের খবর তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। কারণ তিনি মন থেকে চেয়েছিলেন সহোদরী কৈকেয়ীর পুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক। কারণ তিনি হয়তো চেয়েছিলেন কৈকেয়ী যদি রাজমাতা হতে পারেন তাহলে তার নিজেরও আরও সম্মান এবং পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্থরা তৎক্ষণাৎ রামের বনবাসের জন্য কৈকেয়ীর গৃহে পদার্পণ করলেন এবং কৈকেয়ীকে বিবিধ কুটবুদ্ধির দ্বারা প্রলুব্ধ করতে লাগলেন। মন্থরা কর্তৃক যেসকল কুটবুদ্ধির দ্বারা রানী কৈকেয়ীর মনকে বশীভূত করে নিজের মনোকামনাকে পূরণ করেছিলেন, তা ক্রমানুসারে নিম্নে আলোচিত হল–

১. মন্থরা কৈকেয়ীর নিকট গম্ভীরভাবে রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদটি প্রেরণ করে বলেন, কৈকেয়ী জন্মেছেন রাজবংশে, পরে হয়েছেন রাজরানী। অতএব রাজধর্মের তীব্রতা কৈকেয়ীর বোঝা উচিত। রাজা দশরথের ব্যবহার যতই মিষ্ট হোক, অন্তরে তিনি অত্যন্ত শঠ এবং কৈকেয়ীকে তিনি ঠকিয়েছেন। বর্তমানে রাজা দশরথ তার সন্তানকে ভরতকে মামার বাড়ি কেকয়ে প্রদেশে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার পণ করেছেন। সুতরাং কৈকেয়ীর উচিত এইসময়ে নিজের মঙ্গলের চেষ্টা করা এবং নিজেকে আর সন্তান ভরতকে রক্ষা করা। কারণ মন্থরা যখন উপর্যুক্ত বুদ্ধি কৈকেয়ীকে দিয়েছিলেন তখন হয়ত মনে মনে ভেবেছিলেন যে, কৈকেয়ীর দুঃখে তার মহাদুঃখ হবে এবং কৈকেয়ীর অভ্যুদয়ে তার অভ্যুদয় ঘটবে।[১৬২]

২. মন্থরা পুনরায় কৈকেয়ীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, কৌশল্যাকে তিনি সৌভাগ্যশালিনী মনে করেন কারণ রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলে মাতা কৌশল্যা বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিতে সমৃদ্ধ হবেন এবং কৈকেয়ীকে যুবরাজ মাতা কৌশল্যার সারাজীবন দাসীর ন্যায় সেবায় রত থাকতে হবে। রাজমাতা হয়ে কৌশল্যা অবশ্যই কৈকেয়ীর সঙ্গে শত্রুতা করবেন। সুতরাং মন্থরার মতে, কৈকেয়ীর বর্তমানে একটাই চেষ্টা হওয়া উচিত তা হল, ভরতের রাজ্যলাভ এবং তার পাশাপাশি রামের নির্বাসন।[১৬৩]

৩. মন্থরার মতানুযায়ী রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলে, তাঁর পত্নী সীতা সমৃদ্ধিযুক্ত এবং শ্রীসম্পন্না হবেন, কিন্তু ভরতের পত্নী মাণ্ডবী সারাজীবন শ্রীবিরহিতা ও অসমৃদ্ধ থাকবে।[১৬৪]

৪. মন্থরা তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত কূটবুদ্ধির দ্বারা পুনরায় কৈকেয়ীর উদ্দেশ্যে বলেন, রাম যদি বর্তমানে অযোধ্যার রাজা হন, তবে ভবিষ্যতে রামের অবর্তমানে তাঁর পুত্রই রাজা হবেন এবং ভরত অযোধ্যার রাজসিংহাসন থেকে চিরতরে বিচ্যুতি ঘটবে। কারণ রাজার পুত্রই ভবিষ্যতে রাজসিংহাসনের অধিকারী হয়ে থাকেন, অতএব রামচন্দ্র রাজা হলে তার নিজ পুত্রই ভবিষ্যতে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বসবেন, কোন ভ্রাতুষ্পুত্র গুণবান হলেও তাকে রাজসিংহাসন অর্পণ করা হবে না। ভরতের অবস্থা অনাথ পুত্রের ন্যায় হবে এবং তিনি শ্বাশ্বত রাজবংশ বিচ্যুতি হবেন। রামের বৈমাত্রেয় ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজসিংহাসনে কোনরূপ অধিকার নেই, সেবিষয়ে মন্থরা মুখে উচ্চারিত হয়েছে—

> তেঽপি জ্যেষ্ঠাঃ স্বপুত্রেষু জ্যেষ্ঠেষ্বেব ন সংশয়ঃ।
> আসজন্ত্যখিলং রাজ্যং ন ভ্রাতৃষু কথঞ্চন।।[১৬৫]

৫. এছাড়াও মন্থরা কৈকেয়ীর মনকে বিষোদগার করার উদ্দেশ্যে আরও বলেন, কৌশল্যা পুত্র রামচন্দ্র রাজা হলে, ভরতকে হয় দেশান্তরে প্রেরণ করবেন অথবা তাকে হত্যা করবেন। কারণ ভরত বাল্যকাল থেকেই মাতুলালয়েই বড়ে উঠেছিল, সেইহেতু ভরতের প্রতি রামের অনুরাগ কখনোই প্রাপ্ত হয়নি। অথচ সুমিত্রা পুত্র লক্ষ্মণের প্রতি রামের অনুরাগ জগৎবিখ্যাত, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায়। অতএব রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলে লক্ষ্মণের প্রতি কোনরূপ অনিষ্ট কার্য করবেন না। কিন্তু ভরতকে অবশ্যই বনে প্রেরণ করা হবে। রাম কর্তৃক ভরতকে

বনে প্রেরণ এবং ভরতের দুদর্শা থেকে কৈকেয়ীর উদ্ধার করা বিষয়ে মন্থরার মুখে উচ্চারিত হয়েছে—

> অভিদ্রুতমিবারণ্যে সিংহেন গজযূথপম্।
> উচ্ছিদ্যমানং রামেণ ভরতং ত্রাতুমর্হসি।।[১৬৬]

কৈকেয়ী উপর্যুক্ত মন্থরার কথার দ্বারা পুরোপুরি বশীভূত হন এবং মন্থরাকেই দায়ীত্ব দেন যে, কোন উপায় খুঁজে বের করার জন্য, যাতে ভরতের রাজ্যাভিষেক এবং রামচন্দ্রের বনবাস সিদ্ধ হয়। এক্ষেত্রেও মন্থরা কৈকেয়ীকে মনে করে দেন যে, পূর্বকালে দেবাসুরের যুদ্ধে দশরথকে শম্বর বা তিমিধ্বজ নামে এক মায়াবী অসুরের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। যুদ্ধে দশরথ ক্ষতবিক্ষত হলে কৈকেয়ীই বহু সেবা করে তাঁর প্রাণ বাঁচান। সেই সময় দশরথ পত্নী কৈকেয়ীর সেবাই সন্তুষ্ট হয়ে দুটি বর দিতে চান। কিন্তু কৈকেয়ী তখন বর দুটি গ্রহণ না করে বলেছিলেন, তিনি পরে যখন প্রয়োজন হবে তখন এই বর দুটি দশরথের কাছ থেকে চেয়ে নেবেন।

উপর্যুক্ত ঘটনা অর্থাৎ দশরথ কর্তৃক কৈকেয়ীকে দুটি বরদানের কথা মন্থরা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, এই সময়ই কৈকেয়ীর পতির কাছ থেকে বর দুটি চাওয়া উচিত। বর দুটি হল, রামচন্দ্রের চৌদ্দ বছরের বনবাস এবং ভরতকে অযোধ্যার রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। কারণ মন্থরা ভবিষ্যদ্বাণী মনে মনে করেছেন যে, যদি রাম চোদ্দ বছরের বনবাস ভোগ করে যখন ফিরে আসবেন, ততদিনে ভরত রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন এবং রামচন্দ্র ভরতের কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারবেন না।

এরপরের ঘটনাগুলি মন্থরার পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়, রাম বনবাসী হন এবং পুত্রশোকে দশরথ প্রাণত্যাগ করেন। ভরতকে সদূর কেকয় রাজ্য থেকে অযোধ্যায় ফিরে এসে রাজসিংহাসনে বসানো হয়।

রামকে বনবাসে পাঠানোর পেছনে রয়েছে মন্থার বহু পূর্বের গুপ্ত অভিসন্ধি। কৈকেয়ীয় প্রিয় দাসী হিসাবে মন্থরা অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে ভৃত্যদের মধ্যে প্রধান স্থান দখল করেছিলেন। তাই তাকে 'কুণি' (তামিল ভাষায়) নামে ডাকা হত। কুণি শব্দের অর্থ হল আঁকাবাঁকা বক্রদেহী শরীর। মন্থরা দশরথের রাজ্যে স্ত্রীধন ব্যবস্থার অংশ হিসাবে দাসদের সভাপ্রধান ছিলেন। তাই মন্থরা অযোধ্যায়

কৈকেয়ীর ব্যবস্থার জন্য সর্বাত্মক ভূমিকা সর্বদা পালন করেছেন, তার অনুমতি ছাড়া রাজপ্রাসাদে কৈকেয়ীর দৈনন্দিন দ্রব্য সামগ্রী কিছুই নড়তে পারত না। একদিন কৈকেয়ী শয়নরত অবস্থায় তাঁর কক্ষে রামচন্দ্র ঢোকার চেষ্টা করলে মন্থরা বাঁধা দেন। বাল্যকালে সেই রাগে হয়ত খেলার ছলে রামচন্দ্র ছোট ক্যাটাপল্ট দিয়ে মন্থরার পিঠে আঘাত করেছিলেন। ক্যাটাপল্ট হল এমন একটি যন্ত্র যা বস্তুকে জোর করে অনেক দূরত্বে নিক্ষেপ করতে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ বাঁটুল দিয়ে মাটির তৈরি গুলতি নিক্ষেপ যাতীয় খেলনা সামগ্রী। রামচন্দ্রের দ্বারা মন্থরা খেলার ছলে নিগৃহিত হন। সেইসময় থেকে তিনি রামচন্দ্রের প্রতি অন্তরের বিদ্বেশমূলক প্ররোচনার দ্বারা কৈকেয়ীর মনকে বিষাক্ত করার সুযোগ নেন। প্রসঙ্গতঃ মন্থরার গুপ্ত অভিসন্ধি বিষয়ে Rishabh Pandey প্রণিত *Anylysing different versions of Ramāyaṇa* গ্রন্থে বলা হয়েছে– "Another version of the tale involves Mantharā, also known as Kooni, playing a stick-and-ball game with a young Rama who becomes angry and breaks Mantharā's knee with a stick. As the story goes, Mantharā held a grudge against Rāma, setting the stage for her later actions that led to his exile".[১৬৭]

মন্থরার কূট অভিসন্ধি ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা। রামচন্দ্রের বনবাস যাত্রার উদ্দেশ্য সফল হলেও, মন্থরার উদ্দেশ্যে এককথায় বলা যায় যে, তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষেই একজন বক্রদেহী, ঈর্ষাপরায়ণ, কুটবুদ্ধিসম্পন্ন স্ত্রীলোক, যাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল অপরিমেয়।

খ. কুবেরের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা : রাক্ষস, যক্ষদের অধিপতি এবং ধনসম্পদের দেবতা হলেন কুবের। *বৈয়াসিক মহাভারতের* সভাপর্বে কুবেরের রাজপ্রাসাদের সভাঘরের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেখানে আসীন হয়ে কুবের রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। কুবেরের সভাটি একশ যোজন লম্বা এবং সত্তর যোজন চওড়া ছিল। কুবেরের রাজপ্রাসাদের সভাকক্ষটি ছিল শ্বেতবর্ণের। সভাকক্ষের বিভিন্ন স্থান মূল্যবান মণিরত্নে খচিত ছিল। যক্ষরাজ কুবেরের সভায় দেবাদিদেব মহাদেব ও দেবী পার্বতীও অবস্থান করতেন। রম্ভা-মেনকা-উর্বশী প্রমুখ অপ্সরা, চিত্রসেন, মণিভদ্র, চিত্ররথ প্রভৃতি গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, কিন্নর ও বিদ্যাধরগণ, পিশাচগণ প্রমুখরা কুবেরের সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর উপাসনা করতেন। রাক্ষসগণ ও অন্যান্য মন্ত্রী পারিষদগণ তাঁর সভায় উপস্থিত হয়ে মহাদেবের উপাসনা করতেন। এছাড়াও কুবেরের সভায় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিভীষণ এবং পুত্র নলকূবর উপস্থিত থাকতেন। শঙ্খ, পদ্ম প্রভৃতি অষ্টনিধিও দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করে কুবেরের সভায় উপস্থিত থেকে

তাঁর যথাযথ সেবা করতেন। কুবের তাঁর রাজ্যের সভাকক্ষটি মূলতঃ তপস্যা করার হেতুই নির্মাণ করেছিলেন।[১৬৮]

কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ শক্তিশালী হয়ে দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং ঋষিদের বধ করতে লাগলে দেবতারাও রাবণকে বধ করবেন বলে মনোস্থির করেন। কুবের এই কথা জানতে পেরে রাবণের কাছে দূত পাঠালেন এই ভেবে যাতে সে সংযত হয় এবং দুষ্কর্ম থেকে বিরত হয়। এক্ষেত্রে যক্ষরাজ কুবের রাবণের সঙ্গে সন্ধির বার্তা দেন অর্থাৎ রাবণের যাতে উপকার হয় এমন বিষয়ের উপর নজর হেতুই তিনি দূতকে দিয়ে যুদ্ধ না করার পরামর্শ দেন। কিন্তু দূত এসে রাবণকে কুবেরের বার্তা জানালেন এবং তার সাথে আরও বলেন যে, তিনি মহাদেবের সখ্যতা লাভ করেছেন। রাবণ তৎক্ষণাৎ সেই বার্তাবাহক দূতের মুখে কুবেরের সহিত মহাদেবের সখ্যতার কাহিনী শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে সেই বার্তাবাহককে হত্যা করেন। এরপর রাবণ প্রথমে কুবেরের রাজ্য আক্রমণ করেন। যক্ষদের সঙ্গে তাঁর ভয়ানক যুদ্ধ হয় এবং যক্ষরা পরাস্ত হলে কুবের আপন অনুচর মণিভদ্রকে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য পাঠান। মণিভদ্রও যখন পরাজিত হন, কুবের তখন স্বয়ং যুদ্ধে প্রবেশ করেন। কুবেরের বীরত্বে রাবণের মন্ত্রী-সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। অবশেষে ভ্রাতা রাবণ গদা দিয়ে কুবেরের মাথায় আঘাত করেন এবং তাঁর পুষ্পকরথ হরণ করেন। আহত কুবেরকে পদ্ম প্রভৃতি নিধিদেবতাগণ নন্দন বনে নিয়ে এসে সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন। এক্ষেত্রে কুবের ভ্রাতা রাবণের দ্বারা পীড়িত হয়ে নিধিদেবতাগণের নিকট আত্মসমর্পণ অর্থাৎ ষড়গুণের মধ্যে সংশ্রয়ের (seeking protection) এর আশ্রয় নিয়েছেন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ কর্তৃক কুবেরকে আহত এবং নিধি দেবতাগণ কর্তৃক শুশ্রূষা বিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে–

> ততঃ পদ্মাদিভিস্তত্র নিধিভিঃ স তদাবৃতঃ।
> আশ্বাসিতো ধনপতির্ব্বনমানীয় নন্দনম্।।[১৬৯]

পুনরায় কুবেরের বাসস্থানের কাছেই অবস্থিত যে সরোবরে তিনি বিহার করতেন, সেই সরোবরটি ক্রোধবশ নামে রাক্ষসেরা পাহারা দিতেন। কুবেরের রাজপ্রাসাদের বিবিধ বর্ণনানুযায়ী অনুমান করা হয় যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির বিজিগীষু রাজা। তিনি স্বাভাবিকভাবে বিনীত ছিলেন প্রত্যেক প্রজাদের কাছে। কুবের একজন আদর্শ রাজা ছিলেন এবং প্রজারা তাঁকে অত্যন্ত

ভালবাসতেন। কুবেরের শরীর বিকৃত অঙ্গ যুক্ত (তিনটি পা, মাত্র আটটি দাঁত এবং বাম চোখের স্থানে কেবল একটি হলুদ চিহ্ন) হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মা তাঁকে অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর করেছিলেন। একসময় কুবের লঙ্কার রাজত্ব ও ঐশ্বর্য ত্যাগ করে অলকাপুরীতে চলে যান এবং সেখানেই নিজের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। অলকাপুরীর রক্ষার কাজে নিযুক্ত কুবের রাজা হয়ে রাজধর্ম পালনের জন্য নিজেকে বিশেষভাবে তৈরী করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন শান্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং প্রজাহিতে রত রাজা। কারণ *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে, যে রাজা বিনীতাত্মাযুক্ত হন অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে জিতেন্দ্রিয় রাজার যেকোন রাজ্য পরিচালনার কর্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যে সকল বিজিগীষু রাজা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে বিনীতভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন, তিনি কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হয়না। এমনকি বিনয়যুক্ত হয়ে বহু রাজা বনবাসী হয়েও অনায়াসে রাজ্য লাভ করেছেন। কুবেরে এই জাতীয় বিনীত রাজাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন।[১৭০]

গ. শূর্পণখার রাজনৈতিক কুশলতা : ভারতীয় দুই মহাকাব্যে বিশাল যে দুটি যুদ্ধের বিবরণ আমরা শুনি তার একটি হল রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং অন্যটি হল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। ভারতীয় মহাকাব্যে দুটি যুদ্ধের পেছনে দুইজন রমণী রয়েছে। *বাল্মীকীয় রামায়ণে* রাবণের দ্বারা অপহৃতা সীতা উদ্ধারই যুদ্ধের প্রধানতম কারণ হলেও, আরও এক রমণী সেখানে রয়েছেন, যিনি পরস্পরাক্রমে লঙ্কা যুদ্ধের অন্যতম কারণ, তিনি হলেন শূর্পণখা। শূর্প অর্থাৎ কুলো, তার নখগুলি কুলোর মতো চ্যাপটা ছিল বলে শূর্পণখা এমন অন্বর্থ মাতা কৈকসী নামকরণ করেছিলেন।

রাক্ষসী শক্তির সঙ্গে অমিত বলশালিতার এক সুচির কল্পিত সম্পর্ক রয়েছে বলেই রাবণ-কুম্ভকর্ণ যেমন জন্মমাত্রেই বিশাল বলবান ছিলেন, তেমনি শূর্পণখা হলেন এক বিকৃতাননা ভয়ঙ্করী রাক্ষসী। রাক্ষস রাবণের ভগিনী শূর্পণখার মনে স্বামী বিদ্যুদ্-জিহ্বের মৃত্যুর পর চিরকাল দুঃখিত রইলেন না। কারণ বীর ভ্রাতা রাবণের পদমর্যাদায় প্রভাবিত হতে হতে ভগিনীরও মানসিক গঠনটি এমনই হয়ে গিয়েছিল যে, স্বামীর মৃত্যু তাঁর কাছে কোনভাবে প্রভাব ফেলল না। বিধ্বংসী রাক্ষসসেনা এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বীরযোদ্ধা খরকে সঙ্গে নিয়ে দণ্ডকারণ্যের অধীশ্বরীরূপে শূর্পণখা অত্যন্ত আনন্দে জীবন অতিবাহিত করছিলেন।

রাক্ষসী শূর্পণখার সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে রামচন্দ্র প্রথমে লঘু চালে কথাবার্তা শুরু করলেও, শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর নাক-কান কাটার ব্যবস্থা করেন। কারণ প্রথম আলাপে রামচন্দ্র শিষ্টাচারসম্মত ভাবেই নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং শূর্পণখার পরিচয়ও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে শূর্পণখা রামের কাছে প্রেম নিবেদন করেই সীতাকে খেয়ে ফেলার প্রস্তাব করে বসলেন, তখন রামচন্দ্র এবিষয়ে নিতান্তই রসিকতা ভেবেছিলেন। রামচন্দ্রকে একাকী লাভ করার অত্যাগ্রহই তাঁর বিপন্নতা বাড়িয়ে তুলেছিল এবং বিবাহিত পুরুষের প্রতি এই অত্যাকর্ষণ যে আর্য সভ্য সমাজ সহ্য করে না, তা সরল রাক্ষসীর মনে অনুভূত হয়নি। অন্যদিকে শূর্পণখার রাক্ষস সমাজে এই আকর্ষণ অন্যায় বলে গণ্য ছিল না বলেই, তার ব্যবহারকে খুব একটা দোষজনক বলা চলে না।[১৭১]

শূর্পণখার নাক-কান কাটা গেলে তিনি চরম অপমানিত হয়ে দণ্ডকারণ্যে খর এবং দূষণের কাছে গেলেন। খর শূর্পণখার দুর্দশা দেখে প্রচণ্ড ক্ষুদ্ধ হলেন এবং দুর্দশাকারীদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। পরিচয় দেওয়ার সময়েও শূর্পণখা রামচন্দ্রের দেবোপম রূপের বর্ণনা দিতে ভোলেননি, অথচ কোন দোষে তাঁরা শূর্পণখার এমন দুরবস্থা ঘটিয়েছিলেন, সেবিষয়ে তিনি সর্বদা নিশ্চুপ রইলেন। এক্ষেত্রে শূর্পণখার দ্বৈধীভাব অর্থাৎ দুইপ্রকার অবস্থা স্বীকৃত হয়েছে। শূর্পণখার অতিপ্রেম প্রতিহত হয়ে চরম প্রতিহিংসার রূপ ধারণ করলে তিনি খরকে বলেন—

> ত্বৎপ্রসাদাত্তয়োশ্চৈব তস্যাশ্চৈব নিশাচর।
> সফেনং পাতুমিচ্ছামি রুধিরং রণমূর্দ্ধনি।।[১৭২]

শূর্পণখার লক্ষ্মণকর্তৃক খড়্গের দ্বারা নাসিকা-কর্ণ ছেদনের ফলে তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে রাক্ষসের ধর্ম জেগে ওঠে। অর্থাৎ রাম-লক্ষ্মণ-সীতা তিনজনকে মেরে তাদের রক্তপান করবে এবং রক্তপান করেই তাঁর মানসিক তৃপ্তি ঘটবে।

মহাকাব্যের নিয়মে প্রথমে চোদ্দজন রাক্ষস যুদ্ধে নিযুক্ত হল খরের আদেশে। শূর্পণখা আড়াল থেকে যুদ্ধ দেখতে গিয়ে দেখলেন, চোদ্দজনের কেউ বেঁচে ফিরল না। শূর্পণখা কাঁদতে কাঁদতে ভয়ঙ্কর অভিমানে ফিরে এল খরের কাছে এবং এই ভয়ঙ্কর অভিযোগ করল যে, নিশ্চয়ই খর রাম-লক্ষ্মণের নামে ভয় পাচ্ছে যার জন্য সে নিজে যুদ্ধে যেতে চাইছে না। সে তো আর জানে না যে ভুবনবিজয়ী রাবণের প্রতিপক্ষে রামচন্দ্রের বীরত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ক্রমিক পর্যায়ে এগোতে হবে।

অতএব প্রথমে চোদ্দটি রাক্ষস নিহত হওয়ার পর চোদ্দ হাজার রাক্ষসসৈন্য নিয়ে যান জনস্থানের অধিনায়ক খর এবং দূষণ। রামচন্দ্রের সঙ্গে ভীষণ সংঘর্ষের পর ত্রিশিরা, দূষণ ইত্যাদি সেনাপতি এবং অবশেষে খরও পর্যায়ক্রমে মৃত্যুবরণ করলেন। বনবাসে আসবার পর রামচন্দ্রের অতুল শক্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শূর্পণখাই কারণভূত হয়ে রইলেন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে। দণ্ডকারণ্য তথা জনস্থানের এই যুদ্ধে একমাত্র পুরুষ রাক্ষস অকম্পন বেঁচে রইলেন। যে এই দুর্ঘটনা জানাতে দ্রুত লঙ্কায় প্রবেশ করেছিলেন, ঠিক তার পরেই লঙ্কায় প্রবেশ করলেন শূর্পণখা নাসা-কর্ণ ছেদনরত অবস্থায়। এক্ষেত্রেও শূর্পণখা রামের দ্বারা আক্রান্ত ও পীড়িত হয়ে তাকে বাধা দিতে সমর্থ না হয়ে পীড়ানিবৃত্তিরসম্পাদনের জন্য প্রবল সমর্থ রাজা ভ্রাতা রাবণের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, শাস্ত্রের ভাষায় যাকে বলা হয় সংশ্রয় (Seeking Protection)।

অকম্পন রাক্ষসের কথায় রাবণ সেইক্ষণেই রথ সাজিয়ে দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলেন, কিন্তু দণ্ডকবাসী মারীচের কাছে রামচন্দ্রের শক্তিমত্তার কথা শুনে পুনরায় ফিরে এসেছিলেন লঙ্কায়। ভাবটা ছিল উদাসীনের- সুখে থাকতে ভূতের কিল খাবার কী দরকার- এই ভেবেই তিনি চলে এসেছিলেন। কিন্তু শূর্পণখা তাঁকে সুখে থাকতে দিলেন না। রাবণের অনুচর অকম্পন তাঁকে শূর্পণখার কথা বলেনি এবং শূর্পণখাও দেখলেন, রাবণ দণ্ডকারণ্যে এসেও রাম-লক্ষ্মণের সহিত বিনা যুদ্ধ করেই লঙ্কায় ফিরে গেলেন। অতএব এহেন অবস্থায় রাবণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য শূর্পণখা নিজেই লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি প্রথমেই বললেন, রাম-লক্ষ্মণেরা তাঁর নাক-কান কেটে দিয়েছেন। অবশ্য কেন তাঁর এই দশা হয়েছে, সেই সত্য বললেন না। শূর্পণখা রাবণকে ভীষণ তিরস্কার করে যা বললেন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে রাজনীতির কোনও বোধই রাবণের নেই। দিন-রাত কামভোগে মত্ত থাকায় তাঁর রাজ্যে অথবা সামন্তরাজ্যে কী ঘটছে তার কোনও খবরই রাবণ রাখেন না।

রাবণ রামচন্দ্রের কথা কখনো শুনে থাকলেও শূর্পণখার নাক-কান কাটা যাবার খবর রাখতেন না। শূর্পণখা রাবণকে অনেক গালাগালি দিয়েই যখন রামের সবিশেষ পরিচয় দেওয়া আরম্ভ করলেন, তখন তিনি রাম-লক্ষ্মণের শক্তিমত্তার যত পরিচয় দিলেন, তার চেয়ে বেশি সীতার দৈহিক সৌন্দর্যের পরিচয় দিলেন। শূর্পণখা রাবণের অতিশয়িনী সকাম প্রবৃত্তির খবর রাখতেন বলেই রামপত্নী সীতার উত্তুঙ্গ স্তন-জঘনের জুতসই বর্ণনা দিয়ে বললেন—

তথারূপা ময়া নারী দৃষ্টপূর্ব্বা মহীতলে।
যস্যা ভার্য্যা ভবেৎ সীতা যঞ্চ হৃষ্টা পরিষ্বজেৎ।
অপি জীবেৎ স লোকেষু দেবেষ্বিব পুরন্দরঃ।।[১৭৩]

অর্থাৎ সীতার ন্যায় সুন্দরী রমণী শূর্পণখা জীবনে দেখিনি। অতএব সীতার মতো মেয়ে যার বউ হবে অথবা উক্ত রমণী যে পুরুষকে আলিঙ্গন করবে, সে স্বর্গের ইন্দ্রের চেয়েও সুখে জীবন কাটাবেন বলে শূর্পণখা মনে করেন। এক্ষেত্রেও শূর্পণখা শাস্ত্রসম্মত ছয়টিগুণের মধ্যে দ্বৈধীভাব অর্থাৎ একদিকে রাবণের সঙ্গে সন্ধি এবং রামের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের পরিকল্পনা সর্বদা করেছে।

এইভাবে সীতার শারীরিক রমণীয় বর্ণনা করে রাবণের কামলোভ তুঙ্গে চড়িয়ে দিয়ে শূর্পণখা এবার সত্যগোপন করে রাবণকে বললেন— "এই বিস্তীর্ণ-জঘনা, পীনোতুঙ্গপয়োধরা রমণীটিকে তোমার বউ হিসেবে নিয়ে আসার জন্যই আমি সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার ফল হয়েছে এই যে, তোমার সুখ চিন্তা করতে গিয়ে আমার নাক-কান কাটা গেল"।[১৭৪] শূর্পণখা আরও গভীরভাবে রাবণকে বিড়ম্বিত করে বললেন, কেন সীতাকে আনতে গিয়েছিলাম জানো? কেননা, তিনি একমাত্র রাবণের স্ত্রী হবার উপযুক্ত। সীতার একটি স্বামী থাকলেও, একমাত্র রাবণই রামচন্দ্রের থেকে বেশি উপযুক্ত স্বামী। সবচেয়ে বড় কথা শূর্পণখা সেই চাঁদমুখী সীতাকে রাবণ একবার দর্শন করতে বলেন। সীতাকে দর্শনের পরেও যদি রাবণ নিজেকে স্বংযত রাখতে পারেন, তাহলে শূর্পণখাকে তিনি ভ্রাতা হিসাবে যা দণ্ড প্রদান করবেন, তা তিনি সেচ্ছায় মেনে নেবেন।

শূর্পণখার কথায় লম্পট রাবণ যেমন অভিভূত হলেন, তেমনই স্ফীত বোধ করলেন। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠা নারীটিকে তাঁরই হাতে তুলে দেবার কারণে তাঁর ভগিনী দণ্ডকারণ্যে যাদের হাতে নিগৃহীতা হয়েছেন, তারা সত্যিই শাস্তি পাবার যোগ্য। শূর্পণখা রাবণকে বলেছিলেন, যদি সত্যিই তাঁকে বউ হিসেবে লাভ করার ইচ্ছে থাকে, তবে এখনই তোমার ডান পাটি তুলে এগিয়ে যাও নিজের কাজে এবং জয় করো রাম-লক্ষ্মণকে, ছিনিয়ে নিয়ে এসো সীতাকে। প্রসঙ্গতঃ বলা হয়েছে—

যদি তস্যামভিপ্রায়ো ভার্য্যার্থং তব জায়তে।
শীঘ্রমুদ্রিয়তাং পাদো জয়ার্থমিহ দক্ষিণঃ।।[১৭৫]

আমরা জানি যে, লঙ্কায় ফিরে এসেও প্রধানত ভগিনী শূর্পণখার কথাতেই রাবণ আবারও ফিরে গিয়েছিলেন দণ্ডকারণ্যে এবং সেখানে তপস্বীর ছলনায় তিনি সীতাকে হরণ করেছিলেন। এক্ষেত্রেও শূর্পণখা নিজের মানসিক কামনায় শাস্ত্রে উপায়চতুষ্টয়ের মধ্যে ভেদের আশ্রয় নিয়েছেন। একদিকে লঙ্কার অধীশ্বরকে অপমান করে এবং রাবণ সীতাকে হরণ করে বিবাহ করলে তাঁর সঙ্গে রামচন্দ্রের পুনরায় বিবাহের আশাই উপায়চতুষ্টয়ের মধ্যে ভেদ নামক উপায়ের দ্বারা রাবণকে বশীভূত করার সর্বদা চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যে শূর্পণখার কথায় রাবণ সীতাকে হরণ করে আনলেন, সেই শূর্পণখাকে আর কিন্তু আমরা *বাল্মীকীয় রামায়ণে* দেখতে পাই না। সীতাকে নিয়ে এসে রাবণও কিন্তু শূর্পণখাকে একবারও সান্ত্বনা দিয়ে বলেননি যে, 'যার জন্য বা যাদের জন্য আজ তোমার নাক-কান কাটা গেছে, তাকে আমি ধরে এনেছি'। কিন্তু হয় একথা শোনার জন্য শূর্পণখা সেখানে বসে ছিলেন না অথবা রাবণও তাকে ডেকে কোনও সান্ত্বনা দেননি। সীতাহরণের পর থেকেই মহাকাব্যিক ঘটনা পরম্পরা এগিয়ে চলেছে অবধারিত ফলের অভিমুখে।

কিন্তু সারা মহাকাব্য জুড়ে শূর্পণখাকে আর আমরা দেখিনি। রাবণ শূর্পণখার স্বামীকে উদাসীন অবহেলায় হত্যা করেছিলেন, প্রত্যুত্তরে রাবণকে দিয়ে সীতাহরণ করিয়ে শূর্পণখা তাঁর মরণের পথ সবান্ধবে প্রশস্ত করেছিল। সরলা রাক্ষসী রাম-লক্ষ্মণের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে স্বামীহত্যাকারী ভাইয়ের ওপরেই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলেন নিজের অজান্তেই অথবা মহাকাব্যের প্রয়োজনে।

ঘ. ধৃতরাষ্ট্রের রাজনৈতিক কুশলতা : চন্দ্রবংশীয় বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন ধৃতরাষ্ট্র। যদিও জন্মান্ধ হওয়ার দরুণ ধৃতরাষ্ট্র সরাসরি রাজ্যলাভ না করলেও, পাণ্ডুর বনগমনের সময় থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত হস্তিনাপুরের সিংহাসনে পাণ্ডুর প্রতিনিধি রূপে তিনি সর্বদা রাজ্যভার সামলেছেন অর্থাৎ রাজ্যকে কোনমতে ধারণ করেছেন। 'ধৃতরাষ্ট্র' অর্থাৎ যিনি সমগ্র রাষ্ট্রকে ধারণ করেছিলেন, সেই হেতু এইরূপ নামকরণ হয়।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে সহযোগী রাজা হিসাবে বসেন। এইসময় ধৃতরাষ্ট্র তাঁর রাজ্য পরিচালনার জন্য কণিক নামে একজন রাজনৈতিক শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন। কণিক প্রসঙ্গে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত *বৈয়াসিক মহাভারতে* উপলব্ধ

ভারতকৌমুদী টীকায় বলা হয়েছে— 'রাজশাস্ত্রং নীতিশাস্ত্রং তস্য অর্থবিত্তমং বিশেষেণার্থজ্ঞম্'।[১৭৬] অর্থাৎ রাজ্যশাসনের নিয়ম-নীতি যাঁরা জানেন, তাঁদের মধ্যে কণিক হলেন অন্যতম। জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে তিনিই রাজনীতি জ্ঞানের সারকথা প্রদান করেন। জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে কণিক সেইভাবেই তাঁর রাজনৈতিক মত প্রদান করেছিলেন, যেভাবে ধৃতরাষ্ট্র সামাজিকগত ভাবে নিজের মনকে প্রস্তুত করেছিলেন।

কণিক হস্তিনাপুরে আসার পর ধৃতরাষ্ট্র তাঁর নিজ মনের সকল কথা কণিকের নিকট ব্যক্ত করেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে কণিককে বলেন হস্তিনাপুরের সেইসময়ে রাজনৈতিক অবস্থা এবং পঞ্চ পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁর ঈর্ষাজনিত মানসিক অবস্থার কথা। তিনি কণিকের উদ্দেশ্যে বলেন, পাণ্ডবরা তাঁর নিজের ভাইপো হন। কিন্তু তাদের এত বাড়বাড়ন্ত তিনি মন থেকে মেনে নিতে পাড়ছেন না এবং তাঁদের প্রবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও মানতে পাড়ছেন না, তাঁদের প্রতি ঈর্ষায় তাঁর মানসিক গাত্র দহন হচ্ছে। এবিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

উৎসিক্তাঃ পাণ্ডবা নিত্যং তেভ্যোঽসূয়ে দ্বিজোত্তম !![১৭৭]

ধৃতরাষ্ট্রের মানসিক অবস্থা দেখে কণিক রাজনৈতিক অনেক উপদেশ দেন, যার নাম কণিক-নীতি। কণিক বলেন, রাজনীতিতে কেউ কারো নয়, নিজের উন্নতির জন্য যেকোন অন্যায় রাজনীতিতে করা যায়। দরকার হলে শত্রুকে কাঁধে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায়। আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে, অথবা সুযোগ যদি আসে তবে কাঁধে-রাখা শত্রুকে পদাঘাত মেরে শেষ করাও যায়। কারণ অপকারী শত্রুকে বধ করার বিধান শাস্ত্রে রয়েছে। কণিক আরও অনেক অনৈতিক কাজ রাজনৈতিক কর্তব্যের কুক্ষিতে প্রবেশ করিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "যাকে তুমি মারতে চাও, তার কাছে এইরকম দেখাও যে তার কোন ক্ষতিই তুমি করবে না, এমনকী লোক দেখানো দান-মানও তাকে কিছু দিতে পারো, কিন্তু সুযোগ পেলে তাকে বিষ খাইয়েও মারতে পারো। তবে হ্যাঁ, হত্যার মতো সাংঘাতিক কাজ করার আগে কথায় ও ভাবে নিজের মুখে ফুটিয়ে তুলবে বিনয়, কিন্তু মনটা হবে তোমার ক্ষুরের মতো ধারালো"।[১৭৮]

কণিকের কথা ধৃতরাষ্ট্রের মনে যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই তিনি ঠাণ্ডা মাথায় ভালো প্রচার করে গোপনে পাঁচ পাণ্ডব এবং জননী কুন্তীকে বারণাবতের জতুগৃহে পুড়িয়ে মারার

পরিকল্পনা করেন পুত্র দুর্যোধনের সহায়তায়। যুধিষ্ঠির পাণ্ডবপক্ষের রাজা হবার দিকে খানিকটা এগিয়েও কিন্তু আবারও অবস্থার বিপাকে পড়ে গেলেন এবং সেই বিপন্নতা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগছে তাঁদের। কণিকের উপদেশে ধৃতরাষ্ট্রের মনে যথেষ্ট রাজনৈতিক নীতিহীনতার দিকটা ভেসে ওঠে। ধৃতরাষ্ট্রের নীতিলেশহীন রাজনীতির কথা শাস্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে বারংবার উচ্চারিত হলেও, শাস্ত্রানুযায়ী রাজনৈতিক দক্ষতা তাঁর প্রবল ছিল। ধৃতরাষ্ট্রের শাস্ত্রসম্মত রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিম্নে ক্রমানুসারে বর্ণিত হল :

ক. ধৃতরাষ্ট্র নীতিশাস্ত্রজ্ঞ উশনার মতানুযায়ী তাঁর *উশনঃসংহিতা* অনুসরণ করে আটপ্রকার ভেদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ রাজকার্য পর্যালোচনা করতেন। এই আট প্রকার রাজকার্য হল— ১. আদান, ২. বিসর্গ, ৩. প্রৈষ, ৪. নিষেধ, ৫. অনুবচন, ৬. ব্যবহারেক্ষণ, ৭. দণ্ড, ৮. শুদ্ধি। প্রসঙ্গতঃ আট প্রকার ভেদ প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে—

আদানে চ বিসর্গে চ তথা প্রৈষনিষেধয়োঃ।
পঞ্চমে চার্থবচনে ব্যবহারস্য চেক্ষণে ।।
দণ্ডশুদ্ধ্যোঃ সদা যুক্তস্তেনাষ্টগতিকো নৃপঃ।
অষ্টকর্মা দিবাং জাতি রাজা শক্রাভিপূজিতঃ।।[১৭৯]

এই আটপ্রকার রাজকর্ম ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আসীন হয়ে পরিচালনা করেছেন, তা নিম্নে উদাহরণ সহযোগে আলোচিত হল—

১. আদান : প্রজাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করার পদ্ধতিকেই আদান বলা হয়। আদানের লক্ষণ প্রসঙ্গে *মেধাতিথি* ভাষ্যে উক্ত হয়েছে— তত্র স্বীকরণমাদানং বলানাম্।[১৮০]

ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যে প্রজাদের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে কর আদায়ের ফলে হস্তিনাপুরের কোষাগার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় পাণ্ডু কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে সমৃদ্ধশালী রাজ্য দানের কথায়। প্রসঙ্গতঃ *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

নাসৌ কিঞ্চিদ্বিজানাতি ভোজনাদি চিকীর্ষিতম্।
নিবেদয়তি নিত্যং হি মম রাজ্যং ধৃতব্রতঃ।।[১৮১]

২. বিসর্গ : গৃহীত করের বিনিয়োগকে বিসর্গ বলা হয়। বিসর্গের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে *মেধাতিথি ভাষ্যে* বলা হয়েছে—

> ভৃত্যেভ্যো ধনদানং বিসর্গঃ।[১৮২]

ধৃতরাষ্ট্র তাঁর রাজ্যের রাজকোষের ভার অর্পণ করেছিলেন পুত্র দুর্যোধনের হাতে। ধৃতরাষ্ট্রের রাজকোষের অর্থ দুর্যোধন নিজের জনমত ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ করেছিলেন তা তাঁর কথাবার্তায় বারংবার স্পষ্ট করেছে। এবিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উক্ত হয়েছে—

> দৃষ্টা্‌ প্রকৃতয় সর্ব্বা অর্থমানেন পূজিতাঃ।
> ধ্রুবমস্মৎসহায়াস্তে ভবিষ্যন্তি প্রধানতঃ।
> অর্থবর্গঃ সহামাত্যো মৎসংস্থোঽদ্য মহীপতে।।[১৮৩]

এছাড়াও দুর্যোধন পিতা ধৃতরাষ্ট্রের রাজকোষ থেকে প্রভূত ধন ও সম্মানের বিনিয়োগের দ্বারা ধীরগতিতে রাজ্যের সকল প্রজাকে বশীভূত করে তুলেছিলেন তারও প্রমাণ *বৈয়াসিক মহাভারতে* পাওয়া যায়। এবিষয়ে বলা হয়েছে—

> ততো দুর্য্যোধনো রাজা সর্ব্বাস্তু প্রকৃতীঃ শনৈঃ।
> অর্থমানপ্রদানাভ্যাং সঞ্জহার সহানুজঃ।।[১৮৪]

৩. প্রৈষ : বিজিগীষু রাজা কর্তৃক মন্ত্রীদের প্রতি নানারকম রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনার নির্দেশকেই প্রৈষ্য বলা হয়। প্রৈষের লক্ষণ প্রসঙ্গে *মেধাতিথি ভাষ্যে* উল্লিখিত হয়েছে— প্রৈষোঽমাত্যাদীনাং দৃষ্টাদৃষ্টানুষ্ঠানেষু।[১৮৫]

পাণ্ডবদের বারণাবতে নির্বাসনের ব্যবস্থা নিপুণ কৌশলে ধৃতরাষ্ট্র করেছিলেন, তা সর্বকালের অন্যতম কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজা হিসাবে সকলকেই মানতেই হয়। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে যাঁরা ভালো কথা বলতে পারেন, তাঁদের দুই-একজনকে নিযুক্ত করেন একটি বিশেষ কাজে। তাঁদের কাজটি হল— পাণ্ডবদের কাছে বারণাবতের রম্যতা বর্ণনা করা ও মন্ত্রীদের কথায় পাণ্ডবদের বারণাবতে যাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করার প্রচেষ্টা করা। ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক রাজনৈতিক নির্দেশবশতঃ বিশ্বস্ত মন্ত্রীমণ্ডলী পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে বারণাবতে যাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করতে

থাকে এবং শেষ পর্যন্ত্য ধৃতরাষ্ট্রের রাজনৈতিক কুটিল উদ্দেশ্য মান্যতা পায়। প্রসঙ্গতঃ *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

ধৃতরাষ্ট্রপ্রযুক্তাস্তে কেচিৎ কুশলমন্ত্রিণঃ।
কথয়াঞ্চক্রিরে রম্যং নগরং বারণাবতম্।।[১৮৬]

৪. নিষেধ : যাদের উপর ধনরক্ষার ভার অর্পিত হয়, তারা যদি বেশি খরচ করে তা নিবারণ করার নাম নিষেধ। নিষেধের লক্ষণ প্রসঙ্গে *মেধাতিথি ভাষ্যে* বলা হয়েছে— অর্থাধিকৃতানাং মতিপ্রবৃত্তিনিরোধো নিষেধঃ।[১৮৭]

ধৃতরাষ্ট্র যখন ভীষ্মের ও বিবিধ মন্ত্রিপারিষদের সম্মুখে খাণ্ডবপ্রস্থ দান করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই প্রস্তাব যুধিষ্ঠির আনন্দের সহিত মেনে নেন, ঠিক সেই সময় তাঁর রাজ্যের মন্ত্রিদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, বর্তমানে তাঁর রাজ্যের এবং রাজ্যের কোষাগার অর্ধেক হয়েছে। অতএব বর্তমানে হস্তিনাপুর রাজ্যের কোষাগার থেকে সবরকম বর্ধিত খরচ নিবারণের জন্য দুর্যোধন-বিদুরসহ অন্যান্য মুখ্য পারিষদদের আদেশ দেন।

৫. অনুবচন : অসৎ কাজে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে নিষেধ করার নাম অনুবচন। *মেধাতিথি ভাষ্যে* অনুবচনের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— অসৎপ্রবৃত্তিনিষেধশ্চ অনুবচনম্।[১৮৮]

ধৃতরাষ্ট্রের যেরকম প্রবল রাজনৈতিক বুদ্ধি ছিল, সেইরকম রাজনৈতিক বুদ্ধি তাঁর পুত্র দুর্যোধন-দুঃশাসন প্রভৃতির ছিলনা। পাণ্ডবদের বিবিধ অস্ত্রলাভের ফলে শক্তিবৃদ্ধির কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র ভয় পেলেও, দুর্যোধন-দুঃশাসনরা সেইসময় বনবাসী দরিদ্র পাণ্ডবদের মনে কীভাবে ব্যাথা দেওয়া যায়, সেই ভাবনা সর্বদা করতে থাকেন। পাণ্ডবরা সেইসময় দ্বৈতবনে বনবাস অতিবাহিত করছিলেন এবং দ্বৈতবনের কাছেই কুরুরাজ পরিবারের গোসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ হয়। সেইহেতু দুর্যোধন-দুঃশাসনেরা নিজের ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে পাণ্ডবদের মনে কষ্ট দেবার জন্য ঘোষযাত্রার আয়োজন করেছেন। দুর্যোধনদের ঘোষযাত্রার কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন— "মৃগয়ায় গমন, বিবিধ গো দর্শন প্রভৃতি ভাল কার্য। কিন্তু তোমরা যেখানে যাবে তার কাছেই পাণ্ডবরা বাস করছেন। তাঁদের প্রতি অনেক অন্যায় তোমরা করেছ। কপট দ্যূতে পরাস্ত করে তাঁদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছ, বনেও পাঠিয়েছ। অতএব এখন মনে রেখো, দ্বৈতবনে তোমাদের দেখে যুধিষ্ঠিরের

কোন কারণে কোপোদ্রেক না হয়। কোন কারণে যেন ক্রোধী ভীম খেপে না ওঠেন। আর ওই যে রমণীটি যাকে তোমরা অবলা বলে ভাব, সে কিন্তু তেজঃপুঞ্জ ছাড়া আর কিছু নয়। তোমরা যেতে পারো, কিন্তু তোমরা বা তোমাদের সৈন্যসামন্তরা যাতে কোনভাবে তাঁদের কোন ক্ষতি না করে, সে ব্যাপারে তোমাদের কথা দিতে হবে। মনে রেখো অর্জুন কিন্তু কোন দিব্যাস্ত্র ছাড়াই এই পৃথিবী জয় করেছিলেন, এখন তিনি দিব্যাস্ত্র লাভ করে সম্পূর্ণ শক্তিশালী। তোমরা যদি কোনভাবে তাঁদের অনিষ্ট করতে যাও, তবে কিন্তু জেনে রেখো সেটা ভালো তো হবেই না, আর ক্ষমতায়ও কিন্তু কুলোবে না"।[১৮৯] প্রসঙ্গতঃ দ্বৈতবনে দুর্যোধন কর্তৃক পাণ্ডবদের কোনরূপ অসৎ কার্য অবলম্বনে ক্ষতি সাধন ধৃতরাষ্ট্রের দ্বারা নিষেধ বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

অনার্য্যং পরমং তৎ স্যাদশক্যং তচ্চ মে মতম্।[১৯০]

৬. ব্যবহারেক্ষণ : সম্পত্তি প্রভৃতি নিয়ে বিবাদের বিচারকে বলা হয় ব্যবহারেক্ষণ। ব্যবহারেক্ষণের লক্ষণ প্রসঙ্গে *মেধাতিথি ভাষ্যে* উক্ত হয়েছে— 'বর্ণাশ্রমাণাং স্বকর্মসংশয়ে ব্যবহারাবেক্ষণম্ পরস্পরাভিযোগে'।[১৯১]

পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে বিবাহ করে হস্তিনাপুরে ফিরে আসলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের অর্ধেক রাজত্ব দান করতে চান। কারণ কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে বিবাদের অবসানের নিমিত্ত পাণ্ডবেরা যাতে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করে হস্তিনাপুরের অর্ধেকরাজ্য শাসন করেন। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্টের এই প্রস্তাবকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করেছিলেন।

প্রতিষ্ঠিত রাজধানীতে বসে প্রজাপালন করা সহজ, কিন্তু নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা অনেক বেশি কঠিন কাজ। তবুও প্রজাদের ভালোবাসা এবং পাণ্ডবদের পরিশ্রমে অচিরেই খাণ্ডবপ্রস্থের রাজধানী ইন্দ্রপস্থ তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম সমৃদ্ধ জনপদ হয়ে ওঠে। ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক ভীষ্মের সম্মুখে পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য দান এবং সেই অর্ধেক রাজ্যের অধিবাসী হয়ে পাণ্ডবগণের রাজ্যশাসন কার্য পরিচালনা করা বিষয়ে বলা হয়েছে—

তত ভীষ্মেণ রাজ্ঞা চ ধর্ম্মপ্রণয়নে কৃতে।
পাণ্ডবাঃ সমপদ্যন্ত খাণ্ডবপ্রস্থবাসিনঃ।।
পঞ্চভিস্তৈর্মহেষ্বাসৈরিন্দ্রকল্পৈঃ সমন্বিতম।

শুশুভে তৎ পুরশ্রেষ্ঠং নাগৈর্ভোগবতী যথা।।[১৯২]

৭. দণ্ড : পরাজিত রাজার সম্পত্তি গ্রহণের নাম দণ্ড। দণ্ডের লক্ষণ প্রসঙ্গে কুল্লূকভট্ট কৃত *মন্বর্থমুক্তাবলী* টীকায় উক্ত হয়েছে— 'দণ্ডঃ পরাজিতানাং শাস্ত্রোক্তধনসংগ্রহণম্'।[১৯৩]

পাণ্ডবেরা প্রথমবার দ্যূতক্রীড়ায় সর্বস্ব হেরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁদের রাজ্য, ধনসম্পদ সবকিছু ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরলে পুত্র দুর্যোধন পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে তিরষ্কারের দ্বারা উত্তেজিত করে তোলেন। দুর্যোধন পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন— বর্তমানে দ্যূতক্রীড়াঙ্গনে কৌরবগণ বিবিধ অপমানের দ্বারা পাণ্ডবদের ক্রুদ্ধ করে ফেলেছন, বিশেষতঃ দ্রৌপদীর অপমান তাঁরা কখনোই ভুলতে পারবে না। অতএব পাণ্ডবদের পুনরায় রাজ্যশাসন করতে দিলে তাঁদের ক্রোধবহ্নিতেই অবশ্যম্ভাবী কৌরবকূল প্রজ্জ্বলিত হবে। সেইহেতু পুনরায় দুর্যোধন-শকুনিরা পাণ্ডবদের সহিত পাশা খেলার সিদ্ধান্ত নেন এবং পণ হিসাবে বারো বছরের বনবাস ও একবছরের অজ্ঞাতবাসের দাবী ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে রাখেন। ধৃতরাষ্ট্রও পুত্র দুর্যোধনের প্রস্তাবকে তৎক্ষণাৎ মান্যতা দেন এবং পুনরায় পাশা খেলার ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয়বার অক্ষক্রীড়াতেও কৌরবদের জয় এবং পাণ্ডবদের দণ্ডস্বরূপ বনবাস যাত্রার পথ প্রশস্ত হয়। পাণ্ডবগণ কর্তৃক রাজ্যভার ধৃতরাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

প্রবৃত্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য চক্রং রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
পরাজিতাঃ পাণ্ডবেয়া বিপত্তিং পরমাং গতাঃ।।[১৯৪]

৮. শুদ্ধি : কোনরূপ পাপ কাজ করলে তার জন্য যে প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে, তাকেই শুদ্ধি বলে। শুদ্ধির লক্ষণ প্রসঙ্গে কুল্লূকভট্ট কৃত *মন্বর্থমুক্তাবলী* টীকায় বলা হয়েছে— 'শুদ্ধিঃ পাপে কর্মণি জাতে তত্র প্রায়শ্চিত্তসম্পাদনম্'।[১৯৫]

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরকুলের বিনাশের কারণরূপে ধৃতরাষ্ট্র নিজেকেই দায়ী করেছেন। ধৃতরাষ্ট্র নিজের কৃতকার্যের ফলস্বরূপ যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের রাজা হন। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডগণ সহ সকলের সম্মুখে নিজের পাপের শুদ্ধিকরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কিছু ব্রত পালনের জন্য মনোস্থির করেন। এছাড়াও তিনি অনুতাপগ্রস্ত হয়ে বনে গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বনে গমনের পূর্বে ধৃতরাষ্ট্র খই ও বিচিত্র পুষ্প দ্বারা কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে

হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে দেবপূজা করেন এবং ধন দ্বারা ভৃত্যদের সন্তোষবিধানপূর্বক সকলকে পরিত্যাগ করে বনে প্রস্থান করেন। ধৃতরাষ্ট্রের বনে গিয়ে নিজের কৃতকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত হেতু তপস্যার বর্ণনা প্রসঙ্গে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উক্ত হয়েছে—

> ত্বগস্থিভূতঃ পরিশুষ্কমাংসো জটাজিনী বল্কলসংবৃতাঙ্গ।
> স পার্থিবস্তত্র তপশ্চচার মহর্ষিবত্তীব্রমপেতমোহঃ।।[১৯৬]

খ. এছাড়াও ধৃতরাষ্ট্র নীতিশাস্ত্রজ্ঞ কণিকের মতানুযায়ী সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারপ্রকার উপায় চতুষ্টয়ের মাধ্যমে যথাযোগ্য রাজকার্য সম্পাদন করতেন।

সাম : ধৃতরাষ্ট্র সর্বদা তাঁর মন্ত্রীপরিষদের সহিত মধুর বচন প্রয়োগের মাধ্যমে রাজকার্য পরিচালনা করেছেন। তিনি সর্বদা মধুর বাক্যবাণের দ্বারা পাণ্ডবদের সর্বদা বিদ্ধ করেছেন।

দান : ধৃতরাষ্ট্র রাজা হওয়া থেকে শুরু করে শেষজীবন পর্যন্ত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে, ঋষিগণকে, ভৃত্য ও প্রজাগণকে প্রভূত খাদ্য, পানীয়, যান, বস্ত্র, স্বর্ণ, মণিশ্রেষ্ঠ, দাস, ছাগ, মেষ, কম্বল, রত্ন প্রভৃতি দান করতেন। তাঁর দানের প্রমাণস্বরূপ *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> পরিশ্রান্তো যদাসীৎ স দদদ্দানান্যনেকশঃ।
> নিবর্ত্তয়ামাস তদা দানযজ্ঞং নরাধিপঃ।।[১৯৭]

ভেদ : ধৃতরাষ্ট্র সর্বদা পাণ্ডবগণের থেকে তাঁর নিজ পুত্রদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি করে বিরাগভাজনের মাধ্যমে নিঃসঙ্গ ও হীন গণ্য করে পরস্পরের থেকে ভেদ সৃষ্টি করেছেন। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় বারণাবতে পাণ্ডবদের জীবিত থাকার কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র মানসিক ঈর্ষায় দগ্ধ হন। কিন্তু মন্ত্রী বিদুরের সম্মুখে অত্যন্ত আনন্দিত হওয়ার সুনিপুণ অভিনয় করতে থাকে। কিন্তু পরোক্ষণেই তিনি দুর্যোধনকে বলেন, দুর্যোধন পাণ্ডবদের প্রতি যেমন মনোভাব পোষণ করেন, ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব তাঁর ব্যতিক্রম কিছু নয়। অতএব বিদুর যাতে ধৃতরাষ্ট্রের প্রকৃত মনোভাব বুঝতে না পারেন, সেজন্যই তিনি পাণ্ডবদের গুণকীর্তন করেছেন তাঁর রাজ্যের মন্ত্রী বিদুরের সম্মুখে। ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবদের প্রতি ঈর্ষাজনিত মানসিক ভেদ বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

অহমপ্যেবমেবৈতচ্চিকীর্ষামি যথা যুবাম্।
বিবেক্তুং নাহমিচ্ছামি কার্য্যন্তু বিদুরং প্রতি।।
ততস্তেষাং গুণানেব কীর্তয়ামি বিশেষতঃ।
নাববুধ্যেত বিদুরো মমাভিপ্রায়মিঙ্গিতৈঃ ।।[১৯৮]

দণ্ড : ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ পুত্রস্নেহের কারণেই দণ্ডস্বরূপ পাণ্ডবদের বারো বছরের বনবাস এবং এক বছরের অজ্ঞাতবাস হয়েছিল। যার পরিণামস্বরূপ কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। ব্যাসদেব, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, গান্ধারী, কৃষ্ণের উপদেশ তাঁর মনেক শুভবুদ্ধির উদয় ঘটাতে কখনোই সক্ষম হয়নি। কারণ ধৃতরাষ্ট্র সারাজীবন অন্যায়ভাবে পাণ্ডবদের সম্পদ ভোগদখল করার মনোবাসনা রেখেছেন। তাই তিনি মানসিক দিক দিয়ে অত্যন্ত নির্মম হয়ে উঠেছিলেন সেইহেতু নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রদের বৃষ্ণি-অন্ধক রাজ্যে ভিক্ষা করে জীবন কাটাতে বলার সময় তাঁর মনে কোন করুণা-মমতার ভাব জাগ্রত হয়নি। নিজের পুত্র দুর্যোধন রাজ্য দেবার জন্য অনায়াসে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্রে সম্মতি দিতে পেরেছেন। তিনি যে প্রকৃত বিবেক-বুদ্ধিহীন পুত্রস্নেহান্ধ রাজ্যলোভী রাজা ছিলেন *বৈয়াসিক মহাভারতে* বারংবার তাঁর বাচনভঙ্গির মাধ্যমে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। সেই কারণেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যদি কোন প্রকারে পাণ্ডবগণ নিহত হন তাহলে বংশপরম্পরায় ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যলাভ নিশ্চিত হবে। যুদ্ধের পরিণাম অত্যন্ত ভয়ঙ্কর জেনেও তিনি সর্বদা পাণ্ডবদের যুদ্ধে বধ করে তাদের হৃত সম্পত্তি পুত্র দুর্যোধনকে ভোগ করানোর মনোবাসনা করেছেন। মন্ত্রী বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ মনোবাসনার কথা জানতে পেরে তাকে প্রচুর গালমন্দ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদুরের সুউপদেশকে গ্রহণ না করেই তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে প্রিয় মন্ত্রী বিদুরকেও দণ্ডস্বরূপ বনবাসে স্বেচ্ছায় নিক্ষেপ করেন।

আঠারো দিনের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমাপ্তি হওয়ার পর ধৃতরাষ্ট্র নিজের পুত্রদের প্রেতকার্য সেরে গঙ্গাস্নান করে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু পুত্রশোক, ক্রোধ এবং পাণ্ডবদের প্রতি যে বিদ্বেষভাব তিনি দীর্ঘদিন ধরে পোষণ করে এসেছেন আর তাতে ইন্ধন জুগিয়েছেন তাঁর প্রিয় পুত্র দুর্যোধন। এই দুর্যোধনকে ভীম ঊরুভঙ্গের মাধ্যমে বধ করলে ধৃতরাষ্ট্র দণ্ডস্বরূপ ভীমকে নিজ হস্তে প্রাণে মারার সংকল্প গ্রহণ করেন।

ঙ. শকুনির রাজনৈতিক বিচক্ষণতা : গান্ধাররাজ সুবলের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল শকুনি। রাজা সুবলের কোন পাপের ফলে দেবতাদের অভিশাপে তাঁর বংশে এইরূপ অধার্মিক পুত্র জন্মেছেন। শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধনের একজন পরামর্শদাতা হয়ে তাঁকে সর্বদা অন্যায় কর্মে প্ররোচিত করতেন। শকুনি সারাজীবনই দুর্যোধনকে কুমন্ত্রণা দিয়ে গেছেন। এই কুমন্ত্রণটা যে পূর্বপরিকল্পিত ও সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবেই সংযোজিত হয়েছে, তা *মহাভারত*কার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। বস্তুতঃ *বৈয়াসিক মহাভারতে* অন্যতম খলচরিত্র হলেন শকুনি।

কিন্তু *মহাভারতের* বিশাল রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কীভাবে শকুনির প্রবেশ ঘটেছিল, *মহাভারতের* কবি সেবিষয়ে কিছু উল্লেখ করেননি। এমনকি কবে, কখন, কীভাবে হস্তিনাপুরের রাজপরিবারের মধ্যে শকুনি নিজের জায়গা করে নিলেন, সে কথাও কবি পরিষ্কার করে কিচ্ছুটি বলেননি। শুধু এইটুকু জানিয়েছেন যে, হস্তিনাপুরের জ্যেষ্ঠ রাজকুমার ধৃতরাষ্ট্র যেদিন গান্ধার রাজ্যে গিয়ে গান্ধারীকে বিবাহ করলেন, সেদিন গান্ধারী যেমন স্বামীর সম্মানে চোখে পট্টবস্ত্র বেঁধে হস্তিনাপুরের পথে রওনা দিলেন, তেমনই তাঁর ভাই শকুনিও একই সঙ্গে পা বাড়িয়েছিলেন হস্তিনাপুরের পথে। প্রসঙ্গতঃ হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে শকুনির পদার্পণ বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> ততো গান্ধাররাজস্য পুত্রঃ শকুনিরভ্যয়াৎ।
> স্বসারং পরয়া লক্ষ্যা যুক্তমাদায় কৌরবান্।।[১৯৯]

শকুনির এই অনুগমনের পিছনে কারণও ছিল যথেষ্ট। গান্ধার রাজ্যটা ছিল ভারতবর্ষের উত্তরেরও উত্তরে। *ঋগ্বেদ* ও *অথর্ববেদে* আমরা গান্ধার দেশকে ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলেই জানি। কিন্তু এই দুই বেদে উল্লিখিত গান্ধার রাজ্যের মানুষদের তেমন সুনাম কখনোই শোনা যায়নি। পরবর্তীকালে অবশ্য সমগ্র গান্ধার দেশ বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের বসবাসের ফলে অত্যন্ত সুনাম অর্জন করে। *উপনিষদের* যুগে লোকে গান্ধারকে বিদ্যাবত্তা এবং জ্ঞানের অবধিস্থল বলে জানত। কিন্তু গান্ধারের এই মহিমা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। *বৈয়াসিক মহাভারতে* গান্ধারের মানুষেরা কম্বোজ-কিরাত এবং বর্বরদের সঙ্গে একই পংক্তিতে উচ্চারিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলা হয়েছে—

> যৌন-কাম্বোজ-গান্ধারাঃ কিরাতা বর্বরৈঃ সহ।[২০০]

পরবর্তীকালে এই জায়গাটার একটা সাধারণ নাম তৈরি হয়, এই নাম হল উত্তরাপথ। গান্ধার স্থানটি পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায়, অতিদুর্গম পার্বত্য পথ পেরিয়ে সুদূর হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদের রানী হয়ে যাবেন প্রায়ান্ধ গান্ধারী। *বৈয়াসিক মহাভারতের* কবি মন্তব্য করেছেন যে, শকুনি তাঁর ভগিনীর পেছন পেছন গমন করছেন ধৃতরাষ্ট্রের হাতে গান্ধারীকে সম্প্রদানের নিমিত্ত। নববিবাহিতা ও নবযৌবনবতী ভগিনীকে এই পার্বত্য অঞ্চল পেরিয়ে কুরুদের দেশে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল বলে শকুনি হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন।

কারণ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারে এসেছেন, অনুমতা রমণী গান্ধারীকে স্ত্রী হিসেবে মনোনীতও করেছেন। কিন্তু বিবাহের বিধিনিয়ম সব পালিত হয় হস্তিনাপুরে। বৃদ্ধ সুবলের রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার উপায় ছিলনা। সেইহেতু সুবলের পক্ষ থেকে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শকুনি যান বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার জন্য। দুই পক্ষের কুটুম্বিতা সম্পূর্ণ হলে ভীষ্ম শকুনিকে যোগ্য মর্যাদা দিয়েও তুষ্ট করেন। প্রতিপূজিত শকুনিও পুনরায় ফিরে যান গান্ধারে।

তার মানে এটা জলের মতো পরিষ্কার যে, শকুনি ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর পিছন পিছন এলেও শকুনি সেইসময় থেকে যাননি হস্তিনাপুরে, কিংবা হস্তিনাপুরের জাতি-রাজনীতিতেও তিনি প্রবেশ করেননি। তিনি গান্ধারের ছেলে গান্ধারেই ফিরে গেছেন। এরপর কবে শকুনির শুভাগমন ঘটল হস্তিনাপুরে, *মহাভারত*কার তা স্বকণ্ঠে ঘোষণা করেননি। এরমধ্যে কুন্তীর বিয়ে হয়েছে, পাণ্ডু রাজত্ব করে গেছেন, বনে গেছেন, পাণ্ডু মারা গেছেন, তাও শকুনির নাম কখনোই উল্লেখিত হয়নি। যখন মধ্যম পাণ্ডব ভীমকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবার পরিকল্পনা করছেন দুর্যোধন এবং সে পরিকল্পনা যেভাবে হোক বিফলও হয়ে গেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দুর্যোধন-কর্ণ-শকুনিকে পাণ্ডবদের বিপক্ষে কুমন্ত্রণা করতে দেখা যায়। *বৈয়াসিক মহাভারতে* শকুনির প্রাথমিক রাজনীতিতে পদার্পণ হয়েছে কৌরবপক্ষের সহচররূপে। মধ্যম পাণ্ডব ভীমের হত্যা করা চেষ্টা ও দুইকূলের মধ্যে ভেদাভেদ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> এবং দুর্যোধনঃ কর্ণঃ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
> অনেকৈরভ্যুপায়ৈস্তান্ জিঘাংসন্তি পাণ্ডবান্।।[২০১]

শকুনি কুরুবাড়ির রাজপুত্র দুর্যোধনকে সুন্দর বশ করে কৌরব রাজনীতির প্রধান রূপকার হয়ে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করে। শকুনির সবচেয়ে বড় দক্ষত ছিল যে, তিনি একজন জ্যোতিষীর থেকে ভালো করে মানুষের মনস্তত্ব বুঝতে পারতেন। শুধু ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধন নয়, পাণ্ডবদের মনস্তত্ত্বও তাঁর ভালভাবে জ্ঞাত ছিল। এতগুলি গুণ নিয়ে একটি লোক গান্ধারদেশের মতো ছোট্ট একটি পার্বত্য রাজ্যে বসে আপন বুদ্ধির চর্চা করবেন এমন তো কখনোই হয় না। সেকারণেই শকুনি তৎকালীন সমাজে সর্ববৃহৎ কৌরবসাম্রাজ্যের রাজনীতিতে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে।

পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধনের রোষের কারণ মাতুল শকুনি : ভীমের শারীরিক শক্তিবৃদ্ধি ও অর্জুনের অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা বিষয়ে দুর্যোধন উদ্বিগ্ন হয়ে পরিতাপ করতে থাকেন। সেই পরিতাপ দৃশ্য দেখে সুবলপুত্র শকুনি পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে কুন্তীসহ পঞ্চ পাণ্ডবদের বারণাবতে জতুগৃহে দগ্ধ করে মারার বুদ্ধিও দেন।

দুর্যোধন যখনই পাণ্ডবদের রাজ্যশাসন বিষয়ে সন্দেহান্বিত হয়েছেন এবং সেই সন্দেহ যখনই প্রকাশ করেছেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে, তখনই আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ধৃতরাষ্ট্রও মনে মনে একই প্রকার সন্দেহ পোষণ করতেন। এমনকী দুর্যোধন পাণ্ডবদের কোনভাবে ক্ষতি করতে চাইলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরই সেবিষয়ে বিমত প্রকাশ করলেও পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের অনুকূলে মত দিয়েছেন। শকুনির পাণ্ডবদের প্রতি ক্ষতিসাধনের চেষ্টা দুর্যোধনের থেকেও ছিল আগে। দুর্যোধন যখন পাণ্ডবদের কোনপ্রকার ক্ষতিসাধন করবেন বলে স্থির করেন, ক্ষতিসাধনের মন্ত্রণা যখন দানা বাঁধত, ঠিক সেই অপরিপক্ক মুহূর্তে নেমে আসত শকুনির পরামর্শ। মন্ত্রণা যখনই হয়েছে, তখনই *মহাভারতে* দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ এবং শকুনি এই দুষ্ট চতুষ্টয়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। অতএব বলা যায় যে, পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধনের রোষানলরূপ আগুনের সর্বদা ঘৃত হন শকুনি।

শকুনির সামনীতি : দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় ভাগিনেয় কৌরবদের সহিত শুকুনিও উপস্থিত ছিলেন। রাজন্যবর্গের ব্যর্থতা ও দুরবস্থা দেখে লক্ষ্যভেদে তিনি অগ্রসর হননি। জতুগৃহ থেকে প্রাণে বাঁচার পর দ্রৌপদীকে বিবাহ করে পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে বসবাস করতে থাকেন। যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞে নকুলকে দিয়ে ভীষ্ম-দ্রোণাদির সহিত শকুনিকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

আমন্ত্রিত শকুনিও যথাসময়ে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হয়েছিলেন। যজ্ঞ সমাপ্তির পরেও তিনি কিছুকাল দুর্যোধনের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করে যুধিষ্ঠিরের সুসজ্জিত সভাগৃহ দর্শনও করেছিলেন। হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তনের পর দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধির বিষয় চিন্তা করতে করতে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়েন। মাতুল শকুনির নিকট তিনি তাঁর মনের দুঃখ গোপন করেননি। দুর্যোধনের মনের কথা প্রসঙ্গে শকুনি তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

> দুর্য্যোধন ! ন তেহমর্ষঃ কার্য্যঃ প্রতি যুধিষ্ঠিরম্।
> ভাগধেয়ানি হি স্বানি পাণ্ডবা ভুঞ্জতে সদা।।[২০২]

অর্থাৎ শকুনি দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ঈর্ষা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, পাণ্ডবগণ নিজের ভাগ্যফল ভোগ করছেন। নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করেও দুর্যোধন পাণ্ডবদের কোনপ্রকারে অনিষ্ট সাধনে কখনোই সফল হতে পারেনি। শকুনি দুর্যোধনকে আরও মনে করিয়ে দেন যে, তাঁরা (পাণ্ডবরা) কৃষ্ণকেও লাভ করেছেন। অতএব দ্রুপদ, কৃষ্ণ প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁদের সহায় সর্বদা রয়েছে। পাণ্ডবগণ পৈতৃক সম্পদকে আপন শক্তিবলে সমধিক বৃদ্ধি করেছেন। অর্জুন খাণ্ডবদহনের সময় শিল্পী ময়-দানবকে সহায়রূপে লাভ করেছিলেন বলে এইরূপ চমৎকার সভাগৃহ নির্মিত হয়েছে। পাণ্ডবগণ নিজ ক্ষমতাবলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অতএব দুর্যোধনের সন্তাপ অনর্থক কারণ তাঁর সঙ্গে দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কর্ণ, সৌমদত্তি এবং ভ্রাতৃগণও অনুগত রয়েছে। অতএব এদের সহিত মিলিত হলে দুর্যোধনও নিখিল পৃথিবীর অধীশ্বর হতে পারেন। শকুনির মুখে এইরূপ মধুর বাক্য শাস্ত্রসম্মত উপায়চতুষ্টয়ের মধ্যে সাম নীতিরই পরিচায়ক।

শকুনির খলস্বভাবের পরিচয় : দুর্যোধন শকুনির উক্ত বাক্যগুলি শ্রবণ করে বলেন যে, তিনি শকুনির সাহায্যেই পাণ্ডবগণকে জয় করতে চান। শকুনি যদি অনুমোদন করেন, তিনি পাণ্ডবগণকে জয় করতে পারবেন এবং তাঁদের সকল সমৃদ্ধি ও নিখিল জগৎ তার হস্তগত হবে। দুর্যোধনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করে শকুনি তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন, অর্জুন, কৃষ্ণ, ভীম প্রমুখ বীরগণকে যুদ্ধে জয় করা দেবতাদেরও অসাধ্য। তবে একটি উপায় রয়েছে যার দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে জয় করা সম্ভব। শকুনির এইরূপ উক্তি তাঁর চরম খলস্বভাবের পরিচায়ক। তিনি দুর্যোধনকে বলেন যে, যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে ভালোবাসেন। কিন্তু পাশা খেলার কৌশল তিনি বেশি জানেন না। অতএব দুর্যোধন যদি যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ করেন, তবে তিনি সেই আমন্ত্রণ অবশ্যই রক্ষা করবেন।

শকুনি আরও বলেন, তিনি পাশাখেলা এতোটায় ভালো জানেন যে, ত্রিভুবনে তাঁকে কেও হারাতে পারবে না। পাশাখেলায় শকুনির বিচক্ষণতা বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> দেবনে কুশলশ্চাহং ন মেহস্তি সদৃশং ভুবি।
> ত্রিষু লোকেষ কৌরব্য! তং ত্বং দ্যুতে সমাহ্বয়॥[২০৩]

প্রসঙ্গতঃ শকুনি যে পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য নিপুণ দ্যূতক্রিড়ক ছিলেন সেপ্রসঙ্গে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত *ভারতকৌমুদী* টীকায় বলা হয়েছে— "দেবনে দ্যূতক্রীড়ায়াম্। ভুবি ত্রিষু লোকেষু বা মে সদৃশো নাস্তি"।[২০৪]

শেষপর্যন্ত শকুনির প্ররোচনায় দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে কপট দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করেন। তিনি কপট দ্যূতক্রীড়ার দ্বারাই পাণ্ডবদের সর্বস্ব জয় করে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীকে বনবাসে প্রেরণ করেছিলেন। হস্তিনাপুরের রাজদরবারে শকুনি পানে-ভোজনে, দানে-মানে ভালই ছিলেন। কী তার এত প্রয়োজন ছিল পাণ্ডবদের সর্বনাশ করার? পাণ্ডবরা কখনো শকুনির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করেন নি। শকুনি কর্তৃক পাণ্ডবদের ক্ষতিসাধনের মুখ্য কারণ হতে পারে, ভাগ্নে দুর্যোধনকে তিনি সত্যিই বড় ভালবাসতেন। তিনি রাজবাড়িতে থেকে, রাজার শ্যালকের মতো শুধু শুয়ে-বসে দিন কাটাতে রাজি নন। শকুনি নিজেকে কাজে লাগাতে চান দুর্যোধনের স্বার্থে এবং তা এমনভাবেই, যাতে শত শত পরাশ্রয়ী রাজশ্যালকের জঘন্য চরিত্র থেকে তিনি পৃথক মর্যাদায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে, তাঁর খল স্বভাব। সংস্কৃত শাস্ত্র তথা সাহিত্যে খলের চরিত্র হল বিনা কারণে, বিনা প্ররোচনায় পরের ক্ষতি করে আনন্দ পাওয়া। স্বার্থ নয়, নিজের কোনও উন্নতি নয়, নিজের কোনও ভোগ নয়, শুধু পরের ক্ষতি করার মধ্যে অনাবিল এক আনন্দ খুঁজে পায় খলস্বভাবের মানুষ। এরকম মানুষ সমস্ত কালে, সমস্ত সমাজেই আছে। শকুনি তাদের প্রাচীন প্রতিনিধিমাত্র।

মহাকাব্যে ক্ষত্রিয়-জাতির বিশাল মাহাত্ম্যের নিরিখে শকুনি মহানুভব ও পরোপকারী চরিত্র নন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত এক অহিতকর মানুষ ছিলেন। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, ভগিনী গান্ধারীর বিবাহের সময় তিনি প্রথম হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু তারপর ভগ্নিপতির অন্ধতার সুযোগ নিয়ে হস্তিনাপুরের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ক্ষত্রিয়ের মহত্ত্ব থেকে মুক্ত করে শকুনি কপট পাশাখেলার

অন্ধকারে ডুবিয়ে দেন। দুর্যোধনের মতো এক বিরাট বীরকে তিনি তাঁর মনস্তত্ত্বের মাধ্যমে এমনভাবে প্রভাবিত করে ফেলেছিলেন যে, তিনি তাঁর বীর-স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে পাণ্ডবদের প্রতি পরপর কতগুলি অত্যন্ত খারাপ অন্যায় কার্য করেন।

শকুনির শাস্ত্রসম্মত রাজনীতিতে অনভিজ্ঞতার পরিচয় : শকুনি এত বড় একজন অহিতকর অক্ষক্রীড়ক মানুষ হয়েও, তাঁর বুদ্ধির দ্বারা পাশা খেলার মাধ্যমে দীর্ঘকাল কৌরব-পাণ্ডবদের রাজনীতির ধারাটাকে নিয়ন্ত্রণ করে গেছেন। কিন্তু রাজনীতির সততার কাছেই প্রাণ দিয়েছেন। শকুনি সারা জীবন ধরে দুর্যোধনের মনোরথ সাধন করে গেছেন এবং সেই মনোরথ সাধনের জন্য তিনি রাজনীতির মধ্যে কপট পাশাকে সুনিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু রাজনীতি জিনিসটা এমনই, যেটা অশ্বত্থামা বলেছিলেন কৃত দানও নয়, দ্বাপর দানও নয়। তাই পঞ্চ পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুন সর্বশাস্ত্র বিশারদ হলেও, তিনিও পাশাখেলায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। শকুনি বোধহয় কখনো ভাবতেও পারেননি যে, পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে কুরুক্ষেত্র নামে যুদ্ধ সংগঠিত হবে এবং তাঁকেও সেইযুদ্ধে অন্যতম যোদ্ধা হিসাবে অংশ নিতে হবে। বিশেষতঃ রাজনীতির বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অত্যন্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন, তা বোঝা যায়, যখন তিনি ভাগ্নে দুর্যোধনকে শান্তিদৌত্যে নিযুক্ত কৃষ্ণকে বন্দি করার উপদেশ দিয়েছিলেন। এছাড়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরুর প্রারম্ভে শকুনি তাঁর নিজ পুত্রকে উলূককে পাণ্ডবদের নিকট পাঠিয়েছিলেন তাঁদের উত্তেজিত করবার জন্য। বস্তুতঃ শকুনি নিজের ও পুত্রের ভবিষ্যৎ মরণ নিশ্চিত করার জন্যই পাণ্ডব শিবিরে পাঠিয়েছিলেন। এছাড়াও শকুনি পাণ্ডবদেরকে বনবাসকালেও দ্বৈতবনে ঘোষযাত্রার মাধ্যমে হত্যা করার চেষ্টাও করেছিলেন।

কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে শকুনির অংশগ্রহণ : কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শকুনি এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের নায়ক নির্বাচিত হন। এই অক্ষৌহিণী সৈন্য তাঁর নিজের রাজ্য গান্ধার-কান্দাহার থেকে এসেছিল এবং এই পার্বত্যভূমির যোদ্ধারা হয়তো ভারতীয় প্রদেশগুলির ধনুঃশর, তরবারি, গদা প্রভৃতি অস্ত্রের থেকেও দেশজ অস্ত্র-ব্যবহারেই পটু ছিল এবং সেই দেশজ অস্ত্রগুলি ভীষ্মের চোখে বিকৃত গোছের অস্ত্র। তাঁর সম্বন্ধে ভীষ্মের উক্তি হল— “শকুনি যথাসাধ্য যুদ্ধ করবেন দুর্যোধনের জন্য, কেন না যুদ্ধ না করে তাঁর উপায় নেই, যেহেতু পাণ্ডবদের সঙ্গে এই ভীষণ শত্রুতার প্রধান অন্যতম নায়ক তিনিই ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

প্রযুজ্য পাণ্ডবৈর্বৈরং যোৎস্যতে নাত্র সংশয়।[২০৫]

শকুনি-চরিত্রের শেষ কল্প হিসেবে যে কথাটা বারংবার উচ্চারিত হয়েছে তা হল, রাজনীতির মধ্যে বর্তমান রাজনীতিই হোক অথবা প্রাচীন, সব রাজনীতির মধ্যেই দুটো স্তর থাকে। তার একটি পরিশীলিত স্তর যেখানে ভব্য, সভ্য, অভিজন ব্যক্তিদের পদচারণা চলে। আর অন্যটি হল অপরিশীলিত স্তর, সেখানে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুযোগ-সন্ধানীরা আপন আপন খলতায় বিনা কারণে মানুষের ক্ষতি করে। এবিষয়ে সর্বোচ্চ স্তরের ব্যক্তিবর্গের গোপন ইন্ধন থাকে কখনও কখনও, কখনও বা তা থাকেও না। শকুনি এই অপরিশীলিত বর্গের মানুষ। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি এমন একটা জায়গা থেকে প্রশ্রয় ও অনুমোদন পেয়েছেন, যেখানে রাজারই কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। আশ্চর্যের বিষয় দুর্যোধনের মতো ক্ষাত্রবীর্য সম্পন্ন অহংকারী ব্যক্তি কী করে তাঁর মামার খলতা এবং কপটতা আত্মসাৎ করেছিলেন? শকুনির ব্যক্তিত্ব দুর্যোধনের থেকেও যে বেশি ছিল, তা বোঝা যায় তাঁর কথাবার্তায়, চালচলনে এবং যুক্তিতর্কের মাধ্যমে। তাই মহাকাব্যের বীর পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেও শকুনির মস্তিষ্ক প্রসূত বুদ্ধি নমস্কার যোগ্য। তিনি যেসকল বুদ্ধিবলে সাময়িকভাবে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের অভীষ্টপূরণ করেছিলেন এবং এমনভাবেই তা করেছিলেন, যাতে দীর্ঘ তেরো বছর ধরে ধর্মজ্ঞ পাণ্ডবদের বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হয় এবং প্রিয় ভাগ্নে দুর্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থের রাজারূপে স্বীকৃত হন। প্রসঙ্গতঃ শকুনি সম্বন্ধে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত *বৈয়াসিক মহাভারতে* উপলব্ধ *ভারতকৌমুদী* টীকায় বলা হয়েছে— "পার্ব্বতীয় শকুনিঃ, দ্যূতে নিকৃতিং শাঠ্যম, বেদ জানাতি। অতো নেদং ন্যায়েনার্থার্জ্জনমিত্যাশয়ঃ"।[২০৬]

সর্বশেষে বলতে পারি যে, যেসকল বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রবর্গের কথা আলোচ্য গবেষণাসন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে, সেইসকল ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান বিষয়ে যথাসাধ্য নিরীক্ষণ করে বলতে সচেষ্ট হচ্ছি যে, *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের সকলের রাজনৈতিক পরিচয় না পাওয়া গেলেও, তাঁরা সকলে পারিবারিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনায় জড়িয়ে ছিলেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

তথ্যসূত্র :

১. S.I.A., p. 267.

২. F.S., p. 75.

৩. A.H.S., p. 102.

৪. সামা.রাজ., পৃ. ৬৬।

৫. আদি., ১০।৫-৬, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৬. ...., ৯।৬৪-৬৫, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৭. অযো.কা., ৬৫।২৬, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৮. ব্রহ্মাণ্ড.পু., ২।৬৬।৩২

৯. ভাগবৎ.পু., ৯।১৫।৪

১০. আদি., ৩৫।৫, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১১. ...., ৩৬।৬-৭, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১২. https://www.yogapedia.com/definition/9087/manthara.

১৩. শান্তি., ১১৯।২৮, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৪. অযো.কা., ১৬।২৪, রামা., সম্পা. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী।

১৫. আদি., ৬০।১০, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৬. বা.পু., ১।১৩৮

১৭. মৎস্য.পু., ৩।৬

১৮. ভাগ., ৩।২৪।২২

১৯. পু.কো., তৃতীয় খণ্ড, সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ৮৮৮।

২০. উত্তর., ২।৩১, রামা., সম্পা. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী।

২১. ...., ৩।৭, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

২২. ...., ৩।২৯, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

২৩. ...., ১১।৪৯, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

২৪. বন., ৩২৯।৭-৮, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

২৫. উত্তর., ৩২।২৫-২৭, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

২৬. ...., ৩২।৪২, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

২৭. আদি., ১০০।৯-১০, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

২৮. ...., ৬২।৯৫-১০৭, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ৭৬৭-৭৬৯।

২৯. ...., ৬১।৪, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৩০. বা.পু., ২৫।৮২

৩১. আদি., ৬১।৫, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৩২. বা.পু., ৬৫।৯৭-১০৮

৩৩. আদি., ৯৮।৫১, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৩৪. শত.ব্রা., সম্পা. বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য, ১৩।৭।১।১৫

৩৫. আদি., ৬০।১১, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৩৬. বা.পু., ৬৫।১১৪

৩৭. *তদেব,* ৬৫।১১৫-১১৭

৩৮. অর.কা., ১৪।২০-২১, রামা., সম্পা. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী।

৩৯. আদি., ৬১।৭৪, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৪০. ...., ৩।৩৩, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৪১. অনু., ১৯।৪৩-৪৪, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৪২. বন., ২৫২।৩৮, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২৪৬৫।

৪৩. বা.পু., ৭০।৮৯

৪৪. অনু., ১৩।১১১, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৪৫. মৎ.পু., ১।১৯৬।৭

৪৬. আদি., ৮১।১০-১১, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৪৭. আদি., ১১৮।৩৮-৪০, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ১৪১৫-১৪১৭।

৪৮. বা.পু., ৯৬।১৮৭

৪৯. আদি., ৬৩।৭৯, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৫০. শল্য., ২৬।৫৭-৫৮, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৫১. রাজ.সমা., পৃ. ৯।

৫২. T.P.S., p.19.

৫৩. S.I.A., p. 6.

৫৪. সমা.রূ., পৃ. ৩৬।

৫৫. মনু., ১০।৪

৫৬. পদ্ম.পু., ১।২৭

৫৭. মনু., ৬।৮৭

৫৮. *শব্দ.,* ১।২১

৫৯. মনু., ৩।১

৬০. *তদেব,* ২।২৪৩-২৪৪

৬১. *তদেব,* ৩।২

৬২. বন., ৯৩।১৯, মহা., সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৬৩. P.E., p. 652.

৬৪. অযো.কা., ৬৬।৩৩, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ১৪০৭।

৬৫. বা.পু., ৯১।৬২

৬৬. উত্তর., ৩।৮-৯, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৬৭. ...., ৯।৪৫, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৬৮. বন., ২২৯। ১২-১৩, মহা., সম্পা.হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৬৯. আদি., ১০৩।১৯-২১, *তদেব,* সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৭০. তত্রৈব।

৭১. P.E., p. 236.

৭২. আদি., ৯৮।২২, মহা., সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৭৩. শান্তি., ৩২৭।৫১, *তদেব,* সম্পা.হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৭৪. তত্রৈব।

৭৫. P.E., p. 243.

৭৬. আদি., ১৯।১৫-১৬, মহা., সম্পা.হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৭৭. বন., ১০৮।১২, *তদেব,* সম্পা.হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৭৮. আদি., ৩।৩৮, *তদেব,* সম্পা.হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৭৯. ...., ৮১।১২, *তদেব,* সম্পা.হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৮০. ...., ১২৮।৪২-৪৪, *তদেব,* সম্পা.হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৮১. মনু., ৬।৮৯

৮২. *তদেব,* ৩।১২

৮৩. *তদেব,* ৩।২১

৮৪. *তদেব,* ৮।৩৮৯

৮৫. আদি., ১০।৬-৭, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৮৬. ...., ৯।৬৪-৬৫, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৮৭. অযো.কা., ৬৫।৩৪, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৮৮. আদি., ৩৫।৪৬-৪৭, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৮৯. স্ক.পু., রেবাখণ্ড, ৪১।৭।

৯০. G.N.B., Ed. Alice Getty, p. 115.

৯১. বন., ২২৯। ৭-৯, মহা., সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২২৫৮।

৯২. উত্তর., ১২।২, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

৯৩. আদি., ১০৪।১২, মহা., সম্পা.হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৯৪. ...., ১০৪।১৪, *তদেব,* সম্পা.হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৯৫. তত্রৈব।

৯৬. P.E., p.236.

৯৭. সভা., ৬৪।২৭, মহা., সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

৯৮. তত্রৈব।

৯৯. আদি., ৯৮।২৩, *তদেব,* সম্পা.হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১০০. ...., ৬১।৭৪, *তদেব,* সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১০১. অনু., ১৯।৪৩-৪৪, *তদেব,* সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১০২. P.E., p. 65.

১০৩. বন., ২৪৮।৯, মহা., সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২৪১২।

১০৪. P.E., p. 266.

১০৫. আদি., ৩।১০০, মহা., সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২২৪।

১০৬. বন., ১০২।২১, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১০৭. *https://en.wikipedia.org/wiki/Ekalavya.*

১০৮. I.M.L., Chapter- xv, p. 217.

১০৯. শান্তি., ৭।১৩, মহা., সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১১০. বৃহৎ.উপ., ৬।৪।২০

১১১. মনু., ৯।১৫৯-১৬০

১১২. *তদেব,* ৯।১৩৮

১১৩. আদি., ৭২।২৮, মহা., সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১১৪. অযোধ্যা., ১০৭।১২, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১১৫. তত্রৈব।

১১৬. বন., ৯৪।৫১-৫২, মহা., সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১১৭. ...., ৯৪।৬২, *তদেব,* সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১১৮. অযো.কা., ৬৫।৪২-৪৩, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১১৯. ...., ৬৬।৪৭, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ১৪১২।

১২০. বন., ২২৮।১৫-১৬, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১২১. P.E., p. 769.

১২২. আদি., ৯০।৩৯, মহা., সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১২৩. ...., ১১০।১৭-১৮, *তদেব,* সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১২৪. ...., ১০৯।৪০-৪১, *তদেব,* সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১২৫. ...., ৯৮।৪১, *তদেব,* সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১২৬. অরণ্য., ১৩।৩৩, রামা., সম্পা. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী।

১২৭. বন., ২৪৮।১২-১৩, মহা., সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১২৮. আদি., ১০২।১৩, *তদেব,* সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১২৯. *Wikipedia.*

১৩০. যাজ্ঞ.সং., *প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়,* ৪৫।

১৩১. শান্তি., ৬০।৪, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৩২. আদি., ১৮।২৫, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১৩৩. অযো.কা., ৬৫।২৬, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১৩৪. বন., ২২৯।৩৩, মহা., সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৩৫. আশ্র., ২১।১২, *তদেব,* সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৩৬. শান্তি., ২৪৩।২২-২৩, মহা., সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।

১৩৭. ...., ২৪১।৯, *তদেব,* সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।

১৩৮. অনু., ১৪১।৮৯, *তদেব,* সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।

১৩৯. শান্তি., ২৪১।৮, *তদেব,* সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।

১৪০. অনু., ১৬২।৪১, *তদেব,* সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।

১৪১. ...., ১০৪।১৫১, *তদেব,* সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।

১৪২. ...., ১০৪।১০৮, *তদেব,* সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।

১৪৩. শান্তি., ২৯৬।৪, *তদেব,* সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।

১৪৪. পা.গৃ.সু., ১।১৬।৩

১৪৫. উত্তর., ৭২।৫, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১৪৬. আদি., ২২১।৬৯, মহা., সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।

১৪৭. যা.সং., ১১।৮৩

১৪৮. গো.গৃ.সু., ২।১।১

১৪৯. আদি., ২২১।৮৭, মহা., সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।

১৫০. অনু., ৯৫।২৫, *তদেব,* সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।

১৫১. মনু., ২।৬৫

১৫২. শান্তি., ২৪২।২৭-২৮, মহা., সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।

১৫৩. তু.রা.শ., পৃ. ৮৭।

১৫৪. *তদেব,* পৃ. ৮৮।

১৫৫. তত্রৈব।

১৫৬. দি.জি.ডি., পৃ. ৮৪।

১৫৭. মনু., পৃ. ১৪০।

১৫৮. দি.জি.ডি., পৃ. ৮৫।

১৫৯. *তদেব,* ৯।২৯৪

১৬০. সভা., ৫৫।১৫, মহা., সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য, পৃ. ৪৬৫।

১৬১. I.P.T., p. 17.

১৬২. অযো.কা., ৬।১৯, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ৮২৬।

১৬৩. ...., ৭।৫, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ৮৩২।

১৬৪. তত্রৈব।

১৬৫. অযো.কা., ৭।২০, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ৮৩২।

১৬৬. ...., ৭।৩০, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ৮৩৯।

১৬৭. https://www.yogapedia.com/definition/9087/manthara.

১৬৮. পু.কো., দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ৩৪৫।

১৬৯. উত্তর., ১৫।৩৪, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১৭০. মনু., ৭।৪৩-৪৪

১৭১. *রাময়ণী,* সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ৮৩৬।

১৭২. অ.কা., ২৫।১৮, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১৭৩. ...., ৩৯।১৫-১৬, *তদেব,* সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১৭৪. *রাময়ণী,* সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ৮৩৮।

১৭৫. অ.কা., ৩৯।২১, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১৭৬. আদি., ১৩৫।২, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ১৪৭৯।

১৭৭. তত্রৈব।

১৭৮. মহা.নী.অ.দু., সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ২৩৪।

১৭৯. উশ.সং., ৭। ৪৫-৪৬

১৮০. মনু., সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৬৯৯।

১৮১. আদি., ১৩৬।৪৫, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৮২. মনু., সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৬৯৯।

১৮৩. আদি., ১৩৬।৫০-৫১, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৮৪. ...., ১৩৭।১, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৮৫. মনু., সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৬৯৮।

১৮৬. আদি., ১৩৭।২, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৮৭. মনু., সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৬৯৯।

১৮৮. তত্রৈব।

১৮৯. পু.কো., তৃতীয় খণ্ড, সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ৪৯০।

১৯০. বন., ২০২।১৩, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৯১. মনু., সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৬৯৯।

১৯২. আদি., ২০০।৬৩-৬৪, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৯৩. মনু., সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৬৯৮।

১৯৪. সভা., ৭৪।৩, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৯৫. মনু., সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৬৯৮।

১৯৬. আশ্র., ২১।১৭, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৯৭. ...., ১৬।১৬, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৯৮. আদি., ১৯৪।১-২, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৯৯. ...., ১০৪।১৫, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

২০০. মহা.প্রতি., সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ২৩৬।

২০১. আদি., ১২৯।৪০, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

২০২. সভা., ৪৬।১, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

২০৩. সভা., ৪৬।১৯, *তদেব,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

২০৪. তত্রৈব।

২০৫. মহা.প্রতি., সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ২৬৭।

২০৬. সভা., ৬০।১০, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ৪৯৯।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়:

সাংবিধানিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক পর্যালোচনা

দেশের সকল জনসাধারণকে শাসন করার জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করে সেই দেশের সংবিধান। যেকোন রাষ্ট্রের আইনসভা, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি সেই দেশের সংবিধান অনুযায়ী গঠিত হয়। রাষ্ট্রের সংবিধান সকল জনগণের নিজ নিজ ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে এবং পারস্পরিক সকল জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে।

গণতন্ত্র, প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, শাসকদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার সীমিতকরণ এবং আইনের অনুশাসনের ধ্যানধারণা প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল না। ধর্মের সার্বিক মহত্বের ধারণার সঙ্গে আইনের শাসন বা সীমাবদ্ধ সরকারের এই ধারণার প্রায় কোনও পার্থক্যই ছিল না। প্রাচীন ভারতের শাসকগণ ধর্ম মেনে চলতে বাধ্য থাকতেন। প্রজাতান্ত্রিক সরকার, প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা বা স্থানীয় স্বশাসিত সংগঠনের অস্তিত্ব যে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছিল, তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। গণতান্ত্রিক চেতনা ও আচরণ বৈদিক যুগ থেকেই জনজীবনের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ঋগ্বেদ এবং *অথর্ববেদে* 'সভা' (সাধারণ পরিষদ) এবং 'সমিতি'র (বয়স্কদের সভা) উল্লেখ রয়েছে। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র, মহাভারত, মনুস্মৃতি* প্রভৃতি গ্রন্থে বেদ পরবর্তী যুগের ভারতের ইতিহাসে বহু প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বের উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতের* যুগে বড় বড় সাম্রাজ্যগুলি ছোট ছোট প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এই রাষ্ট্রগুলির বিভিন্ন সদস্যরা 'সন্থাগরে' মধ্য থেকে একজনকে মিলিত হয়।[১] প্রকাশ্য সভা থেকে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হতেন। তাঁরা তাঁদের প্রধান হিসাবে নির্বাচিত করতেন, যিনি গোপ অর্থাৎ পৃথিবীকে মন্ত্রিপরিষদের সহায়তায় শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

প্রতিটি রাষ্ট্রের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকল নাগরিকের ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। নাগরিকদের নিজের মধ্যে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অথবা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সঙ্গে সমষ্টির স্বার্থে

সামঞ্জস্য সাধন করার অর্থ ন্যায়বিচার। সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্বাধীনতা, সাম্য ও ভাতৃত্ববোধের চাইতেও ন্যায়বিচারকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ন্যায়বিচারের অর্থ হল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়কে রাজনৈতিক ন্যায়ের চাইতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত।

৪.১. বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের অধিকার সুরক্ষায় স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত বিধানসমূহ ও তার প্রতিফলন : যে শাস্ত্রের মাধ্যমে বেদ বিহিত ধর্মকেই স্মরণ করা হয়, সেই শাস্ত্রকেই বলা হয় স্মৃতিশাস্ত্র। 'স্মৃ' ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন 'স্মৃতি' পদটির ব্যুৎত্তিগত অর্থ হল স্মরণ। পুনরায় স্মৃতি পদটির দ্বারা ধর্মকার্য সংক্রান্ত ও সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সমস্ত বিধিনিষেধকেই বোঝায়। অর্থাৎ প্রতিটি দেশের সুশাসন ও মানুষের জীবনযাত্রার সুনিয়ন্ত্রণের অভিপ্রায় লক্ষ্যেই স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হয়েছে। মনু প্রভৃতি আর্যঋষিগণ তাঁদের রচিত স্মৃতি-সংহিতায় ভিন্ন রাষ্ট্রের সুশাসন ও মানুষের জীবনযাত্রাকে সুনিয়ন্ত্রণ করার অভিপ্রায়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কতগুলি বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেছিলেন। দশবিধ সংস্কার, খাদ্যাখাদ্য বিচার, ব্রতপূজা, প্রায়শ্চিত্ত, দায়ভাগ, রাজধর্ম, শাসননীতি প্রভৃতি নানা বিষয়বস্তুসম্ভারে এই স্মৃতি-সংহিতাগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে। এতে রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। তবে স্মরণীয় যে, যেহেতু স্মৃতি শ্রুতির মত অপরিবর্তনীয় নয়, তাই স্মৃতি-সংহিতার অনুশাসনগুলি যুগের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়েছে।

সকল স্মৃতি-সংহিতার মধ্যে আমাদের দেশে *মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা* ও *পরাশর সংহিতা* সমধিক প্রসিদ্ধ। সংহিতা প্রণেতা ঋষিগণ ছিলেন সমাজ ব্যবস্থাপক ও আইন প্রণেতা। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত হিন্দু আইন মুখ্যতঃ স্মৃতিশাস্ত্রের দায় ও ব্যবহারের উপর ভিত্তি করেই প্রণীত হয়েছে।

স্মৃতিশাস্ত্রে কেবলমাত্র আচার ব্যবহারের পরিশুদ্ধি ঘটাতেই নির্মিত একথা মনে করা ভুল। আর্যঋষিগণের নির্দেশিত বিধি-নিষেধগুলির লক্ষ্য সুদূরপ্রসারী। ব্যক্তিগত তথা সামাজিক জীবনে মানুষের চিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধিই মানবধর্মের প্রথম ধাপ। মানবজীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষলাভ। চিত্তশুদ্ধি না হলে মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সেজন্য স্মৃতিশাস্ত্রে

তদুপযোগী বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা উল্লিখিত হয়েছে। এই বিধিনিষেধ মেনে চললে অন্তরে সত্ত্বভাবের বৃদ্ধি হয়। আর সত্ত্বগুণের দ্বারাই মানব, পশুপ্রকৃতি বা আসুরী প্রকৃতি জয় করে দিব্য প্রকৃতি লাভ করতে পারে।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সামাজিক ন্যায় এবং সাম্য নীতিগতভাবে স্বীকৃত। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও সত্য যে, সামাজিক বিভাজন ও বঞ্চনা নানা চেহারায়, নানাভাবে সর্বত্র বিদ্যমান। অক্ষমতাযুক্ত শিশুরা প্রকৃত অর্থে অক্ষম নয়। তাদের সক্ষমতা সাধারণ শিশুদের তুলনায় ভিন্ন রকম। সেই সক্ষমতার সাহায্যে তারা যা পারে, তাকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা কখনোই যুক্তিযুক্ত নয়। সেই কারণে তাদেরকে ভিন্নতর সক্ষমতাযুক্ত (Differently Abled) বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু (Children with Special Needs) নামে অভিহিত করা হয়। প্রাচীনকালের ভারতবর্ষের বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের অধিকার সুরক্ষা কিরূপ ছিল তা নিম্নে আলোচিত হল—

অক্ষমতা বা Disability হল এমন একটি শারীরিক সমস্যা যা অন্য অধিকাংশ লোকেরা যে কাজ করতে সক্ষম, সে সব কাজ করার সামর্থ্যকে সীমিত করে ফেলে। অর্থাৎ বেশির ভাগ লোক যে কাজ করতে পারে, সে কাজটি যদি কেউ করতে না পারে, তখন তাকে Disabled বা অক্ষম বলা হয়। ঐতিহাসিকভাবে অক্ষমদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কার্যত মানবিক প্রতিক্রিয়া ও আবেগের পর্যায় জুড়ে রয়েছে। প্রাচীনকালেও সকল অক্ষম ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি মানবিক দিক থেকে দেখা হত। এবিষয়ে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> হীনাঙ্গানতিরিক্তাঙ্গান্ বিদ্যাহীনান্ বয়োঽধিকান্।
> রূপদ্রব্যবিহীনাংশ্চ জাতিহীনাংশ্চ নাক্ষিপেৎ।।[২]

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তির অঙ্গের হীনতা রয়েছে। যেমন- কাণা, খোঁড়া ইত্যাদি, অতিরিক্তাঙ্গ অর্থাৎ যাদের অঙ্গের আধিক্য আছে। যেমন, হাতে বা পায়ে ছয়টি আঙুল রয়েছে, যারা বিদ্যাহীন অর্থাৎ একান্ত মূর্খ, যারা বয়োধিক বা অত্যন্ত বৃদ্ধ, যারা রূপহীন অর্থাৎ যাদের অঙ্গ-সন্নিবেশ বিকৃত, যেমন টেরা প্রভৃতি, যারা ধনহীন এবং জাতিহীন অর্থাৎ নিকৃষ্টজন্মা তাদের ব্যঙ্গ বা নিন্দা করা উচিত নয়।

পুনরায় কুল্লূকভট্ট তাঁর *মন্বর্থমুক্তাবলী* টীকায় অক্ষম ব্যক্তিদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাতে নিন্দা না করা হয়, সেবিষয়ে বলেছেন— 'হীনাঙ্গাধিকাঙ্গমূর্খবৃদ্ধকুরূপার্থহীনহীনজাতীন্ কাণশব্দাহ্বানাদিনা ন নিন্দেৎ'।[৩]

৪.১.১. মনুষ্যের ন্যায় অক্ষম কোন প্রাণীকে দিয়ে ভার বহন বা যানকার্যে ব্যবহার শাস্ত্রনিষিদ্ধ : মনুষ্যের ন্যায় অক্ষম কোন প্রাণীকে দিয়ে কোনরূপ কার্য করানো এবং ভার বহন করানো শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ছিল। প্রসঙ্গতঃ *পরাশরসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> ক্ষুধিতং তৃষিতং শ্রান্তং বলীবর্দ্দং ন যোজয়েৎ।
> হীনাঙ্গং ব্যাধিতং ক্লীবং বৃষং বিপ্রো ন বাহয়েৎ।।[৪]

উপর্যুক্ত শ্লোকের পরিপ্রেক্ষিতে একইকথা অর্থাৎ মনুষ্যের ন্যায় অক্ষম কোন প্রাণিকে দিয়ে কোনরূপ কার্য করানো এবং ভার বহন করানো শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বিষয়ে Manmatha Nath Dutt সম্পাদিত *Parāśarasmṛti* গ্রন্থে বলা হয়েছে— 'A hungry, thirsty, or fatigued bullock should not be yoked to a plough and a Brāhmaṇa should not cause maimed, diseased or castrated bull to carry his load'.[৫]

এছাড়াও *বিষ্ণুসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, কোনরূপ হীনাঙ্গ পশুকে দিয়ে কোনরূপ ভার বহন বা যেকোন স্থানে গমন, দুর্বল বাহনের উপর চড়ে কোনরূপ স্থানে গমন, বলীবর্দ্দ অর্থাৎ কোনরূপ বৃষের পিঠে চড়ে গমনক্রিয়া ও উন্মাদ বাহন দ্বারা কোনরূপ স্থানে গমন শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এবিষয়ে বলা হয়েছে যে—

> ন সন্ততং ব্যালব্যাধিতার্ত্তৈর্বাহনৈঃ ন হীনাঙ্গৈঃ।।[৬]

৪.১.২. বিবিধ বিকৃতেন্দ্রিয় বংশে পুরুষ ও কন্যার বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ : কোন ব্যক্তির সবগুলি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটি ইন্দ্রিয়ও যদি আলগা হয়ে যায়, অর্থাৎ কোন বিষয়ে একান্ত আসক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সেই ব্যক্তির অন্য সকল ইন্দ্রিয় থাকলেও তত্ত্বজ্ঞান লোপ পায়। যেমন, কোনও জলপূর্ণ চামড়ার পাত্রে জল রাখলে অর্থাৎ ছাগাদির চামড়ার দ্বারা নির্মিত ভিস্তি জাতীয় পাত্রবিশেষে জল সংগ্রহ করার জন্য একটি ছিদ্র থাকে, তার মধ্য দিয়ে সমস্ত জল যেমন নির্গত হয়, তেমনি

কোন ব্যক্তির একটি ইন্দ্রিয় আলগা হলে ভিস্তির ছিদ্রের ন্যায় সকল তত্ত্বজ্ঞান লোপ পায়। প্রসঙ্গতঃ এবিষয়ে বলা হয়েছে—

ইন্দ্রিয়াণাং তু সর্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞাদৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্।।[৭]

পুত্রের বিবাহের জন্য কন্যার বংশ বা পরিবার সমৃদ্ধশালী হলেও স্ত্রী প্রাপ্তির বিষয়ে বিভিন্ন কুল-শাস্ত্রে বর্জনীয় রয়েছে। যেমন— যে বংশে লোকেরা জাতকর্মাদি সংস্কার এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি নিত্যক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান করে না, যে বংশে পুরুষ সন্তান জন্মায় না অর্থাৎ কেবল কন্যা সন্তানই প্রসূত হয়, যে বংশ নিশ্ছন্দ অর্থাৎ বেদাধ্যয়নরহিত, যে বংশের লোকেদের হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গে বড় বড় লোম দেখা যায়, যে বংশের লোকেরা অর্শ অর্থাৎ মলদ্বারাশ্রিত রোগ বিশেষের দ্বারা আক্রান্ত, যে বংশের লোকেরা ক্ষয়রোগগ্রস্ত, যে বংশের লোকেরা আমাশয়রোগে আক্রান্ত, যে বংশের লোকেদের অপস্মার বা স্মৃতিভ্রম রোগ রয়েছে, যে বংশের লোকেরা শ্বেতরোগে আক্রান্ত অর্থাৎ কুষ্ঠরোগ দ্বারা আক্রান্ত এই সমস্ত দশটি বংশের কন্যাকে বিবাহে নিষেধ রয়েছে। কারণ এই সকল বংশে বিবাহ করলে বিবাহোত্তরকালে উৎপন্ন সন্তানও উপর্যুক্ত রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

- পুনরায় *ব্যাসসংহিতাতেও* পঞ্চদশ প্রকারের দোষযুক্ত সাধ্বী স্ত্রী পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। পঞ্চদশ দোষযুক্ত নারী হল— প্রমাদ, উন্মাদ, ক্রোধসম্পন্ন, ঈর্ষাপরায়ণ, বঞ্চন, অভিমানিতা, পৈশুন্য বা খলতা প্রকৃতির, হিংসাপরায়ণ, বিদ্বেষমূলক, অত্যন্ত অহঙ্কারী, ধূর্ত, নাস্তিক্য, নির্ভীক, অসন্তোষ এবং কপটতাসম্পন্ন স্বভাব। এবিষয়ে বলা হয়েছে—

প্রমাদোন্মাদরোষের্ষ্যাবঞ্চনঞ্চাতিমানিতাম্।।
পৈশুন্যহিংসাবিদ্বেষমহাহঙ্কারধূর্ত্ততাঃ।
নাস্তিক্যসাহসস্তেয়দম্ভান্ সাধ্বী বিবর্জ্জয়েৎ।।[৮]

- এছাড়াও যে কন্যার কেশসমূহ তামাটে কিংবা কনকবর্ণ, যে কন্যার অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ রয়েছে অর্থাৎ হাতে বা পায়ে ছয়টি আঙ্গুল রয়েছে, যে নারী নানা রোগগ্রস্তা বা চিররোগিণী বা দুষ্প্রতিকার্য ব্যধির দ্বারা আক্রান্ত, যে নারী কেশশূন্যা, যে নারী বাচাল এবং যে নারীর চোখ

পিঙ্গলবর্ণ সেই সমস্ত নারীকে বিবাহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ রয়েছে। *মনুসংহিতায়* যে যে বংশীয় নারীদেরকে বিবাহ নিষেধ ছিল তাঁরা হলেন—

হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারিশ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ।।
নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্।।[৯]

৪.১.৩. বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের মন্ত্রণাস্থানে অপসারণের বিধি : জড়প্রকৃতির লোক, বোবা, অন্ধ, কালা, শুক-সারিকা প্রভৃতি তির্যক প্রাণী, অতিবৃদ্ধ লোক, স্ত্রীলোক, ম্লেচ্ছ, ব্যাধিগ্রস্ত লোক এবং বিকলাঙ্গ প্রভৃতি ব্যক্তিদের রাজা মন্ত্রণাকালে মন্ত্রণাস্থান থেকে অপসারিত করেন। কারণ উপর্যুক্ত মানুষ ও প্রাণীদের মন্ত্রণাস্থান থেকে সরিয়ে দিতে হবে, তা না হলে মন্ত্রভেদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পশু-পাখী প্রভৃতি তির্যক্ প্রাণীর মধ্যে শুক-সারিকা প্রভৃতি পাখীরা মন্ত্রণা প্রকাশ করে দিতে পারে। যোগজশক্তি সম্পন্ন লোকেরা গরু-ঘোড়া প্রভৃতির রূপ গ্রহণ করে মন্ত্রণা জেনে নিয়ে পরে দেহ পরিবর্তন করে ভাল-মন্দ খবর রাজ্যের বাইরে নিয়ে যেতে পারে। কারণ শুকাদি পক্ষী, অতিশয় বৃদ্ধ পুরুষ এবং মহিলারা স্বভাবতঃ অস্থিরবুদ্ধি হয়ে থাকে, তাই তারা কোন বিষয় শুনলে তা মন্ত্রভেদের আশঙ্কা থেকেই যায়। আবার বামন-কুব্জাদি-বিকলাঙ্গ জন্মান্তরীয় দুষ্কৃতিবশে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাই তারা একটু অপমানিত বোধ করলে স্থির থাকতে পারে না, তাই তাদের দ্বারা মন্ত্রভেদের আশঙ্কা থেকেই যায়। সেই কারণেই বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রতি রাজা সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ায় তাদের সামনে মন্ত্রণা করা শাস্ত্রসম্মত নিষিদ্ধ করেছেন। এবিষয়ে *মনুসংহিতায়* উল্লিখিত হয়েছে—

জড়মূকান্ধবধিরাংস্তৈর্য্যগযোনান্ বয়োঽতিগান্।
স্ত্রীম্লেচ্ছব্যাধিতব্যঙ্গান্ মন্ত্রকালেঽপসারয়েৎ।।[১০]

এছাড়াও *বিষ্ণুসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, যদি কোন সুস্থ-স্বাভাবিক ব্যক্তি বা রাজা কোনরূপ মত্ত, উন্মত্ত, বিকলাঙ্গ, জাতবামন, জাতবিরেচন, মুণ্ডিত, নপুংসক প্রভৃতি ব্যক্তিকে অবলোকন করলে প্রতিনিবৃত্ত ঘটবে। প্রসঙ্গতঃ বলা হয়েছে—

অথ মত্তোন্মত্তব্যঙ্গান্ দৃষ্টা নিবর্ত্তেত।[১১]

পুনরায় যেকোন হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ ও পতিত ব্যক্তিগণকে কোনরূপ শ্রাদ্ধ দর্শন থেকে সর্বদা নিবৃত্ত থাকার জন্য *বিষ্ণুসংহিতায়* বলা হয়েছে। কারণ বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা সর্বদায় মানসিক দিক থেকে তাদের নিজ শরীরের অক্ষমতা বিষয়ে অসুস্থ থাকেন অথবা অস্বাভাবিক আচরণ করেন। যদি এইরূপ অসুস্থ অবস্থাতে কোনরূপ পরিজনের শ্রাদ্ধাদিকার্য সম্পূর্ণ হতে তারা দেখেন, তবে দুঃখে মানসিক রোগী অথবা দুশ্চিন্তার শিকার হতে পারেন। এইকারণে বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের কোনরূপ শ্রাদ্ধ দর্শন শাস্ত্রে নিয়মবিরুদ্ধ। প্রসঙ্গতঃ বলা হয়েছে যে—

> ন হীনাঙ্গাধিকাঙ্গাঃ শ্রাদ্ধং পশ্যেয়ুঃ।[১২]

৪.১.৪. <u>বিকলাঙ্গ বা অসুস্থ রাজার অনুপস্থিতিতে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বপ্রণালী</u> : কোন রাজার শরীর যখন রোগশূন্য থাকবে তখন তিনি শাস্ত্রোক্ত প্রকারে প্রজাপালনাদির কাজ নিজে করবেন। তবে যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন কিংবা কোন কারণবশত বিকলতা প্রাপ্ত হলে তখন তিনি অমাত্যাদি ভৃত্যবর্গের উপর রাজ্য পরিচালনার ভার অর্পণ করবেন। প্রসঙ্গতঃ অসুস্থ রাজা অমাত্যাদি ভৃত্যবর্গের উপর রাজ্য পরিচালনার ভার অর্পণ করা বিষয়ে *মনুসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

> এতদ্ বিধানমাতিষ্ঠেদরোগঃ পৃথিবীপতিঃ।
> অস্বস্থঃ সর্বমেতত্তু ভৃত্যেষু বিনিযোজয়েৎ।।[১৩]

৪.১.৫. <u>বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রতি কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া করলে রাষ্ট্রকর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্তির বিধান</u> : কাণা, খোঁড়া অথবা যেকোন বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে যদি কেউ সত্যই বলে অথবা বিদ্রুপ করে ডাকে, তাহলে সেই ব্যক্তির প্রতি রাজা কমপক্ষে এক কার্ষাপণ অর্থাৎ চার আনা অর্থদণ্ড করবেন। কারণ অঙ্গবিকল ব্যক্তিরা সর্বদাই মানসিক দিক থেকে অসুস্থ থাকেন। এইরূপ বাক্য প্রয়োগ তাদের পক্ষে অস্বস্তিজনক। সেইহেতু শাস্ত্রে বিধান রয়েছে—

> কাণং বাঽপ্যথবা খঞ্জমন্যং বাপি তথাবিধম্।
> তথ্যেনাপি ব্রুবন্ দাপ্যো দণ্ডং কার্ষাপণাবরম্।।[১৪]

পুনরায় *বিষ্ণুসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, প্রকৃত অন্ধ, কালা, বোবা, পঙ্গু অথবা যেকোনরূপ বিকৃতাঙ্গ ব্যক্তির তাদের নিজ শারীরিক অঙ্গ বিষয়ে কোনরূপ বিদ্রুপ করে সম্বোধন করলে বা গালি দিয়ে তাদের শরীর বিষয়ক কোনরূপ মন্দ নামকরণ করলে, সেই বিদ্রুপকারী ব্যক্তির দুই কার্ষাপণ

অর্থাৎ আট আনা অর্থদণ্ড সেই প্রদেশের রাজা ধার্য করবেন। এছাড়াও হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, মূর্খ, ক্লীব ও ধনহীন কোনরূপ ব্যক্তিকে উপহাস করাও নিয়মবিরুদ্ধ অপরাধরূপে গণ্য হয়। বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের প্রতি যেকোনরূপ বিদ্রুপ বা উপহাসের অর্থদণ্ড বা অর্থ জরিমানা বিষয়ে *বিষ্ণুসংহিতায়* বলা হয়েছে—

কাণখঞ্জাদীনাং তথাবাদ্যপি কার্ষাপণদ্বয়ম্।।[১৫]

৪.১.৬. পিতার ধনসম্পত্তির উপর বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের গ্রাসাচ্ছাদনের বিধান : ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড় অর্থাৎ বিকলাঙ্গগ্রস্থ ব্যক্তিরা কেউই পিতার ধনসম্পত্তির অংশীদার হবে না। কারণ পিতার ধনসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের পক্ষে অসম্ভবাবী। কিন্তু পিতা বিকল পুত্রের প্রতি গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবেন। অর্থাৎ বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিজ পিতার ধনসম্পত্তি ভোগ করে জীবনধারণের প্রক্রিয়াকে গ্রাসাচ্ছাদন বলে। প্রসঙ্গতঃ কুল্লূকভট্ট তাঁর *মন্বর্থমুক্তাবলী* টীকায় বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের প্রতি নিজ পিতার ধনসম্পত্তির অংশীদারত্ব প্রাপ্তি না হওয়া বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে— 'নপুংসকপতিতজাত্যন্ধশ্রোত্রবিকলোন্মত্তজড়মূকা যে চ কাণপঙ্গাদমূয়ো বিকলেন্দ্রিয়াস্তে পিত্রাদিধনহরা ন ভবন্তি, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনভাগিনঃ'।[১৬]

এছাড়াও উপর্যুক্ত বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের বিধানের ন্যায় *বিষ্ণুসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, পতিত, ক্লীব, মহারোগাক্রান্ত, জন্মান্ধ, পঙ্গু ও মুকাদি বিকল ব্যক্তিরা কোনরূপ পৈতৃক ধনসম্পত্তির অধিকারী হবে না। কিন্তু যেসকল সুস্থ-স্বাভাবিক পুত্র পিতার ধনসম্পত্তীর অধিকারী হবেন, তারা নিজ বিকৃতেন্দ্রিয় ভ্রাতার সকল প্রকার ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার সর্বদায় গ্রহণ করবেন। প্রসঙ্গানুযায়ী বলা হয়েছে—

পতিতক্লীবাচিকিৎস্যরোগ-বিকলাস্ত্বভাগহারিণঃ।। ঋক্থগ্রাহিভিস্তে ভর্ত্তব্যাঃ।।[১৭]

৪.১.৭. বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রতি রাজার শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য : এছাড়া অন্ধ, পঙ্গু, সত্তর বছরের স্থবির এবং বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের উপকারকারী ব্যক্তির কাছ থেকে রাজা কোনরূপ কর গ্রহণ করবেন না। কারণ বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের প্রতি দান, সম্মান প্রভৃতির দ্বারা অনুগ্রহ করা রাজার শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য। প্রসঙ্গতঃ বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের কাছ থেকে রাজা কোনরূপ শুল্ক গ্রহণ করবেন না। এবিষয়ে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে—

অন্ধো জড়ঃ পীঠসর্পী সপ্তত্যা স্থবিরশ্চ যঃ।
শ্রোত্রিয়েষূপকুর্বংশ্চ ন দাপ্যাঃ কেনচিৎ করম্।।[১৮]

পুনরায় কুল্লূকভট্ট তাঁর *মন্বর্থমুক্তাবলী* টীকায় বলেছেন বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের থেকে রাজা কোনরূপ কর গ্রহণে করবেন না। এবিষয়ে বলা হয়েছে— “অন্ধো বধিরঃ পঙ্গুঃ সম্পূর্ণসপ্ততিবর্ষঃ। সপ্তত্যেতি প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানমিতি তৃতীয়া। শ্রোত্রিয়েষু ধনধান্যশুশ্রূষাদিনোপকারকঃ, এতে কেনচিদপি ক্ষীণকোষেণাপি রাজ্ঞা স্বগ্রাহ্যকরং ন দাপনীয়াঃ”।[১৯]

পুনরায় পঙ্গু ও অন্ধ ব্যক্তিদের প্রতি যথাশক্তি অন্ন দান করার কথা শাস্ত্রে কথিত আছে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে, অন্যথায় চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশাধিকারে শাস্ত্রসম্মত নিষেধ রয়েছে। এবিষয়ে *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* বলা হয়েছে—

অধীতবেদো জপকৃৎ পুত্রবানন্নদোহগ্নিমান্।
শক্ত্যা চ যজ্ঞকৃন্মোক্ষে মনঃ কুর্য্যাত্তু নান্যথা।।[২০]

৪.১.৮. <u>বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের গুপ্তচররূপে বিজিগীষু রাজা কর্তৃক নিয়োগ</u> : বিজিগীষু রাজা শত্রু, মিত্র, মধ্যম ও উদাসীন রাজগণের উপর এবং তাঁদের প্রধান প্রধান মন্ত্রী-সেনাপতি প্রভৃতি মহামাত্রদের উপর গুপ্তচর নিয়োগ করবেন। শত্রু রাজা প্রভৃতির গৃহের মধ্যে গুপ্তচররূপে কাজ করার জন্য বিজিগীষু রাজা কুব্জ, বামন, নপুংসক, শিল্পজ্ঞ স্ত্রীলোক, বোবা এবং নানাপ্রকার ম্লেচ্ছ জাতীয় পুরুষকে নিযুক্ত করবেন। বিজিগীষু রাজার দ্বারা কৃত শত্রুরাজ্যে বিকৃতেন্দ্রিয় জাতীয় প্রাথমিক গুপ্তচর নিয়োগ বিষয়ে কৌটিল্য প্রণীত *অর্থশাস্ত্রে* বলা হয়েছে—

অন্তর্গৃহচরাস্তেষাং কুব্জ-বামন-ষণ্ডকাঃ।
শিল্পবত্যঃ স্ত্রিয়ো মূকাশ্চিত্রাশ্চ ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।।[২১]

পুনরায় কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* বলা হয়েছে যে, রাজার কাছে কাজ করতে থাকা অবস্থায় (On duty) বেতনভোগী রাজকর্মীদের মৃত্যু হলে, সেই মৃত রাজকর্মচারীর স্ত্রী ও পুত্র রাজার কাছ থেকে অন্ন ও বেতনের অধিকারী হবেন। মৃত ভৃত্যদের শিশু, বৃদ্ধ ও পীড়িত ব্যাক্তিদের প্রতি রাজা অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। প্রসঙ্গতঃ মৃত

রাজকর্মচারীদের পরিবারের প্রতি রাজার অনুগ্রহ বিষয়ে *অর্থশাস্ত্রে* বলা হয়েছে— "কর্মসু মৃতানাং পুত্রদারা ভক্তবেতনং লভেরন্। বাল-বৃদ্ধ-ব্যাধিতাশ্চৈষামনুগ্রাহ্যাঃ"।[২২]

বিজিগীষু রাজা উভয়বেতনভোগী গুপ্তচরকে নিযুক্ত করার আগে রাজা তাদের স্ত্রী-পুত্রকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে নিজের অধীনে স্থাপন করবেন। উভয়বেতনভোগী গুপ্তচর হলেন সেইসকল রাজকর্মচারী যারা বিজিগীষু রাজা এবং শত্রুরাজার কর্মচারী অর্থাৎ দুই রাজার কাছ থেকে বেতনভোগ করেন। শত্রুপ্রেরিত উভয়বেতনভোগী চরগণের বিষয়ে তিনি সর্বদাই অবগত থাকবেন এবং তাদের শৌচসম্বন্ধে তিনি তাঁর উভয়বেতনভোগী চরের দ্বারাই অবগত হবেন এবং নিজের উভয়বেতনভোগী চরদের শুদ্ধিও বিজিগীষু রাজা গোপনে তাঁর উভয়বেতনভোগী চরের মাধ্যমে জানবেন। এইভাবে পুনরায় রাজা পুত্র-স্ত্রী প্রভৃতির কাছ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য নিজেকে প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর শয্যা থেকে উত্থিত হয়ে ধনুষ্পাণি স্ত্রীগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হবেন; দ্বিতীয় কক্ষতে রাজা কুর্তা ও পাগড়ী পরিহিত হয়ে ষণ্ড বা নপুংসক ও রাজার গৃহকার্যে নিযুক্ত ভৃত্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হবেন এবং তৃতীয় কক্ষে রাজা প্রবেশ করলে কুব্জ, বামন ও কিরাত জাতীয় লোকদের দ্বারা সমাদৃত হবেন। এবিষয়ে *অর্থশাস্ত্রে* বিধান রয়েছে— "শয়নাদুত্থিত স্ত্রীগর্ণৈর্ধন্বিভিঃ পরিগৃহ্যেত, দ্বিতীয়স্যাং কক্ষ্যায়াং কঞ্চু-কোষ্ণীষিভির্বর্ষবরাভাগ্যারিকৈঃ, তৃতীয়স্যাং কুব্জ-বামন-কিরাতৈঃ"।[২৩]

৪.১.৯. অপরাধী বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রতি বিজিগীষু রাজা কর্তৃক শারীরিক দণ্ডবিধি : স্বায়ম্ভূব মনু শারীরিক দণ্ড দেওয়ার জন্য ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের দশটি স্থান নির্দেশ করেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণকে শারীরিক কোনরূপ দণ্ড বিধান না করে শুধুমাত্র অক্ষত শরীরে দেশ থেকে নির্বাসিত করেন। মানুষের উপস্থ অর্থাৎ স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয়, উদর, জিহ্বা, হাত, পা, চোখ, নাক, কাণ, ধনসম্পত্তি এবং দেহ প্রভৃতি এই দশটি দণ্ডস্থান। যে মানুষ, যে অঙ্গের দ্বারা অপরাধ করে, তার সেই অঙ্গেই পীড়া দিতে হয়। যেমন, কেউ যদি পরনারীর সাথে জোরপূর্বক সঙ্গম করে তবে তার জননেন্দ্রিয়ে শাস্তির বিধান রয়েছে। চুরি করার অপরাধে উদরের শাস্তি অর্থাৎ আহার বন্ধ প্রভৃতি। এছাড়া যেকোন ব্যক্তির প্রতি অকারণে কেউ বাকপারুষ্য বা গালাগালি এবং দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ মারামারির অপরাধে যথাক্রমে জিহ্বা ও হাতের উপর দণ্ডের বিধান রয়েছে। পদাঘাতের অপরাধে

দুই পায়ের উপর দণ্ড শাস্ত্রে বিধানসম্মত। রাজপত্নী প্রভৃতিকে অভদ্রভাবে কোন ব্যক্তি দেখলে শাস্ত্রে চোখের উপর দণ্ড বিধান রয়েছে। পরনারীর অনুলেপনের গন্ধগ্রহণ করলে নাকের উপর দণ্ড বিধিসম্মত। রাজার গোপন মন্ত্রণা লুকিয়ে শুনলে কানের উপর দণ্ড শাস্ত্রে ধার্য রয়েছে। বিশেষ কোনও অপরাধের শাস্তিস্বরূপ ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল ধনের উপর দণ্ড এবং মহাপাতকী ব্যক্তিকে হত্যা করলে শরীরের উপর দণ্ড শাস্ত্রসম্মত বিধান রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ *মনুসংহিতায়* দশটি দণ্ডস্থান বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে—

> উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমম্।
> চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তথৈব চ।।[২৪]

কিন্তু যদি স্ত্রীলোক, বালক, উন্মত্ত, বৃদ্ধ এবং বিকৃতেন্দ্রিয় রোগীগণ কোনরূপ অপরাধ করেন, তবে এইসকল ব্যক্তিগণের প্রতি বিজিগীষু রাজা ধনদণ্ড প্রদান না করে, শিফা অর্থাৎ চাবুকের আঘাত, বিদল অর্থাৎ বাঁশের কঞ্চি দিয়ে অথবা রজ্জু দিয়ে বন্ধনাদির দ্বারা শাস্ত্রসম্মত দণ্ডবিধানের নির্দেশ রয়েছে। এবিষয়ে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> স্ত্রীবালোন্মত্তবৃদ্ধানাং দরিদ্রাণাঞ্চ রোগিণাম্।
> শিফাবিদলরজ্জ্বাদ্যৈর্বিদধ্যান্নৃপতির্দমম্।।[২৫]

৪.১.১০. বিকলাঙ্গ ব্যক্তির প্রতি অস্ত্রবিদ্যাসংক্রান্ত বিধি : যে যোদ্ধার অস্ত্রসম্বন্ধীয় বিপদ উপস্থিত হয় অর্থাৎ যার অস্ত্র-শস্ত্রাদি ভেঙে গিয়েছে অথবা অস্ত্রাভাবাদিবশতঃ যে যোদ্ধা বিপন্ন, যে ব্যক্তি হতপুত্রাদির শোকে কাতর, যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, যে যোদ্ধা যুদ্ধ করতে ভয় পায় এবং যে যুদ্ধ পরাঙ্মুখ এমন সকল ব্যক্তিকে অর্থাৎ শত্রুকে অস্ত্রাঘাত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ রয়েছে। এবিষয়ে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> নায়ুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্তং নাতিপরিক্ষতম্।
> ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্মমনুস্মরন্।।[২৬]

৪.১.১১. উপার্জনে অক্ষম বিকলাঙ্গ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকতে সাংসারিক দায়িত্বরক্ষণে কনিষ্ঠ ভ্রাতার কর্তব্য সম্পর্কিত বিধান : *পরাশরসংহিতায়* বিধান রয়েছে যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জ, বামন, ক্লীব, গদগদ, জড়, জন্মান্ধ, বধির ও মূক হলে কনিষ্ঠের বিবাহ শাস্ত্রে দূষণীয় নয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি

পিতৃব্যপুত্র হয়, বৈমাত্রেয় হয় বা পিতার ঔরসে পরস্ত্রীগর্ভজাত সন্তান হয়, তাহলে কনিষ্ঠ ভ্রাতার দারপরিগ্রহ ও অগ্নিহোত্রক্রিয়া দোষাবহ নয়। কিন্তু যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান থেকে স্বয়ং বিবাহ করতে অনিচ্ছুক থাকেন, তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি নিয়ে কনিষ্ঠ বিবাহ করবেন। প্রসঙ্গতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা কনিষ্ঠের বিবাহ বিষয়ে শাস্ত্রসম্মত উল্লেখ রয়েছে–

> কুব্জবামনষণ্ঢেষু গদেগদষু জড়েষু চ।
> জাতান্ধে বধিরে মূকে ন দোষঃ পরিবেদনে।।[২৭]

কিন্তু যদি কোন পাত্রের সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে আছে, তবে তার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে চাইলে, তবে ঐ ভাবী পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মৃত্যু প্রাপ্ত হন, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বা পতিত হয়, তবে এই পঞ্চ প্রকার আপদে উক্ত কন্যার পাত্রান্তরে প্রদান শাস্ত্র বিহিত। এবিষয়ে *পরাশরসংহিতায়* উক্ত হয়েছে–

> পিতৃব্যপুত্রঃ সাপত্ন্যঃ পরনারীসুতস্তথা।
> দায়াগ্নিহোত্রসংযোগে ন দোষঃ পরিবেদনে।।[২৮]

বিকলাঙ্গ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা কনিষ্ঠের বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিষয়ে Manmatha Nath Dutt সম্পাদিত *Parāśarasmṛti* গ্রন্থে বলা হয়েছে– "A younger brother commits no sin by marrying before the marriage of his elder brother, if the latter happens to be a hunch-back, eunuch, or idiot, or is born deaf of blind. A younger brother commits no sin by marrying before the marriage of an elder brother, if the latter happens to be a son of his father's elder brother, or a step-brother, or a brother begot by his father on another man's wife".[২৯]

পুনরায় উপর্যুক্ত বিষয়সম্বন্ধে *অত্রিসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি কুব্জ, বামন, খঞ্জ, জনসমাজে নিন্দিত, বেদাধ্যয়নে অসমর্থ, জন্মান্ধ, জন্মবধির বা মূক হয় সেক্ষেত্রে কনিষ্ঠের বিবাহে কোনরূপ দোষ হয় না। এছাড়াও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্লীব, দেশান্তরস্থ, পতিত, সন্ন্যাসী, যোগশাস্ত্ররত, যোগাভ্যাস করার দৃঢ় ইচ্ছায় যদি বিবাহে অনিচ্ছুক হন, সেক্ষেত্রেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পূর্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহে কোনরূপ দোষ হয় না। এবিষয়ে *অত্রিসংহিতায়* বলা হয়েছে–

কুব্জবামনখঞ্জেষু গর্হিতেহথ জড়েষু চ।
জাত্যন্ধবধিরে মূকে ন দোষঃ পরিবেদনে।।
ক্লীবেদেশান্তরস্থে চ পতিতে ব্রজিতেহপি বা।
যোগশাস্ত্রাভিযুক্তে চ ন দোষঃ পরিবেদনে।।[৩০]

এছাড়াও *কাত্যায়ন সংহিতাতেও* বলা হয়েছে যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদি দেশান্তরস্থ, ক্লীব, একবৃষণ বা পুংজননকোষ, অত্যন্ত গণিকা আসক্ত, পতিত, শূদ্রধর্ম্মী, মহারোগী, জড়, মূক, অন্ধ, বধির, কুব্জ, বামন, কুষ্ঠ, অতিবৃদ্ধ, মৃতভার্য্য, কৃষিকার্যে আসক্ত, রাজসেবক, ধনবৃদ্ধি প্রসক্ত, যথেচ্ছাচারী, কুলত্যাগী, উন্মত্ত কিংবা চৌর হলে অথবা উক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহোদর না হলেও সেক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা কনিষ্ঠ ভ্রাতার পূর্বে বিবাহ শাস্ত্রসম্মত অধিকারী হন। প্রসঙ্গতঃ *কাত্যায়ন সংহিতার* ষষ্ঠ খণ্ডে বলা হয়েছে—

দেশান্তরস্থক্লীবৈকবৃষণানসহোদরান্।
বেশ্যাভিসক্তপতিতশূদ্রতূল্যাতিরোগিণঃ।।
জড়মূকান্ধ-বধির-কুব্জ-বামন-কুণ্ঠকান্।
অতিবৃদ্ধানভার্য্যাংশ্চ কৃষিসক্তান্ নৃপস্য চ।।
ধনবৃদ্ধি প্রসক্তাংশ্চ কামতঃ কারিণস্তথা।
কুলটোন্মত্তগৌরাংশ্চ পরিবিন্দন ন দুষ্যতি।।[৩১]

৪.২. <u>বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের অধিকার সুরক্ষায় ভারতীয় সংবিধানের বিধানসমূহ</u> : জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক কোনও সংস্থা একটি সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে। সংবিধান বিবেচনা ও গ্রহণের জন্য যেসব নির্বাচিত সংস্থা গৃহীত হয়, তাকে গণপরিষদ বলে। ভারতে জাতীয় আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গণপরিষদ গঠনের বিষয়টি যুক্ত হয়েছিল। যখন যেকোন দেশের গণপরিষদ গঠনের ভাবনা গৃহীত হয়েছে, সেখানে ভারতীয়রা নিজেরাই নিজেদের সংবিধান নির্মাণের জন্য **১৯১৯** সালে আইনের বিরোধিতার মধ্যে অন্তর্নিহিত হয়েছিলেন। **১৯১৯** সালে শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের উদ্যোগে সিমলায় কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে একটি যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধান রচনার জন্য একটি সম্মেলন ডাকার সিদ্ধান্ত উক্ত সভায় অনুষ্ঠিত হয়। **১৯২৩** সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা পুনরায় একই উদ্দেশ্যে দিল্লিতে এক সম্মেলনে মিলিত হন। এই

সম্মেলন ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বশাসিত উপনিবেশ গণ্য করে সংবিধানের আবশ্যিক উপাদানগুলির একটি রূপরেখা তৈরি করে। স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রুর সভাপতিত্বে ২৪শে এপ্রিল দিল্লিতে একটি ‘জাতীয় সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ‘কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিয়া’ বিলের খসড়া তৈরি হয়। সামান্য সংশোধিত আকারে এটি ১৯২৫ সালের জানুয়ারিতে দিল্লির সর্বদলীয় সম্মেলনের কমিটির কাছে পেশ করা হয়। এই সভায় মহাত্মা গান্ধী সভাপতিত্ব করেন। এরপর একটি খসড়া কমিটি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে ও বিলটি প্রকাশ করে। বিভিন্ন দলের ৪৩ জন নেতার সাক্ষর সম্বলিত একটি স্মারকলিপি সহ এই বিল ব্রিটেনের শ্রমিক দলের জনৈক প্রভাবশালীর সদস্যের কাছে পাঠানো হয়। শ্রমিক দলে এই বিল বিপুল সমর্থন লাভ করে এবং সামান্য পরিবর্তন সহ বিলটি গৃহীত হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হাউস অফ কমন্স এ বিলটির প্রথম পাঠ করা হয়। কিন্তু শ্রমিক সরকারের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলটি ঠাণ্ডা ঘরে চলে যায়। তবে শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক উপায়ে ভারতে একটি সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার এটি ছিল একটি বৃহৎ প্রচেষ্টা।[৩২]

পুনরায় ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর নির্ধারিত দিনে গণপরিষদের সভা শুরু হয়। কয়েকদিন অধিবেশন চলার পর ১৩ই ডিসেম্বর পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ঐতিহাসিক লক্ষ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সুন্দর সুন্দর শব্দে রচিত এই খসড়াকে ভবিষ্যতের সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক মুখবন্ধ বলা যায়। উক্ত প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক কাঠামো, অবশিষ্ট ক্ষমতা স্বশাসিত সংস্থার হাতে অর্পণ এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ও আইনের চোখে সমতা, চিন্তা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম, উপাসনা, সংঘবদ্ধ হওয়া ও কাজ করার স্বাধীনতা প্রভৃতি সকলের জন্য নিশ্চিত করা এবং সংখ্যালঘু, পিছিয়ে পড়া শোষিত শ্রেণী, আদিবাসী ও উপজাতিদের যথেষ্ট রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়। এইভাবেই গণপরিষদকে এই প্রস্তাব দিয়ে পথ নির্দেশকারী নীতি ও দর্শন, যা তাদের সংবিধান তৈরির কাজে নিযুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালের ২২ জানুয়ারী এই প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।[৩৩]

সংবিধান তৈরির বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য গণপরিষদ বেশ কয়েকটি কমিটি গঠন করেন। যেমন কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটি, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বিষয়ক কমিটি, মৌলিক অধিকার

সংক্রান্ত কমিটি, সংখ্যালঘু কমিটি প্রভৃতি। সংবিধানের প্রথম খসড়া ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে তৈরি করেন পরিষদ অফিসের উপদেষ্টা শাখা। এই খসড়া প্রস্তুতির পূর্বে ব্যাপক পরিমাণে কাগজ-পত্র সংগৃহীত হয় এবং গণপরিষদের সদস্যদের কাছে 'সংবিধান নজির' নামে তিন সিরিজে পাঠানো হয়, যার মধ্যে ছিল প্রায় ৮০টি দেশের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি। ১৯৪৭ সালের ২৮ আগষ্ট গণপরিষদ ডঃ বি. আর. আম্বেদকরকে খসড়া কমিটির সভাপতির দায়িত্ব এবং সভার সিদ্ধান্তানুসারে সাংবিধানিক উপদেষ্টা কর্তৃক প্রণীত ভারতের সংবিধানকে খতিয়ে দেখার দায়িত্ব প্রদান করে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের রূপকার হলেন বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর। খসড়া কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত ভারতের সংবিধানের খসড়া ১৯৪৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী গণপরিষদের সভাপতির কাছে পেশ করা হয়। বহু প্রস্তাব, মন্তব্য, সমালোচনা এবং সুপারিশ সংশোধনের জন্য গৃহীত হয় ও খসড়া কমিটিতে বিবেচিত হয়। ১৯৪৮ সালের ১৫ নভেম্বর থেকে ১৯৪৯ সালের ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত গণপরিষদ খসড়া সংবিধানের প্রতিটি ধারা ধরে আলোচিত হয়। সবশেষে গৃহীত হয় প্রস্তাবনার অংশটি। এরপর খসড়া কমিটি আনুষঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় সংশোধনগুলি পাশ করার চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করেন এবং তা গণপরিষদে পেশ করেন।[৩৪]

সংবিধানের দ্বিতীয় পাঠ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর মাসে শেষ হয়। উক্ত দিনেই ভারতের জনগণ গণপরিষদে গৃহীত আইনানুগ সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে সংবিধান নিজেদেরকে উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী যে দিন থেকে সংবিধান কার্যকর হয়, সেদিন থেকেই এর কাজের ধারা প্রসারিত হয় বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে। সংবিধান তৈরি করা ছাড়াও গণপরিষদ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল। যেমন জাতীয় পতাকা গ্রহণ করা, জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ করা, কমনওয়েলথের সদস্য পদ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা, কয়েকটি অপরিহার্য সংবিধি গ্রহণ করা এবং সর্বোপরি প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।[৩৫]

সকল মানুষের সুষ্ঠ, স্বাধীন এবং সুশৃঙ্খলভাবে জীবন পরিচালনার জন্য সংবিধানের মাধ্যমে যে নিয়ম-কানুন তৈরি এবং প্রয়োগ করা হয়, তাকে আইন বলে। আইনের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Law, যা ফারসি শব্দ Lag নামক থেকে উদ্ভূত। Lag এর আভিধানিক অর্থ স্থির, অপরিবর্তনীয় এবং যা সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য।[৩৬] ভারতের সংবিধান হল বিশ্বের দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান,

যাতে ৪৭০ টি অনুচ্ছেদ, ১২টি তফসিল, ১০৫টি সংশোধনী এবং ১১৭,৩৬৯টি শব্দ রয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় আইন ব্যবস্থায় প্রায় ১২৪৮টি আইন রয়েছে। যদিও ভারতের আইন প্রণয়ণ ব্যবস্থা ভারতের সকল আইনকে চারটি প্রধান প্রকারে সরলীকৃত ও শ্রেণীবদ্ধ করেছে। সেগুলি হল– সংবিধিবদ্ধ আইন, ফৌজদারি আইন, দেওয়ানী আইন ও সাধারণ আইন।[৩৭] এই সকল প্রকার আইনের ন্যায় বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের সকল সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের ন্যায় সমাজে সমতা রক্ষার জন্য আমাদের দেশীয় সংবিধান কিছু বিশেষ বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছেন। RPWD (Right of Persons with Disability Act) ২০১৬ হল একটি প্রতিবন্ধী আইন, যা ভারতবর্ষের পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য। জাতিসংঘের অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন কর্তৃক আইনটি ২০০৭ সালে অনুমোদিত হয়। আইনটি প্রথম ১৯৯৫ সালে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের সাধারণ মানুষের ন্যায় সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা এবং সমাজে পূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের অধিকার বিল ২০১৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী সংসদে পেশ করা হয় এবং ২০১৬ সালের ১৪ই ডিসেম্বর লোকসভা দ্বারা বিলটি পাশ হয়। ২০১৬ সালের ২৭শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির সম্মতিতে বিলটি আইনরূপে সম্মতি প্রাপ্ত হয়। প্রতিবন্ধী বা বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের সাংবিধানিক প্রধান প্রধান আইন ক্রমানুসারে নিম্নে আলোচিত হল :

- RPWD (Right of Persons with Disability) ২০১৬ আইনের ৩(১) নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্য সরকারের প্রতিবন্ধী বা বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের সমাজ জীবনে সকল সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় অধিকারের হেতু প্রয়োজনীয় সমতা, মর্যদা ও সম্মানের সাথে বাঁচার অধিকার রয়েছে।[৩৮]

- পুনরায় ভারতীয় সংবিধানের ৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, উপযুক্ত সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নারী ও শিশু প্রতিবন্ধিদের নিশ্চিত করার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং অন্যান্য সকল সুস্থ-স্বাভাবিক ব্যক্তিগণের ন্যায় তারা সমাজে সমানভাবে অধিকার ভোগের সুবিধা পাবেন। উক্ত ধারায় আরও বলা হয়েছে যে, প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বাধীনভাবে সমাজে মতামত প্রকাশ করারও অধিকার রয়েছে। তাদের অক্ষমতার বয়স বিবেচনা করে সহায়তার সকল বিষয় অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য দৈনন্দিন সামগ্রী প্রদানের নিয়ম রয়েছে।[৩৯]

- এছাড়াও অক্ষমতা আইনের ৫ (২) ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রাদেশিক সরকার বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রতি বাসস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যাতে সমাজের কোন অংশে অক্ষম ব্যক্তিরা জোরপূর্বক বসবাস না করেন, তা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের জীবনযাপনে সহায়তার জন্য সেই প্রদেশের সরকার বয়স ও লিঙ্গ অনুযায়ী আবাসিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়িক পরিষেবা প্রদানে অবশ্যই ব্রতী হবেন।[৪০]

- পুনরায় অক্ষমতা আইনের ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী বলা হয়েছে যে, কোন বিকলাঙ্গ ব্যক্তি সমাজে কোনরূপ নির্যাতিত, নিষ্ঠুর, অমানবিক অবমাননাকর আচরণের স্বীকার হলে, সেই ব্যক্তি কোনরূপ গবেষণার বিষয় হবেন না এবং সেই ব্যক্তিকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদেশের সরকারের উপর বজায় থাকবে।[৪১]

- এছাড়াও বিকলাঙ্গ আইনের ৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, অক্ষম ব্যক্তি যদি কোনরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হন, সেক্ষেত্রে দ্রুততার সহিত প্রদেশের সরকার তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করবেন।[৪২]

- পুনরায় RPWD (Right of Persons with Disability) ২০১৬ আইনের ১০ নম্বর ধারা অনুযায়ী বলা হয়েছে যে, সকল বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রতি সরকার বিনামূল্যে সর্বদাই চিকিৎসা প্রদান করবেন। কোন বিকলাঙ্গ ব্যক্তি যদি তার পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে উক্ত পরিবারের চিকিৎসা প্রাদেশিক সরকার বিনামূল্যে প্রদান করবেন।[৪৩]

- এছাড়াও অক্ষমতা আইনের ১১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, জাতীয় নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনগুলি নির্বাচনের সময় নিশ্চিত করবে যে, সকল ভোটকেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি নির্বাচন প্রক্রিয়াজাত সকল বিষয় তাদের কাছে সহজেই যাতে বোধগম্য হয় এবং তাদেরকে ভোটকেন্দ্রে যাবতীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করা যায়, তারও সুব্যবস্থা করবেন।[৪৪]

- পুনরায় অক্ষমতা আইনের ১২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেকোন আদালত বা বিচারবিভাগীয় তদন্তে কোনরূপ বৈষম্য ব্যতীতই সর্বদা উপস্থিত হতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তাদের প্রতি সমর্থন জানানোর জন্য সরকার যথাসাধ্য আইনানুগ ব্যবস্থা করবেন।[৪৫]

- ভারতীয় আইনের ধারা ১৩ নম্বরে বলা হয়েছে যে, নির্বাচিত সরকার নিশ্চিত করবে যে, বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা সমান ভিত্তিতে সমান আইনি অধিকার ভোগ করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্য সকল স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের ন্যায় সমস্বীকৃতি পাওয়ার অধিকারী হবেন।[৪৬]

- পুনরায় RPWD (Right of Persons with Disability) ২০১৬ আইনের ১৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক সরকারকে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে তাদের অন্তর্ভুক্তি শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তাদের শিক্ষাঙ্গন হবে এইরূপ, **ক.** বৈষম্য ছাড়াই প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি নিতে হবে। **খ.** যথাসাধ্য প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা এবং বিদ্যালয়ে অন্যান্য স্বাভাবিক পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সমানভাবে শিক্ষার কার্যকলাপ সহজলভ্য করা। যেমন- বিল্ডিং, ক্যাম্পাসে প্রতিবন্ধী শিশুরা সহযেই যাতে যাতায়াত ও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা এবং প্রত্যেক শিক্ষাক্ষেত্রে শারীরিক অক্ষমদের জন্য শৌচালয় নির্মাণ করা। **গ.** ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যালয়ে পাঠরত প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি শিক্ষকদের বিশেষ নজর দেওয়া আবশ্যক। **ঘ.** অন্ধ বা বধির শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য ব্রেইল ও রেকোর্ডারের ব্যবস্থা করতে হবে।[৪৭]

- এছাড়াও *Disability Rights (Rights of Persons with Disabilities Act & National Trust Act) and Mental Healthcare Act* অনুযায়ী ২৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে– "**Section 29** requires the appropriate government and local authorities to provide sponsorships to artists and writers with disability, establish a disability history museum, which chronicles and interprets their historical experiences, make art accessible, promote recreation centres and other associated activities, redesign courses in cultural and arts subjects to enable participation and facilitate participation in scouting, dancing, art classes, outdoor camps and adventure activities. **Section 29** also requires the development of technology, assistive devices and equipment to facilitate access and inclusion for persons with disabilities in recreational activities and also ensuring that persons with hearing impairment can access television programmers with sign language interpretation or sub-titles".[৪৮]

• পুনরায় RPWD (Right of Persons with Disability) ২০১৬ আইনের ৩১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, পিছিয়ে পড়া প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য তাঁর বাড়ির নিকটস্থ বা তার পছন্দের যেকোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার রয়েছে। এছাড়াও ধারা ৩২ নম্বর অনুযায়ী বিকলাঙ্গ ছাত্র-ছাত্রীরা যেকোন সরকারী বা বেসরকারী উচ্চপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য মোট আসনের ৫% আসন সংরক্ষিত এবং ভর্তির জন্য ৫ বছর বয়সের শিথিলতার আইন রয়েছে। এবিষয়ে *Disability Rights (Rights of Persons with Disabilities Act & National Trust Act) and Mental Healthcare Act* এ বলা হয়েছে– "Section 31 of the Act states that notwithstanding anything contained in the Rights of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, every child with benchmark disability between the ages of 6 to 18 years shall have the right to free education in a neighbourhood school, or a special school, of his choice. Further, Section 32 requires all government institutions of higher education and other higher education institutions receiving aid from the government to reserve not less than 5% seats for persons with benchmark disabilities and to give an upper age relaxation of five years for admission".[৪৯]

• এছাড়াও প্রতিবন্ধী আইনের ৩৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকারকে প্রত্যেক কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে মোট আসনের ৪% বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের জন্য অবশ্যই ধার্য করতে হবে। এই ৪% মোট আসনের প্রতিটি বিকলাঙ্গ গোষ্ঠীর জন্য সরকার আলাদা আলাদা শূন্যপদ পূরণ করবেন। যেমন– ৩৪ (a) ধারায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের জন্য ১%, ৩৪ (b) ধারা অনুযায়ী শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ১%, ৩৪ (c) ধারা অনুযায়ী অস্থিগত বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের জন্য ১% এবং ৩৪ (d & e) ধারা অনুযায়ী বুদ্ধিদীপ্ত বা মানসিক এবং বহু প্রতিবন্ধিদের জন্য ১% আসন ভারতে কর্মী নিয়োগের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ *Disability Rights (Rights of Persons with Disabilities Act & National Trust Act) and Mental Healthcare Act* এ Percentage of reservation provided to persons with benchmark disabilities in government employment distributed বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে– "**Section 34** requires every appropriate government to appoint in every government establishment not less than 4% of the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts meant to be filled with persons with benchmark disabilities of which, 1% each shall be reserved for persons with benchmark disabilities under clauses (a),

(b) and (c) and 1% for persons with benchmark disabilities under clauses(d) and (e), namely

(a) Blindness and low vision;

(b) Deaf and hard of hearing;

(c) Locomotor disability, including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

(d) Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness;

(e) Multiple disabilities from amongst persons under clauses (*a*) to (*d*) including deaf-blindness in the posts identified for each disability".[৫০]

- ভারতীয় সাংবিধানিক ৩৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, সরকারী ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী কর্মীনিয়োগের ন্যায় বেসরকারী ক্ষেত্রেও ৫% বিকলাঙ্গ কর্মচারীদের কর্মশক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করতে হবে।[৫১]

- পুনরায় ভারতীয় সাংবিধানিক আইন ৩৮ নম্বর ধারায় যেকোন অক্ষম ব্যক্তির যদি কখনো উচ্চ সমর্থন বা কোন সংস্থার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে সরকারী তরফে সেই অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতির সঙ্গে উচ্চ সমর্থনের বিধান রয়েছে।[৫২]

- পুনরায় ভারতীয় আইন ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৫ ও ৪৬ নম্বর ধারায় প্রত্যেক বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী সকল লোকস্থানে নবনির্মিত আলাদা ভবন ও শৌচালয় করার উপযুক্ত ঘর নির্মাণের বিধান রয়েছে। লোকস্থানগুলি হল যথাক্রমে, সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, রেলওয়ে স্টেশন, বাসস্টপ, সকল সরকারী ও বেসরকারী ভবন ইত্যাদি। এছাড়াও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের সর্বদা যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রতিটি পরিবহনের স্থানে তাদের জন্য আলাদা বসার স্থান ও যাতায়াতের জন্য নির্দিষ্ট শুল্কের ৫০% ছাড় দেওয়ার নিয়ম রয়েছে।[৫৩]

- এছাড়াও সকল প্রতিবন্ধী কর্মীরা যদি সরকারী কর কাঠামোর আওতায় পড়ে, তবে ভারতীয় আইনের ৮০DD ধারা অনুযায়ী ৪০%-৭৯% শারীরিক বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের ভারতীয় মুদ্রায় ৭৫০০০ টাকা এবং ৮০% উপরে শারীরিক বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের ১২৫০০০ টাকার কর ছাড়ের সুবিধা রয়েছে।[৫৪]

- পুনরায় RPWD (Right of Persons with Disability) ২০১৬ আইনের ৮৪ ও ৮৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী ঘরে ও বাইরে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিরা যাতে কোনরূপ শোষণ, হিংসা, নির্যাতন এবং কোনরূপ লিঙ্গ-বৈষম্যের শিকার না হয়, রাষ্ট্র সেই কারণে আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষা সংক্রান্ত এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোনরূপ শোষণ, হিংসা এবং নির্যাতনের ঘটনা যাতে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে না হয়, রাষ্ট্র সেই ব্যবস্থা সর্বদা গ্রহণ করবে এবং স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি অক্ষম ব্যক্তিদের সুযোগ সুবিধা সঠিক ভাবে প্রদান হচ্ছে কিনা? সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখার বিধান সংবিধানে রয়েছে। এছাড়াও শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং মানসিক উপশম, পুনর্বাসন এবং সামাজিক পূর্ণসমন্বয় অক্ষম ব্যক্তিরা যদি কোন শোষণ, হিংসা বা নির্যাতনের শিকার হন তবে উপযুক্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তাদের নিরাপত্তা প্রদানে। এই পুনর্বাসন এবং পূর্ণসমন্বয় হওয়া উচিত এমন স্থানে, যেখানকার পরিবেশ স্বাস্থ্য, সমাজসেবা, আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা এবং স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রাখার সাংবিধানিক সুবিধা রয়েছে।[৫৫]

৪.৩. <u>বিকৃতেন্দ্রিয়ত্বের অন্তরালে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বান্বেষণ ও এবিষয়ে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি</u> :

মানুষের জীবৎকালের নাম আয়ু। অক্ষুণ্নরূপে দীর্ঘ আয়ু লাভ করবার উপায় যে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, তার নাম *আয়ুর্বেদ*। বিদ্ ধাতুর অর্থ হল জ্ঞান, আয়ু সম্বন্ধীয় জ্ঞান যে শাস্ত্রের দ্বারা লাভ করা যায়, তাকে আয়ুর্বেদ বলে। *চরকসংহিতায় আয়ুর্বেদের* লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধোর্নিদানং শমনং তথা।
> বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্বেদ উচ্যতে।।[৫৬]

অর্থাৎ আয়ুর হিত-অহিত এবং রোগের কারণ ও প্রশমনের উপায় যে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাকেই *আয়ুর্বেদ* বলা হয়।

যেরূপ নিয়মে আহার-বিহারাদি কার্য করলে মানুষ সুস্থ-স্বাভাবিক শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকতে পারে এবং যেরূপ চিকিৎসার দ্বারা ব্যাধিত বা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি চিরতরে রোগমুক্ত হতে পারে, *আয়ুর্বেদে* তা বিশদরূপে বর্ণিত হয়েছে। উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত আয়ুর্বেদ আমাদের নিত্য ও নিতান্ত প্রয়োজন। *অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ধর্ম-অর্থ ও সুখ লাভের উপায় স্বরূপ যিনি পরমায়ু কামনা করেন, তাঁর সেইভাবেই আয়ুর্বেদের উপদেশগুলি যত্নপূর্বক অবশ্যই পালন

করা উচিত। সুতরাং এক কথায় বললে, মানুষের মঙ্গলকর সমস্ত শাস্ত্রেরই মূলসূত্র আয়ুর্বেদে সন্নিবেশিত রয়েছে। প্রসঙ্গানুযায়ী *অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্* গ্রন্থে বলা হয়েছে—

> আয়ুঃ কামরমানেন ধর্ম্মার্থসুখসাধনম্।
> আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ।।[৫৭]

৪.৩.১. <u>প্রাচীন ভারতবর্ষে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের প্রতি বিবিধ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাপদ্ধতি</u> : প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের বেদজ্ঞ ঋষিগণ ভৈষজ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। *অথর্ববেদ* তার অন্যতম জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই *অথর্ববেদ* থেকেই ধন্বন্তরির দ্বারা আয়ুর্বেদের উদ্ভব ঘটেছিল। পরবর্তী সময়ে মহর্ষি আত্রেয়, ভরদ্বাজ, অগ্নিবেশ, চরক, সুশ্রুত ও বাগভট্ট প্রভৃতি ঋষিগণ আয়ুর্বেদীয় অধ্যাপকরূপে কয়েকখানি চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণয়ন করে জীবকূলের বিবিধ রোগের উল্লেখ, রোগের কারণ ও উপশমের দিকনির্দেশ করেছেন। প্রত্যেক মানুষের শরীরে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে বিবিধ রোগের সৃষ্টি হয় এবং সেই সকল রোগ নিবারণের পদ্ধতিও শাস্ত্রে কথিত হয়েছে। মূলতঃ *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* চার প্রকার বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ রয়েছে এবং তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতির কথাও আয়ুর্বেদে বিদ্যমান। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে যেসকল ইন্দ্রিয়ের বিকলতার কথা বলা হয়েছে, সেগুলি হল—

ক. নেত্রগত বিকলতা।

খ. শ্রবণহীন বিকলতা।

গ. অস্থিগত বিকলতা।

ঘ. মানসিক বিকলতা।

উপর্যুক্ত বিকলতার প্রতি ভেষজ আয়ুর্বেদিক পদ্ধতির দ্বারা যেসকল চিকিৎসা পদ্ধতির কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে তা ক্রমানুসারে নিম্নে আলোচিত হল—

ক. আয়ুর্বেদে উল্লিখিত বিবিধ চক্ষুবিষয়ক রোগসমূহ : মানুষের চক্ষুতে পাঁচটি মণ্ডল, ছয়টি সন্ধি ও ছয়টি পটল রয়েছে। পাঁচটি মণ্ডল হল, পক্ষ্মমণ্ডল (চক্ষুর উপর ও নীচের পাতার অন্তঃস্থিত যে রোমসমূহ দ্বারা চক্ষু পরিবেষ্টিত থাকে), বর্ত্মমণ্ডল (চোখের পাতার নাম), শ্বেতমণ্ডল (চোখের

শ্বেতাংশের নাম), কৃষ্ণমণ্ডল (চোখের কৃষ্ণাংশের নাম), দৃষ্টিমণ্ডল (দর্শনক্রিয়া সম্পাদক মধ্যস্থিত সূক্ষ্মাংশের নাম)। সম্পূর্ণ নেত্রমণ্ডলের সর্বমধ্যস্থলে থাকে দৃষ্টিমণ্ডল, তারপরে থাকে কৃষ্ণমণ্ডল, তারপর শ্বেতমণ্ডল, তারপর বর্ত্মমণ্ডল, তারপর পক্ষ্মমণ্ডল অবস্থিত থাকে।

নেত্রমণ্ডলের ছয় প্রকার সন্ধি হল, পক্ষ্ম ও বর্ত্মের মধ্যস্থ সন্ধি, বর্ত্ম ও শুক্লমণ্ডলের মধ্যগত সন্ধি, শুক্ল ও কৃষ্ণমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী সন্ধি, কৃষ্ণ ও দৃষ্টিমণ্ডলের অন্তর্গত সন্ধি, নাসিকা সমীপস্থ চক্ষু কোণ কনীনিকাগতসন্ধি এবং চোখের অপর কোণকে অপাঙ্গগত সন্ধি বলে। এছাড়াও ছয়টি পটলের মধ্যে দুইটি পটল বর্ত্মপটল ও নয়নবুদ্বুদ। নয়নবুদ্বুদের চারটি স্তরে বিভক্ত, যথা— রসরক্তাশ্রয়ী, মাংসাশ্রয়ী, মেদঃসংশ্রিত ও অস্থিগত।

সুশ্রুতের মতে নেত্ররোগ ৭৬ প্রকার। যথা— বাতজ ১০ প্রকার, পিত্তজ ১০ প্রকার, কফজ ১৩ প্রকার, সান্নিপাতিক ২৫ প্রকার, রক্তজ ১৬ প্রকার এবং আগুন্তুজ ২ প্রকার। কিন্তু *চরকসংহিতা* অনুসারে নেত্ররোগের সংখ্যা ৭৮ প্রকারের উল্লেখ করেছেন। যথা— দৃষ্টিমণ্ডলে ১৪, কৃষ্ণাংশে ৪, শুক্লভাগে ১১, বর্ত্মতে ২১, পক্ষ্মে ২, সন্ধিতে ৯ এবং নেত্রের সর্বাংশে ১৭। কিন্তু সুশ্রুত দৃষ্টিমণ্ডলে ১২ প্রকার রোগের উল্লেখ করেছেন। অতএব দৃষ্টিমণ্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকারের নেত্ররোগের নাম এবং রোগ হওয়ার দরুণ মানুষের দৃষ্টিতে যেসকল অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তা নিম্নে উল্লিখিত হল—

- **দৃষ্টিমণ্ডলে জাত দ্বাদশপ্রকার রোগসমূহ :** নেত্রের দৃষ্টিমণ্ডলে ১২ প্রকার রোগ হয়ে থাকে। তন্মধ্যে ছয় প্রকার লিঙ্গনাশ অর্থাৎ দৃষ্টিগত তেজের নাশ হয়ে থাকে। লিঙ্গনাশ বাংলা প্রতিশব্দ হল চোখের ছানি। সুশ্রুত মতানুযায়ী দৃষ্টিমণ্ডলে বারো প্রকার রোগের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> বাতেন পিত্তেন কফেন সর্ব্বৈরক্তাৎ পরিম্লায্যভিধশ্চ ষষ্ঠৈঃ।
> তথা নরঃ পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টিঃ কফেন চান্যস্ত্বথ ধূমদর্শী।
> যো হ্রস্বজাত্যো নকুলান্ধতা চ গম্ভীরসংজ্ঞা চ তথৈব দৃষ্টিঃ।।[৫৮]

অর্থাৎ বাতিক লিঙ্গনাশ (লিঙ্গনাশরোগে বায়ুর আধিক্য থাকলে দৃষ্টিমণ্ডল অরুণবর্ণ হয়), পৈত্তিক লিঙ্গনাশ (পিত্তের আধিক্য থাকলে দৃষ্টিমণ্ডল পরিম্লায়ী বা নীলবর্ণ হয়), শ্লৈষ্মিক লিঙ্গনাশ (দৃষ্টিমণ্ডলে

কফের আধিক্য থাকলে রক্তবর্ণ), সান্নিপাতিক লিঙ্গনাশ (সর্বদোষের আধিক্য থাকলে বিচিত্রবর্ণ হয়), রক্তজ লিঙ্গনাশ (রক্তজ দৃষ্টিনাশে দৃষ্টিমণ্ডল কাঁচের ন্যায় লোহিতবর্ণ দৃষ্ট হয়), পরিম্লায়ীনামক লিঙ্গনাশ (পরিম্লায়ী রোগে দৃষ্টিমণ্ডল ম্লান ও নীল দৃষ্ট হয়) এবং পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি (দৃষ্টিমণ্ডলে দূষিত পিত্তাধিক্য থাকলে আনীল, কাংস্যবর্ণ বা পীত্তবর্ণ হয়), কফবিদগ্ধদৃষ্টি (দৃষ্টিমণ্ডলে দূষিত কফের আধিক্য থাকলে চক্ষুযুগল বহল, স্নিগ্ধ এবং শঙ্খ কুন্দ বা ইন্দুর ন্যায় ধবল হয়ে থাকে), ধূমদর্শন, হ্রস্বজাত্য, কুনলান্ধতা ও গম্ভীরসংজ্ঞক। উক্ত বারো প্রকারের রোগের ফলে যেকোন ব্যক্তির কিরূপ অসুবিধা হয়, তা নিম্নে লক্ষণ সহযোগে আলোচিত হল—

১. বাতিক লিঙ্গনাশ : এই জাতীয় দৃষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চোখে দূষিত বায়ুর আধিক্য বেশি থাকায় সেইসকল ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি যেন কলুষিত, ঈষৎ লোহিতবর্ণ ও পরস্পর মিলিত রূপ সকলের ভ্রম হয়ে থাকে। বাতিক নেত্ররোগ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> বাতেন খলু রূপাণি ভ্রমন্তীব চ পশ্যতি।
> আবিলান্যরুণাভানি ব্যাবিদ্ধানীব মানবঃ।।[৫৯]

২. পৈত্তিক লিঙ্গনাশ : এইজাতীয় রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দৃষ্টিমণ্ডল সূর্য, খদ্যোত, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুতের ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং এই জাতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি দুষ্ট পিত্তের আধিক্য হওয়ায় ময়ূরগণের নৃত্যের ন্যায় সমস্ত জগৎ নীলবর্ণের ন্যায় বোধ হয়। পৈত্তিকলিঙ্গনাশ রোগের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

> পিত্তেনাদিত্যখদ্যেতশক্রচাপতড়িদগুণান্।
> নৃত্যতশ্চৈব শিখিনঃ সর্ব্বং নীলঞ্চ পশ্যতি।।[৬০]

৩. শ্লৈষ্মিক লিঙ্গনাশ : এই জাতীয় রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সকলকে কৃশ ও শ্বেতবর্ণ রূপে বোধ করেন এবং অতি স্থূল আকৃতি ব্যক্তিদের দেখতে পায়। এই নেত্ররোগে আক্রান্ত ব্যক্তি মেঘশূন্য নির্মল আকাশের মেঘকে দর্শন করে জলপ্লাবিত ও জড়ীভূত রূপে সর্বদা বোধগম্য হয়। এই রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> কফেন পশ্যেদ্রুপাণি স্নিগ্ধানি চ সিতানি চ।
> পশ্যেদসূক্ষ্মাণ্যত্যর্থং ব্যভ্রে বৈ চাভ্রসংপ্লবম্।
> সলিলপ্লাবিতানীব পরিজাড্যানি মানবঃ।।[৬১]

৪. সান্নিপাতিক লিঙ্গনাশ : এই জাতীয় নেত্ররোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জগতে অবাস্তব বিচিত্র বর্ণ পদার্থ দৃষ্ট এবং বিপরীত দর্শন হয়। বিপরীত দর্শন এইরূপ হয়, যথা- বহুপদার্থের অসত্তাতেও বহু দর্শন, দুইটি পদার্থের অসত্তাতেও দুইটির ন্যায় দর্শন এবং জগতের চারিদিকে হীনাঙ্গ ও অধিকাঙ্গরূপ দর্শন ও সূর্যের জ্যোতি পদার্থও দৃষ্ট হয়। উক্ত রোগের উদাহরণ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> সন্নিপাতেন চিত্রাণি বিপ্লুতানীব পশ্যতি।
> বহুধা বা দ্বিধা বাপি সর্ব্বাণ্যেব সমন্ততঃ।
> হীনাধিকাঙ্গান্যথবা জ্যোতীংষ্যপি চ পশ্যতি।।[৬২]

৫. রক্তজ লিঙ্গনাশ : এইজাতীয় নেত্ররোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জগতের সবকিছু অন্ধকারস্বরূপ রক্তবর্ণ, হরিত, কৃষ্ণবর্ণ ও পীতবর্ণ বোধ হয়। উক্ত রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> পশ্যেদ্রক্তেন রক্তানি তমাংসি বিবিধানি চ।
> হরিতান্যথ কৃষ্ণানি পীতান্যপি চ মানবঃ।।[৬৩]

৬. পরিম্লায়ী নামক লিঙ্গনাশ : চক্ষুযুগলে পূর্বসঞ্চিত দূষিত পিত্ত রক্তদ্বারা বিকৃত হয়ে পরিম্লায়ী নামক নেত্ররোগ উৎপাদিত হয়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জগতের সবকিছু পীতবর্ণ রূপে দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন— সূর্য উদিত হলে জগতের সকল কিছু জোনাকি পোকা (খদ্যোত) বা অগ্নি প্রভৃতি নীলাভ তেজঃপদার্থ দ্বারা ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে এইরূপ অনুভব হয়। পরিম্লায়ী নেত্ররোগের উদাহরণ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

> রক্তেন মূর্চ্ছিতং পিত্তং পরিম্লায়িনমাচরেৎ।
> তেন পীতা দিশঃ পশ্যেদুদ্যন্তমিব ভাস্করম্।
> বিকীর্য্যমাণান্ খদ্যোতৈর্বৃক্ষাংস্তেজোভিরেব বা।।[৬৪]

৭. পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি : চক্ষুযুগলে উৎপাদিত দুষ্ট পিত্ত যদি চোখের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পটলকে আশ্রয় করে তাহলে চক্ষু পীতবর্ণ বলে সকলের বোধ হয় এবং উক্ত দুষ্ট পিত্ত যদি তৃতীয় পটলে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি দিবসে কোনরূপ বস্তু দেখতে সক্ষম হয়না। কিন্তু রাত্রিতে শৈত্য হেতু

দৃষ্টি স্নিগ্ধ ও পীত্ত হীনতেজ হওয়ায় জগতের সকল পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

> পীতানি রূপাণি চ তেন পশ্যেৎ স বৈ নরঃ পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টিঃ।
> প্রাপ্তে তৃতীয়ং পটলস্তু দোষে দিবা ন পশ্যেন্নিশি বীক্ষতে সঃ।
> রাত্রৌ স শীতানুগৃহীত দৃষ্টিঃ পিত্তাল্পভাবাৎ সকলানি পশ্যেৎ।।[৬৫]

৮. শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টি : দূষিত কফ নেত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় পটলে আশ্রয় করলে জগতের সকল পদার্থ শ্বেতবর্ণরূপে বোধগম্য হয়। কিন্তু উক্ত দূষিত কফই যদি চোখের তিনটি পটলকে আশ্রয় করে তাহলে সেই ব্যক্তির চোখে রাত্রান্ধ রোগ উপস্থিত হয়। এই জাতীয় নেত্ররোগে আক্রান্ত ব্যক্তির দিনের বেলায় সূর্যের তাপে কফ হীনশক্তি হওয়ায় জগতের সকল বস্তুসমূহ সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু রাত্রিতে কফের প্রাবল্য হেতু দর্শনক্রিয়া সম্যক্ সাধিত হয়না। প্রসঙ্গানুযায়ী উক্ত রোগের বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> ত্রিষু স্থিতো যঃ পটলেষু দোষো নক্তান্ধ্যমাপাদয়তি প্রসহ্য।
> দিবা স সূর্য্যানুগৃহীত দৃষ্টিঃ পশ্যেত্তু রূপাণি কফাল্পভাবাৎ।।[৬৬]

৯. ধূমদর্শন নেত্ররোগ : কোন ব্যক্তির যদি দীর্ঘদিন ধরে শোক, জ্বর, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও মস্তকে তাপপ্রাপ্তি ঘটার ফলে নেত্র যুগল বিকৃত হয়ে জগতের সকল বস্তু ধূমময় বলে বোধ করেন, তাহলে এই জাতীয় নেত্রপীড়াকে ধূমদর্শন বলা হয়। ধূমদর্শন নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* ব্যক্ত হয়েছে—

> শোকজরায়াসশিরোঽভিতাপৈরভ্যাহতা যস্য নরস্য দৃষ্টিঃ।
> ধূম্রাংস্তু যঃ পশ্যতি সর্ব্বভাবান্ স ধূমদর্শীতি নরঃ প্রদিষ্টঃ।।[৬৭]

১০. হ্রস্বজাত নেত্ররোগ : এই নেত্ররোগে আক্রান্ত ব্যক্তির দিনেরবেলায় যেকোন বস্তুসমূহ অতিকষ্টে দৃষ্টিগোচর হয় এবং বৃহৎ আকার সকল বস্তুকে ক্ষুদ্ররূপে বোধ হয় কিন্তু রাত্রিতে সকল বস্তু প্রকৃত দৃষ্ট হয়। হ্রস্বজাত নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

> যো বাসরে পশ্যতি কষ্টতোঽথ রূপং মহচ্চাপি নিরীক্ষতেঽল্পম্।
> রাত্রৌ পুনর্যঃ প্রকৃতানি পশ্যেৎ স হ্রস্বজাতো মুনিভিঃ প্রদিষ্টঃ।।[৬৮]

১১. কুনলান্ধতা নেত্ররোগ : উক্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টি দূষিত বায়ুর প্রকোপে নকুলের দৃষ্টির ন্যায় প্রতিভাসিত হয় এবং দিবসে সকল পদার্থ বিচিত্রবৎ দৃষ্ট হয়, এইরূপ নেত্র পীড়ার নাম নক্ত্যন্ধ্য বা নকুলান্ধ্য বা রাত্রান্ধ্য। হ্রস্বজাত ও নকুলান্ধ্য এই দুটি নেত্ররোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা দিবসে একপ্রকার দেখতে পায়, কিন্তু রাত্রিতে দর্শনশক্তি পুরোপুরি লুপ্তপ্রায় হয়। সুতরাং এই দুটি নেত্ররোগ একপ্রকার রাত্রান্ধ রোগ বলা যেতে পারে। কুনলান্ধতা বা নকুলান্ধ্য নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> বিদ্যোততে যস্য নরস্য দৃষ্টির্দোষাভিপন্না নকুলস্য যদ্বৎ।
> চিত্রাণি রূপাণি দিবা তু পশ্যেৎ স বৈ বিকারো নকুলান্ধ্যসংজ্ঞঃ।।[৬৯]

১২. গম্ভীরিকা নেত্ররোগ : এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টি দূষিত বায়ু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টিগহ্বর বিকৃত, সঙ্কুচিত, অভ্যন্তরগত ও গম্ভীরবেদনা দ্বারা ব্যাথিত হয়, এইজাতীয় নেত্ররোগকে গম্ভীরিকা বলা হয়। গম্ভীরিকা নেত্ররোগের লক্ষণ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> দৃষ্টির্বিরূপা শ্বসনোপসৃষ্টা সঙ্কুচ্যতেঽভ্যন্তরতঃ প্রয়াতি।
> রুজাবগাঢা চ তমক্ষিরোগং গম্ভীরিকেতি প্রবদন্তি ধীরাঃ।।[৭০]

▪ **নেত্রগত কৃষ্ণমণ্ডলজাত রোগসমূহ :** চক্ষুযুগলের কৃষ্ণপ্রদেশে যেসকল রোগ হয় তাকে কৃষ্ণমণ্ডলজাত নেত্ররোগ বলা হয়। এইজাতীয় রোগ চারপ্রকার হয়। যথা— সব্রণশুক্র নেত্ররোগ, অব্রণশুক্র নেত্ররোগ, অক্ষিপাকাত নেত্ররোগ এবং অজকা নেত্ররোগ। উক্ত চারপ্রকার কৃষ্ণমণ্ডলজাত নেত্ররোগ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচিত হল—

১৩. সব্রণশুক্র নেত্ররোগ : চোখের কৃষ্ণাংশে সূচীবিদ্ধবৎ গোলাকার অতিশয় ব্যথাযুক্ত ও নিমগ্ন আকারবিশিষ্ট এবং নিরন্তর উষ্ণ রসস্রাবী এক প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, তাকে সব্রণশুক্র নেত্ররোগ বলা হয়। ব্রণশুক্র যদি দৃষ্টিমণ্ডলের নিতান্ত নিকটে না হয়, দূরাবগাহী না হয় অর্থাৎ একত্বগত হয়। তা থেকে অতিশয় স্রাব নির্গত না হয় এবং অধিক বেদনা না থাকে, তাহলে তা সাধ্য হয় এবং বিপরীত হলে অসাধ্য হয়। যুগ্ম ব্রণশুক্র সর্বদা অসাধ্য হয়। সব্রণশুক্র নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> নিমগ্নরূপস্তু ভবেদ্ধি কৃষ্ণে সুচ্যেব বিদ্ধং প্রতিভাতি ষট্ বৈ।
> স্রাবং শ্রবেদুষ্ণমতীব চাপি তৎ সব্রণং শুক্রম্বুদাহরন্তি।।[৭১]

১৪. অব্রণশুক্র নেত্ররোগ : চক্ষুযুগলের কৃষ্ণমণ্ডলে সব্রণশুক্রের ন্যায় অব্রণশুক্র নেত্ররোগ উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই জাতীয় নেত্ররোগ শুভ্রবর্ণ, আকাশস্থ মেঘবৎ স্বচ্ছতাদি গুণবিশিষ্ট, অনধিক বেদনা ও অল্প অশ্রুযুক্ত হয়। এই জাতীয় নেত্র পীড়া অভিষ্যন্দ রোগের (Mucopurulent Conjunctivitis) কারণে হয়ে থাকে। অব্রণশুক্র নেত্ররোগের উদাহরণ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

> সিতং যদা ভাত্যসিতপ্রদেশে স্যন্দাত্মকং নাতিরুগশ্রুযুক্তম্।
> বিহায়সীবাভ্রদলানুকারি তদব্রণং সাধ্যতমং বদন্তি।।[৭২]

১৫. অক্ষিপাকাত নেত্ররোগ : বাত-পিত্ত-কফ এই সকল দোষত্রয় নেত্রে শ্বেতবর্ণ রূপবিশেষে পরিণত হয়ে সমস্ত কৃষ্ণমণ্ডলকে আচ্ছাদন করলে তাকে অক্ষিপাকাত নেত্ররোগ বলা হয়। এই নেত্র পীড়া অভিষ্যন্দ থেকে উৎপন্ন হয় এবং চক্ষুযুগলে অত্যন্ত বেদনা হয়। অক্ষিপাকাত নেত্ররোগের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> সংছাদ্যতে শ্বেতনিভেন সর্ব্বদোষেণ যস্যাসিতমণ্ডলস্তু।
> তমক্ষিপাকাত্যয়মক্ষিকোপ সমুত্থিতং তীব্ররুজং বদন্তি।।[৭৩]

১৬. অজকা নেত্ররোগ : শুষ্ক ছাগীবিষ্ঠার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, অতিশয় বেদনাযুক্ত, ঈষৎ লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট নেত্রমণ্ডলের কৃষ্ণভাগব্যাপী মেদঃপ্রচয়কে অজকাজাত নেত্ররোগ বলে। এইজাতীয় নেত্ররোগে সর্বদা ঘন, পিচ্ছিল ও রক্তবর্ণ অশ্রু নির্গত চোখযুগল থেকে নির্গত হয়। অজকাজাত নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> অজাপুরীষপ্রতিমো রক্তাবান্ সলোহিতো লোহিতপিচ্ছিলাস্রম্।
> বিগৃহ্য কৃষ্ণং প্রচয়োঽভ্যুপৈতি তচ্চাজকাজাতমিতি ব্যবস্যেৎ।।[৭৪]

- **নেত্রগত শুক্লমণ্ডলজাত রোগসমূহ :** চক্ষুযুগলের শুক্লভাগে যেসকল রোগ সৃষ্ট হয় তাকে শুক্লমণ্ডলজাত নেত্ররোগ বলা হয়। নেত্রের শুক্লভাগে একাদশ জাতীয় রোগ সৃষ্ট হয়। সেগুলি হল— প্রস্তারি অর্ম্ম, শুক্লার্ম্ম, রক্তার্ম্ম, অধিমাংসার্ম্ম, স্নাযর্ম্মণো, শুক্তিকা, অর্জ্জুন, পিষ্টক, শিরাজাল, শিরাপিড়কা ও বলাসগ্রথিত।

১৭. প্রস্তারি অর্ম্ম নেত্ররোগ : চোখের শুক্লাংশে শ্যাব বা রক্তবর্ণ বিস্তীর্ণ ও পাতলা পর্দারূপে উৎপন্ন রোগবিশেষকে প্রস্তারি অর্ম্ম বলে। প্রস্তারি অর্ম্ম নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

প্রস্তার্য্যর্ম্ম তনু স্তীর্ণং শ্যাবরক্তনিভং সিতে।[৭৫]

১৮. শুক্লার্ম্ম নেত্ররোগ : চোখের শুক্লাংশে শ্বেতাভ, কোমল ও দীর্ঘকালে বর্দ্ধনশীল রোগবিশেষক মাংসপর্দাকে শুক্লার্ম্ম নেত্ররোগ বলে। উক্ত নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

সশ্বেতং মৃদু শুক্লার্ম্ম শুক্লে তদ্ বর্দ্ধতে চিরাৎ।[৭৬]

১৯. রক্তার্ম্ম নেত্ররোগ : চক্ষুযুগলে অরুণ পদ্মপত্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও কোমল মাংসোচ্ছ্রয়রূপ নেত্ররোগকে রক্তার্ম্ম বলা হয়। রক্তার্ম্ম নেত্ররোগের উদাহরণ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

পদ্মাভং মৃদু রক্তার্ম্ম ষন্মাংসং চীয়তে সিতে।
পদ্মাভম্ অরুণপদ্মপত্রনিভম্ মৃদু কোমলম্।।[৭৭]

২০. অধিমাংসার্ম্ম নেত্ররোগ : চক্ষুমণ্ডলের শুক্লাংশে বিস্তীর্ণ, কোমল, স্থূল এবং যকৃতের ন্যায় ঈষদ্ কৃষ্ণমিশ্র লোহিতবর্ণ দূষিত মাংসপর্দাকে অধিমাংসার্ম্ম নেত্ররোগ বলা হয়। উক্ত রোগের লক্ষণ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* ব্যক্ত হয়েছে—

পৃথু মদ্বধিমাংসার্ম্ম বহুলঞ্চ ষকৃন্নিভম্।[৭৮]

২১. স্নার্যর্ম্মণো নেত্ররোগ : নেত্রমণ্ডলের শুক্লাংশে স্রাবরহিত, কঠিন, বিস্তীর্ণ ও বহু মাংসযুক্ত দূষিত অর্ম্মকে স্নার্যর্ম্ম বলে। প্রস্থারি নামক অর্ম্ম শুষ্ক, কঠিন ও অধিক দূষিত মাংসোচ্ছ্রয়যুক্ত হয়ে স্নার্যর্ম্মরূপে পরিণত হয়। স্নার্যর্ম্ম নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

স্থিরং প্রসারি মাংসাঢ্যং শুষ্কং স্নার্যর্ম্ম পঞ্চমম্।[৭৯]

২২. শুক্তিকা নেত্ররোগ : শ্যামবর্ণ, মাংসবর্ণ, শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট নেত্রের শুক্লমণ্ডলে উৎপন্ন বিন্দুগণকে শুক্তিকা রোগ বলে। শুক্তিকা রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

শ্যাবাঃ স্যুঃ পিশিতনিভাশ্চ বিন্দবো যে শক্ত্যাভাঃ সিতনিয়তাঃ স শুক্তিসংজ্ঞঃ।[৮০]

২৩. অর্জ্জুন নেত্ররোগ : চোখের শুক্লভাগে উৎপন্ন শশকরক্তের ন্যায় লোহিতবর্ণরূপ দূষিত একমাত্র বিন্দুরূপ বিকারকে অর্জ্জুন নেত্ররোগ বলে। অর্জ্জুন নেত্ররোগের উদাহরণ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

একো যঃ শশরুধিরোপমস্তু বিন্দুঃ শুক্লস্থো ভবতি তমর্জ্জুনং বদন্তি।[৮১]

২৪. পিষ্টক নেত্ররোগ : শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপহেতু শুক্লমণ্ডলে উৎপন্ন নেত্রদ্বয়ে পিষ্টকবৎ শুভ্রবর্ণ, গোলাকার ও স্ফীত মাংসসঞ্চয়কে পিষ্টকরোগ বলা হয়। পিষ্টক নেত্ররোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চক্ষুযুগল উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ হয়না, ঈষৎ শ্যাববর্ণ হয়। পিষ্টক নেত্ররোগের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

শ্লেষ্মমারুতকোপেন শুক্লে মাংসং সমুন্নতম্।
পিষ্টবৎ পিষ্টকং বিদ্ধি মলাক্তাদর্শসন্নিভম্।।[৮২]

২৫. শিরাজাল নেত্ররোগ : চোখের শিরাসমূহ যখন ইতস্তত অবস্থিত হয় এবং নেত্রযুগল জালের ন্যায় অরুণবর্ণ হয়ে কাঠিন্যযুক্ত হয়, এইজাতীয় নেত্ররোগকে শিরাজাল বলে। শিরাজাল নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

জালাভঃ কঠিনশিরোহরুণঃ শিরাণাং সন্তানো ভবতি শিরাদি জালসংজ্ঞঃ।[৮৩]

২৬. শিরাপিড়কা নেত্ররোগ : চক্ষুযুগলের কৃষ্ণমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী শুক্লমণ্ডল অংশে উৎপন্ন শিরাসমূহে আবৃত শুভ্রবর্ণ নেত্র পিড়কাগণকে শিরাপিড়কা বলা হয়। শিরাপিড়কা নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

শুক্লস্থাঃ সিতপিড়কাঃ শিরাবৃতা যাস্তা বিদ্যাদসিতসমীপজাঃ শিরাজাঃ।[৮৪]

২৭. বলাসগ্রথিত নেত্ররোগ : নয়নের শুভ্রাংশে কাংস্যবৎ শ্বেতবর্ণ, কঠিন এবং জলবিন্দুর ন্যায় অল্প উন্নত বিন্দুরূপ নেত্ররোগকে বলাসগ্রথিত বলে। উক্ত রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

কাংস্যাভোঽমৃদুরথ বারিবিন্দুকল্পো বিজ্ঞেয়ো নয়নসিতে বলাসসংজ্ঞঃ।[৮৫]

- **নেত্রমণ্ডলের বর্ত্মতে জাত একবিংশ রোগসমূহ :** দূষিত বায়ু পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত হয়ে বর্ত্মস্থ বা চোখের পাতায় অবস্থিত শিরাসকল কুপিত হয়ে মাংস ও দূষিত রক্তের বৃদ্ধি হওয়ায় বিবিধ বর্ত্ম রোগের সৃষ্টি হয় এবং চোখে নানারকম পীড়া দেখা দেয়। নেত্রের পাতায় উৎপন্ন রোগের সংখ্যা প্রধানতঃ ২১ প্রকার *সুশ্রুতসংহিতায়* স্বীকৃত হয়েছে। সেগুলি হল— উৎসঙ্গপিড়কা, কুম্ভিকা, পোথকী, বর্ত্মশর্করা, অর্শোবর্ত্ম, শুষ্কার্শঃ, অঞ্জননামিকা, বহলবর্ত্ম, বর্ত্মবন্ধক, ক্লিষ্টবর্ত্ম, বর্ত্মকর্দ্দম, শ্যাববর্ত্ম, প্রক্লিন্নবর্ত্ম, অক্লিন্নবর্ত্ম, বাতহতবর্ত্ম, বর্ত্মার্ব্বুদ, নিমেষ, শোণিতার্শঃ, লগণ, বিসবর্ত্ম ও কুঞ্চন। নিম্নে একবিংশ প্রকার নেত্রবর্ত্ম রোগ লক্ষণ সহযোগে আলোচিত হল—

২৮. উৎসঙ্গপিড়কা নেত্ররোগ : চোখের নিম্নপাতায় উৎপত্তিশীল পিড়কা বিশেষকে উৎসঙ্গপিড়কা বলে। এই রোগে উৎপন্ন বিন্দুর ন্যায় মুখ চক্ষুমণ্ডলের অভ্যন্তরে দিকে থাকে এবং বহির্ভাগে তাম্রবর্ণ দৃষ্ট হয়। অভ্যন্তরভাগে পুঁজ হয় এবং বিন্দুটি স্থূল ও কণ্ডূবিশিষ্ট হয়। এই নেত্ররোগ বাতজ, কফজ ও পীতজ জাতীয় ত্রিদোষের ফলে উৎপন্ন হয়। উৎসঙ্গপিড়কা নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

অভ্যন্তরমুখী তাম্রা বাহ্যতো বর্ত্মসংশ্রয়া।
সোৎসঙ্গোৎসঙ্গপিড়কা সর্ব্বজা স্থূলকণ্ডূরা।।[৮৬]

২৯. কুম্ভিকায়া নেত্ররোগ : বর্ত্মপ্রান্তে অর্থাৎ বর্ত্ম ও পক্ষ্মের সন্ধিপ্রদেশে দোষত্রয়ের প্রকোপহেতু পীড়া সমূহ উৎপন্ন হয়ে বিদীর্ণ হয়। নেত্রে দূষিত রসাদি স্রাব করে এবং পুনরায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এইপ্রকার নেত্ররোগ দেখতে কুম্ভিকা নামক লতার ফলের বীজের ন্যায়, সেইহেতু উক্ত রোগকে কুম্ভিকাখ্য রোগ বলা যায়। কুম্ভিকার ফলের বীজের আকার প্রায় দাড়িম বীজের ন্যায় হয়ে থাকে। উক্ত নেত্ররোগের উদাহরণ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

বর্ত্মান্তে পিড়কা ধ্মাতা ভিদ্যন্তে চ স্রবন্তি চ।
কুম্ভিকাবীজসদৃশাঃ কুম্ভিকাঃ সন্নিপাতজাঃ।।[৮৭]

৩০. পোথকী নেত্ররোগ : বহুস্রাবনিঃসারক, কণ্ডূবিশিষ্ট, গুরুতা সম্পন্ন, বেদনাযুক্ত, রক্তসর্ষপ আকৃতি বিশিষ্ট নেত্ররোগকে পোথকী বলে। পোথকী নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

স্রাবিণ্যঃ কণ্ডুরা গর্ব্ব্যো রক্তসর্ষপসন্নিভাঃ।
রুজাবত্যশ্চ পিড়কাঃ পোথক্য ইতি কীর্ত্তিতাঃ।।[৮৮]

৩১. বর্ত্মশর্করা নেত্ররোগ : চোখের পাতায় উৎপত্তিশীল কর্কশ অথচ স্থূল রোগবিশেষকে বর্ত্মশর্করা বলে। বর্ত্মশর্করা পরস্পর অতি নিকটজাত, দৃঢ়, সূক্ষ্মতর পিড়কাসমূহে আকীর্ণ থাকে। উক্ত রোগের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

পিড়কাভিঃ সুসূক্ষ্মাভির্ঘনাভিরভিসংবৃতা।
পিড়কা বা খরা স্থূলা সা জ্ঞেয়া বর্ত্মশর্করা।।[৮৯]

৩২. অর্শোবর্ত্ম নেত্ররোগ : চোখের পাতায় কাঁকুরের বীজের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অল্পবেদনাযুক্ত, মসৃণ ও তীক্ষ্ণাগ্র একপ্রকার নেত্ররোগ উৎপন্ন হয়, তাকে অর্শোবর্ত্ম বলে। অর্শোবর্ত্ম রোগ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

এর্ব্বারুবীজপ্রতিমাঃ পিড়কা মন্দবেদনাঃ।
শ্লক্ষ্ণাঃ খরাশ্চ বর্ত্মস্থাস্তদর্শোবর্ত্ম কীর্ত্যতে।।[৯০]

৩৩. শুষ্কার্শঃ নেত্ররোগ : চোখের পাতার অভ্যন্তরদিকে উৎপন্ন দীর্ঘ অঙ্কুরবিশিষ্ট, কর্কশ, স্রাবরহিত ও কঠিন দূষিত মাংসের অঙ্কুরকে শুষ্কার্শঃ বলা হয়। উক্ত রোগের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

দীর্ঘাঙ্কুরঃ খরঃ স্তব্ধো দারুণোঽভ্যন্তরোদ্ভবঃ।
ব্যাধিরোষোঽভিবিখ্যাতঃ শুষ্কার্শো নাম নামতঃ।।[৯১]

৩৪. অঞ্জননামিকা নেত্ররোগ : নেত্রবর্ত্মে দাহ ও সূচীস্ফুটনবৎ পীড়াযুক্ত, তাম্রবর্ণ, অল্প বেদনাবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম ও কোমল একপ্রকার রোগের উৎপন্ন হয়, তাকে অঞ্জননামিকা বলে। অঞ্জননামিকা নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

দাহতোদবতী তাম্রা পিড়কা বর্ত্মসম্ভবা।
মৃদ্বী মন্দরুজা সূক্ষ্মা জ্ঞেয়া সাঞ্জননামিকা।।[৯২]

৩৫. বহলবর্ত্ম নেত্ররোগ : বর্ত্মমণ্ডল, ত্বকের সমান বর্ণবিশিষ্ট ও দৃঢ় পিড়কাসমূহে উপচিত হলে তাকে বহলবর্ত্ম নেত্ররোগ বলে। বহলবর্ত্ম নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

বর্ত্মোপচীযতে যস্য পিড়কাভিঃ সমন্ততঃ।
সবর্ণাভিঃ স্থিরাভিশ্চ বিদ্যাদ্ বহুলবর্ত্ম তৎ।।[৯৩]

৩৬. বর্ত্মবন্ধক নেত্ররোগ : বর্ত্মমণ্ডলে স্বল্প বেদনাযুক্ত ও কণ্ডূজাতীয় দূষিত তরল ফোলাবিশিষ্ট হওয়ায়, চক্ষুর সম্যক্ নিমীলন করতে না পারলে তাকে বর্ত্মবন্ধক নেত্ররোগ বলা হয়। বর্ত্মবন্ধক নেত্ররোগের উদাহরণ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

কণ্ডুমতাল্পতোদেন বর্ত্মশোফেন মানবঃ।
ন সমং ছাদয়েদক্ষি যত্রাসৌ বর্ত্মবন্ধকঃ।।[৯৪]

৩৭. ক্লিষ্টবর্ত্ম নেত্ররোগ : দুই চোখের মধ্যে ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত পাতা যুগল যদি তাম্রবর্ণ, অল্প বেদনাবিশিষ্ট ও কোমল হয়েই হঠাৎ রক্তস্রাব উৎপন্ন হয়, তখন সেই রোগকে ক্লিষ্টবর্ত্ম নামক নেত্ররোগ বলে। উক্ত রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

মৃদুল্পবেদনং তাম্রং যদ্-বর্ত্ম সমমেব চ।
অকস্মাচ্চ স্রবেদ্রক্তং ক্লিষ্টবর্ত্মেতি তদ্ বিদুঃ।।[৯৫]

৩৮. বর্ত্মকর্দ্দম নেত্ররোগ : ক্লিষ্টবর্ত্ম নেত্ররোগ দীর্ঘকাল চক্ষুযুগলে অবস্থান করার দরুণ যখন পিত্ত ও শোণিতের বিকারহেতু যখন আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই আর্দ্রতাবিশিষ্ট রোগকে বর্ত্মকর্দ্দম নেত্ররোগ বলে। বর্ত্মকর্দ্দম নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

ক্লিষ্টং পুনঃ পিত্তযুতং শোণিতং বিদহেদ্ যদা।
তদা ক্লিন্নত্বমাপন্নমুচ্যতে বর্ত্মকর্দ্দমম্।।[৯৬]

৩৯. শ্যাববর্ত্ম নেত্ররোগ : নেত্রবর্ত্ম ও বর্ত্মের বহিরন্তের উভয়দিকেই শ্যামবর্ণ, স্ফীত, বেদনা ও কণ্ডূযুক্ত এবং ক্লেদবিশিষ্ট হলে তাকে শ্যাববর্ত্ম বলে। উক্ত রোগের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

যদ্ বর্ত্ম বাহ্যতোঽন্তশ্চ শ্যাবং শূনং সবেদনম্।
সকণ্ডুকং পরিক্লেদি শ্যাববর্ত্মেতি তন্মতম্।।[৯৭]

৪০. প্রক্লিন্নবর্ত্ম নেত্ররোগ : নেত্রমণ্ডলের বাইরেরদিকে শোথবিশিষ্ট, অল্পবেদনাযুক্ত ও অন্তর্ভাগে অত্যন্ত ক্লেদ বিশিষ্ট বর্ত্মকে প্রক্লিন্নবর্ত্ম নেত্ররোগ। প্রক্লিন্নবর্ত্ম নেত্ররোগের উদাহরণ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

অরুজং বাহ্যতঃ শূনং বর্ত্ম যশ্য নরস্য হি।
প্রক্লিন্নবর্ত্ম তদ্ বিদ্যাৎ ক্লিন্নমত্যর্থমন্ততঃ।।[৯৮]

৪১. অক্লিন্নবর্ত্ম নেত্ররোগ : চক্ষুমণ্ডলের পাতাযুগল অধৌত অবস্থায় থাকে অথবা ধৌত অবস্থায় থেকে পুনঃ পুনঃ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যায়, তবে তাকে অক্লিন্নবর্ত্ম নেত্ররোগ বলে। প্রক্লিন্নবর্ত্মের অপক্ক অবস্থাকেই অক্লিন্নবর্ত্ম বলা হয়। উক্ত নেত্ররোগের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

যস্য ধৌতান্যধৌতানি সম্বধ্যন্তে পুনঃ পুনঃ।
বর্ত্মান্যপরিপক্কানি বিদ্যাদক্লিন্নবর্ত্ম তৎ।।[৯৯]

৪২. বাতহতবর্ত্ম নেত্ররোগ : ব্যাথাযুক্ত চোখের পাতার ও শুক্লমণ্ডলের মধ্যস্থিত সন্ধি বিশিষ্ট হওয়ায় সেই বর্ত্মটি নিমেষোন্মেষ রহিত হয়ে মিলিত হতে পারে না। এই নেত্ররোগে কখনো বেদনা থাকে, কখনো বা থাকে না। বাতহতবর্ত্ম নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

বিমুক্তসন্ধি নিশ্চেষ্টং বর্ত্ম যস্য নিমীল্যতে।
এতদ্ বাতহতং বিদ্যাৎ সরুজং যদি বারুজম্।।[১০০]

৪৩. বর্ত্মার্ব্বুদ নেত্ররোগ : বর্ত্মের অভ্যন্তরজাত বিষমাকৃতি (অবর্ত্তুল) কঠিন অতি স্বল্প বেদনাযুক্ত, ঈষৎ লোহিতবর্ণ ও শীঘ্রোৎপত্তিশীল যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাকে বর্ত্মার্ব্বুদ নেত্ররোগ বলে। বর্ত্মার্ব্বুদ নেত্ররোগের উদাহরণ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> বর্ত্মান্তরস্থং বিষমং গ্রন্থীভূতমবেদনম্।
> আচক্ষীতার্ব্বুদমিতি সরক্তমবিলম্বি চ।।[১০১]

৪৪. নিমেষ নেত্ররোগ : দূষিত বায়ু বর্ত্মশুক্লগত নিমেষকারী শিরাসকলকে আশ্রয় করে চোখের পাতাকে অতি সঞ্চালিত করতে থাকে, তাকে নিমেষ রোগ বলে। নিমেষ নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> নিমেষিণীঃ শিরা বায়ুঃ প্রবিষ্টো বর্ত্ম সংশ্রয়াঃ।
> সঞ্চালয়তি বর্ত্মানি নিমেষঃ স গদো মতঃ।।[১০২]

৪৫. শোণিতার্শঃ নেত্ররোগ : রক্তের প্রকোপহেতু চক্ষুর পাতার মধ্যে রক্তবর্ণ কোমল যে মাংসাঙ্কুর জন্মে, তাকে শোণিতার্শঃ নেত্ররোগ বলে। শোণিতার্শঃ নেত্ররোগ বিদীর্ণ হলে পুনরায় উদ্ভূত হয়ে থাকে। উক্ত নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> বর্ত্মস্থো যো বিবর্দ্ধেত লোহিতো মৃদুরঙ্কুরঃ।
> তদ্রক্তজং শোণিতার্শশ্ছিন্নঞ্চাপি বিবর্দ্ধতে।।[১০৩]

৪৬. লগণ নেত্ররোগ : চোখের বর্ত্মজাত পাকররহিত, কঠিন, স্থূল, বেদনাশূন্য, কণ্ডূযুক্ত, পিচ্ছিল, কুলের ন্যায় পরিমাণবিশিষ্ট গ্রন্থিকে লগণ নেত্ররোগ বলে। লগণ নেত্ররোগের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> অপাকী কঠিনঃ স্থূলো গ্রন্থি র্বত্মভবোঽরুজঃ।
> সকণ্ডুঃ পিচ্ছিলঃ কোলপ্রমাণো লগণঃ স্মৃতঃ।।[১০৪]

৪৭. বিসবর্ত্ম নেত্ররোগ : দোষত্রয়ের প্রকোপহেতু নেত্রবর্ত্মের বাইরের দিকে শোথ এবং অভ্যন্তরদিকে মুখবিশিষ্ট বহু সূক্ষ্ম ছিদ্র উৎপন্ন হয়ে রসাদি নিঃশ্রুত হলে, তাকে বিসবর্ত্ম নেত্ররোগ

বলে। বিস অর্থাৎ পদ্মের মৃণাল যেরূপ বহু সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত ও বর্ত্মের অভ্যন্তরে জলপূর্ণ থাকে, এই নেত্ররোগেরও সেইরূপ প্রকৃতি। বিসবর্ত্ম নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

শূনং যদ্ বর্ত্ম বহুভিঃ সূক্ষ্মৈশ্ছিদ্রৈঃ সমন্বিতম্।
বিসমন্তর্জলমিব বিসবর্ত্মেতি তন্মতম্।।[১০৫]

৪৮. কুঞ্চন নেত্ররোগ : বাতাদি দোষসকল চোখের পাতাকে সঙ্কুচিত করে দর্শনক্রিয়ার ব্যাঘাত করলে, তাকে কুঞ্চন নেত্ররোগ বলে। উক্ত নেত্ররোগের উদাহরণ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

বাতাদ্যা বর্ত্মসঙ্কোচং জনয়ন্তি মলা যদা।
তদা দ্রষ্টুং ন শক্নোতি কুঞ্চনং নাম তদ্ বিদুঃ।।[১০৬]

- **<u>নেত্রপক্ষ্ম রোগ</u> :** পক্ষ্ম অর্থাৎ নেত্রলোমে দুইটি রোগ হয়, একটীর নাম পক্ষ্মকোপ এবং অপরটির নাম পক্ষ্মশাত। নিম্নে দুই প্রকার নেত্রপক্ষ্ম রোগ লক্ষণ সহযোগে আলোচিত হল—

৪৯. পক্ষ্মকোপ নেত্ররোগ : চোখের পাতার লোমসকল বায়ুদ্বারা চালিত হয়ে নেত্র অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক মুহুর্মুহু চক্ষুঘর্ষণ করতে থাকে এবং মূলকোষ থেকে স্খলিত হয়ে শুক্ল ও কৃষ্ণমণ্ডলে পতিত হয়। সেইসময় লোমসকল উৎপাটিত করলে পীড়ার শান্তি হয়। এই পীড়ায় চক্ষে বায়ু, রৌদ্র ও অগ্নির তাপ সহ্য হয় না, এই রোগের নাম পক্ষ্মকোপ। উক্ত রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

উৎপাটিতৈঃ পুনঃ শান্তিঃ পক্ষ্মভিশ্চোপজায়তে।
বাতাতপানলদ্বেষী পক্ষ্মকোপঃ স উচ্যতে।।[১০৭]

৫০. পক্ষ্মশাত নেত্ররোগ : বর্ত্ম ও পক্ষ্মাশয়গত দুষ্ট পিত্ত, রোমসকলকে উন্মূলিত এবং কণ্ডূ ও দাহ জন্মায়, এই পীড়াকে পক্ষ্মশাত বলে। পক্ষ্মশাত রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

বর্ত্ম পক্ষ্মাশয়গতং পিত্তং রোমাণি শাতয়েৎ।
কণ্ডুং দাহঞ্চ কুরুতে পক্ষ্মশাতং তমাদিশেৎ।।[১০৮]

- **নেত্রসন্ধিগত রোগসমূহ :** চোখের সন্ধিস্থানকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, পক্ষ্ম (নেত্রলোম), বর্ত্মের (চোখের পাতার) মধ্যবর্ত্তী সন্ধি, বর্ত্ম ও শুক্লমণ্ডলের মধ্যস্থ সন্ধি, কানীনক সন্ধি (নাসিকার সমীপস্থ নেত্রান্তকে কানীনক সন্ধি বলে), অপাঙ্গসন্ধি (কানীনক সন্ধির অপর প্রান্তকে অপাঙ্গসন্ধি বলে)। এই ছয়প্রকার নেত্রসন্ধিতে মূলতঃ নয়প্রকার নেত্ররোগ উৎপন্ন হয়ে থাকে। সেগুলি হল— পূয়ালস, উপনাহ, চারপ্রকার স্রাব (পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ), পর্ব্বণিকা, অলজী ও ক্রিমিগ্রন্থি। নিম্নে নয় প্রকার নেত্রসন্ধিগত রোগ লক্ষণ সহযোগে আলোচিত হল—

৫১. পূয়ালস নেত্ররোগ : চোখের কানীনক সন্ধিতে শোথ উৎপন্ন হয়ে পেকে ঘন পূয় স্রাবিত করলে উহাকে পূতিপূয়ালস বলে। এই রোগে সূচীবেধবৎ ও বিদারণবৎ পীড়া বর্ত্তমান থাকে। পূয়ালস নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

> পক্বঃ শোথঃ সন্ধিজো সংস্রবেদ্ যঃ।
> সান্দ্রং পূয়ং পূতিপূয়ালসঃ সঃ।।[১০৯]

৫২. উপনাহ নেত্ররোগ : কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডলের সন্ধিতে উৎপন্ন ঈষৎপাকবিশিষ্ট, বহুকণ্ডু ও অল্পবেদনাযুক্ত, অরুণবর্ণ, কঠিন, বৃহৎ গ্রন্থিকে উপনাহ বলে। উক্ত রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> গ্রন্থির্নাল্পো দৃষ্টিসন্ধাবপাকঃ কণ্ডূপ্রায়ো নীরুজস্তূপনাহঃ।[১১০]

৫৩. পৈত্তিক স্রাব নেত্ররোগ : সন্ধিমধ্য থেকে পীত বা নীলবর্ণের ন্যায় জল জাতীয় স্বচ্ছ উষ্ণস্রাব নিঃশ্রুত হয়, এইজাতীয় নেত্ররোগকে পৈত্তিক স্রাব বলে। পৈত্তিক স্রাব নেত্ররোগের উদাহরণ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> পীতাভাসং নীলমুষ্ণং জলাভং পিত্তস্রাবঃ সংস্রবেৎ সন্ধিমধ্যাৎ।[১১১]

৫৪. শ্লেষ্মস্রাব নেত্ররোগ : সন্ধিগত যে শোথ পেকে শ্বেতবর্ণ ঘন ও পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হয়, তাকে শ্লেষ্মস্রাব বলে। উক্ত রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> শ্বেতং সান্দ্রং পিচ্ছিলং যঃ স্রবেত্তু শ্লেষ্মস্রাবোহসি বিকারঃ প্রদিষ্টঃ।।[১১২]

৫৫. সান্নিপাতিক নেত্ররোগ : এইজাতীয় নেত্ররোগে সন্ধিতে শোথ উৎপন্ন হয়ে পেঁকে গিয়ে পূঁজ নির্গত হয়, তাই এই জাতীয় স্রাবের অপর নাম পূয়স্রাব। পূয়স্রাব সাধারণতঃ বায়ু, কফ ও পিত্ত প্রভৃতি ত্রিদোষের ফলে উৎপন্ন হয়। পূয়স্রাব নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

শোথঃ সন্ধৌ সংস্রবেদ্ যস্ত পক্কঃ পূয়ং স্রাবঃ সর্ব্বজঃ সম্মতঃ স্যাৎ।।[১১৩]

৫৬. রক্তজ স্রাব নেত্ররোগ : চক্ষুমণ্ডলে দূষিত রক্তের প্রকোপ হেতু উৎপন্ন স্রাবকে রক্ত স্রাব বলে। এই জাতীয় স্রাবে ঈষদুষ্ণ অনতি ঘন, অধিক পরিমিত, রক্তমিশ্রিত পূঁজ নির্গত হয়। রক্তজ স্রাব বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

রক্তস্রাবঃ শোণিতোত্থঃ সরক্তং কোষ্ণং নাল্পং সংস্রবেন্নাতিসান্দ্রম্।।[১১৪]

৫৭. পর্ব্বণিকা নেত্ররোগ : শুক্ল ও কৃষ্ণমণ্ডলের সন্ধিতে তাম্রবর্ণ দাহ ও শূলবিশিষ্ট গোলাকার পাতলা শোথ উৎপন্ন হলে তাকে পর্ব্বণী বলে। মূলতঃ এই জাতীয় নেত্ররোগে রক্তের আধিক্য থাকে বলে ইহা রক্তজ হয়। এছাড়াও এই রোগ কফজ ও বাতজও হয়ে থাকে। পর্ব্বণিকা নেত্ররোগের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

তাম্রা তন্বী দাহশূলোপপন্না রক্তাজ্ জ্ঞেয়া পর্ব্বণী বৃত্তশোফা।[১১৫]

৫৮. অলজী নেত্ররোগ : শুক্ল ও কৃষ্ণমণ্ডল সন্ধিতে প্রমেহহেতুজাত অলজীলক্ষণাক্রান্ত শোথ উৎপন্ন হয়, তাকে অলজী বলা হয়। এইজাতীয় রোগের পীড়া প্রমেহহেতুজাত অলজীপীড়ার ন্যায় অর্থাৎ রক্তবর্ণ, স্ফোটকব্যাপ্ত ইহার লক্ষণযুক্ত। অলজী নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

জাতা সন্ধৌ শুক্লকৃষ্ণেঽলজী স্যাৎ তস্মিন্নেব ব্যাহৃতা পূর্ব্বলিঙ্গৈঃ।।[১১৬]

৫৯. ক্রিমিগ্রন্থি নেত্ররোগ : চোখের পাতায় ও পক্ষ্মমণ্ডলের মধ্যস্থ সন্ধিতে উৎপন্ন বিভিন্ন আকৃতির ক্রিমিসকল দূষিত কণ্ডূ উৎপাদন করে ক্রমশ বর্ত্ম ও শুক্লমণ্ডলের সন্ধিতে উপস্থিত থেকে চক্ষুকে দূষিত করে অভ্যন্তরে বিচরণ ও নেত্রমণ্ডলের মাংসের ভক্ষণ করে। এইজাতীয় নেত্রপীড়াকে ক্রিমিগ্রন্থি বলে। ক্রিমিগ্রন্থি নেত্ররোগের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

ক্রিমিগ্রন্থির্বর্ত্মনঃ পক্ষণশ্চ কণ্ডুং কুর্য্যুঃ ক্রিময়ঃ সন্ধিজাতাঃ।
নানারূপা বর্ত্মশুক্লান্তসন্ধৌ চরন্তস্তর্লোচনং দূষয়ন্তঃ।।[১১৭]

- **সপ্তদশপ্রকার সর্বাংশ নেত্ররোগ :** সম্পূর্ণ নেত্রমণ্ডলে ১৭ প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। যথা— চারপ্রকার অভিষ্যন্দ (বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্তজ), চারপ্রকার অধিমন্থ (বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত), সশোথপাক, অশোথপাক, হতাধিমন্থ, বাতপর্য্যয়, শুষ্কাক্ষিপাক, অন্যতোবাত, অম্লাধ্যুষিত, শিরোৎপাত ও শিরাহর্ষ। নিম্নে সপ্তদশ প্রকার সর্বাংশ নেত্ররোগ লক্ষণ সহযোগে আলোচিত হল—

৬০. বাতিক অভিষ্যন্দ : এইজাতীয় অভিষ্যন্দে সূচীবেধবৎ পীড়া, চোখের জড়তা, রোমাঞ্চ, সংঘর্ষ (কর্-কর্ পীড়া, রুক্ষতা, মস্তকে বেদনা, চোখের মলরাহিত্য এবং শীতল অশ্রুনির্গম প্রভৃতি সকল লক্ষণ উপস্থিত। বাতিক অভিষ্যন্দের উদাহরণ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> নিস্তোদন স্তম্ভন রোমহর্ষসংঘর্ষ পারুষ্য শিরোহভিতাপাঃ।
> বিশুষ্কভাবঃ শিশিরাশ্রুতা চ বাতাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি।।[১১৮]

৬১. পৈত্তিক অভিষ্যন্দ : উক্ত অভিষ্যন্দে নেত্রের দাহ, পাক, শীতলেচ্ছা, চক্ষু থেকে ধূমনির্গমবৎবোধ, অধিক পরিমাণে উষ্ণ অশ্রুনির্গম এবং নেত্রের পীততা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। পৈত্তিক অভিষ্যন্দ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

> দাহপ্রপাকৌ শিশিরাভিনন্দা ধূমায়নং বাস্পসমুচ্ছ্রয়শ্চ।
> উষ্ণাশ্রুতা পীতকনেত্রতা চ পিত্তাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি।।[১১৯]

৬২. শ্লৈষ্মিক অভিষ্যন্দ : কফজ অভিষ্যন্দে উষ্ণ সেবনেচ্ছা, চোখে শোথ, গুরুতা, কণ্ডূ, মললিপ্ততা, অতিশীতলতা এবং মুহুর্মুহু পিচ্ছিল স্রাব নির্গম পক্রিয়াকে শ্লৈষ্মিক লক্ষণ বলে। উক্ত রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> উষ্ণাভিনন্দা গুরুতাক্ষিশোফঃ কণ্ডূপদেহাবতিশীততা চ।
> স্রাবো মুহুঃ পিচ্ছিল এব চাপি কফাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি।।[১২০]

৬৩. রক্তজ অভিষ্যন্দ : রক্তজ অভিষ্যন্দে অশ্রু তাম্রবর্ণ, নেত্র লোহিতবর্ণ এবং চতুর্দিকে অতি লোহিতবর্ণ রেখা সকল উদগত হয়। অধিকন্তু পৈত্তিক অভিষ্যন্দের লক্ষণসমস্তও এই নেত্ররোগে উপস্থিত থাকে। রক্তজ অভিষ্যন্দ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> তাম্রাশ্রুতা লোহিতনেত্রতা চ রাজ্যঃ সমন্তাদতিলোহিতাশ্চ।
> পিত্তস্য লিঙ্গানি চ যানি তানি রক্তাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি।।[১২১]

৬৪. বাতিক অধিমস্থ : নেত্র অধিমস্থে উৎপাটিতবৎ, দারুমথিতবৎ, স্তব্ধ, আবিল এবং কর্-করিকা পীড়া, সূচীস্ফুটনবৎ পীড়া ও বিদারণবৎ পীড়া ব্যথিত হয়। আবার মস্তকের অর্দ্ধাংশ কুঞ্চন, আস্ফোটন, আধ্মান, কল্প ও বেদনায় পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। উক্ত রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

নেত্রমুৎপাট্যত ইব মথ্যতেহরণিবচ্চ যৎ।
সংঘর্ষতোদনির্ভেদসংযুতং স্তব্ধমাবিলম্।।
কুঞ্চনাস্ফোটনাধ্মানবেপথুব্যথনৈর্যুতম্।
শিরসোহর্দ্ধঞ্চ যেন স্যাদধিমস্থঃ স মারুতাৎ।।[১২২]

৬৫. পৈত্তিক অধিমস্থ : উক্ত অধিমস্থে চক্ষুঃ যকৃৎ পিণ্ডের ন্যায় আভাযুক্ত ও প্রজ্বলিত অঙ্গারব্যাপ্তবৎ এবং মস্তকের দাহ এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়। পৈত্তিক অধিমস্থ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

যকৃৎপিণ্ডোপমং চক্ষুর্জ্বলদঙ্গারকীর্ণবৎ।
অধিমস্থে ভবেৎ পৈত্তে শিরসো দহনং তথা।।[১২৩]

৬৬. শ্লৈষ্মিক অধিমস্থ : এই অধিমস্থে চক্ষুদ্বয় শীতল, ভারযুক্ত, পিচ্ছিল, মলসংযুক্ত, স্ফীত, স্রাবযুক্ত ও কণ্ডূবিশিষ্ট, নাসিকা আধ্মাত, মস্তক ব্যথিত রূপসকল ধূলিব্যাপ্তবৎ আবিলভাবে দৃষ্ট এবং চোখের কৃষ্ণমণ্ডল নত ও শুক্লমণ্ডল উন্নত হয়। শ্লৈষ্মিক অধিমস্থের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

শৈত্যগৌরবপৈচ্ছিল্যদূষিকাশোথসংযুম্।
স্রাবকণ্ডুযুতং নেত্রং নাসাধ্মানং শিরোরুজা।।
আবিলা পাংশুপূর্ণেব দৃষ্টিঃ কফসমুদ্ভবে।
অধিমন্থে নতং কৃষ্ণমুন্নতং শুক্লমণ্ডলম্।।[১২৪]

৬৭. রক্তজ অধিমস্থ : এই অধিমস্থে চক্ষু বান্ধুলী পুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ, অতিশয় বেদনাযুক্ত, স্পর্শাসহ, চতুর্দিকে তাম্রবর্ণব্যাপ্ত এবং উৎপাটনবৎ ও সূচীস্ফুটনবৎ পীড়ায় পীড়িত হয়। এইপ্রকার নেত্র অধিমস্থ হলে দিকসকল অগ্নিবৎ দৃষ্ট হয় এবং মস্তক প্রজ্বলিত অঙ্গারপূর্ণ বোধ হয়। রক্তজ অধিমস্থ নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

মন্থে রক্তভবে নেত্রমুৎপাটনসমানরুক্।
রাগেণ বন্ধুকনিভং তাম্যতি স্পর্শনাক্ষমম্।।[১২৫]

৬৮. সশোথপাক নেত্ররোগ : চোখে কণ্ডু, মলবাহুল্য, দাহ, করকরিকা, সূচীস্ফুটনবৎ পীড়া, ভার ও শোথ হয়ে নেত্রটি তাম্রবর্ণ ও পক্ক ডুমুরের মতো হয়ে অধিক পরিমাণে উষ্ণ ও পিচ্ছিলময় অশ্রু মোচন করলে এবং উহাতে স্নায়ুর ক্রিয়া অতিপ্রবল হয়ে পাকিলে উহাকে চোখের শোথযুক্ত পাক বলা যায়। সশোথপাক নেত্ররোগ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

কণ্ডুপদেহাশ্রুযুতঃ পক্কোডুম্বরসন্নিভঃ।
দাহসংঘর্ষতাম্রত্বশোথনিস্তোদগৌরবৈঃ।।
জুষ্টো মুহঃ স্রবেদ্ বাষ্পমুষ্ণং পিচ্ছিলমেব চ।
সংরম্ভী পচ্যতে যোঽসৌ নেত্রপাকঃ সশোথকঃ।।[১২৬]

৬৯. অশোথপাক নেত্ররোগ : সশোথ নেত্রপাকে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, অশোথ নেত্রপাকেও সেই সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত হয়ে থাকে, কেবলমাত্র শোথ মাত্র থাকেনা। অশোথপাক নেত্ররোগ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

শোথহীনানি লিঙ্গানি নেত্রপাকে ত্বশোথকে।।[১২৭]

৭০. হতাধিমন্থ নেত্ররোগ : বায়ুপ্রধান অধিমন্থ উপেক্ষিত হলে চোখে উগ্র বেদনা উৎপাদনপূর্বক উহাকে শোষিত করে নষ্ট করে। এই পীড়ায় বায়ু, চোখের শিরাগণের অন্তর্ভূত থেকে ক্ষীণতেজ চক্ষুকে বলপূর্বক শোষিত করাতে উহা শুষ্ক পদ্মের ন্যায় অবসন্ন হয়ে দৃষ্টিশক্তি বিহীন হয়। এই ব্যাধির নাম হতাধিমন্থ। হতাধিমন্থ নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

উপেক্ষণাদক্ষি যদাধিমন্থো বাতাধিকঃ শোষয়ভি প্রসহ্য।
রুজাভিরুগ্রাভিরসাধ্য এষ হতাধিমন্থঃ খলু নাম রোগঃ।।[১২৮]

৭১. বাতপর্য্যয় নেত্ররোগ : দূষিত বায়ু, তীব্রবেদনার সহিত পর্যায়ক্রমে, একবার ভ্রূদ্বয়ে এবং অন্যবার নেত্রদ্বয়ে আগত হলে তাকে বাতপর্য্যয় নেত্ররোগ বলে। বাতপর্য্যয়-এর উদাহরণ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

বারং বারঞ্চ পর্য্যেতি ভ্রূবৌ নেত্রে চ মারুতঃ।
রুজাভিঃ সহ তীব্রাভিঃ স জ্ঞেয়ো বাতপর্য্যয়ঃ।।[১২৯]

৭২. শুষ্কাক্ষিপাক নেত্ররোগ : চোখের পাতা বিকৃত ও রুক্ষ, চক্ষু দাহযুক্ত এবং রূপসকল মলিন দৃষ্ট হয়। এই রোগে চোখ প্রায় মুদ্রিত থাকে এবং উন্মীলন করতে অতিশয় যাতনা উপস্থিত হয়। শুষ্কাক্ষিপাক রোগবিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> যৎ কূপিতং দারুণ রুক্ষবর্ত্ম সন্দহ্যতে চাবিলদর্শনং যৎ।
> সুদারুণং যৎ প্রতিবোধনে চ শুষ্কাক্ষিপাকোপহতং তদক্ষি।।[১৩০]

৭৩. অন্যতোবাত নেত্ররোগ : দূষিত বায়ুর ফলে ঘাড়, কর্ণ, মস্তক, হনু, মন্যা অথবা পৃষ্ঠদেশে থেকে ভ্রুতে ও চোখে অতিশয় বেদনার সৃষ্টি হয়, তাই ইহার নাম অন্যতোবাত। দূষিত বায়ু একস্থানে অবস্থিত হয়ে অন্যস্থানে বেদনা উৎপাদন করে, এই জন্য উক্ত পীড়াকে অন্যতোবাত বলা যায়। অন্যতোবাত নেত্ররোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> যস্যাবটু কর্ণশিরোহনুস্থো মন্যাগতো বাপ্যনিলোহন্যতো বা।
> কুর্য্যাদ্রুজোঽতি ভ্রুবি লোচনে চ তমন্যতোবাতমুদাহরন্তি।।[১৩১]

৭৪. অম্লাধ্যুষিত নেত্ররোগ : প্রতিনিয়ত অধিক পরিমাণে অন্নভোজন করার ফলে পিত্ত দূষিত হওয়াতে চক্ষুযুগল শ্যাববর্ণ, চতুর্দিকে লোহিতরাগে পরিবেষ্টিত, দাহ ও স্রাবযুক্ত এবং উহাতে শোথ উৎপন্ন হয়ে সমস্ত চক্ষু পেকে যায়, এই জাতীয় পীড়ার নাম অম্লাধ্যুষিত। অম্লাধ্যুষিত চক্ষুরোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* উক্ত হয়েছে—

> শ্যাবং লোহিতপর্য্যন্তং সর্ব্বমক্ষি প্রপচ্যতে।
> সদাহশোথং সাস্রাবম্লাধ্যুষিতমম্লতঃ।।[১৩২]

৭৫. শিরোৎপাত নেত্ররোগ : এইজাতীয় রোগে চোখের শিরা সকল চতুর্দিকে তাম্রবর্ণ হয়ে উত্থিত হয় এবং মুহুর্মুহু বর্ণান্তর প্রাপ্ত হয়। এই জাতীয় নেত্ররোগে কখনও বেদনা থাকে, কখনও বা থাকেনা। এই পীড়ার নাম শিরোৎপাত। উক্ত রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> অবেদনা বাপি সবেদনা বা যস্যাক্ষিরাজ্যো হি ভবন্তি তাম্রাঃ।
> মুহুর্বিরজ্যন্তি চ যাঃ সমন্তাদ্ ব্যাধিঃ শিরোৎপাত ইতি প্রদিষ্টঃ।।[১৩৩]

৭৬. শিরাহর্ষ নেত্ররোগ : মূঢ়তাবশতঃ শিরোৎপাত পীড়াকে উপেক্ষা করলে শিরাহর্ষ রোগ জন্মায়। এই রোগে নিরন্তর তাম্রবর্ণ স্বচ্ছ অশ্রু নির্গত হয় এবং রোগী ভাল দেখতে পায়না, সেই কারণেই উক্ত রোগকে শিরাহর্ষ বলা হয়। শিরাহর্ষ রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> মোহাৎ শিরোৎপাত উপেক্ষিতস্তু জায়েত রোগস্তু শিরাপ্রহর্ষঃ।
> তাম্রাচ্ছমস্রং স্রবতি প্রগাঢ়ং তথা ন শক্নোত্যভিবীক্ষিতুঞ্চ।।[১৩৪]

❖ **<u>আয়ুর্বেদিক পদ্ধতি অনুসারে বিবিধ নেত্ররোগের চিকিৎসা পদ্ধতি</u> :** আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বহু প্রাচীনকাল থেকে তরুলতাদির গুণ, অবস্থান ও ব্যবহার অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। যথা— শাকবর্গ, পুষ্পবর্গ, হরিতকীবর্গ, কর্পূরাদিবর্গ, গুলঞ্চাদিবর্গ ও তৈলবর্গ। এই সকল বিভাগ প্রধানত উদ্ভিদের গুণাগুণের উপর নির্ভর করেই লিখিত হয়েছে। *সুশ্রুতসংহিতা* অনুসারে যেসকল চক্ষুরোগের কথা গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত হয়েছে, সেই সকল রোগের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির কথা মাধবকর তাঁর *ভৈষজ্য রত্নাবলী* গ্রন্থে 'নেত্ররোগাধিকার'[১৩৫] অধ্যায়ে বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। চক্ষুরোগের প্রতিষেধ বিষয়ে যেসকল আয়ুর্বেদিক পদ্ধতি *ভৈষজ্য রত্নাবলী* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে তা নিম্নে আলোচিত হল—

১. দেবদারু, আতইচ বা অতিবিষা ও লোধচূর্ণ গাছের পাতার রসের সঙ্গে অল্প পরিমাণে সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত পোটলীবদ্ধ করে চোখের বাইরে ভালোভাবে বোলালে বাতাদি লিঙ্গনাশ বা ছানি রোগ উপশম হয়।

২. আমলকীফলের রস চক্ষুতে পূরণ অথবা মধু ও সৈন্ধব লবণের সঙ্গে সজিনাছালের রস সেচন করলে নেত্রকোপ নিবারণ হয়।

৩. করবী গাছের কচিপত্র ছিঁড়ে যে রস নির্গত হয়, তা চক্ষু যুগলে দিলে নেত্রকোপ নিবারণ হয়।

৪. আপাং বা বিলাইখামচি গাছের মূলের সঙ্গে সৈন্ধব লবণের সহিত তাম্রপাত্রে দধির মধ্যে ঘর্ষণ করে চোখে দিলে অচিরজাত নেত্রকোপ উপশমিত হয়।

৫. সৈন্ধব লবণ, দারুহরিদ্র গাছের পাতা, গৈরিক মাটি, হরিতকী ও রসাঞ্জন (গন্ধক ও অ্যান্টিমনি মিশ্রিত খনিজ পদার্থ) একত্রে মর্দন করে চোখে প্রলেপ দিলে বিভিন্ন প্রকার চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়।

৬. হরিতকী ঘৃতে ভেজে তা চোখের বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে চক্ষুর প্রকোপ নিবারণ হয়।

৭. গৈরিক মাটি, রক্তচন্দন, শুষ্ক আদা, খড়ি মাটি ও বচ গাছ একসঙ্গে মর্দন করে চোখে প্রলেপ দিলে চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়।

৮. ভুঁই আমলা বা ভূমি আমলার মূল মিশ্রিত কাঁজি বা কাঞ্জি (কালো গাজরের সরবত) ও সৈন্ধব লবণের সহিত তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করে তা ঘনীভূত হলে চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে অভিষ্যন্দ রোগ প্রশমিত হয়।

৯. এরণ্ড বা ভেরেণ্ডা (Castor) গাছের পাতা, মূল, ত্বক অথবা কন্টকারী বা কন্টিকারী গাছের মূলের সঙ্গে ছাগদুগ্ধ পাক করে, তা দিয়ে চক্ষু সেচন করলে চোখের উপকার হয়।

১০. বৃহতী, এরণ্ডমূলের ছাল, সজিনামূলের ছাল ও সৈন্ধব লবণ ছাগদুগ্ধের সঙ্গে বেটে বর্তি প্রস্তুত করে দিলে অঞ্জনাদি রোগ বিশেষ উপশম হয়।

১১. গৈরিক মাটি ১ ভাগ, সৈন্ধব লবণ ৩ ভাগ, পিপুল ৫ ভাগ, তগরপাদুকা ৭ ভাগ এই সমুদায় জলে মিশ্রিত অবস্থায় গুড়িকা প্রস্তুত করে তা চোখে দিলে বর্ত্ম রোগ প্রশমিত হয়।

১২. প্রপৌণ্ডরীক, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, আমলা, পদ্মকাষ্ঠ এই সকল সমুদায় দ্রব্য শীতল জলে বেটে মধুর সঙ্গে চোখে সেচন করলে পৈত্তিক নেত্ররোগ বিনিষ্ট হয়।

১৩. দ্রাক্ষা বা আঙ্গুর, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা বা কফি জাতীয় উদ্ভিদ ও জীবনীয়গণের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ দ্বারা পান করলে শোথ, শূল ও চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

১৪. লোধকাষ্ঠ নিমপত্রে বেষ্টন করে অগ্নিতে উষ্ণ করে নিলে, তা পরে চূর্ণ বা কল্ক স্তনদুগ্ধের সঙ্গে মিশ্রিত করে চোখে প্রলেপ দিলে পিত্ত রক্ত ও বায়ুজন্য নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

১৫. পলাশ গাছের ছাল, আকন্দ গাছের ছাল, কদবেল গাছের ছাল, বেলছাল, শাঁইছাল, পিলু গাছের ছাল, কৃষ্ণতুলসী, নিশিন্দাপত্র, বালা, শুঁট বা শঠি গাছের ছাল, দেবদারু গাছের ছাল ও কুড় এইসকল সমুদায়ের স্বেদ বা প্রলেপ দিলে কফজ নেত্ররোগ নিবারিত হয়।

১৬. শুঁট বা শঠি গাছের পত্র ও নিমপাতা একত্রে বেটে নিয়ে তা অল্প পরিমাণে সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত ঈষৎ উষ্ণ করে চোখে দিলে নেত্রের শোথ, কণ্ডূ ও বেদনা নিবারণ হয়।

১৭. পালিধা গাছের ছাল বেটে উৎপাদিত তৈল, কাঁজি ও সৈন্ধব লবণের সঙ্গে মিশ্রিত করে প্রলেপ দিলে কফজ নেত্ররোগ নিবারণ হয়।

১৮. ঘৃত ভর্জিত লোধকাষ্ঠ ও সৈন্ধব লবণ একত্র মিশ্রিত, কাঁজিতে পেষিত ও শুভ্র বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করে তা নেত্রমণ্ডলে প্রলেপ দিলে চোখের কণ্ডূ, দাহ ও ব্যাথার প্রশমন হয়।

১৯. লোধ (Symplocos bark), ত্রিফলা, যষ্টিমধু, চিনি ও মুথা বা ভাদাইল এই সমুদায় দ্রব্য শীতল জলে বেটে চোখে সেচন করলে রক্তাভিষ্যন্দ নেতরোগ নিবারণ হয়।

২০. দারুহরিদ্রা, পটলপত্র, যষ্টিমধু, নিমছাল, পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল বা নীল পদ্ম ও পণ্ডুরিয়া একত্রে বহুদিন ধরে পচিয়ে মিশ্রিত করে, হাফ সের তরল ও জল দুই সের মিশ্রিত করে পুনরায় অগ্নিতে পাক করে ঠাণ্ডা অবস্থায় আট তোলা মধু মিশ্রিত করে চোখে দিলে নেত্রের দাহ, অশ্রুপাত, শোথ ও বেদনা নিবারণ হয়।

২১. সজিনাপাতার রস তাম্রপত্রে মর্দন করে ঘৃতের সহিত মিশ্রিত ও অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ করে চোখের চারিদিক লেপন করলে শোথ, কণ্ডূ, অশ্রুপাত ও বেদনা প্রশমিত হয়।

২২. বিল্বপত্র রস ৪ মাষা, সৈন্ধব ২ রতি, গব্যঘৃত ৪ রতি এই সমুদায় তাম্রপত্রে রেখে উত্তম কড়ির দ্বারা ঘর্ষণ করে ঘনীভূত অবস্থায় ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে উত্তপ্ত ও স্তন্যদুগ্ধে মিশ্রিত তরলীকৃত করে চোখে দিলে চোখের শোথ শূল, অধিমস্থ ও রক্তস্রাব উপশমিত হয়।

২৩. বিল্বপত্ররস, কাঁজি, সৈন্ধব লবণ ও কটুতৈল এই সমুদায় তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করে চোখে দিলে নেত্রস্রাব রোগের নিবারণ হয়।

২৪. বহেড়া, হরিতকী, আমলকী, পটলপত্র, নিমছাল, বাসকছাল, গুগগুল বা ধূপ গাছ এই সমুদায়ের সহিত ঘৃত পাক করে সেবন করলে চোখের শোথ ও পাক প্রভৃতি নিবারণ হয়।

২৫. বাসকছাল, হরিতকী, নিমছাল, আমলকী, মুথা, বহেড়া, পটলপত্র একত্রে দুই তোলা মর্দন করে ও সেই দুই তোলা মিশ্রণের মধ্যে জল হাফ সের দিয়ে প্রত্যহ পান করলে এবং চোখে সেচন করলে চোখ থেকে রক্তস্রাব ও শ্লেষ্মা নিবাড়িত হয়।

২৬. বাসকছাল, নিমের মূলের ছাল, মুথা, পটলপত্র, কটকী বা কুম্ভী গাছের ছাল, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, কুরচি বা কুর্চিছাল, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, শুঁঠ, চিরতা, আমলা, হরিতকী, বহেড়া, শ্যামলতা, যবতণ্ডুল প্রভৃতি মিশ্রিত চার তোলা, জল এক সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া একত্রে মিশ্রিত করে প্রত্যহ সকালবেলায় এই মিশ্রণ পান করলে চোখের কণ্ডু, তিমির রোগ ও পটলার্বুদ পীড়ার উপশম হয়।

২৭. হরিতকী তিনটি, বহেড়া ছয়টি, আমলকী বারোটি এই সমুদায় এক সের জলে সেদ্ধ করে অর্দ্ধ পোয়া অবস্থাতে নামিয়ে পান করলে চোখের অভিষ্যন্দ, শোথ ও অশ্রুপাতাদি প্রভৃতি রোগের নিবারণ হয়।

২৮. ছাগঘৃত চার সের, ছাগদুগ্ধ ষোল সের, কল্লার্থ যষ্টিমধু, উৎপল, জীবক, ঋষভক প্রভৃতি মিশ্রিত করে মোট দুই পল ঘৃত প্রস্তুত করে চোখে ধারণ করলে নেত্রের অভিঘাতজ রোগ প্রশমিত হয়।

২৯. ডহরকরঞ্জ ফল, শঙ্খচূর্ণ, লোধ ও রূপাভস্ম এই সমুদায় কাঁসার পাত্রে স্তনদুগ্ধের সহিত চোখে প্রদান করলে ব্রণশুক্র রোগ বিনষ্ট হয়।

৩০. ছাগদুগ্ধে পদ্ম বেটে চোখে সেচন করলে চোখের রক্তিমা, অশ্রুপাত ও ব্যাথা প্রভৃতি নিবারণ হয়। এছাড়াও উক্ত মিশ্রণে তুঁতে বা তেঁতুল ঘষে সেই জল চোখে দিলে শুক্ররোগ নষ্ট হয়।

৩১. সমুদ্র জলের ফেনা, কুকুটডিম্বের খোসা, সৈন্ধবলবণ, মধু ও সজিনাবীজ এই সমুদায় মিশ্রিত করে সজিনা গাছের রসের সহিত চোখে দিলে শুক্ররোগ প্রশমিত হয়।

৩২. আমলা, নিমপত্র, কদবেলপত্র, যষ্টিমধু, লোধ, খদির বা খয়ের ও তিল মিশ্রিত উষ্ণ জলে ফুটিয়ে তা ঠাণ্ডা করে চোখে সেচন করলে সকলপ্রকার নেত্রগত শুক্ররোগ প্রশমিত হয়।

৩৩. কুক্কুটাণ্ড ত্বক্ বা মুরগীর ডিমের খোসা, মান গাছের ছাল, শঙ্খচূর্ণ, কাচলবণ (Black Salt), রক্তচন্দন, গৈরিক মাটি একত্রে বেটে যে তরল পদার্থ বের হয় তা চোখে দিলে কুসুম ও অর্ম্মাদিরোগ বিনষ্ট হয়।

৩৪. হস্তী, শূকর, উষ্ট্র বা উট, অশ্ব ও গর্দভ বা গাধা জাতীয় প্রাণীদের দন্ত এবং শঙ্খচূর্ণ, মুক্তা ও সমুদ্র জলের ফেনা প্রত্যেক সমভাগ এবং মরিচ সিকিভাগ সমুদায় দিয়ে ঔষধ প্রস্তুত করে চোখে প্রয়োগ করলে ক্ষতশুক্ররোগ নিবারিত হয়।

৩৫. শঙ্খচূর্ণ ৪ ভাগ, মানছাল ২ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ ও সৈন্ধব লবণ এক চতুর্থাংশ মিশ্রিত করে মধুর সঙ্গে মর্দন করে চোখে প্রলেপ দিলে শুক্র ও তিমিররোগ নষ্ট হয়।

৩৬. তিলতৈল এক সের, ছাগদুগ্ধ চার সের, কল্কদ্রব্য পিপুল, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ দ্রব্য মিশ্রিত ষোল তোলা দিয়ে তরল তৈল প্রস্তুত করা হয়, যা চোখে লেপন করলে তিমির, অজক, শুক্র, শিরঃশূল ও অক্ষিঃশূল প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

৩৭. অর্ধেক সের ঘৃত, চূর্ণ শশক মাংস এক সের, জল আট সের, শেষ দুই সের, ছাগদুগ্ধ দুই সের এবং কল্ক যষ্টিমধু ও পুণ্ডরীয়া চার তোলা প্রভৃতি সমুদায় একত্রে মিশ্রিত করে চোখে দিলে শুক্র ও অজক রোগ প্রশমিত হয়।

৩৮. নির্ম্মল্লি ফল, শঙ্খ, ত্রিকটু, সৈন্ধব, চিনি, সমুদ্রফেন, রসাঞ্জন (কর্পূর), মধু, বিড়ঙ্গ, মানছাল, মুরগীর ডিমের খোসা এই সমুদায়ের দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করে চোখে লেপন করলে তিমির, পটল, কাচ, অর্ম্ম, শুক্র, কণ্ডূ, ক্লেদ, অর্বুদ ও মল প্রভৃতি নেত্ররোগ দূরীভূত হয়।

৩৯. হরিতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, শঙ্খনাভি, মানছাল এই সমুদায় ছাগদুগ্ধে পেষণ করে যে ঔষধ প্রস্তুত হয়, তা চোখে সেচন করলে চোখের কণ্ডূ, তিমির, পটল, অর্বুদ, অধিমাংস, কুসুম ও রাত্র্যন্ধতা রোগ নিবারণ হয়।

৪০. তিলফুল ৮০-টি, পিপুলের চাউল ৬০-টি, জাতীফুল-৫০ টি, মরিচ ১৬-টি এই সমুদায় একত্রে মর্দন করলে যে ঔষধ প্রস্তুত হয়, তা চোখে দিলে নষ্ট চোখ পুনরায় লব্ধ হয়।

৪১. সুর্মা, সজিনাবীজ, পিপুল, যষ্টিমধু, বহেড়াফলের মজ্জা, মানছাল এই সমুদায় দ্রব্য সমান পরিমাণ নিয়ে তাতে ছাগদুগ্ধ পেষণ করে ও ছায়ায় শুকিয়ে যে ঔষধ প্রস্তুত হয়, তা চোখে লেপন করলে অর্বুদ, পটল, কাচ, তিমির, রক্তরাজিকা, অধিমাংস, অর্ম্ম ও রাত্র্যন্ধতা নেত্ররোগ নিবারণ হয়।

৪২. ত্রিকটু, করঞ্জফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধব লবণ, বিল্বমূল, বরুণমূল, বারিচর বা শৈবাল এই সমুদায় দ্রব্য একত্রে বেটে নিয়ে নেত্রমণ্ডলে লেপন করলে তিমির ও পটল প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

৪৩. ত্রিফলার জল, ভীমরাজের রস, শুঁঠের চূর্ণ, মধু, ঘৃত, ছাগমূত্র ও গোমূত্র এই সমুদায় দিয়ে দিনে সাতবার চোখ ধৌত করলে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়।

৪৪. হরিদ্রা, নিমপত্র, পিপুল, মরিচ, মুথা, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ এই সমুদায়ে গোমূত্র একত্রে পেষণ করে গুলি বা গুড়ী প্রস্তুত করা হয়। ছাগমূত্রের সহিত উক্ত গুড়ী চোখে পেষণ করলে জ্বর ও ভূতাবেশ, জলের সহিত প্রদানে তিমির রোগ, মধুর সহিত প্রদানে পটল রোগ, ভীমরাজের সহিত প্রদানে রাত্র্যন্ধতা, স্তনদুগ্ধের সহিত পুষ্পক এবং শিশির সহিত প্রদানে পরিস্রাব, অর্বুদ ও পিচ্চট রোগ নিবারিত হয়।

৪৫. দূর্বা ঘাস, যবতণ্ডুল, গৈরিকমাটি, অনন্তমূল এই সমুদায় বেটে প্রলেপ দিলে চোখের রক্তিমা ও ব্যথা নিবারণ করে।

৪৬. সুর্মা, শঙ্খচূর্ণ, ত্রিকটু, কৃষ্ণসুর্মা, মানছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গোময়ী বা গুলঞ্চ, রক্তচন্দন এই সমুদায় চোখের রাত্যন্ধতা ও দিনান্ধ্য নিবারণ হয়।

৪৭. মধুর সহিত শঙ্খচূর্ণ, সৈন্ধব লবণের সহিত নির্মল্লি ফলচূর্ণ অথবা চিনির সহিত সমুদ্রফেন সমুদায় চোখে দিলে অর্জুন রোগের উপশম হয়।

৪৮. পিপুল, সজিনাবীজ, সৈন্ধব লবণ, শুঁঠ এই সমুদায় টাবালেবু বা পাতি গন্ধরাজ লেবুর রসে মর্দন করে চোখে অঞ্জন দিলে পিষ্টকা রোগ নষ্ট হয়।

৪৯. যষ্টিমধু, ত্রিফলা প্রত্যেক এক তোলা (১৬ গ্রাম), লৌহ চার তোলা এই সমুদায় একত্রে মিশ্রিত করে শয়নকালে ঘৃত ও মধুর সহিত দুই মাষা (০.৯৭২ গ্রাম) প্রত্যেকদিন সেবন করলে নানাবিধ নেত্ররোগের উপশম হয়।

৫০. ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শটী, রাস্না, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, নীলোৎপল, কাঁকলা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, নাগেশ্বর, বৃহতী, কণ্টকারী মিলিত দুই পল, লৌহ এক পল (ষাট ভাগের একভাগ), অভ্র এক পল এই সমুদায় একত্র মর্দন করে যথাক্রমে ত্রিফলার চূর্ণ, তিলতৈল ও ভীমরাজের রসে ডুবিয়ে কুল আটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করা হয়। এই বটিকা প্রত্যেকদিন সেবন করলে সকলপ্রকার নেত্ররোগ চিরতরে বিনষ্ট হয়।

খ. আয়ুর্বেদে উল্লিখিত বিবিধ শ্রবণেন্দ্রিয় বিষয়ক রোগসমূহ : পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে অন্যতম অঙ্গ হল কর্ণ বা কান। মানুষের শরীরে সকল ইন্দ্রিয়ের ন্যায় কর্ণ বা শ্রবণেন্দ্রিয়েও বিবিধ দোষের কারণে রোগের উৎপত্তি হয়। শিশির, জলক্রীড়া, কর্ণকণ্ডূয়ন এবং শব্দের অনুপযুক্ত প্রয়োগ, এই সকল কারণে বা অন্য প্রকোপের কারণে বায়ু দূষিত হয়ে কর্ণরন্ধ্রগত শিরাসমূহকে দূষিত করে কর্ণবিবরে শূলবৎ বেদনা উপস্থিত করে, তাকেই কর্ণরোগ বলে। *সুশ্রুতসংহিতা* অনুসারে মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়ে মোট আঠাশ প্রকার রোগ জন্মায়। শ্রবণেন্দ্রিয়ে জাত রোগসমূহ হল— কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য, কর্ণক্ষেড়, কর্ণস্রাব, কর্ণকণ্ডু, কর্ণগূথ, কর্ণপ্রতীনাহ, কৃমিকর্ণ, দুই প্রকার কর্ণ বিদ্রধি, কর্ণপাক, পূতিকর্ণ, চারপ্রকার কর্ণার্শঃ, সাতপ্রকার কর্ণার্বুদ ও চারপ্রকার কর্ণশোথ। অতএব দৃষ্টিমণ্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকারে কর্ণরোগের নাম এবং রোগ হওয়ার দরুণ মানুষের শ্রবণ ক্রিয়ায় যেসকল অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তা নিম্নে উল্লিখিত হল—

১. কর্ণশূল কর্ণরোগ : কর্ণগত দূষিত বায়ু প্রতিলোমভাবে বা বিপরীতভাবে ইতস্তত বিচরণ করে কর্ণে অতি কষ্টদায়ক শূল উপস্থিত করে এবং দূষিত রক্ত, পিত্ত বা কফ ইহার মধ্যে যে দোষ দ্বারা আবৃত হয়, তার লক্ষণ প্রদর্শন করে থাকে, এইরূপ ব্যধিকে কর্ণশূল বলে। কর্ণশূল রোগে

মুর্চ্ছা, দাহ, জ্বর, কাস, ক্লম ও বমি এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত হয়। কর্ণশূল রোগবিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> সমীরণঃ শ্রোত্রগতোঽন্যথা চরন্ সমন্ততঃ শূলমতীব কর্ণয়োঃ।
> করোতি দোষৈশ্চ যথাস্বমাবৃতঃ স কর্ণশূলঃ কথিতো দুরাচরঃ।।[১৩৬]

২. কর্ণনাদ কর্ণরোগ : কর্ণস্রোতে বায়ু বিবিধ প্রকারে অবস্থিত হয়ে কর্ণে ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ প্রভৃতির ন্যায় বিবিধ প্রকার শব্দ অনুভূত হয়, এইজাতীয় কর্ণরোগকে কর্ণনাদ বলে। কর্ণনাদ রোগের উদাহরণ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> কর্ণস্রোতঃস্থিতে বাতে শৃণোতি বিবিধান্ স্বনান্।
> ভেরীমৃদঙ্গশঙ্খানাং কর্ণনাদঃ স উচ্যতে।।[১৩৭]

৩. বাধির্য্য বা কালা কর্ণরোগ : শুদ্ধ বায়ু বা কফ সংযুক্ত বায়ু শব্দবহ স্রোতকে আবরণ করলে, বাধির্য্য বা কালা রোগ উপস্থিত হয়। উক্ত রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> যদা শব্দবহং বায়ুঃ স্রোত আবৃত্য তিষ্ঠতি।
> শুদ্ধঃ শ্লেষ্মান্বিতো বাপি বাধির্য্যং তেন জায়তে।।[১৩৮]

৪. কর্ণক্ষ্বেড় কর্ণরোগ : শ্রমহেতু, ক্ষয়হেতু, রুক্ষভোজনহেতু ও কষায়ভোজনহেতু বায়ু শব্দপথে অবস্থিত হয়ে কর্ণদ্বয়ে অতীব ক্ষ্বেড় অর্থাৎ বেণুশব্দের ন্যায় শব্দানুভব উপস্থিত হয়, তাকে কর্ণক্ষ্বেড় বলে। কর্ণনাদ ও কর্ণক্ষ্বেড় রোগের পার্থক্য হল, কর্ণনাদ রোগ বায়ুজন্য হয় এবং ইহাতে নানাবিধ শব্দ শ্রুত হয়। কর্ণক্ষ্বেড় রোগ পিত্তাদিযুক্ত বায়ুদ্বারা উৎপন্ন হয় এবং ইহাতে কেবলমাত্র বেণুশব্দ শ্রুত হয়। কর্ণক্ষ্বেড় কর্ণরোগের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> বায়ুঃ পিত্তাদিভির্যুক্তো বেণুবোষসমস্বনম্।
> করোতি কর্ণয়োঃ ক্ষ্বেড়ং কর্ণক্ষ্বেড়ঃ স উচ্যতে।।[১৩৯]

৫. কর্ণস্রাব কর্ণরোগ : মস্তকে আঘাত, জলে নিমজ্জন অথবা কর্ণজাত বিদ্রধির পাক এইসকল কারণে বায়ু দূষিত হয়ে কর্ণকে প্রপীড়িত করে তা থেকে পুঁজ রক্ত ও জল নিসৃত হতে থাকে, তাকে কর্ণস্রাব বলে। কর্ণস্রাব বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

শিরোঽভিঘাতাদথবা নিমজ্জতে জলে প্রপাকাদথবাপি বিদ্রধেঃ।
স্রবেদ্ধি পূয়ং শ্রবণোঽনিলার্দ্দিতঃ স কর্ণসংস্রাব ইতি প্রকীর্ত্তিতঃ।।[১৪০]

৬. কর্ণকণ্ডূ কর্ণরোগ : কর্ণগত বায়ু কফ সংযুক্ত হয়ে কর্ণে কণ্ডূ উপস্থিত করে, তাকে কর্ণকণ্ডূ বলে। উক্ত রোগের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

মারুতঃ কফসংযুক্তঃ কর্ণে কণ্ডুং করোতি হি।।[১৪১]

৭. কর্ণগূথ কর্ণরোগ : কর্ণস্থ কফ পিত্তোষ্মদ্বারা শোষিত হয়ে কর্ণগূথ ব্যাধি উৎপাদন করে। কর্ণগূথ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

পিত্তোষ্মশোষিতঃ শ্লেষ্মা কুরুতে কর্ণগূথকম্।[১৪২]

৮. কর্ণপ্রতীনাহ কর্ণরোগ : কর্ণগূথ রোগ যদি দ্রব্য হয়ে নাসিকা ও মুখ দিয়ে নির্গত হয়, তাহলে তাকে কর্ণ প্রতীনাহ বলে। কর্ণপ্রতীনাহ রোগ মস্তকেরও রোগ উৎপাদন করে। কর্ণপ্রতীনাহ রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

স কর্ণগূথো দ্রবতাং যদা গতো বিলাপিতো ঘ্রাণমুখং প্রপদ্যতে।
তদা স কর্ণপ্রতিনাহসংজ্ঞিতো ভবেদ্ বিকারঃ শিরসোঽর্দ্ধভেদকৃৎ।।[১৪৩]

৯. কৃমিকর্ণক কর্ণরোগ : কর্ণের অভ্যন্তরে মাংস ও রক্ত পচে গিয়ে কৃমি প্রভৃতি উৎপন্ন হলে অথবা মক্ষিকাগণ ডিম্ব প্রসব করলে, তাকে কৃমিকর্ণরোগ বলা হয়। কর্ণে কৃমিলক্ষণ প্রকাশ পায় বলে প্রাচীন বৈদ্যগণ কর্তৃক ইহা কৃমিকর্ণক রোগ নামে অভিহিত করা হয়। উক্ত রোগের উদাহরণ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

যদা তু মূর্চ্ছন্ত্যথবাপি জন্তবঃ সৃজন্ত্যপত্যান্যথবাপি মক্ষিকাঃ।
তদ্ব্যঞ্জনত্বাচ্ছ্রবণো নিরুচ্যতে ভিষগ্ভিরাদ্যৈঃ ক্রিমিকর্ণকো গদঃ।।[১৪৪]

১০. দ্বিবিধ কর্ণবিদ্রধি কর্ণরোগ : মানুষের কর্ণে দুই প্রকার বিদ্রধি হয়ে থাকে, একপ্রকার বিদ্রধি আগুন্তজ অর্থাৎ ক্ষত বা আঘাত থেকে উৎপন্ন হয় এবং অপর বিদ্রধি দোষজ অর্থাৎ বাতাদি দোষ থেকে উৎপন্ন হয়। কর্ণ বিদ্রধি রোগদ্বয়ে সূচীবেধবৎ বেদনা, ধূমনির্গমনবৎ পীড়া, দাহ ও সন্তাপ

এই সকল উপদ্রব উপসস্থিত হয় এবং রক্ত, পীত বা অরুণবর্ণ স্রাব নির্গত হয়। দ্বিবিধ কর্ণবিদ্রধি বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

ক্ষতাভিঘাতপ্রভবস্তু বিদ্রধি ভবেৎ তথা দোষকৃতোঽপরঃ পুনঃ।
সরক্তপীতারুণমস্রমাস্রবেৎ প্রতোদধুমায়নদাহচোষবান্।।[১৪৫]

১১. কর্ণপাক কর্ণরোগ : পিত্তপ্রকোপ হেতু কর্ণদ্বয় পেকে গিয়ে পূতিভাব ও আর্দ্রতা উপস্থিত হয়, তাকে কর্ণপাক রোগ বলে। উক্ত রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

কর্ণপাকস্তু পিত্তেন কোথবিক্লেদকৃদ্ ভবেৎ।।[১৪৬]

১২. পূতিকা কর্ণরোগ : কর্ণবিদ্রধির পাক অথবা কর্ণের জলপূর্ণতাহেতু দুর্গন্ধ পুঁজ নিঃসৃত হলে তাকে পূতিকর্ণ রোগ বলা যায়। পূতিকর্ণে সর্বদা পূতি স্রাবই নির্গত হয়। উক্ত রোগের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

কর্ণবিদ্রধিপাকাদ্ বা কর্ণে বা বারিপূরণাৎ।
পূয়ং স্রবতি যঃ পূতি স জ্ঞেয়ঃ পূতিকর্ণকঃ।।[১৪৭]

১৩. চতুর্বিধ অর্শ কর্ণরোগ : কর্ণে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তনিমিত্ত চারপ্রকার অর্শরোগ হয়ে থাকে। বাতজ কর্ণরোগে নানাবিধ শব্দ, অতিশয় বেদনা, কর্ণমূলের শুষ্কতা, পাতলা ধাতুনির্গম ও শ্রবণশক্তির লোপ পায়।

পৈত্তিক কর্ণরোগে রক্তবর্ণ শোথ, বিদারণবৎ পীড়া, দাহ এবং পীতবর্ণ দুর্গন্ধ স্রাব নির্গম এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

শ্লৈষ্মিক বা কফজ কর্ণরোগে শ্রবণবৈপরীত্য, কণ্ডূ, কঠিনশোথ, শ্বেতবর্ণ চিকণ স্রাব নির্গমন ও অল্প বেদনা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

রক্তজ বা ত্রিদোষজ কর্ণরোগে উল্লিখিত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই ত্রিবিধ কর্ণরোগেরই লক্ষণ সংঘটিত এবং প্রত্যেক দোষজ স্রাবের বর্ণবিশিষ্ট স্রাব নিসৃত হয়।

১৪. সপ্তবিধ অর্বুদ কর্ণরোগ : মানুষের কর্ণে অর্বুদ সাতপ্রকার হয়। যথা— বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা কফজ, রক্তজ, মাংসজ, মোদোজ ও শিরাজ।

- উপর্যুক্ত আঠাশ প্রকার কর্ণরোগ ছাড়াও পরিপোটক কর্ণরোগ, উৎপাত কর্ণরোগ, উন্মন্থক কর্ণরোগ, দুঃখবর্দ্ধন কর্ণরোগ, পরিলেহিনো কর্ণরোগ মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়ে দেখা যায়। এই পাঁচপ্রকার অতিরিক্ত কর্ণরোগ মানুষের ভুল কার্যের দ্বারা সৃষ্ট হয়। উক্ত কর্ণরোগ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিম্নে আলোচিত হল—

i. পরিপোটক কর্ণরোগ : পূর্বতন লোকেরা কর্ণপালীর বৃহদায়তন ও স্থূলতাকে সৌন্দর্য্যের অংশ মনে করে শিশুকাল থেকে সুকোমল কর্ণ টেনে বৃহদ্বাকার করার চেষ্টা করতেন। কর্ণ অনেকসময় ধরে অধিক জোরে টানার ফলে কর্ণের শিরাতে কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ স্তব্ধভাবাপন্ন শোথ উৎপন্ন হয় এবং ঐ স্থানের ত্বক্ ঈষৎ বিদীর্ণ ও বেদনা সঞ্জাত হয়, এইজাতীয় কর্ণপীড়ার নাম পরিপোটক। এইজাতীয় কর্ণরোগ মূলতঃ বাতজ রোগ হয়। পরিপোটক কর্ণরোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> সৌকুমার্য্যাচ্চিরোৎকৃষ্টে সহসাতি প্রবর্দ্ধিতে।
> কর্ণশোথো ভবেৎ পাল্যাং সরুজঃ পরিপোটবান্।
> কৃষ্ণারুণাভিঃ সংস্তব্ধঃ স বাতাৎ পরিপোটকঃ।।[১৪৮]

ii. উৎপাত কর্ণরোগ : অধিক ভারবিশিষ্ট কর্ণে আভাড়ণ ধারণ, তাড়ন বা নির্যাতন ও ঘর্ষণ এই সকল কারণে কর্ণের পালীতে বা শিরাতে শ্যাব বা রক্তবর্ণ শোথ উৎপন্ন হয়ে দাহ, বেদনা ও পাক উপস্থিত হয়, এইজাতীয় ব্যাধিকে উৎপাত বলে। এই জাতীয় ব্যধি রক্ত-পিত্ত দোষের কারণেই হয়। উৎপাত কর্ণরোগের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> গুর্ব্বাভরণ সংযোগাৎ তাড়নাদ্ ঘর্ষণাদপি।
> শোথঃ পাল্যাং ভবেচ্ছ্যাবো দাহপাকরুজান্বিতঃ।
> রক্তো বা রক্তপিত্তাভ্যামুৎপাতঃ স গদঃ স্মৃতঃ।।[১৪৯]

iii. উন্মন্থক কর্ণরোগ : বলপূর্বক কর্ণ টানিলে কর্ণের শিরাতে বায়ু কুপিত ও কফের সহিত সংযুক্ত হয়ে স্তব্ধ, অল্পবেদনাযুক্ত ও কুণ্ডুবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন করে, এইরূপ ব্যাধিকে উন্মন্থক বলে।

এইপ্রকার রোগ বাতশ্লৈষ্মিক পীড়া। উক্ত কর্ণরোগের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> কর্ণং বলাদ্ বর্দ্ধয়তঃ পাল্যাং বায়ুঃপ্রকুপ্যতি।
> কফং সংগৃহ্য কুরুতে শোথং স্তব্ধমবেদনম্।
> উন্মন্থকঃ সকণ্ডুকো বিকারঃ কফবাতজঃ।।[১৫০]

iv. দুঃখবর্দ্ধন কর্ণরোগ : কর্ণ বৃদ্ধির নিমিত্ত টানলে অথবা অনুচিতরূপে বিদ্ধ করলে কণ্ডু, দাহ ও বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয়ে পাক প্রাপ্ত হয়, এইজাতীয় কর্ণরোগকে দুঃখবর্দ্ধন বলে। ইহা সন্নিপাতজ বা ত্রিদোষজ ব্যাধি। উক্ত কর্ণরোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> সংবর্দ্ধ্যমানে দুর্ব্বিদ্ধে কণ্ডূদাহরুজান্বিতঃ।
> শোথো ভবতি পাকশ্চ ত্রিদোষো দুঃখবর্দ্ধনঃ।।[১৫১]

v. পরিলেহী কর্ণরোগ : কফ ও রক্ত বিকৃত হওয়ায় ইতস্ততঃ বিচরণশীল সর্ষপাকার কৃমি সকল কর্ণগহ্বরে বিচরণ করে কণ্ডু, বেদনা ও দাহযুক্ত পীড়া উৎপাদন করে। সেই কফরক্ত কৃমিসম্ভূত পিড়কাত্মক ব্যাধি ইতস্তত বিসর্পিত হয়ে কর্ণগহ্বরকে নির্মাংস বা আচ্ছাদিত করে, এইরূপ ব্যাধিকে পরিলেহী বলে। পরিলেহী কর্ণরোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> কফাসৃকক্রিমিসংভূতঃ স বিসর্পন্নিতস্ততঃ।
> লিহেৎ সশঙ্কুলীং পালীং পরিলেহীতি স স্মৃতঃ।।[১৫২]

❖ **<u>আয়ুর্বেদিক পদ্ধতি অনুসারে বিবিধ কর্ণরোগের চিকিৎসা পদ্ধতি</u> :** বনৌষধি আবিস্কার করেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ। প্রকৃতির রত্নাগার হতে এই শ্রেষ্ঠ রত্ন আহরণের জন্য তৎকালীন যুগের মানুষেরা অনুসন্ধান করে গেছে। এই অনুসন্ধানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শরীরের বিবিধ অঙ্গে জাত রোগসমূহ থেকে মুক্তিলাভ। তেমনি শরীরের পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে অন্যতম অঙ্গ হল শ্রবণেন্দ্রিয়। এই শ্রবণেন্দ্রিয়ে জাত রোগসমূহের উপশম বিষয়ে *আয়ুর্বেদে* বিবিধ প্রকার চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে। *সুশ্রুতসংহিতা* অনুসারে যেসকল কর্ণরোগের কথা গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত হয়েছে, সেই সকল রোগের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির কথা মাধবকর তাঁর *ভৈষজ্য রত্নাবলী*

গ্রন্থে 'কর্ণরোগাধিকার'[১৫৩] অধ্যায়ে বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। কর্ণরোগের প্রতিষেধ বিষয়ে যেসকল আয়ুর্বেদিক পদ্ধতি *ভৈষজ্য রত্নাবলী* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে তা নিম্নে আলোচিত হল—

১. কদবেল পত্রের রস, ট্যাবা লেবুর রস ও আদার রস ঈষৎ উষ্ণ করে কর্ণে দিলে কর্ণশূল নিবারণ হয়।

২. রসুন, আদা, সজিনাছাল, মূলা ও কদলী বা কলাগাছের রস ঈষৎ উত্তপ্ত করে কর্ণগহ্বরে দিলে যন্ত্রনা থেকে মুক্তি লাভ হয়।

৩. আদা, মধু, সৈন্ধব ও তৈল এই সকল দ্রব্য ঈষৎ উষ্ণ করে কর্ণে দিলে বেদনার উপশম হয়।

৪. আদা, হুড়হুড়ে বা স্পাইডার ফুল, সজিনা অথবা মূলার রস, মধু, তৈল ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করে কর্ণে দিলে কর্ণশূল নিবারণ হয়।

৫. সজিনার রস তিলতৈলের সহিত সংযুক্ত ও উষ্ণ করে কর্ণে পূরণ করলে কর্ণশূল উপশমিত হয়।

৬. কতগুলি অশ্বত্থপত্র পুট বা ঠোঙ্গা তৈরি করে তা তৈলাক্ত ও অঙ্গারপূর্ণ করে কর্ণের উপর স্থাপন করে, অঙ্গারের উত্তাপে তৈলবিন্দুসকল কর্ণরন্ধ্রে পতিত হয়, যার ফলে তৎক্ষণাৎ কর্ণের বেদনার নিবৃত্তি হয়।

৭. আকন্দপত্রের পিঠে সিজপত্র বা ফণিমনসা পত্র ঝলসানো অবস্থায়, তার ইষদুষ্ণ রস কর্ণে দিলে কর্ণশূল নিবারণ হয়।

৮. পাকা আকন্দপত্রে ঘৃত লেপন অবস্থায় অগ্নিতে উত্তপ্ত করে তার রস নিপীড়ন করে কর্ণগহ্বরে দিলে কর্ণশূল ও তজ্জনিত বেদনার নিবৃত্তি হয়।

৯. হিং, ধনিয়া, শুঁঠ বা শঠি এই সমুদায়ের সহিত সর্ষের তেল পাক করে কর্ণে দিলে কর্ণশূল নিবারণ হয়।

১০. তৈল ৪ সের, মধুশুক্ত ১৬ সের, ট্যাবালেবুর রস ১৬ সের, কদলী বা কলাগাছের রস ১৬ সের এবং কল্কার্থ বা খইল বালার ক্ষার, মূলার ক্ষার, শুঁঠের ক্ষার, হিং, শুঁঠ, শুল্ফা বা মৌরিজাতীয়

একপ্রকার সুগন্ধি শাক, বচ, কুড়, দারুহরিদ্রা, সজিনাছাল, রসাঞ্জন বা কপূর, সচললবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, উদ্ভিদলবণ, সৈন্ধবলবণ, ভূর্জপত্র, পিপুলমূল, বিটলবণ, মুতা বা মুঠা একত্রে মিলিত ১ সের (০.৯৩৩ গ্রাম) । এই জাতীয় মিশ্রিত তৈল কর্ণে পূরণ করলে বধিরতা, কর্ণনাদ, পূয়স্রাব ও কৃমি নিবারণ হয়।

১১. তিলতৈল ৪ সের, কাঁজি ১৬ সের, কল্কার্থ সাচিক্ষার, শুষ্কমূলা, হিঙ্গু, পিপুল, শুঁঠ, শুল্ফা মিলিত ১ সের মিশ্রিত কর্ণগহ্বরে দিলে কর্ণনাদ, কর্ণশূল, বধিরতা ও কর্ণস্রাব নিবারণ হয়।

১২. তিলতৈল ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, কল্ক গোমূত্রপিষ্ঠ বেলশুঁঠ ১ সের মিশ্রিত করে কর্ণে দিলে বাধির্য্য রোগের উপশম হয়।

১৩. তিলতৈল ১ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, কল্কার্থ রসুন, আমলা হরিতাল মিলিত ২ পল একত্রে মিশ্রিত করে কর্ণে দিলে বধিরতার নিবারণ হয়।

১৪. পঞ্চকষায় চূর্ণ কদবেলের রস মধুর সহিত মিশ্রিত করে কর্ণে পূরণ করলে কর্ণ থেকে পূয়াদি বা পুঁজ নিঃসারণ নিবারণ হয়।

১৫. মধু সংযুক্ত মালতীপত্রের রস অথবা গোমূত্র দ্বারা কর্ণ পরিষ্কার করলে পূতিরোগ বা কানপচা রোগ নিবারিত হয়।

১৬. কচি জামপত্র, কচি আমপত্র, কদবেল, কার্পাস ফল, আদা এই সমুদায়ের রস নিপীড়িত ও তার সঙ্গে মধু মিশ্রিত করে কর্ণে পূরণ করলে কর্ণস্রাব নিবারণ হয়।

১৭. উপর্যুক্ত দ্রব্যের সহিত নিম, করঞ্জ বা করমচা ও সর্ষের তৈল সিদ্ধ করে কর্ণে পূরণ করলে স্রাব নিবারণ হয়।

১৮. শাল গাছের ত্বক্ চূর্ণ ও কার্পাস ফলের রস একত্র মিশ্রিত ও মধু সংযুক্ত করে কর্ণে প্রদান করলে কর্ণস্রাবের নিবারণ হয়।

১৯. কটুতৈলে শামুকের মাংস সিদ্ধ করে ঐ তৈল কর্ণে প্রদান করলে কর্ণনালী প্রশমিত হয়।

২০. কটুতৈল ১ সের, ধুতুরাপাতার রস ৪ সের, কল্ক হরিদ্রা বা কাঁচা হলুদ ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা প্রভৃতি মিশ্রিত তৈল কর্ণে প্রয়োগের ফলে কর্ণনালী রোগের প্রশমন ঘটায়।

২১. নিসিন্দাপত্র রস, তৈল, সৈন্ধব লবণ, ঝুল, পুরাতন গুড় ও মধু এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করে কর্ণে পূরণ করলে পূতিকর্ণ রোগ নষ্ট হয়।

২২. জাতীপত্রের রসের সহিত পক্কতৈল কর্ণে পূরণ করলে পূতিকর্ণ রোগ নিবারণ হয়। এইরূপ বরুণ, আকন্দ, কদবেল, আম ও জাম প্রভৃতি পত্রের সহিত পক্ক তৈল অথবা শুদ্ধ জাতীপত্ররস পূতিকর্ণ রোগে প্রযোজ্য।

২৩. হুড়হুড়ে, নিসিন্দাপত্রের রস ১ তোলা, প্রক্ষেপ ত্রিকটু চূর্ণ ৪ রতি কর্ণে পূরণ করলে কর্ণের কৃমি বিনষ্ট হয়।

২৪. শিলাজতু, অভ্র ও লৌহ প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বর্ণ ০.২৫ সিকি ভাগ এই সমুদায় একত্র করে কাকমাচি, শতমূলী, আমলকী ও পদ্মের রস একত্রে মিশ্রিত করে ২ রতি কর্ণরোগের ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। আমলকীর রস প্রত্যহ সকালে এক চামচ সেবন করলে কর্ণনাদাদি রোগসমস্ত, বাতজ ব্যাধিসকল নিরাকৃত হয়।

২৫. অনন্তমূল, যষ্ঠীমধু, কুড়, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাচ, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল মূল, গুলঞ্চ, লবঙ্গ, হরিতকী, আমলা ও বহেড়া প্রত্যেক সমভাগ, সমষ্টিতুল্য অভ্র এবং অভ্রের সমান লৌহ এই সমুদায় একত্র করে কেশুরিয়ার রস, অর্জুনছালের ক্বাথ, যবের ক্বাথ, কাকমাচি বা তিতবেগুনের রস ও কুঁচমূলের ক্বাথ দিয়ে ৬ রতি ঔষধ প্রস্তুত হবে এবং এই ঔষধ ঈষৎদুষ্ণ দুগ্ধ, শতমূলীর রস অথবা চন্দন মিশ্রিত জলের সহিত প্রত্যহ সকালে খালিপেটে ১ চামচ সেবন করলে বিবিধ কর্ণরোগ, প্রমেহ ও রক্তপিত্তাদি নানা পীড়ার উপশম হয়।

গ. আয়ুর্বেদে উল্লিখিত বিবিধ অস্থি বিষয়ক রোগসমূহ : প্রত্যেক মানুষের শরীর ও মানস উভয়বিধ রোগ প্রধানত শরীরকে আশ্রয় করে উৎপন্ন হয় বা প্রকাশ পায়। উভয়বিধ রোগে শরীরই চিকিৎসার প্রধান ক্ষেত্র। শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হলে প্রথমেই অস্থির বিষয়ে অবগত হওয়া প্রয়োজন। কারণ অস্থি সমূহকে অবলম্বন করেই শরীর অবস্থিত থাকে। মানুষের শরীরে

অস্থি যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেইরূপ অস্থিসকল সেই সেই স্থানেই অবস্থিত। চরক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বেদবাদীদিগের মতে অস্থির সংখ্যা তিনশত ষাট টি। সুশ্রুত, ভেল প্রভৃতি শল্যতান্ত্রিকদের মতে অস্থির সংখ্যা তিনশত। পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের মতে অস্থির সংখ্যা দুইশত ছয়। প্রত্যেক পণ্ডিতগণ নিজ নিজ মতানুযায়ী অস্থির সংখ্যানুসারে বিবিধ রোগের কথা উল্লেখ্য করেছেন। তন্মধ্যে মূলতঃ সাত প্রকার অস্থিরোগের কথা এই গবেষণা সন্দর্ভে উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের নিরিখে আলোচিত হয়েছে। অস্থিরোগকে *আয়ুর্বেদশাস্ত্রে* বাতব্যাধি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই সাত প্রকার অস্থিরোগ *সুশ্রুতসংহিতা* অনুসারে আলোচিত হল—

১. কুব্জ অস্থিরোগ : দূষিত বায়ু কুপিত হয়ে যদি হৃদয় বা পৃষ্ঠকে ক্রমশ উন্নত ও ব্যাথিত করে তোলার ফলে পৃষ্ঠে যদি কুঁজ অর্থাৎ টিট্টিভ পাখির ন্যায় এবং জঙ্ঘা ও পাদদ্বয় দীর্ঘ-কৃশের ন্যায় দেখায়, তখন তাকে কুব্জ অস্থিরোগ বলে। উক্ত রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> হৃদয়ং যদি বা পৃষ্ঠমুন্নতং ক্রমশঃ সরুক্।
> ক্রুদ্ধো বায়ুর্যদা কুর্য্যাৎ তদা তং কুব্জমাদিশেৎ।।[১৫৪]

২. খঞ্জ ও পঙ্গু জাতীয় অস্থিরোগ : কটিস্থ বায়ু কুপিত হয়ে যদি ঊরুস্থ কণ্ডরাকে আক্ষিপ্ত করে, তবে রোগীকে খঞ্জ বলা যায়। যার উভয় ঊরুই এইরূপ কুপিত বায়ু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তাকে পঙ্গু বলা হয়। খঞ্জ ও পঙ্গু এই দুই শব্দ ভাব প্রধান নির্দেশে রোগবাচক হয়। খঞ্জ ও পঙ্গু রোগের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> বায়ুঃ কট্যাশ্রিতঃ সক্থুঃ কণ্ডরামাক্ষিপেদ্ যদা।
> খঞ্জস্তদা ভবেজ্জন্তুঃ পঙ্গুঃ সক্থোর্কয়োর্বধাৎ।।[১৫৫]

৩. কলায়খঞ্জ অস্থিরোগ : যে ব্যক্তি চলতে আরম্ভ করার সময় খঞ্জের ন্যায় কাঁপতে থাকে অথচ গমন করতে পারে না, তাকে কলায়খঞ্জ বলে। এইরূপ ব্যাধিতে পদদ্বয়ের সন্ধিবন্ধন সমস্ত শিথিল হয়ে যায়। উক্ত রোগের উদাহরণ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> প্রক্রামন্ বেপতে যস্ত খঞ্জন্নিব চ গচ্ছতি।
> কলায়খঞ্জং তং বিদ্যান্মুক্তসন্ধিপ্রবর্দ্ধনম্।।[১৫৬]

৪. বাতকণ্টক অস্থিরোগ : উচ্চনীচ স্থানে পা পড়লে অথবা শ্রমহেতু কুপিত বায়ু পাদ ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থানে আশ্রয় করে বেদনা উৎপাদন করে, তখন তাকে বাতকণ্টক অস্থিরোগ বলে। বাতকণ্টক রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> রুক্ পাদে বিষমে ন্যস্তে শ্রমাদ বা জায়তে যদা।
> বাতেন গুল্ফমাশ্রিত্য তমাহুর্বাতকণ্টকম্।।[১৫৭]

৫. পাদদাহ অস্থিরোগ : বায়ু, পিত্ত ও রক্তের সহিত সংযুক্ত হয়ে পাদদ্বয়ে রোগ উৎপাদন করে। অধিক ভ্রমণ হেতু প্রায় এই পীড়া উৎপন্ন হয়ে থাকে। পাদদাহ অস্থিরোগবিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> হৃষ্যেতে চরণৌ যস্য ভবেতাঞ্চাপি সুপ্তকৌ।
> পাদহর্ষঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কফবাত প্রকোপজঃ।।[১৫৮]

৬. পাদহর্ষ অস্থিরোগ : কফযুক্ত বায়ুর প্রকোপবশতঃ যার পদদ্বয় হৃষ্ট হয় বা শিড়শিড় করে এবং অসাড়ের মতো হয়ে যায়, তখন তাকে পাদহর্ষ অস্থিরোগ বলে। উক্ত রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> হৃষ্যেতে চরণৌ যস্য ভবেতাঞ্চাপি সুপ্তকৌ।
> পাদহর্ষঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কফবাত প্রকোপজঃ।।[১৫৯]

৭. বাহুশোষ অস্থিরোগ : স্কন্ধদেশস্থ বায়ুর প্রকোপবশতঃ স্কন্দ বন্ধনকারক শ্লেষ্মাকে শোষণপূর্বক বাহুর শিরা সকলকে সঙ্কুচিত করে অববাহুক নামক বাতরোগ উৎপাদন করে। বাহুশোষ অস্থিরোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> অংসদেশে স্থিতো বায়ুঃ শোষয়েদংসবন্ধনম্।
> অংসবন্ধন শোষাৎ স্যাদ্ বাহুশোষঃ সবেদনঃ।।[১৬০]

❖ **<u>আয়ুর্বেদিক পদ্ধতি অনুসারে বিবিধ অস্থিরোগের চিকিৎসা পদ্ধতি</u> :** *আয়ুর্বেদে* বিবিধ প্রকারে অস্থিরোগের চিকিৎসাপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। *সুশ্রুতসংহিতা* অনুসারে যেসকল অস্থিরোগের কথা গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত হয়েছে, সেই সকল রোগের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা-পদ্ধতির কথা

মাধবকর তাঁর *ভৈষজ্য রত্নাবলী* গ্রন্থে 'বাতব্যাধ্যধিকার'[১৬১] অধ্যায়ে বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। অস্থিরোগের প্রতিষেধ বিষয়ে যেসকল আয়ুর্বেদিক পদ্ধতি *ভৈষজ্য রত্নাবলী* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে তা নিম্নে আলোচিত হল—

১. বায়ু দ্বারা শিরা বিকৃত হলে ঘৃত-তৈলাদির গণ্ডূষ অর্থা ঘৃত-তৈলাদি দ্রব্য দিয়ে বিকৃত শিরায় মালিশ করতে হবে। বায়ু দ্বারা মানুষের কুব্জতা প্রাপ্ত হলে বাতঘ্ন ঔষধ, দশমূলের ক্বাথ, স্নেহসেবন অর্থাৎ যেসকল খাদ্যে সম্পৃক্ত চর্বি জাতীয় এসিড বেশি মাত্রায় থাকে, সেইসকল খাদ্যদ্রব্যগুলিকে স্নেহজাতীয় খাদ্য বলে, যেমন— মাংস, মাখন, পনির, চকলেট, বাদাম ইত্যাদি ভোজন করা প্রয়োজন। কিন্তু কুব্জতা অধিক প্রাপ্ত হলে এজাতীয় ভোজন অসাধ্য।

২. কুল- আঁটির শস্য, কুলথু কলায় বা কুলথি কলায়, দেবদারু, রাস্না, মাষকলায়, মসিনার তৈল বা তিসির তৈল, ত্রিফলা, কুড় বা কুরচি, শুলফা বা ঝিঙ্গাগাছ, যবচূর্ণ একসঙ্গে বেটে উষ্ণ করে প্রলেপ দিলে বাতরোগের প্রশমন হয়।

৩. তিল তৈল ৪ সের, শতমূলীর রস ৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, আদার রস ৪ সের একসঙ্গে মিশ্রিত করে এবং কল্কার্থ বা খইল, শুলফা, দেবদারু, জটামাংসী বা জটামানসী, শৈলজ, বেড়ালা, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা বা টগর ফুলের মূল, কুড়, এলাইচ, শালপাণি, রাস্না, অশ্বগন্ধা, বরাক্রান্তা বা বরাহক্রান্তা, শ্যামলতা, অনন্তমূল, চাকুলে, বচ, এরণ্ডমূল বা রেড়ী, সৈন্ধব লবণ, শুঁঠ প্রভৃতি মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দনে কুব্জতা, পঙ্গু প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

৪. শতমূলীর রস ৪ সের, কুষ্মাণ্ড জল ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, শিমূলমূলের রস ৪ সের, গোক্ষুর রস ৪ সের, নারিকেলের জল ৪ সের, কদলীমূলের বা কলাগাছের মূলের রস ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, তিল তৈল ৪ সের মিশ্রিত অবস্থায় কল্কদ্রব্য অর্থাৎ রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, শৈলজ, যষ্ঠিমধু, দেবদারু, নখী, হরিতকী, খাটাশী, পিড়িংশাক পত্র, কুন্দুরখোটী, নালুকা, শতমূলী, লোধকাষ্ঠ, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জয়িত্রী, মৌরী, শটী, শ্বেতচন্দন, গেঁটেলা, কর্পূর ২ তোলা। এই তৈলে গন্ধদ্রব্যসকল নিক্ষেপ করার ফলে বায়ুরোগের অতি উৎকৃষ্ট তৈল সৃষ্টি হয়। এই তৈল মর্দনে উচ্চস্থানাদি থেকে পতনের জন্য বেদনা, পঙ্গুতা, অঙ্গশোষ, বিকৃতি ও অন্যান্য বাতব্যধি প্রশমিত হয়।

৫. হীরক, স্বর্ণ, মুক্তা, তীক্ষ্ণলৌহ প্রত্যেক ১ ভাগ, অভ্র ৪ ভাগ, রসসিন্দুর ৪ ভাগ, লৌহ বা প্রস্তর খণ্ডে ঘৃতকুমারী রস মর্দন করে ১ রতি ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। ইহা অনুপান দ্বারা বাতব্যাধি ও অনান্য বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

৬. পিঁপুলমূল, চিতামূল, পিঁপুল, শুঁঠ, রাস্না ও সৈন্ধব লবণ প্রভৃতি মাষকলায় ক্বাথের সহিত যথাবিধি তিলতৈল পাক করে ঐ তৈল মর্দন করলে সকল প্রকার বাতব্যধির উপশম হয়।

৭. কুব্জত্বরোগে দশমূল ও অন্যান্য বাতঘ্ন ঔষধ, স্নেহ দ্রব্য ও মাংসের যুষ হিতকর।

৮. তিল তৈল ৪ সের, ক্কাতার্থ শতমূলী, শালপাণি, চাকুলে, শটী, বচ, এরণ্ডমূল, কণ্টকারীমূল, বৃহতীমূল, নাটাকরঞ্জমূল, গোরক্ষচাকুলের মূল, ঝাঁটিমূল প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; গব্য ও ছাগদুগ্ধ প্রত্যেক ৮ সের, শতমূলীর রস ৪ সের। কল্কার্থ পুনর্নবা, বচ, দেবদারু, শুলফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, এলাচ, জটামাংসী, শালপাণি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, রাস্না প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল মর্দনে কুব্জ, খঞ্জ, পঙ্গু, কলায়খঞ্জ প্রভৃতি সকলপ্রকার অস্থিরোগের উপশম হয়।

৯. তিল তৈল ১৬ সের, ক্বাথার্থ গন্ধভাদুলে ৬ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দধির স্বর ১৬ সের, কাঁজি ১৬ সের, দুগ্ধ ৩২ সের। কল্কদ্রব্য যথা চিতামূল, পিপুলমূল, যষ্ঠিমধু, সৈন্ধব, বেড়েলা, শুলফা, দেবদারু, রাস্না, গজপিপ্পলী, গন্ধভাদুলের মূল, জটামাংসী, ভেলার মুটী প্রত্যেক ২ পল। এই তৈল মর্দনে কুব্জতা, পঙ্গুত্ব ও অন্যান্য বাতব্যাধী রোগের উপশম হয়।

১০. তিল তৈল ৪ সের, বেড়েলামূলের ক্বাথ ৩২ সের, মিলিত দশমূলের ক্বাথ ৩২ সের, যব, কুলশুঁঠ ও কুলথি ডালের ক্বাথ মিলিত ৩২ সের, দুগ্ধ ৩২ সের। কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকলা, ক্ষীরকাকলা, মুগানি, মাষাণি, জীবন্তি, যষ্ঠিমধু, সৈন্ধব, অগুরু, শ্বেত ধূনা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচ, পীতচন্দন, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, তগরপাদুকা, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুলফা, পুনর্নবা মিলিত ১ সের প্রভৃতি মিশ্রিত তৈল মর্দন করলে সকলপ্রকার বাতব্যাধি রোগ নিবারিত হয়।

ঘ. আয়ুর্বেদে উল্লিখিত বিবিধ মানসিক বিষয়ক রোগসমূহ : মুহ্ ধাতু থেকে উৎপত্তি হয় মুর্চ্ছা রোগের অর্থাৎ মস্তিষ্কের স্মরণশক্তির পুরোপুরি লোপ পায়। মস্তিষ্কের জ্ঞানাদির যাবতীয় নাড়ী বাতাদিদ্বারা আচ্ছন্ন হলে সহসা সুখ ও দুঃখজ্ঞাননাশক তমোগুণ এসে উপস্থিত হয় এবং সুখ-দুঃখ জ্ঞানের নাশহেতু মনুষ্য কাষ্ঠবৎ পতিত হয়, এই পীড়ার নাম মোহ বা মূর্চ্ছা। *আয়ুর্বেদশাস্ত্রে* মূলতঃ তিনপ্রকার মানসিক রোগের কথা উল্লিখিত হয়েছে, যথা— উন্মাদরোগ বা পাগল, অপস্মার বা মৃগী রোগ এবং মূর্চ্ছা বা মানসিক রোগ। আমার এই গবেষণাসন্দর্ভে মূর্চ্ছা রোগের কথায় বলা হয়েছে। মুর্চ্ছা রোগ উপস্থিত হওয়ার পূর্বে হৃদয়ে পীড়াবিশেষ, জৃম্ভণ বা প্রবল হাসি, গ্লানি ও জ্ঞানের দৌর্বল্য এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়। *সুশ্রুতসংহিতায়* বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তদর্শনাদিজাত, মদ্যজ ও বিষজ এই ছয় প্রকার মূর্চ্ছা রোগের কথা উল্লিখিত হয়েছে। নিম্নে উপর্যুক্ত ছয় প্রকার মূর্চ্ছা রোগ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচিত হল—

১. বাতিক মূর্চ্ছারোগ : রোগী যদি নীল, কৃষ্ণ অথবা অরুণবর্ণ আকাশ দর্শন করে মূর্চ্ছিত হয় ও শীঘ্র সংজ্ঞালাভ করে এবং কম্পন, অঙ্গমর্দ, হৃদয়পীড়া, কৃশতা ও অরুণবর্ণ গাত্রকান্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, এই জাতীয় রোগীকে বাতজ মূর্চ্ছা বলে। উক্ত রোগের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> নীলং বা যদি বা কৃষ্ণমাকাশমথবারুণম্।
> পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি শীঘ্রঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।।
> বেপথুশ্চাঙ্গমর্দ্দশ্চ প্রপীড়া হৃদয়স্য চ।
> কার্শ্যং শ্যাবারুণাচ্ছায়া মূর্চ্ছায়ে বাতসম্ভবে।।[১৬২]

২. পিত্তজ মূর্চ্ছারোগ : এই জাতীয় রোগী রক্ত, হরিত বা পীতবর্ণ আকাশ দর্শন করে মুর্চ্ছিত হয় এবং পশ্চাৎ ঘর্ম্মাক্তদেহ, পিপাসান্বিত, সন্তাপসূক্ত ও পীতকায় হয়ে জাগরিত হয়ে ওঠে। এই সময় ইহার চক্ষু রক্ত, পীত বা অরুণ বর্ণ হয় এবং মলনির্গম হয়ে থাকে। পিত্তজ রোগ বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> রক্তং হরিতবর্ণং বা বিয়ৎ পীতমথাপি বা।
> পশ্যংস্তেমঃ প্রবিশতি সস্বেদশ্চ প্রবুধ্যতে।।
> সপিপাসঃ সসন্তাপো রক্তপীতারুণেক্ষণঃ।
> সংভিন্নবর্চ্চাঃ পীতাভো মূর্চ্ছায়ে পিত্তসম্ভবে।।[১৬৩]

৩. কফজ মূর্চ্ছারোগ : শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছায় শুভ্রমেঘনিভ অথবা নিবিড় অন্ধকারাবৃত আকাশদর্শনানন্তর মূর্চ্ছা হয়। ইহাতে দীর্ঘকাল পরে মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় এবং সেইকালেই রোগী আপন অঙ্গসকল আর্দ্রচর্মবেষ্টিতবৎ গুরু বোধ এবং মুখদ্বারা জলস্রাব ও বমির বেগ হয়ে থাকে। কফজ মূর্চ্ছারোগের উদাহরণ প্রসঙ্গে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> মেঘসঙ্কাশমাকাশং তমোভির্বা ঘনৈর্বৃতম।
> পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি চিরাচ্চ প্রতিবুধ্যতে।।
> গুরুভিঃ প্রাবৃতৈরঙ্গৈর্যথৈবার্দ্রেণ চর্ম্মণা।
> সপ্রসেকঃ সহৃল্লাসো মূর্চ্ছায়ে কফসম্ভবে।।[১৬৪]

৪. রক্তদর্শনাদিজাত মূর্চ্ছারোগ : মৃত্তিকা ও জল তমোগুণবহুল, রক্তগন্ধ ও মৃত্তিকাজলাত্মক বলে রক্তের গন্ধ আঘ্রাণে মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। কেউ কেউ বলেন দ্রব্যের স্বভাবই কারণ, যেহেতু রক্তের গন্ধ আঘ্রাণ না করেই দর্শন করলেও মূর্চ্ছা হয়ে থাকে। রক্তদর্শনাদি হেতু মূর্চ্ছিত ব্যক্তির অঙ্গ স্তব্ধীভূত এবং অব্যক্তরূপে শ্বাসক্রিয়া নির্বাহিত হয়। রক্তদর্শনাদিজাত রোগের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> স্তব্ধাঙ্গদৃষ্টি স্ত্বসৃজা গূঢোচ্ছ্বাসশ্চ মূর্চ্ছিতঃ।।[১৬৫]

৫. মদ্যজ মূর্চ্ছা : কোন ব্যক্তি অধিক পরিমাণে মদ্যপান করলে জ্ঞানরহিত ও ভ্রান্তচিন্তা হয়ে অঙ্গ সকল আক্ষিপ্ত করে প্রলাপ করতে করতে ভূমিতে পতিত অর্থাৎ মূর্চ্ছিত হয়। পীত মদ্য যাবৎ না জীর্ণ হয়, তাবৎ চেতনারও উদয় হয় না, এই জাতীয় রোগকে মদ্যজ মূর্চ্ছা বলে। মদ্যজ মূর্চ্ছা বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> মদ্যেন্ প্রলপন্ শেতে নষ্টবিভ্রান্তমানসঃ।
> গাত্রাণি বিক্ষিপন্ ভূমৌ জরাং যাবন্ন যাতি তৎ।।[১৬৬]

৬. বিষজ মূর্চ্ছা : মূল, স্কন্দ, ফল, পত্র ও ক্ষীরাদি ভেদে বিবিধ বিষের যে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ উক্ত রয়েছে, সেজাতীয় সমুদায় যদি মদ্যেও উপস্থিত অবস্থিত থাকে। তথাপি বিষে তদপেক্ষা তীব্রভাব থাকে। অতএব উক্ত বিষসেবন দ্বারা মূর্চ্ছিত হলে কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ণা ও অন্ধকার দর্শন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। বিষজ মূর্চ্ছা বিষয়ে *সুশ্রুতসংহিতায়* বলা হয়েছে—

বেপথু স্বপ্নঃ তৃষ্ণাঃ স্যুস্তমশ্চ বিষমূর্চ্ছিতে।
বেদিতব্যং তীব্রতরং সথাস্বং বিষলক্ষণৈঃ।।[১৬৭]

❖ **আয়ুর্বেদিক পদ্ধতি অনুসারে বিবিধ মানসিকরোগের চিকিৎসা পদ্ধতি :** *আয়ুর্বেদে* বিবিধ প্রকারে মূর্চ্ছারোগের চিকিৎসাপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। *সুশ্রুতসংহিতা* অনুসারে যেসকল মূর্চ্ছারোগের কথা গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত হয়েছে, সেই সকল রোগের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির কথা মাধবকর তাঁর *ভৈষজ্য রত্নাবলী* গ্রন্থে 'মূর্চ্ছাধিকার'[১৬৮] অধ্যায়ে বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। মূর্চ্ছা রোগের প্রতিষেধ বিষয়ে যেসকল আয়ুর্বেদিক পদ্ধতি *ভৈষজ্য রত্নাবলী* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে তা নিম্নে আলোচিত হল—

১. সকল প্রকার মূর্চ্ছা রোগেই শীতল জলাভিষেক, অবগাহন, পদ্মরাগাদি মণি গ্রথিত হার, গাত্রে উশীর চন্দনাদি লেপন, ব্যজন বায়ু এবং কপূরাদি বাসিত শীতল পানীয় এই সমস্ত উপকারী।

২. কুল আঁটির শস্য, পিপুল, বেণার মূল, নাগেশ্বর এই সমুদায় শীতল জলে মর্দন করে সেবন করলে অথবা পিপুলচূর্ণ ও মধু একত্রিত করে অবলেহন করলে মূর্চ্ছা নিবারণ হয়।

৩. ঘৃত সহিত দুরালভা গাছের ক্কাথ অথবা রাত্রিতে মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ সেবন করলে ভ্রম রোগ নিবারণ হয়। এই রোগে দুগ্ধ অতি উপকারী এবং দশ বৎসরের পুরাতন ঘৃত মর্দন ও শিলাজতু প্রভৃতি রাসায়নিক ঔষধসেবন প্রশস্ত।

৪. প্রত্যহ রাত্রিতে ত্রিফলাচূর্ণ ও মধু, প্রাতে আদা ও গুড়সেবন এবং সুপথ্য ভোজন করলে এক সপ্তাহের মধ্যে মদ, মূর্চ্ছা, কামলা ও উন্মাদরোগ নিবারিত হয়।

৫. পিপুলমূলচূর্ণ ও গুড় একত্র মিশ্রিত করে সেবন করলে চিরপ্রনষ্ট নিদ্রাও উপস্থিত হয়। ইক্ষু, পুঁইশাক, মাষকলায়, মদ্য, মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ, গোধূম, গুড় ও মৎস্য এই সমুদায় ভোজন করলে সুনিদ্রা হয়। দুগ্ধে সিদ্ধি বেটে পাদদ্বয়ে লেপন করলে নিদ্রা হয়।

৬. অশ্বগন্ধা ৫০ পল, তালমূলী ২০ পল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্ঠীমধু, রাস্না, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অর্জুনছাল, মুতা, তেউড়ী প্রত্যেক ১০ পল, অনন্তমূল, শ্যামলতা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বচ ও চিতামূল প্রত্যেক ৮ পল এই সমুদায় ৫১২ সের জলে পাক করে ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকতে

নামিয়ে শীতল হলে ছেঁকে তাতে ধাইফুল ১৬ পল, মধু ৩৭ সের, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ পল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাচ প্রত্যেক ৪ পল, প্রিয়ঙ্গু ৪ পল ও নাগেশ্বর ২ পল এই সমুদায় প্রক্ষিপ্ত করে আবৃত পাত্রে এক মাস রাখবে এবং পরে ছেঁকে নিয়ে যে ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা সেবন করলে মূর্চ্ছা, অপস্মার, শোষ, উন্মাদ ও বাতজ রোগ-সমস্ত বিনষ্ট হয়।

৭. মূর্চ্ছা প্রসক্ত হলে হরিতকীর ক্বাথে সিদ্ধ ঘৃত পান করবে অথবা আমলকীর স্বরসে ঘৃত পাক করে পান করা উচিত। দ্রাক্ষা, চিনি, দাড়িম, নীলোৎপল ও পদ্মের সুগন্ধি পান করা উচিত।

৮. শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব লবণ, রসুন, মানছাল ও বচ এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করে তা অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করলে মূর্চ্ছার শান্তি হয়।

৯. সৈন্ধব লবণ, মানছাল ও মরিচ মধুর সহিত মর্দন করে অঞ্জন দিলে মূর্চ্ছা নিবারণ হয়।

১০. তাম্রভস্ম অর্দ্ধ রতি, বেণার মূল অর্দ্ধ রতি এবং নাগেশ্বর অর্দ্ধ রতি একত্র শীতল জলের সহিত সেবন করলে শীঘ্র মূর্চ্ছা নিবারণ হয়।

১১. শুঁঠ, পিঁপুল, শুল্ফা ও হরিতকী প্রভৃতি চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করে সেবন করলে ভ্রমরোগের শান্তি হয়।

১২. মূর্চ্ছারোগে পিঁপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত রসসিন্দুর সেবনীয়।

৪.৩.২. হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে বিবিধ চক্ষুরোগের চিকিৎসা পদ্ধতি : ঠান্ডা লাগা প্রভৃতি যে সকল কারণে সর্দি হয়, সেই সকল কারণেও চোখ উঠতে পারে। প্রথম অবস্থায় 'একোনাইট' ঔষধ দিতে হবে। কিন্তু যদি আলোর দিকে তাকালে কষ্ট হয় তাহলে 'বেলাডোনা' ও 'মার্কিউরিয়স্' দিন-রাতে তিন-চারবার করে দিতে হবে। চক্ষু ওঠার সঙ্গে চোখের পাতাগুলি ফুলে উঠলে 'রটক্স' দেওয়া যায়। রাতের বেলা চোখ জোড়া লেগে যাওয়ার পক্ষে 'পল্-সেটিলা' ভাল, তাতে উপকার না হলে 'কেল্কেরিয়া' ঔষধ দেওয়া যায়। চোখের যন্ত্রণা বেশী হলে চক্ষুতে গরম জল কিংবা গরম দুধের ভাপ দেওয়া যেতে পারে। রোগী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করার পরেও আলোকের দিকে দেখতে কষ্ট হলে তাকে অন্ধকার স্থানে থাকবে। চোখ ওঠার সঙ্গে চোখ দিয়ে অত্যন্ত জল

ঝরিলে এক কাঁচা আন্দাজ গোলার জলে ৮।১০ রতি ফিটকারীর গুলে সেই জল পায়রার পালকে তুলে ফোঁটা ফোঁটা চোখে দিলে ব্যাথা উপশম হয়।

আঞ্জুনি এক প্রকার ফোড়া, চক্ষুর পাতার উপর হয়। আঞ্জুনির প্রথম অবস্থায় বিশেষত উপর পাতায় হলে 'পল্সেটিলা' কিংবা নিচের পাতায় হলে 'রটক্স' ৩-৪ ঘন্টা অন্তর দিতে হবে। প্রতিনিয়ত আঞ্জুনি হতে থাকলে 'হিপার' ৩০ বার দিতে হবে ও প্রতিবার আঞ্জুনি ভাল হওয়ার পর চক্ষুর পাতায় শক্ত গুটির মতো থেকে গেলে 'স্ট্যাফাইসেগ্রিয়া' প্রত্যহ চোখে ২।১ বার করে দিতে হয়। চোখে আঞ্জুনি হওয়ার দরুণ অত্যধিক যন্ত্রণা হলে তিসির পুল্টিশ গরম গরম লাগাতে হবে।[১৭০]

বেশি রাত জাগা, ভাল পুষ্টিকর খাদ্য খেতে না পারা, উপবাস করা, উজ্বল আলোর দিকে তাকিয়ে থাকা, ক্রমাগত বই পড়া, খুব সূক্ষ্ম জিনিসের দিকে তাকানো, অত্যন্ত মানসিক শ্রম, হস্তমৈথুন, নানা রকম ভারী রোগের কারণে চোখের শক্তি কমে যায় ইত্যাদি কারণে যেকোন মানুষ অল্প দৃষ্টি দেখায় 'অর্ণিকা' ২।৩ ফোটা করে দিনে চারবার খাওয়া উচিত। এছাড়া বেশি চিন্তা করা, রাত জাগা, লেখা পড়া করা কিংবা নেশা করার পর দৃষ্টিহীনতা দেখা দিলে 'নক্সভমিকা' ঔষধ দেওয়া হয়। দৃষ্টি শক্তি মাঝে মাঝে কমে যাওয়ার সঙ্গে মাথাধরা থাকলে 'জিঙ্কম্' ঔষধ দেওয়া হয় কিন্তু ভয়ানক দপদপ মাথা ধরা থাকলে 'স্যাঙ্গু নেরিয়া' ঔষধ চোখে দেওয়া উচিত। দৃষ্টি হীনতার সঙ্গে চক্ষু থেকে অনবরত জল পড়লে 'ইউফ্রেসিয়া' দেওয়া হয়। দৃষ্টি হীনতার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষিযুগল লাল আর তার সঙ্গে আলোকের দিকে তাকালে 'বেলাডোনা' ঔষধ ব্যবহার করা হয়। অত্যধিক পরিমাণে তামাক খাওয়ার জন্য দৃষ্টিহীনতা দেখা দিলে 'ট্যাবাকম' ঔষধ দিনে একবার করে সেবন করা হয়। বেশি বয়সে দৃষ্টিহীনতা দেখা দিলে 'ফসফরস্' ঔষধ এবং অল্প বয়সে শরীর অতিশয়, দুর্বল হওয়ার জন্য দৃষ্টিহীনতা দেখা দিলে 'ফেরম্-মিউরিটিকম্' ঔষধ প্রত্যহ একবার সেবন করা উচিত। চোখ দিয়ে জল পড়ার প্রধান ঔষধ 'ইউফ্রেসিয়া' ঔষধ প্রত্যহ দুইবার সেবন করা প্রয়োজন কিন্তু জল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু অতিশয় চুল্কায় তাহলে 'সলফর-১২' প্রত্যহ দুইবার সেবন করে চার দিন পর্যন্ত খাওয়া উচিত। অত্যন্ত ঠাণ্ডা লেগে চোখ উঠলে, চক্ষুতে জ্বালা জনক পিচুটি পড়লে, চক্ষুতে অত্যন্ত জ্বালা ও গরম বোধ হলে 'আর্সেনিক' ঔষধ অবশ্য প্রত্যহ দুই ফোটা সেবনীয়।[১৬৯]

অল্প ও অধিক পরিমাণে দর্শনশক্তির অভাব হলে 'আজেন্টম্ নাইট্রিকম্', 'অবম্', 'বেলেডনা', 'চায়না', 'ইগ্নেসিয়া', 'নক্সভমিকা', 'ফস্ফবস', 'বুটা', 'সিপিয়া', 'সলফর্' ও 'টেবেকম্' প্রভৃতি ঔষধ সমুদায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১৭০]

• **<u>হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে বিবিধ কর্ণরোগের চিকিৎসা পদ্ধতি</u> :** অত্যন্ত ঠান্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে কান কট্-কট্ করলে 'ক্যামোমিলা' ঔষধ সেবন অত্যন্ত হিতকর কিন্তু তাতে উপকার না হলে 'ডলকামেরা' ঔষধ সেবন এবং তাতেও উপকার না হলে 'মার্কিউরিয়স্' দেওয়া হয়। কানের ভেতর কট্-কট্ করার সঙ্গে যদি কান দিয়ে পুঁজ নির্গত হয়, তবে 'পলসেটিলা' ভাল, তাতে উপকার না হলে 'মার্কিউরিয়স্' ঔষধ প্রয়োগ হিতকর। যদি কানের ভেতর ফুলে উঠে, আর হাত দিলে বেদনা বোধ হয় তবে 'বেলাডোনা' খুব ভাল তাতে উপকার না হলে 'মার্কিউরিয়স্' কিংবা 'পলসেটিলা' তিন-চার ঘন্টা অন্তর কর্ণে দুই ফোটা প্রয়োগ করা হয়, আর তাতেও উপকার না হলে 'কার্বো-ভেজিটেবলস্' প্রয়োগ করা হয়। গুটিবসন্তের পর কান দিয়ে পুঁজ পড়লে প্রথমে 'মার্কিরিয়স্' দেওয়া হয়, তাতে পনেরো দিনের মধ্যে উপকার না হলে 'হিপার' দেওয়া হয়। পারা খাবার পর কান পাকলে 'নাইট্রিক এসিড্' প্রয়োগ হিতকর কিন্তু তাতে উপকার না হলে 'হিপার' দেওয়া হয়। ছোট শিশুদের কান পাকা কিছুতেই না সারলে 'কেল্কেরিয়া' ঔষধ দেওয়া হয়। এই সকল ঔষধ প্রত্যহ ২।৩ বার করে কর্ণগহ্বরে প্রয়োগ করা উচিত এবং দিনে দুইবার ঠাণ্ডা জলের পিচকারি দিয়ে কান পরিষ্কার করা উচিত। 'আইডোফর্ম' ও 'গ্লিসরিন্' একত্র মিশ্রিত করে প্রত্যহ ২।১ বার কানের ভেতর ফোঁটা ফোঁটা দিলে কান থেকে পুঁজ পড়া ও বেদনার উপশম হয়।[১৭১]

কানে যদি শুনতে না পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোঁ ভোঁ শব্দ বোধ হতে থাকে, আর মাথা ঘোরে তবে 'চায়না' ঔষধ সেবন করা উচিত। 'চায়না' ঔষধ সেবন করে উপকার না হলে 'ফস্ফরস্' ঔষধ দেওয়া হয়। যে সকল ব্যক্তির বাতের মত শরীরে হাতে বেদনা হওয়ার ফলে শ্রবণশক্তির হ্রাস পেলে 'রোডোডেণ্ড্রন্' ঔষধ সেবন বাধ্যতামূলক। এছাড়া প্রত্যহ কুইনাইন জাতীয় ঔষধ সেবনের পর শ্রবণশক্তির হ্রাস হলে 'কেল্কেরিয়া' ঔষধ প্রয়োগ এবং শ্রবণশক্তির উপকার না হলে 'ক্যামোমিলা' ঔষধ প্রত্যহ দুইবার অতিআবশ্যক। কানের বেদনা অনেকদিন অন্তর অন্তর হলে 'জেলসিমিনম্' ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।[১৭২]

- **হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে বিবিধ অস্থিরোগের চিকিৎসা পদ্ধতি :** কুব্জ রোগে রোগীর মেরুদণ্ড যাতে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে এরূপ অনেক আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। তৎসত্বেও এই রোগ অনুসারে 'ক্যাল্ক্-কার্ব', 'সালফার', 'ফস্ফরাস' সর্বোৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। এছাড়াও ডাক্তাররা 'কাফ্কা', 'ন্যাট্রামমি', 'লিলিয়্যাস্থাল্', 'সোরিণাম্' ঔষধ ব্যবহার করতে বলেন। কেবলমাত্র মাথার ঘাম ও অস্থির প্রদাহ থাকলে 'সাইলিসিয়া' ঔষধ ব্যবহার করতে বলেন।[১৭৩] শরীরে ঠাণ্ডা লাগার পর এক মাত্রা 'ডল্কামেরা' ঔষধ সেবনে কোনরকম পীড়া উৎপন্ন হতে পারে না। এছাড়াও হিম লাগার জন্য শরীরে পীড়া হলে 'একোনাইট', 'মার্কিওরিয়ণ', 'রিষ্টকস্', ও 'হিপার গন্ধক' প্রভৃতি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অত্যন্ত হীতকর। বেশি চলাফেরা ও পরিশ্রমের দরুণ শরীরের যেকোন অঙ্গের কুঁচকি লাগলে 'রস্টক্স', 'আর্ণিকা' ও 'ককিউলস্' জাতীয় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ডাক্তাররা পেসস্ক্রাইব করেন। রাত্রিবেলায় অত্যধিক পেশির ব্যাথা এবং পেশি ফুলে যাওয়ার ফলে নড়তে-চড়তে ব্যাথা অনুভব হলে 'ব্রায়োনিয়া', 'ফেরম্', 'নক্সভমিকা', 'কেল্কেরিয়া' 'চায়না' 'ল্যাকিসিল', ও 'নাইট্রিক এসিড্' প্রভৃতি ঔষধ প্রত্যহ ২।৩ ঘন্টা অন্তর দুই ফোঁটা করে প্রত্যহ সেবন করতে হবে।[১৭৪]

- **হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে বিবিধ মানসিকরোগের চিকিৎসা পদ্ধতি :** বেশি চিন্তা করা, লেখা পড়া করা প্রভৃতি নানা রকম মানসিক শ্রমের দরুণ যে রোগ হয়, তার পক্ষে 'নক্সভমিকা', 'সলফর্' ও 'কেল্কেরিয়া' প্রভৃতি হোমিওপ্যথিক ঔষধ সেবন করা উচিত। কোন কারণে ভয় পাওয়ার পর একমাত্র 'ওপিয়ম্' ঔষধ সেবনীয়। কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছুদিন পর মনের আশঙ্কা না কাটে তবে 'একোনাইট' ঔষধ দিনে একবার করে ত্রিশদিন অবশ্য সেবনীয়। যেকোন কারণে মনে অতিশয় শোক কিংবা দুঃখ হলে 'ইগনেসিয়া', 'ফসফরিক্ এসিড্' প্রভৃতি ঔষধ ত্রিশ দিন প্রত্যহ দুই ফোঁটা করে তিনবার সেবন করা উচিত। কোন কারণে অতিশয় মনে ক্রোধ হলে 'ক্যামোমিলা' ঔষধ সেবন করা উচিত এবং 'কালো সিন্থ' ঔষধ ক্রোধ না কমলে সেবন করা উচিত।[১৭৫] যদি সামান্য কারণে মূর্চ্ছা হয়ে থাকে তথাপি হৃদপিণ্ডের দোষ, অধিক দিন রোগের জন্য মস্তিষ্কের দুর্বলতা, কোন রকম যন্ত্রণা, ভয়, রক্তভাঙ্গা ইত্যাদ কারণে মূর্চ্ছা বা ভ্রিমি রোগ হয়। ভয়জন্য মূর্চ্ছা হলে 'একোনাইট', 'ওপিয়ম্'; রাগজন্য 'ক্যামোমিলা'; শোকজন্য 'ইগ্নেসিয়া', 'জেলসিমিয়ম্'; আঘাতজন্য 'আর্ণিকা'; রক্তস্রাব ও ধাতুক্ষয় জন্য 'চায়না'; ভয়ানক বাতনা জন্য

'একোনাইট', 'ক্যামোমিলা', 'ভেরাট্রম্'; সামান্য মাত্র যাতনা জন্য 'হিপার' প্রভৃতি ঔষধ ২০।২৫ মিনিট অন্তর প্রত্যহ সেবন করতে হবে।[১৭৬]

৪.৩.৩. এলোপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে বিবিধ চক্ষুরোগের চিকিৎসা পদ্ধতি : অন্যান্যো রোগসমূহের মতোই চোখের রোগ খুব কষ্টকর। চোখ এমনই একটি অঙ্গ যে তার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম কোন পদার্থ বা কণা পড়লেও অস্বস্তির কারণ হয়। চোখের সাদা অংশ লাল, চোখ দিয়ে জল পড়া ও ভোরবেলা পিঁচুটি পড়া প্রভৃতি লক্ষণে চক্ষু প্রদাহ বা চোখ ওঠা (Opthalmia) রোগ হয়।[১৭৭] উক্ত রোগের এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ে নিম্নে আলোচিত হল—

১. সেলুমাইড আই ড্রপস্ (Cellumide Eye Drops) দিনে ৩-৪ বার ১/২ ফোঁটা করে অথবা প্রয়োজন মতো আক্রান্ত চোখে দিতে হবে।

২. গ্যারামাইসিন আই ড্রপস্ (Garamycin Eye Drops) ১/২ ফোঁটা করে চার ঘন্টা অন্তর অথবা রোগানুসারে প্রত্যেক ঘন্টায় দুই ফোঁটা করে চোখে দেওয়া উচিত।

৩. অ্যালফ্লক্স আই ড্রপস্ (Alflox Eye Drops) ১/২ ফোঁটা করে দিনে ৩-৪ বার অথবা প্রয়োজনানুসারে আক্রান্ত চোখে দিতে হবে।

৪. ক্লোরোমাইসেটিন অ্যাপ্লিক্যাপস্ (Chloromycetin Aplicaps) মুখের কাছে সামান্য কেটে সুরমা পড়ানোর ন্যায় চোখে লাগাতে হবে।

৫. গ্যারাসোন আই ড্রপস্ (Garason Eye Drops) ঔষধ ১/২ ফোঁটা করে দিনে ৩-৪ বার আক্রান্ত চোখে দিতে হবে।

৬. জেন্টিসিন আই ড্রপস্ (Genticin Eye Drops) দিনে ৩-৪ বার করে ২/৩ ফোঁটা অথবা প্রয়োজন মতো আক্রান্ত চোখে দিতে হবে।

৭. প্রত্যহ Boric Acid Distilled ঔষধ জলে গুলে তা দিয়ে চোখ ধৌত করতে হবে।

৮. সিপ্লক্স আই ড্রপস্ (Ciplox Eye Drops) ঔষধ ১-২ ফোঁটা করে এক ঘন্টা অন্তর দিতে হবে। রোগ একটু কম হলে দুই-তিন ঘন্টা অন্তর দিতে হবে।

৯. সালফাডায়াজিন ট্যাবলেট (Sulfadiagin Tablet) দুটি করে দিনে চার বার অথবা প্রয়োজন মতো সোডাবাই কার্বের সঙ্গে সেবনীয়।

১০. প্যারাক্সিন আই অয়েন্টমেন্ট (Paraxin Eye Oentment) প্রয়োজন মতো দিনে ২-৩ বার আক্রান্ত চোখে দিতে হবে।

১১. অরেমাইসিন ক্যাপসুল (Auremycin Cap.) একটি করে ক্যাপসুল ৬ ঘন্টা অন্তর অথবা প্রয়োজন মতো সেবন করতে হবে।

১২. Protargol Lotion প্রত্যহ ২/১ ফোঁটা করে মাঝে মাঝে চোখে দিলে ভাল হয়।

তারামণ্ডল প্রদাহ : চক্ষুতারকার চারদিকের বর্ণ বিশিষ্ট মন্ডলকে বলা হয় তারামণ্ডল বা Iritis। এই অংশে রোগ হলে দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়, ছানি, গ্লুকোমা বা কঠিন রোগ হতে পারে।[১৭৮] এই চক্ষুরোগের এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ে নিম্নে আলোচিত হল—

নিচের ঔষধ সমূহের মধ্যে যে কোনও একটি লাগালে উপকার হয় :

i. Locula 10% রোজ ৩-৪ বার করে চোখে এক ফোঁটা দিতে হয়।

ii. Lotio Protargol প্রত্যহ ৩-৪ বার করে এক ফোঁটা করে দিতে হবে।

iii. Apkul Lotion প্রত্যহ ৩-৪ বার করে এক ফোঁটা করে দিতে হবে।

iv. Atropine Eye Ointment মলম চোখে লাগাতে হবে।

v. Atropine Eye Dionine মলম চোখে ভালো করে মালিশ করতে হবে।

vi. Terramycin Eye Ointment মলম প্রত্যহ চোখে দিতে হবে।

vii. Ambramycin Eye Ointment চোখে দিতে হবে।

viii. Subamycin Eye Ointment মলম চোখে ভালো করে মালিশ করতে হবে।

উপরের ঔষধের সঙ্গে নিচের যে কোন একটি Antibiotic ঔষধ খেতে হবে রোজ চারবারে চারটি করে পাঁচ থেকে সাত দিন। Antibiotic ঔষধগুলি হল—

Terramycin Cap (250), Oxytetracyline Cap (250), Subamycin Cap (250), Ledermycin Cap (300), Achromycin Cap (250), Hostacyline Cap (250), Septran Tab, Ampicillin Cap (250)।

চোখের ছানি : সাধারণত বৃদ্ধ বয়সে এই রোগ বেশি হয়। চোখের লেন্স ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যায়, তার ফলে রোগী চোখে দেখতে পায় না। অপারেশন করে ছানিযুক্ত লেন্স কেটে বাদ দিতে হয়। সম্পূর্ণভাবে লেন্স অন্ধকার বা Opaque হয়ে গেলে তখন চোখে একেবারেই দেখা যায় না। লেন্স কেটে বাদ দেওয়ার সাত-আট দিন পর ঘা শুকিয়ে গেলে চোখ খুলে দিতে হয়। তখন লেন্সের বদলে মোটা লেন্সের চশমা পড়লে রোগী দেখতে পায়। অপারেশন ছাড়া এই রোগ নিরাময়ের জন্য দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।[১৭৯]

গ্লকোমা : এটি এক ধরণের চোখের রোগ, যাতে রোগী সব কিছুকেই রামধনুর মতো নানা রঙ দেখে। সব কিছু অস্পষ্ট দেখলে বা রামধনুর মতো নানা রঙ দেখলেই এই রোগ বোঝা যায়। প্রথম অবস্থায় Prednisolone Tab একটি করে দিনে তিন-চার বার সেবন করলে উপকার হয়। অথবা Decadron বা Cortisone Tab একটি করে দিনে তিন-চার বার সেবন করতে হবে। এছাড়াও ভিটামিন B কমপ্লেক্স এবং তৎসহ ভিটামিন A জাতীয় ট্যাবলেট সেবন করা বাধ্যতামূলক। ভিটামিন B কমপ্লেক্স ও A মিশ্রিত যে কোন একটি ঔষধ খেতে হবে। যেমন— Adifral Tab একটি করে রোজ তিন বার, Adexolin Cap প্রত্যহ একটি করে তিন বার, Decadexolin Inj. প্রত্যহ এক মিলিগ্রাম করে, Halborange তরল রোজ দুই চামচ করে দুই বার, Vi-delta ইমালশন রোজ দুই চামচ করে দুই বার, Rediostoleum তরল দুই চামচ করে রোজ দুই বার, Radiostoleum Cap প্রতিদিন একটি করে দুই বার সেবন করতে হবে।[১৮০]

আঞ্জুনি (Stye) : চোখ ওঠার মতো এটিও একটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক রোগ। চোখে আঞ্জুনি উঠলে স্বভাবতই বেশ কষ্ট পেতে হয়। আঞ্জুনি হল চোখের পালকের মধ্যে হওয়া এক বা একাধিক

ফুসকুড়ি।[১৮১] এই রোগ চোখে হলে যেসকল চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তা হল নিম্নরূপ—

১. বিস্ট্রেপেন ইঞ্জেকশন (Bistrepen Inj.) ডিস্টিল ওয়াটার মিশিয়ে ভাল করে গুলে নিয়ে মাংসপেশীতে প্রতিদিন ১/২ বার দিতে হবে।

২. লাইরামাইসিন আই ড্রপ (Lyramycin Eye Drops) ২/৩ ফোঁটা চারবার করে আক্রান্ত চোখে দিতে হবে।

৩. সল্ফাডায়াজিন ট্যাবলেট (Sulfadiagin Tabs.) দুটি করে দিনে তিন থেকে চার বার অথবা প্রয়োজন অনুসারে সেবন করা প্রয়োজন।

৪. পেন্টিডস (Pentids Tabs.) প্রতিদিন তিন-চার বার ২ থেকে ৬ লাখ ইউনিট প্রয়োজনে সেবনীয়।

৫. ডিক্রিস্টিসিন এস ইঞ্জেকশন (Decrysticin- S Inj.) দিনে এক থেকে দুই বার গভীর মাংস পেশীতে পুশ করতে হবে।

৬. ক্লোবোমাইসেটিন অ্যাপ্লিক্যাপ (Chloromycetin Aplicaps) প্রয়োজন মতো মুখ কেটে চোখে কাজল পরার মতো লাগাতে হবে।

৭. জেন্টিসিন আই ড্রপস (Genticin Eye Drops) এক-দুই ফোঁটা করে দিনে তিন-চার বার অথবা প্রয়োজন মতো চোখে দিতে হবে।

৮. প্যাবাক্সিন ক্যাপসুল (Pabaxic Cap.) ২৫০-৫০০ মিলিগ্রাম একটি করে প্রত্যহ ছয় ঘন্টা অন্তর সেবন করতে হবে।

চোখে বাইরের কিছু পড়া (Foreign Body in Eye) : চোখ এমনই স্পর্শকাতর অঙ্গ যা বাইরের কিছু পড়া, যেমন, ধূলোকণা, কুটো, নোংরা, ঘাসের টুকরো, লোহার টুকরো, কয়লার কুঁচি, বিষাক্ত পোকা প্রভৃতি পড়লে চোখ নিয়ে খুব কষ্ট পেতে হয়। অনেক সময় যদিও তা পরিষ্কার রুমাল

কিংবা কাপড় দিয়ে বের করে দিলে আরাম বোধ হয়। কিন্তু যদি তা না বেরোই এবং চোখে ইনফেকশন হয়ে গেলে যেসকল এলোপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসা করা হয়,[১৮২] তা হল—

১. সোফ্রাকর্ট আই ড্রপস্ (Sofracort Eye Drops) এক-দুই ফোঁটা করে দিনে দুই-তিন বার অথবা প্রয়োজন অনুসারে চোখে দিতে হবে।

২. অ্যালবুসিড আই ড্রপস্ (Albucid Eye Drops) প্রত্যহ ১/২ ফোঁটা করে আক্রান্ত চোখের মধ্যে পড়া বাইরের বস্তু বের করে প্রয়োগ করতে হবে।

৩. ক্লোরোমাইসেটিন অ্যাপ্লিক্যাপ (Chloromycetin Aplicaps) চোখের পড়া জিনিস বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রয়োজন মতো মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত।

৪. সেলুমাইড আই ড্রপস্ (Cellumide Eye Drops) এক-দুই ফোঁটা করে দিনে তিন-চার বার চোখে দিতে হবে।

৫. লোকুলা আই ড্রপস্ (Locula Eye Drops) এক-দুই ফোঁটা করে দিনে তিন-চার বার অথবা প্রয়োজ মতো আক্রান্ত চোখে দিতে হবে।

রাতকানা ও দিনকানা রোগ (Night and Day Blindness) : চোখের জটিল রোগসমূহের মধ্যে এটি একটি বিরল রোগ। এই রোগের রোগী দিনের বেলায় কোন সমস্যা হয় না কিন্তু তাঁরা রাতের বেলায় কিছুই দেখতে পান না বা ভীষণ কম দেখতে পান অথবা দিনের বেলায় কম বা কিছুই দেখতে পাননা কিন্তু রাতের বেলায় সব কিছু দেখতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ ভিটামিনের অভাবে এই রোগ হয়।[১৮৩] এই সকল রোগের রোগীদের জন্য যেসকল এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহৃত হয়, তা হল নিম্নরূপ—

১. অ্যারোভিট ট্যাবলেট প্রতিদিন দুটো করে দুই বার সেবন করতে হবে।

২. ইউনি-ভাইট ড্রপস্ প্রত্যহ ০.৬ এম. এল. করে দিতে হবে।

৩. মিনোল্যাড লিক্যুইড দুই চামচ করে দুই বার প্রতিদিন সেবন করতে হবে।

৪. ক্যারোফ্রাল ক্যাপসুল একটি করে দিনে দুই বার সেবন করতে হবে।

৫. অ্যাবডেক ড্রপস্ ০.৩ এম. এল. থেকে ০.৬ এম. এল. করে দিনে দুই-তিন বার সেবন করতে হবে।

৬. শারকোমল্ট লিকুইড ৫-১৫ এম. এল. দিনে দুই থেকে তিন বার অথবা প্রয়োজন মতো সেবন করতে হবে।

৭. হ্যেভিট সিরাপ ১/২ চামচ করে দিনে দুই বার খাওয়ার পর সেবন করতে হবে।

৮. প্রিপ্যালিন ইঞ্জেকশন ১/২ এম. এল. করে প্রতিদিন একবার করে মাংস পেশীতে পুস করতে হবে।

৯. কড লিভার অয়েল দুধের সঙ্গে এই তেল মিশিয়ে দুই ফোঁটা করে চক্ষুযুগলে দিতে হবে।

১০. এডিনল ক্যাপসুল একটি করে দিনে একবার অথবা রোগী ও রোগের অবস্থা বুঝে সেবন করতে হবে।

কনীনিকা ব্রণ (Keratitis) : এলোপ্যাথিক চিকিৎসা মতে এই রোগকে বলে কর্ণিয়া বা কর্ণিয়াল আলসার। সাধারণ অর্থে এটিকে চোখের ক্ষত বলা যেতে পারে। সাধারণতঃ এই রোগ যুবা বা বৃদ্ধ বয়সে হয়। এতে রোগীর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়।[১৮৪] উক্ত রোগের এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ে নিম্নে আলোচিত হল—

১. সেব্রাণ আই ড্রপস্ ১/২ ফোঁটা দিনে দুই-চার ঘন্টা অন্তর লাগাতে হবে।

২. কনফক্স আই ড্রপস্ ১/২ ফোঁটা করে দিনে তিন-চার বার করে অথবা প্রয়োজন মত চোখে দিতে হবে।

৩. অক্যুভির অপ্টিকক্স আক্রান্ত চোখে প্রয়োজন মতো হার্পিস সিমপ্লেক্স কেরাটাইটিস অবস্থায় নিতে হবে।

৪. নরজন আই ড্রপস্ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করার জন্য কনীনিকা ব্রণ রোগে ১/২ ফোঁটা করে চার বার দিতে হবে।

৫. সেপ্ট্রান ট্যাবলেট ১/২ টি করে দিনে তিন বার অথবা প্রয়োজন মতো সেবনীয়।

- **এলোপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে বিবিধ কর্ণরোগের চিকিৎসা পদ্ধতি :** কানের মধ্যে কোন রকম বীজাণুর আক্রমণ হলে, তাকে কর্ণপ্রদাহ বা কর্ণশূল (Otitis) বলে। ঠাণ্ডা লাগা, বীজাণু দূষণ, আঘাত লাগা, কাঠি দিয়ে কান খোঁচানো, কানের মধ্যে জল প্রবেশ প্রভৃতি নানা কারণে এই রোগ হয়ে থাকে। অনেক সময় এই রোগে আক্রান্ত রোগীর কান পাকে বা কানে পুঁজ হয়। কান পাকলে বা পুঁজ হলে বা যে কোন রকম Otitis হলে নিচের যে কোন একটি Substitutive ঔষধ নিয়মিত প্রায় দশ থেকে কুড়ি দিন খেতে হবে। রোগের অবস্থা অনুযায়ী ঔষধ নির্বাচন করতে হবে।[১৮৫] যে সকল এলোপ্যাথিক ঔষধ উক্ত রোগে ব্যবহৃত হয়, তা হল—

Pentid 400 Tab দুটি করে রোজ তিন থেকে চার বার, Stanpen 500 Tab দুটি করে রোজ তিন থেকে চার বার, Ampicillin 250 Tab একটি করে রোজ তিন থেকে চার বার, Erythromycin Cap একটি করে প্রতিদিন তিন থেকে চার বার, Terramycin Cap ২৫০ প্রতিদিন একটি করে তিন থেকে চার বার, Oxytetracycline 250 রোজ একটি করে তিন থেকে চার বার, Ledermycin Cap 300 রোজ একটি করে তিন থেকে চার বার, Hostacycline Cap 250 রোজ একটি করে তিন থেকে চার বার, Doxycycline Cap প্রতিদিন একটি করে দশ দিন সেবন করতে হবে।

কানে বেশি ব্যাথা হলে উপর্যুক্ত ঔষধের সঙ্গে নিম্নলিখিত যেকোন একটি ঔষধ খেতে হবে। ঔষধগুলি হল— Codopycin একটি করে ট্যবলেট খাওয়ার পর দুই থেকে তিন বার, Micropyrin C Tab দুটো করে খাওয়ার একঘন্টা আগে রোজ দুই থেকে তিন বার, Novalgin Tab একটি করে দুই থেকে তিন বার, Analgin Tab একটি করে দুই থেকে তিন বার, Croain সিরাপ দুই চামচ করে রোজ দুই থেকে তিন বার, Ultragin সিরাপ দুই চামচ করে রোজ দুই থেকে তিন বার।

এছাড়াও কানের মধ্যে নিম্নলিখিত যে কোন একটি ড্রপস্ দিতে হবে। ড্রপস্ গুলি হল— Terramscin ear drop প্রতিদিন দুই থেকে তিন বার লাগাতে হবে, Chloromycetin ear drop

রোজ দুই থেকে তিনবার, Enteromycetin ear drop প্রতিদিন দুই থেকে তিনবার, Terracortil ear drop রোজ দুই থেকে তিন বার কর্ণগহ্বরে দিতে হবে।

কানে ব্রণ (Furuncle of the meatus) : এই রোগ এক ধরণের বীজাণুর ইনফেকশন থেকে হয়ে থাকে। অনেক সময় পেকে ফেটে যাবার পর ঐ সকল বীজাণুর ইনফেকশনের কারণে বিভিন্ন শারীরিক অঙ্গাদি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। নিচের যে কোন একপ্রকার Antibiotic ঔষধ রোজ দুই থেকে তিন বার সেবন করতে হবে। Antibiotic ঔষধগুলি হল— Sulphatriad Tab., Am Picillin 250 Cap., Pentid 800 Tab., Stanpen 500 Tab., Terramycin Cap 250, Oxytetracyclin Cap 250, Ledermycin 300 Cap, Subamycin 250 Cap, Hostacycline 250 Cap, Achromycin 250 Cap।

এছাড়াও Gutac Phenol দুই ফোঁটা করে প্রতিদিন কানে দুই তিন বার দিলে ব্যাথা কমে যায় ও ইনফেকশন কম হয়। তাছাড়াও কানে নিম্নলিখিত যে কোন একটি ড্রপস্ ও মলম দশ দিন দুই থেকে তিনবার উষ্ণ জল দিয়ে কান পরিষ্কার করে লাগাতে হবে। ঔষধগুলি হল— Terramycin Ear Drop, Chloromycetin Ear Drop, Chloromycetin ear-eye Suspension মলম, Terricortil ear মলম দিতে হবে।[১৮৬]

বধিরতা (Deafness) : এই রোগে রোগী কানে কম শোনে বা না শোনা দুইরকম বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। শরীরে অসাধ্য স্নায়ু সংক্রান্ত গোলযোগের ফলে মানুষ আংশিক বা পূর্ণরূপে বধির হয়ে যেতে পারে। শারীরিক দুর্বলতাও বধিরতার অন্যতম কারণ হয়। এছাড়া বসন্ত, হাম, স্কারলেট ফিভার, টাইফয়েড, কানে পুঁজ, কানে ময়লা, অত্যধিক জোরালো আওয়াজ প্রভৃতি কারণে মানুষ বধির হয়ে যেতে পারে। কানের বধিরতা সারানোর জন্য নিম্নলিখিত ঔষধগুলি দিনে দুইবার করে একটি করে সেবন করতে হবে। এলোপ্যাথিক ঔষধগুলি হল— Otoflour Tabs., Vi-Magna, B G Phos Elixub, Prepain Tabs., Arovit Tabs., Prepalin Cap, Mayadec Cap[১৮৭] ইত্যাদি।

কানে ময়লা বা কানে খোল (Cerumen or Ear Wax) : এটি ঠিক রোগ নয় তবে এর থেকে অবশ্যই রোগ হতে পারে। কম বেশি কানে ময়লা বা খোল সকলেরই দেখা যায়। যারফলে কানে ফরফর্ শব্দ, কটকট্ করে, কানের ভেতর চুলকানি হয়। অনেক সময় কানের ময়লার কারণে

ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কানের ময়লা নিবারণ করার জন্য নিম্নলিখিত ড্রপস্-গুলি ৩/৫ ফোঁটা করে প্রতিদিন তিন-চার বার দিতে হবে। এলোপ্যাথিক ড্রপস্ গুলি হল— Waxolve Ear Drops, Tyotocin Ear Drops, Methazil Ear Drops, Tytin Ear Drops, Otogesic Ear Drops, Surfaz Ear Drops, Gentisyn Ear Drops, Otek Ear Drops[১৮৮] ইত্যাদি।

- **এলোপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে বিবিধ অস্থিরোগের চিকিৎসা পদ্ধতি :** দেহের কোন স্থানে আঘাত লেগে থেঁতলে যাওয়া, মচকানো, কোনকিছু বিদ্ধ হওয়া প্রভৃতি নানা ধরণের আঘাত লেগে থাকে। যদি রক্ত বের না হয়, তাহলে কালশিরা পড়ে যায় এবং চামড়ার নিচে রক্তপাত হয়। শরীরের আহত স্থানে শীতল জল বা বরফ দিয়ে পট্টি দিলে ভেতরের রক্তপাত বন্ধ হয়। যদি বাইরে ক্ষত থাকে, তাহলে Tincture Iodine দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করতে হবে। সব সময় মনে রাখা কর্তব্য যে Internal Haemorrhage হলে বরফ লাগানো খুব উপকারী।

মচকানো ব্যাথা হলে Goulard’s Lotion দিয়ে পট্টি বাঁধতে হবে ও তার উপরে মাঝে মাঝে লোশন দিয়ে ঐ পট্টি বা ব্যান্ডেজ ভিজিয়ে দিতে হবে। ব্যথার কিছু উপশম হলে Iodex, Volini gel, Kilpane Cream, Dolonex-gel, Flamar Cream অথবা Penorub দিনে তিনবার মালিশ করতে হবে এবং হালকা গরম সেঁক দিতে হবে। Sloan’s Liniment বা Sloan’s Balm লাগালে মচকানো ব্যথা প্রশমিত হয়।[১৮৯]

অস্থি বা হাড়ভাঙ্গা : কোনকিছুর আঘাত হেতু হাড় ভেঙ্গে গেলে কাঠের বা বাঁশের টুকরো লম্বালম্বি বসিয়ে অথবা শক্ত লম্বা পিচবোর্ডের টুকরো ও তুলো দিয়ে তারপর ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে। তারপর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে X’ray করে Plaster করে দিতে হবে। যদি হাড় ভেঙ্গে ব্যান্ডেজ বাঁধার পর প্রবল ব্যাথা বা যন্ত্রণা হতে থাকে তাহলে Codopyrin অথবা Micropyrin C Tablet খেতে হবে। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল মাত্রায় রোগী Shock হলে Atropine ও Morphine ইনজেকশন দিতে হবে। যদি একটি শরীরের একটি হাড় ভেঙ্গে অন্যটির উপর উঠে যায়, তাহলে অজ্ঞান করে Reduction করে প্লাস্টার করতে হবে।[১৯০]

আঘাত ও রক্তপাত : শরীরের আঘাত প্রাপ্ত জায়গায় ব্যাণ্ডেজ করতে হবে। প্রথমে Mercurochrome Lotion দিয়ে ক্ষত জায়গা শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর নিচের যেকোন ভাল

মলম দ্বারা ব্যাণ্ডেজ করতে হবে। মলমগুলি হল— Soframycin Ointment, Neosporin Ointment, Wokadine Ointment।

শিরা বা ধমনী কেটে গেলে ক্যাট গাট দিয়ে সেলাই করতে হবে। কাটা যদি গভীর হয় তাহলে সেলাই করতে হবে এবং উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে ব্যাণ্ডেজ করতে হবে।

রক্তপাত বন্ধ করতে দিতে হবে Injections Styptochrome ২ মিলিগ্রাম করে পেশীতে ছয় ঘন্টা অন্তর অন্তর দিতে হবে। Injections Tetanus Toxoid ০.৫ মি.লি. পেশীতে এক মাস অন্তর অন্তর দিতে হবে। Injections Ampoxin- 500mg এবং Injections Megapen-500mg প্রতিদিন দিনে দুই বার করে দিতে হবে। ব্যাথা যন্ত্রণা খুব হলে প্রতিদিন একটি করে তিন থেকে চারবার Cap Baciclox- 500mg, Tab Althrocin- 250mg অথবা Tab Emflam Plus এর মধ্যে যে কোন একটি সেবন করতে হবে। ক্ষত নিরাময় বিলম্ব ঘটলে Ciplox Ear Drops ক্ষত স্থানে লাগাতে হবে, তার সাথে Beplex- Zee Capsule বা Becozine Capsule প্রত্যহ একটি করে খাবার পর সেবন করতে হবে।[১৯১]

এলোপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে বিবিধ মানসিকরোগের চিকিৎসা পদ্ধতি : কোন ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতা বেশি থাকে, কোন ব্যক্তির কম থাকে। এই মানসিক ক্ষমতাকে বলা হয় বুদ্ধি বৃত্তি ও স্মরণশক্তির ক্ষমতার পরিমাপ। মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে যেকোন ব্যক্তির স্মরণশক্তি ক্ষমতা নির্ণয় করতে পারেন। কিন্তু প্রবল বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন লোকেরা কোন কোন বিষয়ে খামখেয়ালী বা Eccentric হতে পারে। তার ফলে সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না, এই জাতীয় রোগকে বলা হয় ব্যক্তিত্বের গোলমাল বা Personality Disorders।[১৯২] এই রোগ হলে যেসকল এলোপ্যাথিক চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুসারে রোগীর চিকিৎসা করা হয়, তা হল—

১. রোগীর হাত-পা কাঁপা বা Delirium Tremen’s প্রভৃতি দেখা যায় তাহলে Chloropromazine I. M. ইনজেকশন দিতে হবে।

২. রোগীর লিভারের রোগ থাকলে তার চিকিৎসা করতে হবে এবং Personality Disorders রোগে নিম্নলিখিত ঔষধ দিনে দুই থেকে তিনবার সেবন করতে হবে। ঔষধগুলি হল—

Dihydroemetine Inj. বা Emetine Hydrochlor Inj.— 1 এম্পুল, Liv. 52 Tab., Livotone Liq. বা Livergen Liq.— দুই চামচ।

৩. যদি ক্রনিক ডিসপেপসিয়া দেখা যায়, তাহলে নিম্নলিখিত ঔষধ খাবার পর প্রতিদিন তিনবার সেবন করতে হবে। ঔষধগুলি হল— Combyzyme Tab., Diapepsin (Liq.) বা Liquor Diastos— দুই চামচ, Unienzyme Tab., Festal Tab., Take Diastase Tab., Take Combex Cap. প্রভৃতি।

মানসিক অবদমন (Depressive Illness) : মানসিক অবদমন এমন একটি রোগ যা অনেক সময় অনেকের মধ্যেই সাময়িক ভাবে দেখা যায়। প্রচণ্ড কর্মশক্তি শুরু এবং কর্তব্যপরায়ণ লোকেরও অনেক সময় মানসিক কোন আঘাতের জন্য হঠাৎ সাময়িক মানসিক অবদমন দেখা দিতে পারে।[১৯৩] উক্ত মানসিক রোগ হলে রোগীর যেসকল এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করা হয় তা হল নিম্নরূপ—

১. রোগীকে প্রথম অবস্থায় প্রত্যহ পুষ্টিকর হালকা পথ্য দিতে হবে। সেই সঙ্গে যাতে কোষ্ঠকাঠিন্য না হয় তার জন্য ফলমূল, শাকশব্জী প্রভৃতি খেতে দিতে হবে। মানসিক অবদমন রোগের প্রথম অবস্থায় নিম্নলিখিত যেকোন একটি ট্যাবলেট ভারী পথ্যের পর একবার করে দিতে হবে। এলোপ্যাথিক ট্যাবলেটগুলি হল— Anatensol 1mg. Tab., Stemetil Tab., Eskozine Tab., Librium 10 Tab., Sparine 25 Tab., Largactil Tab., Calmpose Tab., Miltown Tab. প্রভৃতি।

২. অতিরিক্ত মানসিক অবসাদ দেখা দিলে নিম্নলিখিত যেকোন একটি ট্যাবলেট প্রতিদিন খাবার পর দুইটি করে সেবন করতে হবে। ঔষধগুলি হল— Sarotena Tab., Amytal Sodium Cap. প্রভৃতি।

৩. স্নায়বিক দুর্বলতা থাকলে যেকোন একটি ঔষধ প্রতিদিন দুইবার করে সেবন করতে হবে। এলোপ্যাথিক ঔষধগুলি হল— Nurobion Forte Cap., Beplex Forte Cap., Becadex Forte Cap., Becosules Cap., Stresscap ইত্যাদি।

৪. যদি মানসিক অবদমনের জন্য হজমের গোলমাল বা ডিসপেপসিয়া হয়ে থাকে, তাহলে নীচের যেকোন একটি ঔষধ দিনে দুই থেকে তিনবার খাওয়ার একঘন্টা আগে সেবন করতে হবে। ঔষধগুলি হল— Combizyme Tab., Unienzyme Tab., Take Diastose Tab., Diapepsin Liq. বা Alvizyme Liq.— ১ চামচ, Take Diastos পাউডার এক চামচ।

স্মৃতিশক্তি লোপ (Memory Loss) : মানুষের ব্রেণের নানা ধরণের রোগ থেকে স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া বা লোপ পাওয়া প্রভৃতি হতে পারে। স্মৃতিশক্তির লোপ বিষয়ে আধুনিক এলোপ্যাথিক যেসকল চিকিৎসা পদ্ধতির[১৯৪] কথা বলা হয়েছে তা হল নিম্নরূপ—

i. মনোবিজ্ঞানের রোগের চিকিৎসার সময় রোগীকে মানবিক দিক থেকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগীর সঙ্গে নার্স, চিকিৎসক, আত্মীয় প্রভৃতি সহৃদয় ব্যবহার করবে।

ii. রোগীর স্নায়ুর দুর্বলতা থাকলে তার জন্য নিম্নলিখিত যেকোন একটি ইঞ্জেকশন বা ঔষধ দিনে একবার ব্যবহার করতে হয়। ঔষধগুলি হল— Triredisol H Inj.— রোজ ২ ml., Macrabin H Inj.— ২ ml., Vit. B Complex Inj.— রোজ ২ ml., Nurobion Forte Cap., Becosules Cap., Sresscaps Cap.।

iii. রোগীর রক্তশূন্যতা থাকলে তার জন্য নিচের যেকোন একটি ঔষধ প্রত্যহ দুই চামচ করে দুইবার সেবন করতে হবে। ঔষধগুলি হল— Dexorange, Hepatoglobin, Acemenos, Rubraplex ও Calron প্রভৃতি।

iv. অনিদ্রার জন্য রোজ রাতে শোবার পূর্বে নিম্নলিখিত যে কোন একটি ঔষধ দিতে হবে। ঔষধগুলি হল— Stemetil, Librium 10, Calmpose, Anatensol 1 mg, Largactil 25mg ইত্যাদি।

সর্বশেষে বলতে পারি যে, বর্তমান যুগেও আয়ুর্বেদিক, এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বিধান সমাজে সর্বস্থলে কার্যকরী রয়েছে এবং সমাজের সকল প্রকার অসুস্থ ব্যক্তি নিজ নিজ পছন্দ অনুসারে এই তিন চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে যেকোন একটি পদ্ধতিকেই সুস্থ হওয়ার লক্ষ্যে সর্বদা বেছে নিয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. আ.সং., সম্পা. পার্থ সরকার, পৃ.৭।

২. মনু., ৪।২৪১

৩. তত্রৈব।

৪. পরা.সং., ২।৪

৫. Parāśa., p. 13.

৬. বি.সং., ৬৩।১৪

৭. মনু., ২।৯৯

৮. ব্যা.সং., ২।৩৪-৩৫

৯. মনু., ৩।৭-৮

১০. *তদেব,* ৭।১৪৯

১১. বি.সং., ৬৩।৩৪

১২. *তদেব,* ৮১।১৫

১৩. মনু., ৭।২২৬

১৪. *তদেব,* ৮।২৭৪

১৫. বি.সং., ৫।২৭

১৬. মনু., ৯।২০১

১৭. বি.সং., ১৫।৩২-৩৩

১৮. মনু., ৮।৩৯৪

১৯. তত্রৈব।

২০. যা.সং. ৩।৫৭

২১. অর্থশা., ১।১২।৫।২১, সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১১৯।

২২. *তদেব,* ৫।৩।৮, সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৩১।

২৩. *তদেব*, ১।২১।১, সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৮১।

২৪. মনু., ৮।১২৫

২৫. *তদেব*, ৯।২৩০

২৬. *তদেব*, ৭।৯৩

২৭. পরা.সং., ৪।২৩

২৮. *তদেব*, ৪।২৪

২৯. Parāśa., p. 31.

৩০. অত্রি.সং., ১০৫-১০৬

৩১. কাত্যা.সং., ৬।৪-৬

৩২. I.T.C.I., pp. 5-6.

৩৩. তত্রৈব।

৩৪. জন.ভার., পৃ. ৯১।

৩৫. P.I.S.I., p. 117.

৩৬. C.L.I.C.C.S., p. 369.

৩৭. T.C.I.S., p. 89.

৩৮. Di. Ri., p. 3.

৩৯. তত্রৈব।

৪০. Di.Ri., পৃ. ৪।

৪১. তত্রৈব।

৪২. Di.Ri., পৃ. ৫।

৪৩. *The Rights of Persons with Disabilities Act- 2016*, p. 14.

৪৪. *তদেব*, পৃ. ২৬।

৪৫. তত্রৈব।

৪৬. *The Rights of Persons with Disabilities Act- 2016*, পৃ. ১৭।

৪৭. *তদেব*, পৃ. ৩০।

৪৮. Di.Ri., pp. 15-16.

৪৯. *তদেব*, পৃ. ১১।

৫০. তত্রৈব।

৫১. *The Rights of Persons with Disabilities Act- 2016*, p. 19.

৫২. *তদেব*, পৃ. ১৩।

৫৩. *তদেব*, পৃ. ১৮।

৫৪. Di.Ri., pp. 21.

৫৫. *The Rights of Persons with Disabilities Act- 2016*, p. 33.

৫৬. চরক.সূত্র., ১।১৫

৫৭. *তদেব*, ১।১

৫৮. সু.সং., উত., ৭।১১-১২

৫৯. *তদেব*, ৭।১৩

৬০. *তদেব*, ৭।১৪

৬১. *তদেব*, ৭।১৫

৬২. *তদেব*, ৭।১৬

৬৩. *তদেব*, ৭।১৭

৬৪. *তদেব*, ৭।১৮

৬৫. *তদেব*, ৭।১৯

৬৬. *তদেব*, ৭।২০

৬৭. *তদেব*, ৭।২১

৬৮. *তদেব*, ৭।২২

৬৯. *তদেব*, ৭।২৩

৭০. *তদেব*, ৭।২৪

৭১. *তদেব,* ৮।২৪

৭২. *তদেব,* ৮।২৫

৭৩. *তদেব,* ৮।২৬

৭৪. *তদেব,* ৮।২৭

৭৫. *তদেব,* ৯।২

৭৬. *তদেব,* ৯।৩

৭৭. *তদেব,* ৯।৪

৭৮. *তদেব,* ৯।৫

৭৯. *তদেব,* ৯।৬

৮০. *তদেব,* ৯।৭

৮১. *তদেব,* ৯।৮

৮২. *তদেব,* ৯।৯

৮৩. *তদেব,* ৯।১০

৮৪. *তদেব,* ৯।১১

৮৫. *তদেব,* ৯।১২

৮৬. *তদেব,* ১০।৬

৮৭. *তদেব,* ১০।৭

৮৮. *তদেব,* ১০।৮

৮৯. *তদেব,* ১০।৯

৯০. *তদেব,* ১০।১০

৯১. *তদেব,* ১০।১১

৯২. *তদেব,* ১০।১২

৯৩. *তদেব,* ১০।১৩

৯৪. *তদেব,* ১০।১৪

৯৫. *তদেব*, ১০।১৫

৯৬. *তদেব*, ১০।১৬

৯৭. *তদেব*, ১০।১৭

৯৮. *তদেব*, ১০।১৮

৯৯. *তদেব*, ১০।১৯

১০০. *তদেব*, ১০।২০

১০১. *তদেব*, ১০।২১

১০২. *তদেব*, ১০।২২

১০৩. *তদেব*, ১০।২৩

১০৪. *তদেব*, ১০।২৪

১০৫. *তদেব*, ১০।২৫

১০৬. *তদেব*, ১০।২৬

১০৭. *তদেব*, ১১।৪

১০৮. *তদেব*, ১১।৫

১০৯. *তদেব*, ১২।৩

১১০. *তদেব*, ১২।৪

১১১. *তদেব*, ১২।৫

১১২. *তদেব*, ১২।৬

১১৩. *তদেব*, ১২।৭

১১৪. *তদেব*, ১২।৮

১১৫. *তদেব*, ১২।৯

১১৬. *তদেব*, ১২।১০

১১৭. *তদেব*, ১২।১১

১১৮. *তদেব*, ১৩।৩

১১৯. *তদেব,* ১৩।৪

১২০. *তদেব,* ১৩।৫

১২১. *তদেব,* ১৩।৬

১২২. *তদেব,* ১৩।৭

১২৩. *তদেব,* ১৩।৮

১২৪. *তদেব,* ১৩।৯

১২৫. *তদেব,* ১৩।১০

১২৬. *তদেব,* ১৩।১১

১২৭. *তদেব,* ১৩।১২

১২৮. *তদেব,* ১৩।১৩

১২৯. *তদেব,* ১৩।১৪

১৩০. *তদেব,* ১৩।১৫

১৩১. *তদেব,* ১৩।১৬

১৩২. *তদেব,* ১৩।১৭

১৩৩. *তদেব,* ১৩।১৮

১৩৪. *তদেব,* ১৩।১৯

১৩৫. ভৈ.র., নেত্র., ২।৬-৮

১৩৬. সু.সং., উত., ২০।৩।

১৩৭. *তদেব,* ২০।৪

১৩৮. *তদেব,* ২০।৫

১৩৯. *তদেব,* ২০।৬

১৪০. *তদেব,* ২০।৭

১৪১. *তদেব,* ২০।৮

১৪২. *তদেব,* ২০।৯

১৪৩. *তদেব*, ২০।১০

১৪৪. *তদেব*, ২০।১১

১৪৫. *তদেব*, ২০।১২

১৪৬. *তদেব*, ২০।১৩

১৪৭. *তদেব*, ২০।১৪

১৪৮. *তদেব*, ২০।৩২

১৪৯. *তদেব*, ২০।৩৩

১৫০. *তদেব*, ২০।৩৪

১৫১. *তদেব*, ২০।৩৫

১৫২. *তদেব*, ২০।৩৬

১৫৩. ভৈ.র., কর্ণ., ২।১০

১৫৪. সু.সং., নি.স্থা., ১।৫৫

১৫৫. *তদেব*, ১।৬২

১৫৬. *তদেব*, ১।৬৩

১৫৭. *তদেব*, ১।৬৪

১৫৮. *তদেব*, ১।৬৫

১৫৯. *তদেব*, ১।৬৬

১৬০. *তদেব*, ১।৬৭

১৬১. ভৈ.র., বাত., ৩।৪-৫

১৬২. সু.সং., উত., ৪৬।২

১৬৩. *তদেব*, ৪৬।৩

১৬৪. *তদেব*, ৪৬।৪

১৬৫. *তদেব*, ৪৬।৫

১৬৬. *তদেব*, ৪৬।৬

১৬৭. *তদেব,* ৪৬।৭

১৬৮. ভৈ.র., মূর্চ্ছা., ২।১৪

১৬৯. হোমিও.চি.পরি., পৃ. ১৬৪-১৬৫।

১৭০. হোমিও.চি.বি., প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৬৬।

১৭১. হোমিও.চি.পরি., পৃ. ১৬৭-১৬৮।

১৭২. হোমিও.চি.বি., চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৪৬।

১৭৩. *তদেব,* পৃ.১২৯।

১৭৪. হোমিও.চি.পরি., পৃ. ২৩০।

১৭৫. *তদেব,* পৃ.১৯৭।

১৭৬. হোমিও.চি.বি., চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৩

১৭৭. প্র্যাক.অ.মে., পৃ. ১৩৬৫-১৩৬৮।

১৭৮. P.O.M., পৃ. ৫৭৫।

১৭৯. *তদেব,* পৃ. ৫৭৬।

১৮০. *তদেব,* পৃ. ৫৭৭।

১৮১. প্র্যাক.অ.মে., পৃ. ১৩৭১-১৩৭৩।

১৮২. *তদেব,* পৃ. ১৩৭৫-১৩৭৬।

১৮৩. *তদেব,* পৃ. ১৩৭৭-১৩৭৯।

১৮৪. *তদেব,* পৃ. ১৩৮৬-১৩৮৮।

১৮৫. P.O.M., পৃ. ৫৮২।

১৮৬. *তদেব,* পৃ. ৫৮৩।

১৮৭. প্র্যাক.অ.মে., পৃ. ১৩৩২।

১৮৮. *তদেব,* পৃ. ১৩৩৪।

১৮৯. *তদেব,* পৃ. ১৩৯০-১৩৯১।

১৯০. P.O.M., পৃ. ৬৮১।

১৯১. প্র্যাক.অ.মে., পৃ. ১৩৯১।

১৯২. P.O.M., পৃ. ৮২৭-৮২৮।

১৯৩. *তদেব*, পৃ. ৮৩০-৮৩১।

১৯৪. *তদেব*, পৃ. ৮৩৭।

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়:

প্রাচীন ও বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের বিশেষাধিকারসমূহ (Privileges)

শারীরিক গঠন, অঙ্গসংস্থানগত এবং পেশিগত কোন অসুবিধা যদি কোন ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজকর্মে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে, তখন তাকে বলা হয় বিকলাঙ্গতা বা Disability। এক্ষেত্রে ব্যক্তি সাধারণভাবে বিশেষ কাজ করতে সক্ষম হয় না। তবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সাহায্যে অর্থাৎ চিকিৎসা বা অন্যান্য সংশোধনী ব্যবস্থাদির মাধ্যমে এই বিকলাঙ্গতার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন, কোন একজন ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি তুলনামূলক সুস্থ ব্যক্তির থেকে কম। স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি খালি চোখে যা দেখতে পায়, তুলনামূলক কম দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তা পায় না। কিন্তু যদি তুলনামূলক কম দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে চশমা দেওয়া হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের মতোই সবকিছু দেখতে পায়। এক্ষেত্রে তার চোখের অস্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি তার মধ্যে যে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে, সেটাই হল Disability বা বিকলাঙ্গতা।

Impairment বা দুর্বলতার এবং Disability বা বিকলাঙ্গতার প্রভাবে কোন ব্যক্তি যখন তার পরিবেশে স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করার ক্ষেত্রে অনতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হয়, তখনই তাকে Handicap বা প্রতিবন্ধিতা বলা হয়।[১] অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মধ্যে যখন এমন একটি অসুবিধার সৃষ্টি হয়, যা কোনপ্রকার সংশোধনীর দ্বারা অতিক্রম করা যায় না, তখনই তাকে Handicap বা প্রতিবন্ধিতা বলা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি বর্ণান্ধ (Colour Blind) হয়, তবে এই বর্ণান্ধতার প্রভাবে কৃষিকাজ করার ক্ষেত্রে তার মধ্যে হয়তো কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয়না। কিন্তু উক্ত বর্ণান্ধ ব্যক্তি যদি কোনরূপ যানবাহনের চালক হতে চায়, তবে বর্ণান্ধতা এক্ষেত্রে তার কাছে প্রতিবন্ধক হবে এবং সে প্রতিবন্ধীরূপে বিবেচিত হবে।

ব্যতিক্রমের মাত্রা অনুসারে এই ব্যতিক্রমধর্মী শিশুদের মধ্যে অবশ্যই কিছু বিশেষ চাহিদা থাকে। দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তাদের ব্যতিক্রমের ভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন উপকরণগত চাহিদা থাকে। তবে তাঁরা সবচেয়ে বেশি অভাব বোধ করে সামাজিক ও মানসিক দিক থেকে। অর্থাৎ

সমাজব্যবস্থায় এখনও কোন একজন প্রতিবন্ধিকে সবসময় স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া হয় না। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের পরিবারের সদস্যদের কাছেও এরা উপযুক্ত সামাজিক মূল্য পায় না। এইরূপ সামাজিক সহযোগিতার অভাবে ব্যতিক্রমধর্মী শিশুরা মানসিক নিশ্চয়তার অভাব বোধ করে এবং যেকোন ধরণের প্রতিবন্ধিই ফলতঃ বৃহত্তর অর্থে মানসিক প্রতিবন্ধিতে পরিণত হতে পারে। তাই ব্যতিক্রমধর্মী শিশুদের সম্পর্কে সঠিক এবং সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে সমাজের সুস্থ জনসাধারণকে উপযুক্ত সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা দরকার। বর্তমানের ন্যায় প্রাচীন ভারতীয় সমাজেও ব্যতিক্রমী বা বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের প্রতি রাষ্ট্রের রাজারাও বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ সমাজে যাতে কোনরূপ ব্রাত্যরূপে পরিগণিত না হয়, তার জন্য অনেকরকম আইন প্রনয়ণ ও তাদের সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে বাঁচার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

৫.১. প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের (*মনুসংহিতা* ও *অর্থশাস্ত্র*) নিরিখে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি বিশেষ ব্যবস্থা : স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষে যারা হীনাঙ্গ অর্থাৎ শরীরের কোন অঙ্গের হীনতা রয়েছে, যেমন কাণা, খোঁড়া ইত্যাদি; এছাড়াও অতিরিক্তাঙ্গ অর্থাৎ যাদের অঙ্গের আধিক্য রয়েছে, যেমন হাতে বা পায়ে অতিরিক্ত আঙুল রয়েছে প্রভৃতি; যারা বিদ্যাহীন অর্থাৎ একান্ত মূর্খ, যারা অত্যন্ত বৃদ্ধ, যারা রূপহীন অর্থাৎ যারা বিভিন্ন অঙ্গে বিকারযুক্ত— এইজাতীয় ব্যক্তিদের প্রতি রাষ্ট্র মানবিকতার সঙ্গে সর্বদা আচরণ করবেন। এই জাতীয় ব্যক্তিরা যাতে সমাজে কোনরূপ বৈষম্যের স্বীকার না হন, সেইদিকে রাষ্ট্র-প্রধানদের সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। কারণ বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরাও অন্য সকল সুস্থ মানুষের ন্যায় সমাজের স্বাভাবিক অংশ। যেরূপে কোন যোদ্ধার যুদ্ধ করতে গিয়ে অস্ত্র-শস্ত্রাদি ভেঙ্গে যায় অথবা অস্ত্রাভাবাদিবশতঃ যে যোদ্ধা বিপন্ন, যে ব্যক্তি হতপুত্রাদির শোকে কাতর, যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়, যে যোদ্ধা যুদ্ধ করতে ভয় পায় এবং যে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ এমন সকল ব্যক্তিকে অস্ত্রাঘাত না করার শাস্ত্রসম্মত নিষেধ রয়েছে। কারণ এটিই শিষ্টব্যবহার। সেইরূপে একজন বিপন্ন যোদ্ধার ন্যায় বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রতি সর্বদা শিষ্টব্যবহার কাম্য।

এছাড়াও সমাজের কোন বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গ যদি শ্রোত্রিয় (বিদ্যাদানকারী ব্রাহ্মণ), ব্যাধিগ্রস্ত, পুত্রাদি-প্রিয়জন বিয়োগে কাতর, বালক, বৃদ্ধ, অকিঞ্চন অর্থাৎ দুরবস্থাগ্রস্ত নিঃসম্বল, মহাকুলীন

(অর্থাৎ যশ, ধন, বিদ্যা, শৌর্য প্রভৃতি গুণে উৎকৃষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করেন) এবং উদার প্রকৃতির হন, তাহলে এইজাতীয় ব্যক্তিগণের প্রতি বিজীগিষু রাজার দান, যথাযোগ্য সন্মান প্রর্দশণের দ্বারা অনুগ্রহ করা ইত্যাদি একান্ত কর্তব্য। যেমন অন্ধ, পঙ্গু, সত্তর বছরের বৃদ্ধ ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের উপকারকারী ব্যক্তিগণের প্রতি বিজিগীষু রাজা মানবিক দিক দিয়ে কর ছাড়ের ব্যবস্থা করবেন। এবিষয়ে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে—

শ্রোত্রিয়ং ব্যাধিতার্তৌ চ বালবৃদ্ধাবকিঞ্চনম্।
মহাকুলীনমার্যঞ্চ রাজা সংপূজয়েৎ সদা।।[২]

৫.১.১. বিকলাঙ্গ ব্যক্তি কর্তৃক নিজ ভার্যার রক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাগ্রহণ : অন্যপুরুষের সংস্পর্শ থেকে ছোট খাটো ব্যাপারেও স্ত্রীলোকদের আগলে রাখা উচিত। কারণ স্ত্রীলোকদের রক্ষণব্যাপারে যদি উপেক্ষা করা হয়, তাহলে কোনভাবে তার দ্বারা পিতৃকুল ও পতিকুলের সম্মানহানি ঘটতে পারে। সেই কারণে স্ত্রীলোকদের রক্ষণাবেক্ষণ রূপ ধর্ম সকল বর্ণেই এক প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে পড়ে। অতএব এই সকল ব্যাপার বুঝে অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি দুর্বল প্রকারের স্বামীরাও নিজ নিজ স্ত্রীর প্রতি রক্ষণের যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যেমন সংসারে টাকাকড়ি ঠিকমতো হিসাব করে জমা রাখা এবং খরচ করা, গৃহ ও গৃহস্থালী শুদ্ধ রাখা, ধর্ম-কর্মসমূহের আয়োজন করা, অন্নপাক করা এবং শয্যাসনাদির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে স্ত্রীলোকদের নিযুক্ত করা। দুর্বল ব্যক্তির স্ত্রীজনদের প্রতি বিশেষ ব্যবস্থাগ্রহণ প্রসঙ্গে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে—

ইমং হি সর্ববর্ণানাং পশ্যন্তো ধর্মমুত্তমম্।
যতন্তে রক্ষিতুং ভার্যা ভর্তারো দুর্বলা অপি।।[৩]

কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে থেকে কোনও বিকলাঙ্গ পত্নীর স্ত্রী সাধারণ ধনসম্পত্তি থেকে কিছু নিয়ে সঞ্চয় অথবা অলঙ্কারাদি নির্মাণ করা তাঁর স্বামীর অনুমতি ব্যতীত অসম্ভব কার্য। কারণ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর ধন থেকে যথেচ্ছ ব্যয় করা শাস্ত্রসম্মত নয়।

৫.১.২. বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের জন্য শাস্ত্রসম্মত গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা : ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড় অর্থাৎ বিকলান্তঃকরণ, কোনরূপ বর্ণের অনুচ্চারক অর্থাৎ মূক, কালা প্রভৃতি বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গ কেউই পিতার ধনসম্পত্তির অংশভাগী হবে না। কিন্তু যারা পিতার

প্রকৃত ধনসম্পত্তির অংশীদারী হবেন, তারা সুবিবেচনাপূর্বক যথাশক্তি ঐ সকল ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড় অর্থাৎ বিকলান্তঃকরণ, কোনরূপ বর্ণের অনুচ্চারক অর্থাৎ মূক, কালা প্রভৃতি ব্যক্তির প্রতি যাবজ্জীবন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। গ্রাসাচ্ছাদন বলা হয় সেই প্রক্রিয়াকে, যে প্রক্রিয়ার দ্বারা বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ তার নিজ পিতার ধনসম্পত্তি ভোগ করে যাবজ্জীবন জীবনধারণ করেন। বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের গ্রাসাচ্ছাদন বিষয়ে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে—

> সর্বেষামপি তু ন্যায্যং দাতুং শক্ত্যা মনীষিণা।
> গ্রাসাচ্ছাদনমত্যন্তং পতিতো হ্যদদদ্ভবেৎ।।[৪]

এছাড়াও শত্রুরাজা প্রভৃতির গৃহের মধ্যে গুপ্তচররূপে কাজ করার জন্য যেকোন প্রদেশের বিজিগীষু রাজা কুব্জ, বামন, নপুংসক, শিল্পজ্ঞ স্ত্রীলোক, বোবা এবং নানাপ্রকার ম্লেচ্ছ জাতীয় পুরুষকে যাবজ্জীবন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য রাজকর্মচারীরূপে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। প্রসঙ্গতঃ বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের রাজকর্মচারী রূপে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাগ্রহণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> অন্তর্গৃহচরাস্তেষাং কুব্জ-বামন-ষণ্ডকাঃ।
> শিল্পবত্যঃ স্ত্রিয়ো মূকাশ্চিত্রাশ্চ ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।।[৫]

এছাড়াও যদি কোন ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড় অর্থাৎ বিকলান্তঃকরণ, কোনরূপ বর্ণের অনুচ্চারক অর্থাৎ মূক, কালা, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কোনরূপ রক্ষকশূন্য হন, তাহলে প্রাদেশিক বিজিগীষু রাজা এইজাতীয় সকল ব্যক্তিগণের সারাজীবনের জন্য ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রসঙ্গক্রমে *অর্থশাস্ত্রে* বলা হয়েছে— 'কুব্জ-বাল-বৃদ্ধ-ব্যাধিত-ব্যসন্যনাথাংশ্চ রাজা বিভৃয়াত্'।[৬]

৫.১.৩. <u>বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের বিবাহ বিষয়ক ব্যবস্থাগ্রহণ</u> : বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকর্তৃক যে সমস্ত নারীর বিবাহ পশস্ত তারা হলেন, যে নারীর কোনরূপ অঙ্গ বৈকল্য নেই অর্থাৎ অবয়ব সংস্থানের পরিপূর্ণতা রয়েছে; যেসকল নারীদের নাম সৌম্য বা মধুর অর্থাৎ যে নামগুলি সুখে বা বিনাকষ্টে উচ্চারণ করা যায়; যেসকল কন্যাগণের গতিভঙ্গী হংস বা হস্তীর মতো অর্থাৎ বিলাসযুক্ত ও মন্থরগমনযুক্ত; যাদের লোম, কেশ ও দন্ত নাতিদীর্ঘ এবং যাদের অঙ্গসমূহ মৃদু বা সুখস্পর্শ অর্থাৎ

যে নারী কোমলাঙ্গী হয় ইত্যাদী। এইজাতীয় নারীদের সঙ্গে যেকোন ধরণের সৎ বিকলাঙ্গ পুরুষের বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য তাদের পরিবার যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কারণ এই জাতীয় নারীদের সঙ্গে যে কোন বিকলাঙ্গ পুরুষের বিবাহ হলে তারা মানসিক দিক থেকে সর্বদা সুস্থ থাকেন এবং সুস্থ-স্বাভাবিক কুলবৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এবিষয়ে *মনুসংহিতায়* বর্ণিত হয়েছে—

> অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীম্।
> তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্।।[৭]

৫.১.৪. <u>বিজিগীষু রাজাকর্তৃক বিকৃতেন্দ্রিয় গুপ্তচরের প্রতি বার্ষিক ভাতা ও অবসরভ্রাতা প্রদান</u> : বিজিগীষু রাজা গ্রামের সকল সরকারী ভৃত্যগণ, কপটবৃত্তি ছাত্রবেশী গুপ্তচর, নানা শাস্ত্রে অধ্যয়নকারী বলে পরিচিত গুপ্তচরবিশেষ, শত্রুহত্যায় নিপুণ ও অতিসাহসী গুপ্তচরবিশেষ, বিষপ্রদায়ী বিকলাঙ্গ গুপ্তচর, ভিক্ষুকের বেষধারী, উদাসীন সন্ন্যাসীর বেষধারী, মুণ্ডিতমস্তক বা জটাযুক্ত তপস্বীর বেষধারী প্রভৃতি বিকৃতেন্দ্রিয় গুপ্তচরদের প্রতি কর্মের দক্ষতা অনুযায়ী বার্ষিক সর্বোপরি একহাজার পণ এবং সর্বনিম্ন পাঁচশত পণ বেতন দানের ব্যবস্থা করবেন।

এছাড়াও গুপ্তচরদের অধীনস্ত ভ্রমণরত সকল বিকলাঙ্গ পুরুষগণের প্রত্যেকে দুইশত পঞ্চাশ পণ বার্ষিক বেতন বিজিগীষু রাজাকর্তৃক লাভ করবেন। অথবা তারা তাদের প্রয়াসের অনুরূপ অর্থাৎ তাদের কার্যের ভিত্তিতে উক্ত বেতনের বর্ধিত অংশও লাভ করতে পারেন। এক্ষেত্রে সকল বিকলেন্দ্রিয় গুপ্তচরগণ বিজিগীষু রাজা ও শত্রুদেশের রাজার কাছ থেকে অর্থাৎ উভয় রাজার কাছ থেকে বেতনভোগীর অধিকারী হবেন। প্রসঙ্গতঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গুপ্তচরের বার্ষিক ন্যূনতম বেতন প্রসঙ্গে *অর্থশাস্ত্রে* বলা হয়েছে—

> কাপটিকোদাস্থিত-গৃহপতিক-বৈদেহক-তাপসব্যঞ্জনাঃ সাহস্রঃ।
> গ্রামভৃতক-সত্রি-তীক্ষ্ণ-রসদ-ভিক্ষুক্যঃ পঞ্চশতাঃ
> চারসঞ্চারিণোঽর্ধতৃতীয়শতাঃ।[৮]

কিন্তু যদি কোন বিকৃতেন্দ্রিয় গুপ্তচরের বিজিগীষু রাজার কাছে কর্মরত অবস্থাতে মৃত্যু হয়, তাহলে সেই মৃত রাজকর্মচারীর পুত্র ও স্ত্রী বিজিগীষু রাজার কাছ থেকে অন্ন ও বেতন লাভের অধিকারী হবে। মৃত রাজকর্মচারীর শিশু, পিতা-মাতা ও অন্যান্য পীড়িত ব্যক্তিদের প্রতি রাজা অনুগ্রহ

প্রর্দশন করবেন। এক্ষেত্রে মৃত রাজকর্মচারীর পরিবারের অন্য কারোর মৃত্যু হলে বা কেউ পীড়িত হলে বা সন্তানপ্রসবাদি ব্যাপারে বিজিগীষু রাজা যথাসাধ্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন এবং উক্ত পরিবারের প্রতি যথোচিত সন্মান প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অল্প সম্পদের অধিকারী (With a small treasury) বিজিগীষু রাজা কর্তৃক কাউকে সাহায্যদানের প্রয়োজন হলে রাজা তাকে কুপ্য বা বনসম্পদ, পশু, ক্ষেত্র এবং অল্পপরিমাণ হিরণ্য বা নগদ টাকা দেবেন। বিজিগীষু রাজাকর্তৃক কোন শূন্য প্রদেশে গ্রামে নিবেশ করতে ইচ্ছুক হলে অর্থাৎ বিকলাঙ্গ জনসাধারণের নিবাসানুরূপ করতে চাইলে তৎসম্পর্কিত লোকদের হিরণ্য বা নগদ টাকা অল্প-বেশি পরিমাণে দানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কিন্তু নতুন জায়গায় বসতি স্থাপন করতে ইচ্ছুক বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রতি অনুগ্রহ প্রর্দশনের জন্য কোনরূপ গ্রাম দান করবেন না। কারণ যে গ্রাম পূর্ব থেকেই নিবেশিত হয়ে আছে, সেখানে যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা দৃঢ় করাই রাজার মুখ্য কর্তব্য অর্থাৎ পূর্ব থেকে যে গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, সেখান থেকে উৎপন্ন হিরণ্যাদি বা আমদানীর দৃঢ়ীকরণের দিকেই দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

এইভাবে বিজিগীষু রাজা স্থায়ী ও অস্থায়ী বিকলাঙ্গ রাজকর্মচারীদের প্রতি বিদ্যা ও কর্মনিপুণতার তারতম্য বিচার করে তাদের যোগ্যতানুরূপ বিশেষ অন্ন ও বেতনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিকলাঙ্গ রাজকর্মচারীকে কি পরিমাণ অন্ন বা তণ্ডুলাদি দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সে প্রসঙ্গে *অর্থশাস্ত্রে* বলা হয়েছে– বার্ষিক ষাট পণ বেতনের ক্ষেত্রে দৈনিক এক আঢক তণ্ডুলাদি অন্ন দেওয়ার ব্যবস্থা স্থির করে মৃত বিকলাঙ্গ রাজকর্মীর পরিবারকে রাজা নগদ টাকা প্রাপ্তির অনুরূপ তণ্ডুলাদি অন্নদানের ব্যবস্থা করবেন। অর্থাৎ বার্ষিক বেতন ষাট পণ নগদ টাকার বেশী বা কম হলে দৈনিক অন্নও অনুরূপভাবে বেশি বা কম হবে।

৫.১.৫. বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের কাছ থেকে বিজিগীষু রাজাকর্তৃক যেকোন যানবাহনে চলাফেরার জন্য শুল্ক ছাড়ের ব্যবস্থাগ্রহণ : দুই মাস বা তার বেশি কালের গর্ভিণী নারী, চতুর্থাশ্রমস্থিত সন্ন্যাসী, মুনি অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রমী তপস্বী, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী, ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড় অর্থাৎ বিকলান্তঃকরণ, কোনরূপ বর্ণের অনুচ্চারক অর্থাৎ মূক, কালা, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির কাছ থেকে নদীপথে এবং স্থলপথে গমনের জন্য কোনরূপ মাশুল গ্রহণ করা

হবে না। সেই প্রদেশের বিজিগীষু রাজা উক্ত ব্যক্তিদের নদীপথে এবং স্থলপথে যানবাহনে গমনের জন্য প্রয়োজনীয় মাশুলের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—

গর্ভিণী তু দ্বিমাসাদিস্তথা প্রব্রজিতো মুনিঃ।
ব্রাহ্মণা লিঙ্গিনশ্চৈব ন দাপ্যাস্তারিকং তরে।।[১]

অর্থাৎ বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের প্রতি বিজিগীষু রাজার মানবিক দিক থেকে সকলকে দান, সন্মান প্রভৃতির দ্বারা অনুগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য।

৫.১.৬. বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের বিবিধ শিক্ষা-কর্ম বিষয়ক ব্যবস্থা : শিক্ষার সহজলভ্যতা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। মানসিক অপরাধবোধ, যৌক্তিক চিন্তাভাবনা এবং বৌদ্ধিক অগ্রগতি যা একজন ব্যক্তিকে আলোকিত করে তোলে এবং মানুষের জন্য উপযুক্ত অতিরিক্ত মৌলিক অধিকার বোঝার জন্য এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জীবনযাত্রার মান শুধুমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারে, কারণ এটি মানুষকে তাদের বাহক বাছাই করতে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। প্রাচীন ভারতেও সাধারণ মানুষের ন্যায় সকল বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গও শিক্ষা-কর্মমূলক সমাজের শুভকর্মের অধিকার লাভ করতেন। মূলতঃ বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা ও গুরুসেবা— এই ছয়টি শ্রেষ্ঠ মোক্ষসাধন কর্মের মধ্যে 'বৈদিক কর্ম' অর্থাৎ প্রত্যক্ষশ্রুতিবচনবোধিত জ্যোতিষ্টোমাদি কর্মকে ইহলোকে ও পরলোকে পরম শ্রেষ্ঠ কর্ম বলে বুঝতে হবে। কারণ বৈদিক জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম দুইপ্রকার। **১.** প্রবৃত্ত কর্ম অর্থাৎ যে কর্মফলের দ্বারা স্বর্গাদি সুখ ও ইহলোকের অভ্যুদয়াদি লাভ হয়। **২.** নিবৃত্ত কর্ম অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স বা যে কর্মের মাধ্যমে মুক্তিলাভ হয়। এছাড়াও সনাতন বেদশাস্ত্রই সকল প্রাণীকে ধারণ করে থাকে। সেইহেতু বেদশাস্ত্রের দ্বারা জীবনের সুখ-দুঃখের সাধন নির্দেশ করে অর্থাৎ বেদশাস্ত্রই মানুষের পুরুষার্থ সাধনের পরম উপায় বলে চিহ্নিত করা হয়। অতএব যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রবিদ্, তিনি সেনাপতিত্ব, রাজ্য, দণ্ডনেতৃত্ব, সর্বলোকাধিপত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ের যোগ্য পাত্ররূপে পরিগণিত হবেন। *ঋগ্বেদ* প্রভৃতি তিন বেদে অভিজ্ঞ তিনজন, হেতুক অর্থাৎ অনুমানাদি (logician) নিপুণ একজন, তর্কী অর্থাৎ ঊহ-অপোহকুশল একজন (মীমাংসক), বেদাঙ্গ-নিরুক্তশাস্ত্র জ্ঞাত একজন, মানবাদিধর্ম শাস্ত্রজ্ঞ একজন এবং প্রথম তিন আশ্রমের তিন ব্যক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থী ও বানপ্রস্থী এইরকম ন্যূনতম দশজনকে নিয়ে বিজিগীষু রাজা তাঁর রাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রদেশে 'দশাবরা

পরিষৎ'[১০] গঠন করবেন। সেইহেতু প্রদেশের সকল সুস্থ-স্বাভাবিক ব্যক্তির ন্যায় যেসকল বিকলাঙ্গ ব্যক্তিগণ কর্ম করার জন্য বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে চায় নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম করার উদ্দেশ্যে, সেইসকল ব্যক্তিগণের প্রতি রাজা নিজ প্রদেশেই প্রকৃত অধ্যয়নের (ব্রহ্মচর্যাদি শিক্ষা) ব্যবস্থা করবেন।

৫.২. *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ : প্রাচীন যুগের লোকজনের শ্রেণিকরণের কোন গুরুত্ব ছিল না। সেই সময়ে বেঁচে থাকাই ছিল প্রধান ব্যাপার। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাদিতে যারা অক্ষম হওয়ার জন্য পরিপূর্ণভাবে অংশ নিতে পারতেন না, তাদের হয় মৃত্যুর হাতে ছেড়ে দেওয়া হত অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হত। কিন্তু পরবর্তীকালে মানসিক প্রতিবন্ধী ও আবেগগতভাবে মানসিক বিকারগ্রস্তদের কখনো স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি, কখনো জড়বুদ্ধি বা মূর্খ এবং আহাম্মক (fool) জাতীয় ক্ষতিকর আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্যান্য অপারগতা ও শারীরিক বিকৃতি সম্পন্ন লোকজনকে বোঝাতে প্রায়শঃ অবমাননাকর অর্থবোধক শব্দাবলী ব্যবহৃত হত।

ঐতিহাসিকভাবে অক্ষমতা বা Disability হল এমন একটি শারীরিক সমস্যা যা অন্য অধিকাংশ লোকেরা যে কাজ করতে সক্ষম সে সকল কাজ করার সামর্থ্যকে সীমিত করে ফেলে। অর্থাৎ বেশীরভাগ লোক যে কাজ করতে পারে সে কাজটি যদি কেউ করতে না পারে তখন তাকে Disabled বা অক্ষম বলা হয়। অর্থাৎ অক্ষমতা একটি শারীরিক অবক্ষয় বা ক্ষয়ের (Impairament) মতো অবস্থার সৃষ্টি করে। যতক্ষণ পর্যন্ত শারীরিক সমস্যাটি শিক্ষাগত, সামাজিক, বৃত্তিমূলক বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি না করে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন অক্ষম ব্যক্তি কখনোই প্রতিবন্ধী বা Handicapped নয়।

কিন্তু*বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতের* সময় থেকেই প্রতিবন্ধিদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী কার্যতঃ মানবিক প্রতিক্রিয়া ও আবেগের পর্যায়ে জুড়ে রয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* যেসকল বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্র রয়েছে তাদের সকলের বিলাপ সাধন, কুসংস্কার, পরিহাস, করুণা থেকে শুরু করে তাদের জন্য সেবামূলক কার্যক্রমের

উদ্ভবের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেই হেতু *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* উদ্ভূত যেসকল বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্র রয়েছে, তাদের বিকলাঙ্গের উপর ভিত্তি করে যেসকল বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা স্মৃতিশাস্ত্রের নিরিখে উল্লিখিত হয়েছে তা আমার শোধপত্রের চরিত্রসংঘের অন্তরালে ক্রমানুসারে নিম্নে আলোচিত হল :

১. **ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি :** মস্তকের উপরে হরিণের শৃঙ্গের ন্যায় অতিরিক্ত মাংসপিণ্ড নিয়ে জন্মানোর পরেও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি পিতা বিভাণ্ডকের বনের আশ্রমেই বসবাস করতেন। তিনি মূলতঃ বাল্যকাল থেকেই আশ্রমে মুখ্য ও গৌণ দুই প্রকার তপস্যার দ্বারা মহাতেজস্বী একজন মুনিরূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর শারীরিক অক্ষমতার দরুন কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি এবং সমাজ তাকে কোনরূপ তাচ্ছিল্যের স্বীকার হতে হয়নি। উপরন্তু তিনি রাজা দশরথের কন্যা শান্তাকে বিবাহ করেছিলেন এবং রাজা দশরথের পুত্র প্রাপ্তিতে তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। এছাড়াও *বৈয়াসিক মহাভারতের* সভাপর্বে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত ঋষিদের মধ্যে ঋষ্যশৃঙ্গের নাম উল্লিখিত হয়েছে।[১১]

উপর্যুক্ত বিভিন্ন ঘটনা প্রণালী থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি স্বয়ং বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা ও গুরুসেবা— এই ছয়টি শ্রেষ্ঠ মোক্ষসাধনার মধ্যে দিয়েই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি নিজেই পৌরহিত্য কর্মের দ্বারা পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেছেন এবং চতুরঙ্গ নামে এক ধার্মিক পুত্রেরও জন্ম দিয়েছেন।

২. **অন্ধক মুনি :** সরযূ নদীর তীরবর্তী নির্জ্জন আশ্রমেই অন্ধ মুনিদম্পতি এবং তাঁদের একমাত্র পুত্র সিন্ধু বসবাস করতেন। মুনিদম্পতি অন্ধ হওয়ার দরুন তাঁদের একমাত্র পুত্র সিন্ধু বাল্যকাল থেকেই বন্য-ফলমূল, শাক, অন্ন, পানীয় প্রভৃতির আরোহনের দ্বারাই অন্ধ পিতা-মাতার জীবনধারণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। মুনিদম্পতির একমাত্র পুত্র ভরণ-পোষণ অর্থাৎ গ্রাসাচ্ছাদনের প্রকৃত দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও সরযূ নদীর তীরবর্তী নির্জ্জন আশ্রমে প্রত্যহ বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠ পুত্র সিন্ধুর মুখে উচ্চারণের থেকেই অন্ধ মুনিদম্পতি শ্রবণ করতেন এবং প্রত্যহ শাস্ত্রাভ্যাসে রত থাকতেন। অন্ধ মুনিদম্পতি মূলতঃ তাদের একমাত্র পুত্র সিন্ধুর চোখ দিয়ে জগতের সকল প্রকার সুখ-দুঃখকে উপলব্ধি করতেন। কিন্তু রাজা দশরথের দ্বারা ভুলক্রমে বাণের

দ্বারা সিন্ধু নিহত হলে, সেই বাণ মুনিদম্পতির হৃদয়েও বিদ্ধ হয়েছিল। যার পরিণামস্বরূপ অন্ধ মুনিদম্পতিও তৎক্ষণাৎ পুত্রের মৃত্যুশোকে এবং ভবিষ্যতে স্বাতন্ত্রবিহীন প্রকৃত গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবের চিন্তায় দুইজনেই প্রাণ ত্যাগ করেন। অন্ধ মুনিদম্পতির পুত্রশোকে প্রাণ ত্যাগ প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

সোঽপ্যৃষিঃ পুত্রশোকেন ন চিরাদিব সংস্থিতঃ।[১২]

৩. কুশনাভের শতকন্যা : রাজা কুশনাভ তাঁর বিকলাঙ্গ শতকন্যার সর্বদায় ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং কাম্পিল্য নগরের রাজা ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে পবনদেব কর্তৃক কটিদেশ ভগ্ন শতকন্যাদের বিবাহ দিয়েছিলেন। এছাড়াও কুশনাভের নগরেই পবনদেব কর্তৃক শতকন্যার কুব্জত্ব প্রাপ্তির দরুন নগরের নামকরণ কান্যকুব্জ অর্থাৎ কুব্জা রমণীগণের নগরী নামে খ্যাতিলাভ করে।[১৩]

৪. মন্থরা : রাজা দশরথের সঙ্গে কেকয়রাজ অশ্বপতির কন্যা কৈকেয়ীর বিবাহের সময় অন্যান্য যৌতুকের সঙ্গে রাজা অশ্বপতি মন্থরা নামক একজন দাসীকে অযোধ্যায় পাঠিয়েছিলেন। মূলতঃ মন্থরা কৈকেয়ীর বাল্যকাল থেকেই একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী এবং রূপবিশারদ ছিলেন। তিনি খুব সুন্দর সুগন্ধী প্রস্তুতকারকও ছিলেন। বাল্যকালেই মন্থরার পিঠে একটি স্থূল মাংসপিণ্ড বা কুঁজ থাকায় রাজা অশ্বপতি করুণাবশতঃ কেকয়রাজ্যেই কন্যার রূপবিশারদরূপে তাঁকে নিয়োগ করে তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেন। রাজা অশ্বপতিই মন্থরার প্রাথমিক ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেন। পরবর্তী সময়ে রাজা দশরথ নিজ পত্নীর বিশ্বস্ত দাসীরূপে মন্থরার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মন্থরাকে প্রতিমাসে ১০০ শতপণ কৈকেয়ীর বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীরূপে, রাজা অশ্বপতি কর্তৃক বেতন দেওয়া হত।[১৪]

৫. কুবের : ভরদ্বাজ ঋষির কন্যা দেববর্ণিনীর পুত্র কুবের ছিলেন রাক্ষস, যক্ষদের অধিপতি এবং ধনসম্পদের দেবতা। বিকৃতেন্দ্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করলেও কুবের বাল্যকাল থেকেই কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন এবং ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের বরে তিনি চতুর্থ লোকপালের পদ লাভ করেন। কুবেরের কঠোর তপস্যায় পিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে তার বিকৃতেন্দ্রিয় শরীর নিয়ে চলাফেরার সুবিধার্থে পুষ্পক নামক বিমান দান করেন। প্রসঙ্গতঃ ব্রহ্মাকর্তৃক কুবেরের গমনাগমনের সুবিধার্থে পুষ্পক বিমান দান প্রসঙ্গে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

এতচ্চ পুষ্পকং নাম বিমানং সূর্য্যসন্নিভম্।
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব যানার্থে ত্রিদশৈঃ সমতাং ব্রজ।।[১৫]

এছাড়াও বিশ্রবা মুনি নিজপুত্র কুবেরের বসবাসের স্থান ও জীবনধারণের জন্য দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে ত্রিকূট পর্বত শিখরে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় বিশ্বকর্মাকর্তৃক নির্মিত রাক্ষসদের বসবাসের জন্য যে লঙ্কা নগরী নির্মাণ করেছিলেন, সেই নগরীর রাজারূপে কুবেরকে অভিষিক্ত করেন। পুরাকালে রাক্ষসগণ বিষ্ণুর ভয়ে ভীত হয়ে সুবর্ণ এবং বৈদূর্য্যমণিদ্বারা নির্মিত রমনীয় লঙ্কানগরী পরিত্যাগ করেছিলেন। সেই মানবশূন্য লঙ্কানগরীতে অচিরেই কুবেরের শাসনের দ্বারা বহুসহস্র রাক্ষসের দ্বারা পরিপূর্ণ হল এবং বিশ্রবা ঋষির পুত্র সেই সমুদ্রপরিবেষ্টিত নগরীতে অত্যন্ত সুখে বসবাস করতে লাগলেন। মাঝেমধ্যেই সেই ধনাধিপতি পুষ্পকরথে আরোহণ করে পিতা বিশ্রবা ও মাতা দেববর্ণীনির আশ্রমে আসতেন এবং বিনম্রের সহিত পিতা-মাতার সেবা শুশ্রূষা করতেন।

পরবর্তী সময়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ লঙ্কার অধিকার প্রার্থনা করেন এবং কুবেরের কাছে তাঁর দূত প্রহস্তকে পাঠান। কুবের ভাতৃদূত প্রহস্তকে বলেন, তাঁর যা কিছু রয়েছে, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিসেবে রাবণও সেই সকল ধনসম্পত্তির অধিকারী হবেন। এরপর কুবের পিতা বিশ্রবার পরামর্শ চাইলে, বিশ্রবা রাবণের শক্তিশালী হওয়ার পেছনে উৎকৃষ্ট বরলাভের কথা ব্যক্ত করেন এবং ভ্রাতার সঙ্গে যুদ্ধ না করার পরামর্শ দেন। বিশ্রবা মুনি পুনরায় কুবেরকে কৈলাস পর্বতে গিয়ে বসবাস করার পরামর্শ দেন এবং পিতার আদেশে সারাজীবন কৈলাস পর্বতের অলকাপুরীতেই জীবন অতিবাহিত করেন।

৬. <u>শূর্পণখা</u> : রাবণের ভগিনী রাক্ষসী শূর্পণখা বাল্যকাল থেকে লঙ্কাপুরীতেই ছিলেন এবং লঙ্কাধিপতির ভগিনী হওয়ায় তাঁর প্রাত্যহিক ভোগ-বিলাসের কোনরূপ ত্রুটি হয়নি। বিবাহের পর শূর্পণখা কালকেয় নগরে কিছুকাল সময় অতিবাহিত করেন। কিন্তু রাবণ কালকঞ্জ নামক বিখ্যাত শতসহস্র দানব বধ করতে করতে ভুলক্রমে শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুৎজিহ্বকে হত্যা করে নিজ ভগিনীকে বিধবা করেন। স্বামীর হত্যার ফলে রোদনকারী শূর্পণখার উদ্দেশ্যে রাবণ মধুর বাক্য প্রয়োগ করে বলেন, "বৎসে, বিলাপ করিও না, তুমি কাহাকেও ভয় করিও না। দান, মান এবং প্রসাদনদ্বারা যত্নপূর্বক আমি তোমার সন্তোষ বিধান করিব"।[১৬]

ভগিনী শূর্পণখার প্রতি রাবণের আশ্বাস অনুযায়ী, ঐশ্বর্যশালী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা খরের সঙ্গে শূর্পণখাকে দণ্ডকারণ্যেই চিরস্থায়ীরূপে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন। কারণ খর ছিলেন মহাবলশালী এবং চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসের রাজা। অতএব রাক্ষস খরের প্রতি শূর্পণখার প্রতিপালন পূর্বক প্রভুত্ব সর্বদাই বজায় থাকবে। এছাড়াও মহাবলশালী খরভ্রাতা দূষণও শূর্পণখার সৈন্যাধক্ষরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

উপর্যুক্ত রাবণের কথার ভিত্তিতে শূর্পণখা পরাক্রমশালী রাক্ষসসেনার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অকুতোভয়ে অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যের উদ্দেশ্যে গমন করেন এবং সেই দণ্ডকারণ্যেই খর নিষ্কণ্টক রাজ্য স্থাপন করে সেই প্রদেশেই বসবাস শুরু করেন। দণ্ডকারণ্যকেই শূর্পণখার বসবাসের জন্য বিবেচিত করার পিছনে রয়েছে পুরাকালে ঊশনা কর্তৃক সেই অরণ্যপ্রদেশের শাপবৃত্তান্ত। এবিষয়ে *বাল্মীকীয় রামায়ণে* বলা হয়েছে—

স হি শপ্তো বন্নোদ্দশঃ ক্রুদ্ধেনোশনসা পুরা।
রাক্ষসানামধীবাসো ভবেতি সুমহাত্মনাম্।।[১৭]

কিন্তু লক্ষ্মণ কর্তৃক খড়্গের দ্বারা দণ্ডকারণ্যেই শূর্পণখার বিকলাঙ্গত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর, শূর্পণখার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা খরপ্রভৃতি সকল রাক্ষসগণ রাম-লক্ষ্মণের দ্বারা যুদ্ধে নিহত হন। এরপর শূর্পণখা দণ্ডকারণ্য থেকে পালিয়ে লঙ্কানগরীতেই বসবাস শুরু করেন এবং রাবণের মৃত্যুর পর ভ্রাতা বিভীষণের সহিত লঙ্কানগরীতেই সারাজীবন অতিবাহিত করেন।

৭. ধৃতরাষ্ট্র : পিতামহ ভীষ্ম জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে নিজ পুত্রগুণে লালন-পালন করেছিলেন। সেইকারণে ভীষ্ম জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে প্রাথমিক বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রে শ্রুতির ন্যায় পাঠদান করতেন। এছাড়াও ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি কুরু রাজকুমারদের জন্য হস্তিনাপুরের কুলগুরুরূপে ঋষি শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্যকে নিয়োগ করেছিলেন। কুলগুরু কৃপাচার্যের পরামর্শেই ধৃতরাষ্ট্র মল্লযুদ্ধ, যুদ্ধে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ, হস্তিযুদ্ধ, দৌড়ানো এবং অন্যান্য দৈহিক ব্যায়ামে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। মূলতঃ ধৃতরাষ্ট্র কুরু রাজকুমার হওয়ায় পিতামহ ভীষ্মই তার ভরণ-পোষণ এবং বিবাহের সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন।

এছাড়াও মহর্ষি কিন্দমের শাপে রাজা পাণ্ডুর মৃত্যু হলে, হস্তিনাপুরের স্থায়ী রাজারূপে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজসিংহাসনে আসীন হন। এইসময় ধৃতরাষ্ট্রের মুখ্য উপদেষ্টারূপে ঋষি ব্যাসের শিষ্য সঞ্জয় নিয়োজিত হন। সঞ্জয় মূলতঃ সেই সময় থেকেই সারাজীবন ধৃতরাষ্ট্রের দেখাশুনা করেন। পুনরায় দুর্যোধন প্রভৃতি শত পুত্ররাও জন্মান্ধ পিতার প্রকৃত ভরণ-পোষণের দায়িত্বগ্রহণ করলেও, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সকল পুত্র নিহত হলে, পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠর হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির বাল্যকাল থেকেই যেরূপে ধৃতরাষ্ট্রকে সর্বকর্তৃত্বময় রাজার সম্মান দিতেন, সেইরূপে তিনি সিংহাসন অধিগ্রহণের পরও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সর্বদা একই সম্মান প্রদর্শন করেছেন। যে কোনরূপ কার্য সর্বদা ধৃতরাষ্ট্রের মত নিয়েই করতেন। কারণ যাতে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের এমন কখনোই মনে না হয় যে ক্ষমতা না থাকার দরুণ তাঁকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। এমনকি জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সুখ-দুঃখের কথা শোনার জন্য, তাঁকে সর্বদা দেখাশুনা করার জন্য যুধিষ্ঠির সর্বদা মহামতি বিদুর, সঞ্জয় এবং যুযুৎসু (ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর বৈশ্য দাসীর গর্ভজাত পুত্র) নামে তিনজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণকে তটস্থ রাখেন। রাজা যুধিষ্ঠির কখনো পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি রাজোচিত বিলাস ব্যসনে কার্পণ্য রাখেননি। এমনকি যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে রাজনৈতিকভাবেও পঙ্গু করে দেননি। কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্র বা সামন্ত রাজ্য যদি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে কোনরূপ প্রার্থনা নিয়ে আসত, সঙ্গে সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ অনুসারে যুধিষ্ঠির সেই প্রার্থনা পুরণের ব্যবস্থা করতেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে হস্তিনাপুরের প্রজারাও ধৃতরাষ্ট্রের কথা মেনে চলতেন। প্রসঙ্গতঃ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি পাণ্ডবগণের সকল প্রকার সেবা বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* উক্ত হয়েছে—

> সদা হি গত্বা তে বীরাঃ পর্য্যুপাসত তং নৃপম্।
> পাদাভিবাদনং কৃত্বা ধর্ম্মরাজমতে স্থিতাঃ।।[১৮]

৮. <u>দীর্ঘতমস্</u> : বেদজ্ঞ পণ্ডিত দীর্ঘতমস্ দেবগুরু বৃহস্পতির শাপে জন্মান্ধরূপে জন্মগ্রহণ করলেও, পিতা উতথ্যের মুখে বাল্যকাল থেকেই শিক্ষা-কল্প ইত্যাদি অঙ্গশাস্ত্র, চতুর্বেদ, পুরাণাদি প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তী সময়ে দীর্ঘতমস্-এর পত্নী প্রদ্বেষী কিছুকাল তাঁর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুসময় পরে পত্নী প্রদ্বেষী দীর্ঘতমস্ ঋষির কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁকে ত্যাগ করে ভেলায় ভাসিয়ে দেন। সেই সময় বলি নামক অপুত্রক রাজা

দীর্ঘতমস্-কে কলার ভেলা থেকে উদ্ধার করে নিজের রাজপ্রাসাদে স্থান দেন এবং তাঁর ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এছাড়াও দীর্ঘতমস্ নিজ তপস্যার বলে বৃদ্ধ বয়সে অন্যান্য মহান্ মহর্ষিগণের সহিত ইন্দ্রের সভায় তেজস্বী, সোমপায়ী এবং শোক-সন্তাপশূন্য হয়ে অবস্থান করতেন এবং তিনি ইন্দ্র দেবতার কাছ থেকে পারিশ্রমিক ও প্রভূত মূল্যবান্ উপহার পেতেন। ইন্দ্রের সভায় যেসকল মহর্ষি সর্বদা উপস্থিত থাকতেন তাঁরা হলেন—

> শঙ্খশ্চ লিখিতশ্চৈব তথা গৌরশিরা মুনিঃ।
> দুর্ব্বাসাঃ ক্রোধনঃ শ্যেনস্তথা দীর্ঘতমস্ মুনিঃ।।[১৯]

৯. অরুণ : দক্ষ প্রজাপতির অষ্টম কন্যা বিনতার বিকলাঙ্গ পুত্রের নাম অরুণ। জন্ম থেকেই অরুণের দেহ প্রভাতের সূর্যের মতো রক্তবর্ণ ছিল। তিনি বাল্যকাল থেকে মহাদেবের কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়েছিলেন। অরুণের কঠোর তপস্যাকালে একবার সূর্যদেব তাঁর উদয়কালে দেখলেন যে, অরুণ তাঁর নিজের বিকলাঙ্গ শরীরের তেজে সূর্যের সমান উজ্জ্বলরূপ প্রকাশ লাভ করেছেন। অরুণের সূর্যসমতুল্য তেজ দেখে সূর্যদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং নিজের সারথিরূপে অরুণকে নিয়োগ করেন। এইভাবে বিনতাপুত্র অরুণ সূর্যের সারথি রূপে নিযুক্ত হয়ে নিজের প্রাত্যহিক জীবনধারণের ব্যবস্থা করেন। সূর্যদেবের রথের সারথিরূপে অরুণের নিয়োগ বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে—

> স্বতেজসা প্রজ্বলন্তমাত্মনঃ সমতেজসম্।
> সারথ্যে কল্পয়ামাস প্রীয়মাণস্তমোনুদঃ।।[২০]

পরবর্তী সময়ে অরুণের দুই পুত্র সম্পাতি ও জটায়ু, তাঁদের বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ পিতার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১০. অষ্টাবক্র : মাতামহ উদ্দালকের ছত্রছায়াতেই বিকলাঙ্গ অষ্টাবক্র মুনি বেড়ে উঠতে থাকেন এবং মাতামহকেই তিনি বাল্যকাল থেকে পিতা বলে মনে করতেন। উদ্দালক মুনি বাল্যকাল থেকে বারো বৎসর পর্যন্ত বিকলাঙ্গ অষ্টাবক্র মুনির জীবনধারণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এছাড়াও উদ্দালক মুনির তত্ত্বাবধানেই অষ্টাবক্র মুনি বেদ, পুরাণ, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। পরবর্তী সময়ে অষ্টাবক্র মুনি নিজের বুদ্ধির দ্বারা জন্মদাতা পিতা কহোড়কে

জনকরাজার কাছ থেকে উদ্ধার করেন এবং জনক রাজাসভার মুখ্য পুরোহিতরূপে নিযুক্ত হন। জনকরাজা তাঁর রাজকোষ থেকে অষ্টাবক্র মুনিকে বার্ষিক বেতন এবং প্রভূত উপহার দিয়ে সর্বদা সম্মান প্রর্দশন করতেন।[২১]

১১. দ্যুমৎসেন : শাল্বদেশের রাজা হওয়ায় দ্যুমৎসেনকে প্রাথমিক জীবনধারণের ক্ষেত্রে কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু আকস্মিক দুর্ঘটনার দ্বারা তাঁর চক্ষুযুগল নষ্ট এবং রাজ্য থেকে বিতাড়িত হলে তিনি চরম অসুবিধার সম্মুখীন হন। এইসময় রাজ্যচ্যুত হয়ে তিনি তাঁর পত্নী ও একমাত্র ধর্মজ্ঞ পুত্র সত্যবানকে নিয়ে অরণ্যে আশ্রম তৈরি করে বসবাস শুরু করেন। অন্ধ দ্যুমৎসেনের প্রাত্যহিক দেখাশুনার জন্য তাঁর ধর্মপত্নীকে নিযুক্ত করেন এবং অন্ন আহরণের দ্বারা জীবনধারণের জন্য একমাত্র পুত্র সত্যবানকে নিয়োগ করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর পুত্রবধূ সাবিত্রী যমের নিকট আরাধোনার দ্বারা শ্বশুরের পুনরায় দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্তি এবং তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করেন।[২২]

১২. উপমন্যু : মহর্ষি আপোদধৌম্যের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম শিষ্য হলেন উপমন্যু। বাল্যকাল থেকে উপমন্যু গুরুভক্তি এবং নির্বিচারে গুরুবাক্য পালনের ন্যায় আপোদধৌম্যের সেবা করে তাঁর আশ্রমেই বেড়ে উঠতে থাকেন। কিন্তু আকস্মিক ক্ষুধায় কাতর হয়ে আকন্দ গাছের পাতা খেয়ে অন্ধত্ব প্রাপ্তি হলে, গুরু আপোদধৌম্য শিষ্য উপমন্যুকে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত করার জন্য বৈদ্যরাজ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করতে বলেন। গুরুর কথানুসারে উপমন্যু বৈদিকমন্ত্রতুল্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব শুরু করেন এবং দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বরে তিনি পুনরায় দৃষ্টিলাভ করেন। পুনরায় আপোদধৌম্য উপমন্যুর বেদ ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন এবং উপমন্যু অল্পসময়ে অত্যন্ত কুশল হয়ে ওঠেন। উপমন্যুর জ্ঞানলাভ বিষয়ে *বৈয়াসিক মহাভারতে* বলা হয়েছে— 'সর্বে চ তে বেদাঃ প্রতিভাস্যন্তি, সর্ব্বাণি চ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি ইতি'।[২৩]

১৩. পৌষ্য : জনৈক ন্যায়পরায়ণ ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। আপোদধৌম্যের শিষ্য ছিলেন বেদ এবং বেদের শিষ্য ছিলেন উতঙ্ক, এই উতঙ্কের শাপেই রাজা পৌষ্য সাময়িক দৃষ্টিহীন হয়েছিলেন। পৌষ্য যেহেতু রাজা ছিলেন সেইহেতু তাঁকে বাল্যকাল থেকে জীবনধারণের কোনরূপ অসুবিধার

সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু উতঙ্কের শাপে তিনি দৃষ্টিহীন হলে, পত্নী প্রীতি এবং একমাত্র পুত্র মতিনার তাঁর ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[২৪]

১৪. একলব্য : নিষাদরাজ হিরণ্যধনু ও সুলেখার পুত্র হলেন একলব্য। পিতা হিরণ্যধনুই বাল্যকাল থেকে একলব্যের সকল দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পিতা হিরণ্যধনু এলাহাবাদ প্রদেশের শ্রিংহবেরপুর প্রদেশের রাজা হওয়ার দরুণ পুত্র একলব্যকে জীবনধারণে কোনরূপ বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু একলব্য গুরু দ্রোণের দ্বারা বিকলাঙ্গত্ব প্রাপ্ত হলে সাময়িক ভরণ-পোষণের জন্য পত্নী সুনীতা তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে পিতা হিরণ্যধনুর অবর্তমানে তিনি শ্রিংহবেরপুরের রাজসিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন। *বৈয়াসিক মহাভারতে* একলব্যের সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবদের যে সখ্যতা প্রবল ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে একলব্য কর হিসাবে তাঁর চর্মপাদুকা দান করেন। তেমনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের হয়ে যুদ্ধ করার জন্য যুধিষ্ঠির একলব্যকে নিমন্ত্রণ প্রেরণ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হওয়ার পর বিকলাঙ্গ একলব্যের প্রতি সর্বদা মানবিক দিক দিয়ে দেখতেন এবং নিষাদগোষ্ঠীকে সুরক্ষিত রাখারও তিনি যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেছিলেন।[২৫]

১৫. শকুনি : গান্ধাররাজ সুবল বাল্যকাল থেকেই শকুনির প্রাত্যহিক জীবনের সকল দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শকুনি যেহেতু গান্ধার প্রদেশের রাজকুমার ছিলেন, সেইহেতু তাঁকে প্রাত্যহিক জীবন-যাপন ও শিক্ষা-দীক্ষায় কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। পরবর্তী সময়ে তাঁর একমাত্র ভগিনী গান্ধারীর সঙ্গে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হলে, তিনি গান্ধার ছেড়ে হস্তিনাপুরের রাজসভায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এইসময় হস্তিনাপুরের রাজা ধৃতরাষ্ট্র শকুনির যাবতীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং হস্তিনাপুরের রাজদরবারে শকুনির জন্য ধৃতরাষ্ট্র পান-ভোজন, দান-মানে কোনরূপ খামতি রাখেননি। শকুনিকে রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিশ্বস্ত, বুদ্ধিমান্, কূটকৌশলী, বিচক্ষণ, দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ণ, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরূপে হস্তিনাপুরের রাজদরবারে স্থান দিয়েছিলেন।[২৬]

৫.৩. বর্তমান সময়ে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি গৃহীত বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ :

প্রতিবন্ধকতার সমস্যা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কোন একটি সমাজের

বৈজ্ঞানিক সচেতনতা, ধর্মীয় চিন্তাধারা, সামাজিক সংস্কার, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে প্রতিবন্ধিদের প্রতি সমাজের মনোভাব গঠিত হয়। এছাড়াও প্রতিবন্ধিদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণার অভাব অথবা ভ্রান্ত ধারণার কারণে প্রতিবন্ধিদের প্রতি আমাদের যে মনোভাবের প্রকাশ ঘটে, তার উপর নির্ভর করেও প্রতিবন্ধিদের প্রতিবন্ধিতাজনিত সমস্যার উদ্ভব ঘটে। হেলেন কেলার তাঁর আত্মজীবনী *The Story of My Life* গ্রন্থে বলেছেন, "Not blindness, but the attitude of the seeming to the blind is the hardest burden to bear"।[২৭] সুতরাং প্রতিবন্ধিদের সম্বন্ধে সচেতন করা অর্থাৎ কারা প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধিতার কারণ কি, প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধের সম্ভাব্য উপায় কি এবং প্রতিবন্ধিদের প্রতি সমাজের মনোভাব কি হওয়া উচিত ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা উচিত।

সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা তথা ভ্রান্ত ধারণা, অন্ধবিশ্বাস ও মৌলবাদী চিন্তাধারার কারণে বহু শিশু প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মায় অথবা জন্মের পর প্রতিবন্ধী হয়। অথচ উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক সচেতনতা জনমানসে সৃষ্টি করতে পারলে বহু ক্ষেত্রেই আমরা শিশুকে বিকলাঙ্গ হওয়ার হাত থেকে মুক্ত করতে পারি। আবার কোন শিশু প্রতিবন্ধী জানবার পর বহু ক্ষেত্রেই পিতামাতা ভাগ্য বা কর্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকেন, শিশুর জন্য কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টাও করেন না। ফলে এরূপ ক্ষেত্রে শিশুর প্রতিবন্ধিতা জনিত কারণে সমস্যার গভীরতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং শিশু সমাজ ও পরিবারের পক্ষে বোঝা বা দায় হিসেবে বড়ো হয়। বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক-সামাজিক পুনর্বাসন করা প্রদেশের সরকারের উচিত। যদি উপযুক্ত সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটানো যায় এবং প্রতিবন্ধিদের জন্য সমাজের ও রাষ্ট্রের সহায়তার হাত উন্মুক্ত করা যায়, তবে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা সমাজের কাছে প্রতিবন্ধক না হয়ে সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নতির সহায়করূপে পরিগণিত হবেন। সেই উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে বর্তমান ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। আমার গবেষণা-প্রবন্ধে যেসকল প্রতিবন্ধকতার কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলি হল দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা, অস্থিগত প্রতিবন্ধকতা ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা। এই সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নে আলোচিত হল :

৫.৩.১. দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার প্রতিকারমূলক বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা : দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রধান সমস্যা হল এরা দেখতে না পাওয়ার জন্য পরিবেশকে নিজের সপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে না। দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার কারণে পরিবারে, সমাজে সর্বত্র তাদের ঘৃণা, অবজ্ঞা এবং বিভিন্ন নেতিবাচক মনোভাবের শিকার হয়। অতএব দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের শিক্ষাদানের পূর্বে তাদের এইসকল সমস্যা সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। অর্থাৎ এদের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ও সামাজিক মনোভাবগত অবস্থা বিচার করতে হবে। যদিও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের শিক্ষানীতি স্বাভাবিক দৃষ্টির শিক্ষার্থীদের চেয়ে পৃথক্ নয়, তবুও বিশেষ প্রতিবন্ধিতার জন্য বিশেষ কয়েকটি নীতির প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[২৮] দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষানীতিগুলি হল—

ক. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু যাতে নিজের পরিবেশের সঙ্গে সহজে নিজেকে অভিযোজিত করতে পারে, সেই ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. শিশুর শারীরিক বিকাশ, সঞ্চালনমূলক বিকাশ, দক্ষতার বিকাশ, প্রাক্ষোভিক (উত্তেজনাদায়ক) বিকাশ, মানসিক বিকাশ, ভাষার বিকাশ প্রভৃতি যাতে যথাযথভাবে ঘটে সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ. শিশুর শিক্ষা অবশ্যই তার প্রতিবন্ধকতা জয় করতে সাহায্য করে, সেই দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

ঘ. শিক্ষা শিশুর জ্ঞানমূলক দক্ষতার বিকাশ ঘটাবে এবং উন্নত চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটাবে।

ঙ. এই শিক্ষা শিশুকে আত্মনির্ভরশীল করবে এবং আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলবে।

আধুনিক শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, প্রতিটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুযায়ী বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এই ধরণের শিক্ষার অভ্যাস শিশুকে মূলতঃ বিচ্ছিন্ন বিশেষ শ্রেণিতে আবদ্ধ করে। তাই শুধুমাত্র মানবিকতার দিক থেকে নয়, শিশুর শিক্ষার যথেষ্ট উপযোগিতা যাতে থাকে সেজন্য সাধারণ পাঠক্রমেও এদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাঠক্রমের দিক থেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং দৃষ্টিমান্ শিক্ষার্থীরা আলাদা নয়। অর্থাৎ একই পাঠক্রম উভয়েরই

জন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কারণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের বৌদ্ধিক ক্ষমতা দৃষ্টিমান্ শিক্ষার্থীর তুলনায় কোন অংশে কম নয়। কিন্তু এই দৃষ্টি প্রতিবন্ধিরা যেহেতু শিক্ষাগত দিক থেকে দৃষ্টিহীন অর্থাৎ Educationally Blind তাই এরা দৃষ্টিশক্তিকে শিক্ষাগ্রহণ বা তথ্যসংগ্রহণের জন্য ব্যবহার করতে পারে না। এরা অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে তথ্যসংগ্রহ, তথ্য-উপস্থাপন ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করে। তাই এই দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের সাধারণ পাঠক্রমে প্রবেশ করানোর আগে এক বিশেষ পাঠক্রম শিক্ষা দেওয়া হয়, যা এই শিশুদের সাধারণ পাঠক্রম গ্রহণে (বিশেষ পদ্ধতিতে) উপযোগী করে তোলে। সেইহেতু অন্যান্য স্বাভাবিক দৃষ্টিমান্ শিশুদের পাঠ্যক্রমের তুলনায় দৃষ্টিহীনদের পাঠ্যক্রমে কিছু নতুন বিষয় সংযোজন করা প্রয়োজন। এগুলোকে ‘প্লাস্ বা কমপেনসেটারি কারিকুলাম্ অ্যাকটিভিটিজ্’ (Plus or Compensatory Curriculum activities) বলা হয়।[২৯] এই ‘প্লাস্ কারিকুলাম্’ শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ‘সমন্বিত শিক্ষা’র অধিকারী হতে পারে অর্থাৎ এক সাধারণ পাঠক্রমের আওতাভুক্ত হতে পারবে। প্লাস্ বা কমপেনসেটরি কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলীগুলি হল :

(১) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ (Sensory Training)।

(২) ব্রেইল লিখন ও পঠন (Braille Writing and Reading)।

(৩) দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রশিক্ষণ (Daily Living Skills Training)।

(৪) পরিবেশ পরিচিতি ও নিরাপদ হাঁটার কৌশলের প্রশিক্ষণ (Orientation and Mobility Training)।

(৫) অ্যাবাকাস (Abacus)।

(৬) রেকর্ডকৃত বই (Recorded Book)।

(৭) হাতের লেখা (Hand-Writing)।

(৮) টাইপিং (Typing)।

নিম্নে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল :

৫.৩.১.১. জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ (Sensory Training) : কোন শিশু তার পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করে। শিশু যে সমস্ত উদ্দীপনা ও তথ্য পরিবেশ থেকে গ্রহণ করে তার অধিকাংশই প্রবেশ করে তার দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা গেছে, একজন শিশুর ধারণার বিকাশে প্রায় ৮৫% ভূমিকা গ্রহণ করে তার দর্শনেন্দ্রিয়। এই দর্শনেন্দ্রিয় যাদের কার্যকারী নয়, তাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে আরও উন্নত ও কার্যকারী করে তুলতে হবে, যাতে এগুলি দর্শনেন্দ্রিয়ের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।[৩০] এজন্য বিভিন্ন আধুনিক কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। এই আধুনিক কৌশলগুলি হল :

ক. পিতা-মাতার মধ্যে বিশেষভাবে মা তার দৃষ্টিহীন শিশুকে কোলে নিয়ে আদর করার সময় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, যেমন হাত, পা, নাক, কান প্রভৃতি স্পর্শ করিয়ে সে সম্পর্কে ধারণা দেবেন। নিজের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ও পরিবেশ সম্পর্কে এভাবে বিভিন্ন ধারণা দেবেন।

খ. দৃষ্টিহীন শিশুর শ্রবণেন্দ্রিয়কে প্রখর করতে শিশুকে বিভিন্ন প্রকার শব্দযুক্ত খেলনা দিতে হবে। দৃষ্টিহীন শিশুর পিতা-মাতা শিশুকে বিভিন্ন খেলনা ও বস্তুসামগ্রী বাজিয়ে শব্দ শোনাবেন এবং এই শব্দটি কীসের শব্দ এবং সেটি তার থেকে কত দূরে রয়েছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করবেন।

গ. দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে ও কতটুকু শব্দের প্রাবল্য হ্রাস পায় সে সম্পর্কে শিশুকে ধারণা দিতে হবে। হাঁটার সময় সামনে কোন বড় বাধা আছে কিনা তা প্রতিধ্বনির মাধ্যমে অনুধাবন করার অভিজ্ঞতা দিতে হবে।

ঘ. পিতা-মাতা ঘরের বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী স্পর্শ করাবেন এবং কোনটি কি বস্তু তা দৃষ্টিহীন শিশুকে জ্ঞাত করাবেন।

ঙ. দৃষ্টিহীন শিশুকে বিভিন্ন প্রায় সমজাতীয় বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে এবং এদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তা শেখাবেন।

চ. দৃষ্টিহীন শিশুর মানসিক দিকের কথা বিচার করে পরিবারের যেকোন ঘটনা, আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে শিশুকে অবহিত করাতে হবে।

ছ. কিছু কিছু বস্তু আছে যেগুলির স্বাদ বা গন্ধ রয়েছে, এই দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটাতে হবে। যেমন-সাবান, তেল ইত্যাদি।

জ. দৃষ্টিহীন শিশুর আঙুল সাধারণতঃ তার চোখের পরিবর্তরূপে কাজ করে। তাই আঙুল সঞ্চালনের সূক্ষ্ম প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আঙুল যাতে পুড়ে বা কেটে না যায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫.৩.১.২. ব্রেইল লিখন ও পঠন : দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পুরোনো এবং বর্তমানেও যথার্থ পন্থা হল ব্রেইল। এটি একটি আয়তাকার প্লেটের মতো অথবা দুটি সারিবিশিষ্ট একটি বিশেষ উপকরণ, যার প্রতিটি সারিতে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্রেইল কোশ। প্রতিটি কোশ ছয়টি বিন্দু নিয়ে গঠিত। বিন্দুগুলোতে স্টাইলাস্ (স্টাইলাস্ হল একধরণের সূঁচালো লোহা বা ব্রঞ্জের তৈরি কাঁটাবিশেষ; প্রাচীনকালে এই ধরণের কাঁটা লেখার কাজে ব্যবহৃত হত) দিয়ে চাপ দিলে নীচে রাখা কাগজ চাপের ফলে গর্ত হয়ে যায়। এবার ফর্মা থেকে কাগজ বের করলে উলটো দিকে উঁচু উঁচু বিন্দু পাওয়া যাবে, যেগুলি চাপ দেওয়ার ফলে সৃষ্ট হয়। এই উঁচু উঁচু বিন্দুগুলি হাতের আঙুলের স্পর্শ পড়ার প্রক্রিয়াকেই ব্রেইল পদ্ধতিতে বই পড়া বলে। সাধারণতঃ কাগজটি একটু মোটা নেওয়া হয়, যাতে গর্ত বা উঁচু স্থানগুলি স্থায়ী ও স্পষ্ট অনুভূত হয়।

ব্রেইলের এই ছয়টি বিন্দু বিভিন্ন অবস্থানের সম্মিলিত উপস্থাপনাই বিভিন্ন বর্ণ, নম্বরকে বোঝায়। ব্রেইলকে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার আত্মা বলা হয়। এখনও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দৃষ্টিহীনদের শিক্ষায় ব্রেইল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তাই ব্রেইলের এই কোডগুলো মুখস্থ করা স্টাইলাস্ (চাপ দেওয়ার কাঠি) ব্যবহারের সূক্ষ্মতা দৃষ্টিহীনদের শেখাতে হবে। যেমন-ইংরেজি বর্ণমালা A, B, C, D, E, F, G, H, I, J..... বর্ণগুলির ব্রেইলের লিখন পদ্ধতিগুলি হল এইরূপ[৩১] :

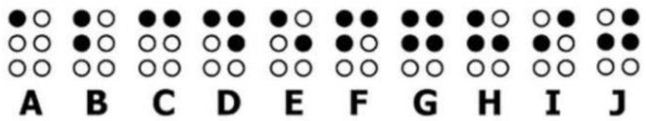

৫.৩.১.৩. দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রশিক্ষণ : একজন মানুষের জীবনকে সুস্থভাবে পরিচালনা করতে কতগুলো দক্ষতা শেখা এবং তাতে অভ্যস্ত হওয়া বিশেষভাবে

প্রয়োজন। এই দক্ষতাগুলোকে বলে দৈনন্দিন কার্যাবলী বা প্রাত্যহিক জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় দক্ষতাসমূহ (Daily living skills)। দৃষ্টিমানরা ও সাধারণ বুদ্ধির অধিকারীরা অপরকে দেখে ও অনুকরণ করে শেখে এবং কখনও কখনও সামান্য প্রশিক্ষণে এই দক্ষতাগুলোতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু দৃষ্টিহীনরা যেহেতু অপরকে অনুকরণ করতে পারে না, সেহেতু তাদেরকে এই দক্ষতাগুলোতে অভ্যস্ত হবার জন্য বিশেষ প্রকারের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। মানসিক প্রতিবন্ধিদের স্বাভাবিক দৃষ্টি থাকলেও যেহেতু অনুকরণ করে শিখবার মতো বুদ্ধি নেই, তাই কোন কোন ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদেরও এই দৈনন্দিন কার্যাবলীর প্রশিক্ষণ দিতে হয়। একাধিক ধরণের প্রতিবন্ধিতার সমস্যায় জর্জরিতদেরও এই প্রশিক্ষণ দিতে হয়। “Daily living skills are those abilities that enable the disabled child to carry out his day to day activities without assistance or with minimum assistance”।[৩২] এই দক্ষতাগুলোর বিকাশ ঘটলে প্রতিবন্ধী শিশুদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগে এবং তারা সাধারণ শিশুদের সাথে সমন্বিত কার্যক্রমে শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত বিবেচিত হয়। দৃষ্টিহীনতা, পরিবেশগত প্রতিকূল অবস্থা এবং সুযোগের অভাবে দৃষ্টিহীনরা দৃষ্টিমানদের তুলনায় দৈনন্দিন কার্যাবলীর দক্ষতা অর্জনে যথেষ্ট পিছিয়ে থাকে। তবে সঠিক পদ্ধতিতে ধৈর্য ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এদের শিক্ষা দিতে পারলে এরাও সাধারণ শিশুদের ন্যায় বিভিন্ন দক্ষতায় অভ্যস্ত হতে সক্ষম।

দৈনন্দিন কার্যাবলী সমাপনে তাদেরকে যেসমস্ত বিষয়ে নজর দিতে হবে, সেগুলিগুলো হল:

১. যতখানি সম্ভব বাইরের বা অন্যের সাহায্য ছাড়াই এবং নিশ্চিন্তে দৃষ্টিহীন ব্যক্তি যাতে তার প্রতিদিনের কাজগুলো করতে পারে, সেজন্য তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

২. সকল প্রকার কাজে দৃষ্টিহীন ব্যক্তি যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে, তাকে সেই মতো সাহায্য করা।

৩. সমাজের সাথে সমন্বয় গড়ে তোলার জন্য ব্যক্তির মধ্যে প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা দরকার।

৪. ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সুস্থ সম্পর্কের বিকাশে সহায়তা করা।

৫. ব্যক্তির নিজেকে এবং গৃহকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালনায় সাহায্য করা।

৬. পরিবারে যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে, দৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের শিক্ষাদান এবং সে সম্বন্ধে তার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিত।

৭. দৃষ্টিহীন ব্যক্তি যাতে নিজেকে ঠিকমতো সাজিয়ে রাখতে পারে তার জন্য শিক্ষাদান করা উচিত।

৮. দৃষ্টিহীন ব্যক্তির অপরের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং জীবনধারণের জন্য ব্যয় হ্রাস করা।

৯. দৃষ্টিহীন ব্যক্তি যাতে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারে, তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০. দৃষ্টিহীন ব্যক্তির নিজের সম্বন্ধে একটি সুপ্ত গ্রহণোপযোগী ধারণার বিকাশ ঘটানো।

কোন দৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে জীবনযাপনের জন্য দৈনন্দিন কার্যাবলী সাধারণের দক্ষতা সম্বন্ধে শিক্ষাদানের পূর্বে জানতে হবে যে তাকে কোথায়, কীভাবে এবং কখন এই দক্ষতাগুলো সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দান করা হবে। এই দক্ষতাসমূহের বিকাশের জন্য কোন প্রোগ্রাম তৈরির পূর্বে প্রশিক্ষকের নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলো থাকা প্রয়োজন—

ক. বিভিন্ন বয়সের দৃষ্টিমান শিশু বা ব্যক্তিরা কোন একটি দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য যেভাবে প্রয়োজনীয় দক্ষতা দেখায়, সেবিষয়ে প্রশিক্ষকের লক্ষ্য রাখা উচিত।

খ. কোন একটি সুস্থ স্বাভাবিক শিশু, যে দুই চোখে ভালোভাবে দেখতে পায়, তার সাথে একটি দৃষ্টিহীন শিশুর দর্শন বিষয়ে পার্থক্য ভালো করে নিরীক্ষণ করা।

গ. সমস্যা চিহ্নিতকরণের পর কোন দৃষ্টিহীন শিশুকে কোন একটি বিশেষ দক্ষতা প্রশিক্ষণ দানের পূর্বে তার জন্য উক্ত দক্ষতা অর্জনের জন্য অন্য দক্ষতা গুলোকে (prerequisite skills) ঠিক করা।

ঘ. নির্দিষ্ট বয়স ও গ্রেড্ অনুযায়ী দৃষ্টিহীনদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো শ্রেণিবিভাগ করা।

ঙ. প্রতিটি দক্ষতা শিক্ষাদানের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি স্থির করা।

চ. বিভিন্ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ দানের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করা।

ছ. দক্ষতা প্রশিক্ষণের শেষে শিক্ষার্থী কতখানি ঐ দক্ষতা আয়ত্ত করেছে, তার যথাযথ মূল্যায়ন করা।

জ. আয়ত্ত করা দক্ষতাকে শিশু কতখানি ব্যবহার করছে, সে সম্বন্ধে নিয়মিত খোঁজ রাখা।

প্রত্যেক দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের নিম্নলিখিত দক্ষতা সহকারে শিক্ষাদান করা উচিত। শিক্ষাগুলি হল :

১. শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা দান ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শেখানো।

২. স্নান করা, তেল, সাবান দেওয়া, সাজসজ্জা ও জামাকাপড় পরিষ্কার করা ও নিজে নিজে পরার অভ্যাস করানো।

৩. খাবার খাওয়া ও যথাস্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করার অভ্যাস গড়ে দেওয়া।

৪. সামাজিক বিভিন্ন রীতিনীতি, আচরণ ইত্যাদিতে দক্ষ করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৫. গৃহ ও বাসনপত্র পরিষ্কার করা, চুল বাঁধা, বিছানা প্রস্তুত করতে শিখিয়ে দেওয়া।

৫.৩.১.৪. পরিবেশ পরিচিতি ও নিরাপদে হাঁটা-চলার জন্য প্রশিক্ষণ : দৃষ্টিহীনদের নিরাপদে হাঁটা-চলা করার জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করতে এদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বল্প দৃষ্টিমান্ শিশুরা যেহেতু সামান্য দেখতে পায়, তাই তারা এই ধরনের বিশেষ প্রশিক্ষণ নাও নিতে পারে। তবে অবশ্যই তাদের যাতায়াতের কৌশলগুলি শেখানো উচিত। অতএব সমাজকে জানার জন্য এবং নিরাপদে গমনের জন্য দৃষ্টিহীনদের যে সকল প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তা হল নিম্নরূপ :

ক. দৃষ্টিমান্ সহযাত্রী পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে একজন দৃষ্টিমান্ ব্যক্তি একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে তার যেকোন একটি হাতের কনুইয়ের ঠিক উপরে ধরে চলতে সাহায্য করেন। দৃষ্টিমান্ ব্যক্তি অনুসরণকারী দৃষ্টিহীন ব্যক্তি থেকে এক পদক্ষেপ সামনে থাকবেন। ভিড় ও অন্যান্য জটিল পরিস্থিতিতে দৃষ্টিমানের এক কাঁধে দৃষ্টিহীন হাত রাখবেন ও তার ঠিক পিছনেই থাকবেন। এই পদ্ধতির অসুবিধা হল, একজন ব্যক্তিকে সর্বদা প্রতিবন্ধির সঙ্গে সঙ্গে থাকতেই হয়।[৩৩]

খ. সহযোগী কুকুর (Dog guide) : পাশ্চাত্যে Lambrador জাতের কুকুর দৃষ্টিহীনদের হাঁটাচলার জন্য পথপ্রদর্শকরূপে কাজ করে। উন্নয়নশীল দেশে উন্নতমানের এই জাতীয় কুকুরের অভাবে এই পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায় না। তাছাড়া কুকুর অসুস্থ হলে বা মারা গেলে দৃষ্টিহীন ব্যক্তি হঠাৎ অচল হয়ে পড়তে পারেন, তাই এই পদ্ধতি সেই দিক থেকে নির্ভরযোগ্য নয়।[৩৪]

গ. সাদা ছড়ির ব্যবহার : দৃষ্টিহীনদের স্বাভাবিক ও নিরাপদে হাঁটা-চলার জন্য নির্ভরযোগ্য সর্বাধিক ব্যবহৃত কৌশল হচ্ছে সাদা ছড়ির ব্যবহার। এই কৌশলটি জানা থাকলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিরা সর্বদা একাকী পরিচিত ও অপরিচিত স্থানে চলাফেরা করতে পারেন।[৩৫]

ঘ. নিরাপদ কৌশল : দৃষ্টিহীনরা যখন পরিচিত বা অপরিচিত পরিবেশে থাকেন, তখন হাঁটা-চলার সময় বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। এই অসুবিধা দূর করার জন্য বিভিন্ন নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন- দরজার সামনে কোন উঁচু কাঠ (চৌকাঠ) না রাখা ইত্যাদি।

ঙ. অতিস্বনক মরীচি (Ultrasonic Beam) : এক ধরণের Ultrasonic রশ্মির মাধ্যমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু বা ব্যক্তিরা সামনে অবস্থানকারী বড় বাধা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। এক্ষেত্রে এই রশ্মির প্রতিফলন ঘটে ও ব্যক্তি অনুধাবন করতে পারেন। অতি সাম্প্রতিককালে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে এক ধরনের জুতো আবিষ্কার করা হয়েছে যার সাহায্যে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা সম্মুখের কোন বাধা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।[৩৬]

৫.৩.১.৫. অ্যাবাকাস্ (Abacus) : গাণিতিক যন্ত্র হিসাবে অ্যাবাকাস্ এশিয়া মহাদেশেই উন্নত হয়েছে। এটি একটি মানুষ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র, যা দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিয়োগ, গুণ, ভাগ, শতাংশ, বর্গমূল প্রভৃতি নির্ণয় করতে অ্যাবাকাস্ ব্যবহার করতে পারেন।[৩৭] দৃষ্টিহীনদের অ্যাবাকাস্ ব্যবহার শেখানোর কতকগুলি সুফল রয়েছে, সুফলগুলি হল :

ক. যেকোন দেশের মানচিত্র তৈরি করাকে উৎসাহিত করে।

খ. বোধগম্য এবং আগ্রহী সমস্যার মানচিত্র তৈরিতে সাহায্য করে।

গ. গাণিতিক সমস্যা দ্রুত এবং সঠিকভাবে নির্ণয়ে সাহায্য করে।

ঘ. হাতের আঙুলের সূক্ষ্ম সঞ্চালনে সাহায্য করে।

৫.৩.১.৬. রেকর্ডকৃত বই (Recorded Book) : লিখিত তথ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করার অন্য এক উপায় হল রেকর্ডকৃত বই বা ক্যাসেট। রেকর্ডকৃত বইয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। যেকোন তথ্যকে ব্রেইলে পড়ার চেয়ে রেকর্ডকৃত বইয়ে পড়া অনেক সহজ এবং দ্রুত প্রক্রিয়া। রেকর্ডকৃত বই শ্রবণ দক্ষতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করে। রেকর্ডকৃত বই সহজেই পাওয়া যায় এবং খুব ব্যয়বহুল নয়।[৩৮]

কিন্তু রেকর্ডকৃত বইয়ের (Recorded Book) অনেক সুবিধা থাকলেও দৃষ্টিহীনরা কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন। তার মধ্যে প্রধান দুটি অসুবিধা হল :

ক. রেকর্ডকৃত বইয়ের ব্যবহারের ফলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিরা পড়তে ভুলে যায় বা পারে না।

খ. মানচিত্রগত সমস্যা, লেখচিত্র প্রভৃতি রেকর্ডকৃত বইয়ের দ্বারা বোঝানো মুশকিল।

দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের রেকর্ডেড্ বই (Recorded Book) ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতকগুলো নিয়ম মানতে হয়। এই নিয়মগুলি হল :

(১) পশ্চাতের শব্দ কমানোর জন্যে টেপ রেকর্ডারকে একটি শান্ত, বদ্ধ কক্ষে নিয়ে যেতে হবে।

(২) বই রেকর্ড করার আগে নির্দিষ্ট বইটি পড়তে হবে।

(৩) রেকর্ডকৃত বই শুরু করার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আগে রেকর্ড করতে হবে। যেমন- বইয়ের নাম, লেখক, প্রকাশের তারিখ, বিষয়বস্তু, টেপ্ নম্বর, অধ্যায়ের ক্রমিক নম্বর প্রভৃতি।

(৪) নির্দিষ্ট বই রেকর্ডের পূর্বে ১৫ সেকেন্ড বিরতি দেওয়া উচিত।

(৫) অবশ্যই রেকর্ড করার পূর্বে গলা কফ্-মুক্ত, স্পষ্ট রাখতে হবে।

(৬) স্বাভাবিক গতিতে, স্বাভাবিক কণ্ঠে পড়তে হবে।

(৭) বিভিন্ন চরিত্রের (নাটক) ক্ষেত্রে কণ্ঠ কখনোই অভিনয়ের মতো হবে না।

(৮) কোন অপরিচিত, কঠিন শব্দ, নাম হলে তা বানান করতে হবে।

(৯) কোন মানচিত্র থাকলে তা এখানে বর্ণনা করতে হবে।

(১০) কোন বইয়ের শব্দ পরিবর্তন করা যাবে না।

(১১) কোন একটি অনুচ্ছেদ বা লাইনের মাঝে কোন টেপ্ শেষ করা যাবে না।

৫.৩.১.৭. হাতের লেখা (Hand Writing) : কোন কোন শিক্ষক মনে করেন যে যারা সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন, তাদের ক্ষেত্রে হাতের লেখা অসম্ভব এবং যারা আংশিক দৃষ্টিহীন তারা একাকীই হাতের লেখা লিখতে পারবে। কিন্তু এই ধারণা মোটেই ঠিক নয়। সকল প্রতিবন্ধির হাতের লেখার প্রয়োজন রয়েছে।[৩৯]

ক. সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন : যারা সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন ব্যক্তি, তারা হাতের লেখা বেশি অভ্যাস করতে পারবে না। সকল বর্ণ লেখা তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তার নাম লিখতে যে কটি বর্ণের প্রয়োজন সেই কটি বর্ণকেই প্রথমে লিখতে শেখানো উচিত।

একটি বিশেষ ধরণের বাক্স তৈরি করতে হবে, যা একটি কাগজের উপর রাখলে মাঝখানে একটি আয়তক্ষেত্রের ন্যায় ফাঁকা জায়গা থাকবে এবং এই ফাঁকা স্থানে শিক্ষার্থী তার নামের অক্ষরগুলি পর পর লিখবে। প্রথমে এই কাঠের বাক্সটি বড়ো হলেও পরে আস্তে আস্তে ছোট করা হবে।

খ. আংশিক দৃষ্টিহীন : আংশিক দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধিরা তাদের নামের বাইরেও তারা বিভিন্ন বর্ণমালা ও অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন। এক্ষেত্রে কতকগুলি ধাপ অনুসরণ করা উচিত।

(১) শিশুকে সাদা কাগজে কালো দাগ টানা খাতা দিতে হবে।

(২) শিশুকে কালো কালির কলম দিতে হবে।

(৩) লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন প্রতিফলন কাগজে না পড়ে।

(৪) শিশুকে সাদা বোর্ডের উপর লিখতে দিতে হবে।

(৫) শিশুকে সঠিকভাবে লেখার কৌশল শেখাতে হবে।

(৬) আংশিক দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা প্রায়শই বাঁকা ও অস্পষ্ট লিখে থাকে, এদের সঠিকভাবে লেখায় যত্ন নিতে হবে।

৫.৩.১.৮. টাইপ (Type) : সকল দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধিরা নিজেদের হাতের সঠিক সঞ্চালনের অভ্যাসের পর টাইপ চালানোর জন্য সুযোগ দেওয়া উচিত। এটি বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা দৃষ্টিমানদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে, টাইপের মাধ্যমে লিখে পাঠানো যেতে পারে। তাছাড়া বর্তমানকালে ব্রেইলার, ব্রেইল কম্পিউটার প্রভৃতিতে কিছু লিখতে গেলে টাইপের বিশেষ প্রয়োজন আছে।[৪০]

যদি উপর্যুক্ত কৌশলগুলি কমপক্ষে টানা একবছর অনুসরণ করা হয়, তাহলে শিশু নিশ্চয়ই গণিত শিখনে সমর্থ হয়ে উঠবে। একথা মনে রাখতে হবে যে 'গণিত শিক্ষা একটি কঠিন কাজ। বিশেষ করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের ক্ষেত্রে' -এই বক্তব্যটি পুরোটা ব্যক্তিনির্ভর। কোন কোন শিশু গণিত পছন্দ করে, আবার কেউ করে না। কিন্তু দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের একজন শিক্ষক হিসাবে এই ধরনের মূল বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস অবশ্যই রাখতে হবে।

৫.৩.২. দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা : দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল :

(১) পৃথকীকৃত শ্রেণি : এই পদ্ধতিতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বাভাবিক শিশুদের থেকে পৃথক্ করে নির্দিষ্ট একটি শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের একজন শিক্ষকের অধীনে শিক্ষা গ্রহণের কথা বলা হয়। তবে বর্তমানে শিক্ষাবিদ্ এই সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের পরিবর্তে দিনের নির্দিষ্ট একটি সময়ে পৃথক্‌ভাবে পাঠদানকে বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করেন।[৪১]

(২) সহায়ক পাঠক ও লেখক : উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মূলতঃ যেখানে ব্রেইল পুস্তক উপযুক্ত সংখ্যায় পাওয়া যায় না, সেখানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা সাধারণ পাঠক্রম অনুসরণের ক্ষেত্রে সহায়তাকারী হিসাবে একজন স্বাভাবিক ব্যক্তিকে পাঠক ও লেখক হিসাবে নিতে পারে এবং পরীক্ষা দিতে পারে।[৪২]

(৩) ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক : শহর বা গ্রাম, ছোট বড় যেকোন সমাজেই দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের শিক্ষাদানের জন্য ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এলাকার বিভিন্ন স্কুলে বা একটি স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষকদের উক্ত প্রতিবন্ধিদের শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পরামর্শ, সহায়ক পুস্তক, সহায়ক যন্ত্রপাতি, বিশেষতঃ ব্রেইল ব্যবহার সম্পর্কে সাহায্য করে থাকেন।[৪৩]

(৪) সমন্বিত পরিকল্পনা : এটি মূলতঃ আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের জন্যই প্রযোজ্য। যেসমস্ত ক্ষেত্রে নিকট ও স্বল্প দৃষ্টির প্রয়োজন হয়, সেইসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের একত্রে শিক্ষাদান করা হয়। এছাড়া অন্যান্য কাজগুলি দিনের বাকি সময়ে পৃথক্‌ভাবে করানো হয়।[৪৪]

(৫) রিসোর্স কক্ষ : এই পদ্ধতি সমন্বিত পরিকল্পনার একটি উন্নত রূপ। এখানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা দিনের অধিকাংশ সময় স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে একত্রে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং দিনের নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের অধীনে রিসোর্স কক্ষে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।[৪৫]

(৬) আবাসিক বিদ্যালয় : শুধুমাত্র দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ আবাসিকভাবে এই বিশেষ ধরণের বিদ্যালয় গঠন করা হয়। সাধারণতঃ বছরের অধিকাংশ সময় শিক্ষার্থীরা এখানে থাকে। এই বিদ্যালয়ে সাধারণ পড়াশোনার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার উপর নির্ভর করে এই বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো গঠন করা হয়।[৪৬]

৫.৩.৩. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য খেলাধূলা, শারীরিক ব্যায়াম এবং অবসর বিনোদনের ব্যবস্থাসমূহ : দৃষ্টির সমস্যার কারণে এই জাতীয় অক্ষম ব্যক্তিরা হাঁটাচলা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নড়াচড়ায় বিশেষভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। যেহেতু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পরিবেশকে স্বপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তাই পরিবেশে কোন বাধা থাকতে পারে এই ভয় হতেও এদের চলন ও গমন বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীন শিশুর প্রতি পিতামাতার নেতিবাচক মনোভাব অধিক প্রতিরোধ ও শিশুর চলন ও গমনে উৎসাহ না থাকার জন্য দায়ী করা হয়। যেসকল পিতামাতারা শিশুর দৃষ্টিহীনতার জন্য নিজেদের দোষী মনে করেন বা নিজেদের কর্মফলকে দায়ী করেন তারা নিজেদের অজ্ঞাতে শিশুর জন্য আত্মদান করার মাধ্যমে শিশুর প্রতি

নিজেদের পাপের ফল কল্পনা করেন এবং সেই অনুসারে শিশুর সব কাজ করে দেন এবং এমনকি শিশু হাঁটতে গেলে কষ্ট পাবে, আঘাত পাবে বা পড়ে যাবে ভেবে শিশুকে কখনো হাঁটতেও শেখান না। ফলে এদের শারীরিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং মাংসপেশীসমূহের বিকাশ বয়স অনুপাতে হয় না। এই কারণে রুগ্নতা এবং দুর্বল স্বাস্থ্য দৃষ্টিহীনদের মধ্যে প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। একদিকে দারিদ্র্যের কারণে অপুষ্টি এবং অন্যদিকে দৃষ্টিহীনতার কারণে শারীরিক বিকাশে বাধা, সব মিলিয়ে দৃষ্টিহীন শিশুদের পক্ষে শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শরীরশিক্ষা যেমন মাংসপেশীসমূহের বিকাশ ঘটায় তেমনি ব্যক্তিকে চঞ্চল করে, সুস্থ ও নীরোগ রাখে, কর্মশক্তি যোগায়, প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরপুর করে রাখে, সাহসী ও উদ্যমী করে। এছাড়াও খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুর অন্তরের দ্বন্দ্ব, ক্ষোভ ও আক্রমণাত্মক মনোভাব গঠনমূলক পথে প্রকাশ পায় এবং শিশুকে মানসিক সৌন্দর্য ও প্রশান্তি দান করে। সুতরাং দৃষ্টিহীন শিশুদের পক্ষে খেলাধুলা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৃষ্টিনির্ভর এবং অনুকরণ ও অনুশীলনের দ্বারা এই বিষয়ে দক্ষতা জন্মায়। আবার দৃষ্টিমানদের খেলাধুলাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একজন দৃষ্টিহীন হুবহু করতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন হয়। অথবা দৃষ্টিহীনদের জন্য নির্দিষ্ট খেলাধুলা বা ব্যায়ামকে অভিযোজিত করতে হয়। নিম্নে দৃষ্টিহীনদের পক্ষে উপযুক্ত কতগুলো শারীরিক ব্যায়াম ও খেলাধুলা সম্বন্ধে আলোচনা করা হল :

দৃষ্টিহীনদের ব্যায়াম :

ক. ক্যালিস্থেনিকস্ (Calisthenics) : একসঙ্গে ছন্দোবদ্ধভাবে শারীরিক কৌশলের অভ্যাস করাকে ক্যালিস্থেনিকস্ বোঝায়। ক্যালিস্থেনিকস্ হল শক্তি প্রশিক্ষণের একটি রূপ, যা একজন ব্যক্তির শরীরের ওজনকে ব্যবহার করে বহু সন্ধি, যৌগিক নড়াচড়াকে বোঝায়। National Cadet Corps (N.C.C.) এবং ব্রতচারীও একধরনের ক্যালিসথেনিকস্।[৪৭]

খ. এ্যারোবিকস্ (Aerobics) : এ্যারোবিকস্ হল বাজনার সঙ্গে নির্দিষ্ট তালে দেহভঙ্গিমার পরিবর্তনজনিত ব্যায়াম। কোরিওগ্রাফি এবং নৃত্য এই ধরণের ব্যায়ামের অন্তর্ভুক্ত। দৃষ্টিহীন শিশুদের ক্যালিসথেনিকস্ বা এ্যারোবিকস্-এর শিক্ষা দিতে হলে প্রতিটি পর্যায়কে বার বার স্পর্শ

করে দেখার জন্য জীবন্ত মডেলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দৃষ্টিহীন শিশুকে স্পর্শ করিয়ে পৃথক্ভাবে এক একজনকে প্রথমে শিক্ষা দিতে হবে। প্রয়োজনে দৃষ্টিহীন শিশুকে মডেলের শরীরের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে প্রশিক্ষকে শিক্ষা দিতে হবে। প্রত্যেকের পৃথক্ প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষক গোষ্ঠীবদ্ধভাবে সবাইকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ দেবেন।[৪৮]

গ. ভারোত্তোলন, ডন বৈঠক, সূর্যপ্রণাম, গদা ঘুরানো : উল্লিখিত শারীরিক কৌশলের অভ্যাস প্রায় কোন পরিবর্তন বা পরিমার্জন ছাড়াই দৃষ্টিহীন শিশুকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও একক প্রশিক্ষণ ও জীবন্ত মডেলের প্রয়োজন রয়েছে।[৪৯]

ঘ. সাঁতার : সাঁতার একটি আদর্শ ব্যায়াম। কারণ এর মাধ্যমে শরীরের সকল পেশী একযোগে কাজ করে। এছাড়াও সাঁতার দৃষ্টিহীন শিশুকে চাপ সম্বন্ধে ধারণা দেয়, দৃষ্টিহীন শিশুর ভেসে থাকার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং Kinesthetic development ঘটায়। সাঁতারের দ্বারা দৃষ্টিহীন শিশু জলে আত্মরক্ষা করতেও শেখে। সাঁতারের প্রশিক্ষণ দানের জন্য প্রতিটি দৃষ্টিহীন শিশুর জন্য দড়ির টানা দেওয়া পৃথক ট্র্যাক (Track)-এর ব্যবস্থা করতে হবে। ট্র্যাক-এর শেষ প্রান্ত বোঝানোর জন্য লোহার রড বা বাঁশে প্লাস্টিক বেঁধে রাখতে হবে যাতে শিশুর হাতে বা মাথায় কোন আঘাত না লাগে।[৫০]

ঙ. যোগ ব্যায়াম : যোগ ব্যায়ামে শরীরের বিভিন্ন ধরণের গঠনগত বা অঙ্গভঙ্গিগত পরিবর্তন কিভাবে করতে হয়, তা প্রথমে জীবন্ত মডেল দিয়ে প্রতিটি পর্যায়ে ও পরে কৃত্রিম ফরমেট দিয়ে দেখালে প্রায় কোন পরিবর্তন ছাড়াই দৃষ্টিহীনরা যোগ ব্যায়াম করতে পারে।[৫১]

দৃষ্টিহীনদের খেলাধূলা :

ক. সিঁড়ি বেয়ে ওঠা ও স্লিপারে পেছনে নামা এবং সোজা উঁচু সিঁড়ির ন্যায় স্ট্যান্ডে ওঠা : এই দুটি খেলাও দৃষ্টিহীন শিশুর পক্ষে খুবই উপযোগী এবং আনন্দপ্রদ। এই দুটি খেলাতেও কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। তবে স্লিপার ও সিঁড়ি কোথায় রয়েছে তা দৃষ্টিহীন শিশুকে জানাবার জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা নিতে হবে।[৫২]

খ. দাবা, লুডো, ক্যারাম, চাইনিজ চেকার ও তাস্ : দৃষ্টিহীনদের জন্য দাবা খেলা মানসিক ব্যায়াম এবং অবসর সময়কে ভালোভাবে যাপনের ব্যবস্থা স্বরূপ। এদের জন্য দাবা বোর্ডকে স্পর্শযোগ্য অর্থাৎ উঁচু ও নিচু করতে হবে। অন্যান্য কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

লুডো, ক্যারাম, চাইনিজ চেকার ও তাস্ প্রকৃতপক্ষে অবসর বিনোদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা শারীরিক বা মানসিক ব্যায়াম হয় না। লুডোর ক্ষেত্রে বোর্ডকে স্পর্শযোগ্য করে তৈরি করতে হবে। প্রত্যেক ধরণের ঘুটিকে আলাদাভাবে চেনবার জন্য পৃথক গুরুত্ব বিশিষ্ট করতে হবে এবং ঘুটির উপরে স্পর্শযোগ্য কোন চিহ্ন দিতে হবে যাতে প্রত্যেক ধরণের ঘুটিকে পৃথকভাবে চেনা যায়। চাইনিজ্ চেকারের ক্ষেত্রে প্রতিটি ধরণের ঘুটি এমনভাবে তৈরি হবে যা পৃথক স্পর্শযোগ্য। তাসের ক্ষেত্রে প্রতিটি তাসে ব্রেইল পদ্ধতিতে তাসের প্রকার লেখা থাকা বাঞ্ছনীয়।[৫৩]

গ. ক্যারাটে ও কুংফু : এই ধরণের খেলাগুলোতে একদিকে যেমন পেশীর ব্যায়াম হয়, তেমনি শিশুর মধ্যে সাহসের সঞ্চার করে ও প্রয়োজনে আত্মরক্ষাতেও সাহায্য করে। এই ধরণের খেলাতে প্রশিক্ষককে জীবন্ত অনুকরণীয় ব্যক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও দৃষ্টি না থাকায় এই ধরণের খেলায় প্রতিপক্ষ না নিয়ে একক শারীরিক কৌশলের অভ্যাস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।[৫৪]

ঘ. ক্রিকেট, বাস্কেট বল, ভলিবল ও ফুটবল : এই খেলাগুলো বিশেষ স্কুলে দৃষ্টিহীন শিশুরা নিজেরা খেললেও সমন্বিত বিদ্যালয়ে দৃষ্টিমানদের সঙ্গে দৃষ্টিহীন শিশুরা খেলবে। বলগুলো সকল ক্ষেত্রেই বাজনাযুক্ত হবে। বল ছুড়লে বা গড়িয়ে দিলে শব্দ হবে। সেই শব্দ লক্ষ্য করে দৃষ্টিহীন শিশু ব্যাট চালাবে বা বলের পেছনে দৌড়াবে। ফুটবল এবং বাস্কেটবলের ক্ষেত্রে গোলপোস্টে সর্বদা বাজবে এমন কোন বাজনা ঝুলিয়ে রাখতে হবে। উক্ত বাজনাকে লক্ষ্য করে দৃষ্টিহীন শিশু বল ছুড়বে। এছাড়াও ফুটবলের ক্ষেত্রে গোলপোস্টে সর্বদাই বাজবে এমন কোন বাজনা ঝুলিয়ে রাখতে হবে, যাতে গোল হলেই পৃথক শব্দ হয় এবং দৃষ্টিহীন শিশু বুঝতে পারে।[৫৫]

ঙ. দোলনায় দোল খাওয়া, উঠ বস করা, স্কিপিং : এই সকল খেলায় দৃষ্টিহীন শিশুর জন্য পৃথক্ কোন ব্যবস্থা বা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না।

চ. দৌড়ানো, দূর থেকে দৌড়ে লাফ দেওয়া এবং উঁচুতে লাফানো দৃষ্টিহীন শিশুরা করতে পারে। দৌড়ানোর ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীনদের জন্য ট্র্যাকের দুই দিকে দড়ি বেঁধে দিতে হবে যাতে কেউ অন্যের ট্র্যাকে ঢুকে না পড়ে। এছাড়াও ট্র্যাকের শেষে বিশেষ কোন সাংকেতি চিহ্নের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে লক্ষ্যে পৌঁছানোর সাথে সাথে দৃষ্টিহীন শিশু বুঝতে পারে যে তার দৌড়নোর পথ শেষ হয়ে গেছে। উচ্চ লাফ দেওয়ার (High jump) ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীন শিশুর পক্ষে দূর হতে দৌড়ে এসে লাফানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে শিশুকে বার স্পর্শ করে সোজা লাফিয়ে বার টপকে যাওয়ার প্রশিক্ষণ দিতে হবে।[৫৬]

৫.৪. শ্রবণ প্রতিবন্ধিতার প্রতিকারমূলক বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা : শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করতে হলে প্রথমে এর কারণগুলিকে আগে অপসারণ করতে হবে। শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ করতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।[৫৭]

(১) জিনঘটিত কারণ যাতে না থাকতে পারে সেজন্য ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিবাহদান নিষিদ্ধ করতে হবে।

(২) পিতা-মাতার রক্তের শ্রেণি ও রেসার্স পরীক্ষা করতে হবে, বিশেষ করে গর্ভাবস্থা শুরুর পূর্বে। চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) যে সকল পরিবারে বংশগত বধিরতা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে সন্তান গ্রহণের পূর্বে জেনেটিক পরামর্শ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

(৪) রুবেলার সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য গর্ভাবস্থায় দুই বা তিন মাস পূর্বে মহিলাকে রুবেলা প্রতিষেধক ভ্যাকসিন দেওয়া উচিত।

(৫) গর্ভকালীন সময়ে মহিলাকে কোন প্রকার উচ্চমাত্রার ওষুধ, মাদক দ্রব্য সেবন করতে দেওয়া উচিত নয় এবং প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ দিতে হবে।

(৬) গর্ভাবস্থায় ও গর্ভাবস্থার পূর্ব থেকে মহিলাকে উপযুক্ত পরিমাণ আয়োডিন যুক্ত লবণ, লৌহযুক্ত খাদ্য, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও ক্যালরিযুক্ত খাদ্য দিতে হবে।

(৭) উপযুক্ত সহযোগী বা চিকিৎসকের উপস্থিতিতে প্রসবের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) নবজাত শিশুকে সকল প্রকার প্রতিষেধক টিকা দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) শিশুকে স্ট্রেপ্টোমাইসিন্, কুইনাইন্, অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড্, অ্যাসপিরিন্ ঔষধ দেওয়া কখনই উচিত নয়।

(১০) শিশুর কানে ও মস্তিষ্কে যাতে আঘাত না লাগে এবং রক্তক্ষরণ না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১১) নবজাত শিশুর কানে যাতে উচ্চ শব্দ না যায়, বিশেষ করে বেশি সময়ের জন্য প্রবেশ না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(১২) শিশুর কানে যাতে কোন আঘাত না লাগে সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে। এছাড়াও পুকুরে, নদীতে স্নান করার সময় যাতে কানে জল প্রবেশ করে কানকে সংক্রোমিত না করতে পারে, এজন্য খুব সাবধানে স্নান করা উচিত। ঘন ঘন ঠাণ্ডা লাগলে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

৫.৪.১. শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিকারমূলক বিশেষ বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম : শিক্ষা কোন সুযোগ নয়। পৃথিবীতে শিক্ষা যেকোন শিশুর জন্মগত অধিকার। এই অধিকারকে সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব সব রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদেরও সকল প্রকার শিক্ষালাভের জন্মগত অধিকার রয়েছে। যে সকল শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে, সেই সকল শিশুর শিক্ষার অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রবণ পতিবন্ধিদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

ক. কানে খাটো (Hard of hearing) শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম।

খ. বধির (Deaf) শিশুদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম।

৫.৪.১.১. কানে খাটো শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম (Educational Pro-gramme for the Hard of Hearing) : কানে খাটো শিশুরা তাদের স্বাভাবিক সহপাঠী বন্ধুদের থেকে আলাদা নয়। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র ভাষায়, বক্তব্যে এবং পড়ার ক্ষেত্রে। তবে তারা লেখাপড়ার দিক থেকে

পিছিয়ে নেই। এইজন্য কানে খাটো শিশুদের নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে পড়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে বিদ্যালয়কে অবশ্যই সমন্বয় শিক্ষায় বিশ্বাসী হতে হবে। কানে খাটো শিশুদের সমন্বয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কর্মসূচিতে রাখতে হবে।

(ক) শ্রবণ সহায়ক উপকরণের ব্যবহার শেখাতে হবে।

(খ) শ্রবণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে (Auditory Training)।

(গ) ওষ্ঠপঠন (Lip-reading) শেখাতে হবে।

(ঘ) বাক্যগত সংশোধন (Speech Correction) শেখাতে হবে।

এই শিক্ষাদান কর্মসূচি শ্রেণি-শিক্ষক, বিশেষ-শিক্ষক এবং দক্ষ ভ্রাম্যমাণ (Itinerant) শিক্ষক এগুলির সমন্বয়ে বাস্তবায়িত করবেন।

(ক) শ্রবণ সহায়ক উপকরণের ব্যবহারের নির্দেশনা (Instruction in the use of Hearing Aids) : শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার করতে হলে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। গৃহের বাইরে শিশুটি শ্রবণযন্ত্রটি ব্যবহার করবে না। সবচেয়ে ভালো কৌশল হল, প্রথমে নির্দেশ মতো কম সময় ব্যবহার করতে হবে এবং ধীরে ধীরে শিশুটির মধ্যে অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।[৫৮]

(খ) শ্রবণ প্রশিক্ষণ (Auditory Training) : বিভিন্ন ধরণের শব্দ শুনে তাদেরকে পৃথক করার প্রশিক্ষণই হল শ্রবণ প্রশিক্ষণ (Auditory Training)। এই প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হল শিশুটি যাতে যত শীঘ্র সম্ভব বিভিন্ন ধরণের শব্দকে চিনতে পারে এবং পৃথক করতে পারে। এটি একটি বিশেষ ধরণের কাজ। এই রকমের নির্দেশনা চিকিৎসকের সহযোগিতায় একজন ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক শিশুদের দিয়ে থাকেন। শ্রবণ প্রশিক্ষণ (Auditory Training) যত শীঘ্র হবে ততই শিশুর পক্ষে মঙ্গলজনক।[৫৯]

(গ) ওষ্ঠপঠন ও বাক্যগত পঠন (Lip-reading & Speech Reading) : যদিও আমরা কানে শুনে শব্দ বুঝতে ও চিনতে পারি, তবুও বক্তার মুখের দিকে তাকালে শব্দটি সহজে ভালোভাবে নির্ভুল বোঝা যায়। মুখের ভাবভঙ্গি বক্তার কথাকে বুঝতে সাহায্য করে। আর সে কারণেই

টেলিভিশন (T.V.) যা শ্রবণ ও দর্শন উভয়ই করিয়ে থাকে, তা Radio-এর চেয়ে অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং ফলপ্রসূ। এই Lip-reading কানে খাটো শিশুদের বিভিন্ন বক্তব্য, নির্দেশ বুঝতে সাহায্য করে। ঠোঁটের বিশেষ সংকেত এবং মৌখিক প্রকাশের মাধ্যমে তারা না শোনা শব্দ বুঝতে পারে।

আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে Lip-reading-এর মাধ্যমে শব্দ বুঝতে অসুবিধা হয়। যেমন ‘Cup’ অথবা ‘Up’। তবে ‘Fish’ এবং ‘Ball’ এই শব্দগুলি সহজেই পৃথক করা যায়।[৬০] সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতিতে শেখানো হয়। যথা—

(ক) Phonatic Approach.

(খ) Whole Approach.

(গ) German Mueller Walle Method.

(ঘ) বাক্যগত প্রশিক্ষণ সংশোধন (Speech Training Correction) : কানে খাটো অনেক শিশু বিশেষ কিছু কিছু শব্দ ভালোভাবে শুনতে পায় না। অনেক সময় তারা পশ্চাতের অন্যান্য শব্দের মধ্যে (Background noises) নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় না। তাই তারা জোরে জোরে কথা বলে এবং নিজের মতো অন্যকেও জোরে জোরে কথা বলতে অনুরোধ করে। এদের সাধারণতঃ Conductive Loss হয়ে থাকে। অর্থাৎ শব্দকে বহন করার ক্ষেত্রে কোথাও বাধা থাকে। Speech Training-এর জন্য প্রথমেই দেখতে হবে শিশু কথা বলতে কোথায় কোথায় ভুল করছে। ভুলগুলিকে তালিকা আকারে সাজাতে হবে। Articulation Test-এর মাধ্যমে সাধারণতঃ এটি করা হয়। এক্ষেত্রে একটি শিশুকে কতকগুলো বস্তু বা ফোটো দেওয়া হয় এবং তা উচ্চারণ করে তাদের নাম বলতে বলা হয়। শিক্ষক পাশে থেকে সর্বদা লক্ষ্য করবেন শিশুটি কি করছে এবং কি কি বলছে অথবা কি বলতে পারছে না। শিক্ষক দেখবেন, কোন কোন বস্তুর নামের ক্ষেত্রে ভাষার পরিবর্তে অন্য কোন সংকেত ব্যবহার করছে। উপরন্তু শিক্ষক শিক্ষার্থীর গলার স্বর এবং অন্যান্য অসংগতি লিখে রাখবেন। বিশেষ ত্রুটিগুলি নির্ণয় করার পর সেগুলি সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে, শিশুকে সাধারণ নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে তার

সহপাঠীদের সঙ্গে রেখে দেওয়াই উচিত। তবে বিশেষ দক্ষ শিক্ষক শিশুর ভাষা এবং শ্রবণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বদা নিয়োজিত থাকবেন।[৬১]

৫.৪.১.২. বধির শিশুদের জন্য বিশেষ পাঠক্রম (Specialised curriculum for Deaf Children) : বধির শিশুদের জন্যে বিশেষ পাঠক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকবে

(ক) ভাষার বিকাশ (Speech Development).

(খ) ভাষাগত পঠন ও শ্রবণ প্রশিক্ষণ (Speech Reading & Auditory Training).

(গ) ভাষার বিকাশ (Language Development)।

(ঘ) পঠন (Reading) এবং অন্যান্য স্কুলের বিষয়।

ক. ভাষার বিকাশ (Speech Development) : সর্বপ্রথমে শিশু গলায় বিভিন্ন ধরণের আওয়াজ করে থাকে। সে এই ধরণের শব্দের সঙ্গে খেলা করে এবং বারবার এই শব্দগুলি অনুকরণ করে এবং বলার চেষ্টা করে। এমনকি কোন ব্যক্তির কথাও সে অনুকরণ করে। শিশুটি 'মা', 'বা', 'দা' প্রভৃতি শব্দ বারবার বলে। যদিও এর অর্থ শিশুর কাছে বোধগম্য হয় না। যখন সে পর পর 'মা' 'মা' বলছে তখন তার মাকে পাচ্ছে এবং এইভাবে সে তার নিজ মা এবং 'মা' শব্দকে একত্রিত করছে এবং নিজের কাছে অর্থবহ করে তুলছে। এইভাবে সে আরও কথা বলতে শেখে। শিশু যখন বিভিন্ন শব্দগুলোকে বিভিন্ন সত্তার সঙ্গে যুক্ত করে তখন তার মা তাকে 'বা' 'বা' বললে শিশুটি তার বাবাকে খুঁজতে থাকে। এই মুহূর্তে তার বাবা যেন তার কাছে চলে আসে। এইভাবে শিশুর নিজের সৃষ্ট ও অনুকরণকৃত বিভিন্ন আওয়াজ তার কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে।

কিন্তু বধির শিশু নিজের অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পায় না এবং তার মা-বাবার শব্দগুলোও সে শুনতে পায় না, ফলে অনুকরণও করতে পারে না। সুতরাং অনুকরণকৃত শব্দগুলো তার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হয় না। এককথায় সে কথা বলা শিখতে পারে না এবং যদিও কখনও কথা বলতে পারে, সেটা অবশ্যই শ্রবণের মাধ্যমে নয়, অন্য কোন উপায়ে হয়।

এটা দেখা গেছে যে, সম্পূর্ণ বধির শিশুও কথা বলতে পারে, যদি তার মাতা-পিতা শিক্ষক যথেষ্ট যত্ন নেন। তারা হয়তো একজন স্বাভাবিক সাধারণ শিশুর মতো কথা বলতে পারবে না। কিন্তু সকল কথাই বুঝতে পারবে। কম্পন, স্পর্শানুভূতি, দর্শন উপকরণ, দেহের চলন প্রভৃতির মাধ্যমে শিখতে পারে।

i. কম্পন, স্পর্শানুভূতির মাধ্যমে বাচিক প্রশিক্ষণ (Speech Training) : Kate এবং Alcort প্রথম স্পর্শানুভূতিকে বধির শিশুদের কথা শেখানোর কাজে ব্যবহার করেন। সাধারণ শিশু যেমন কথা বলার পূর্বে শুনে বুঝে নেয়, তেমনি বধির শিশুদের স্পর্শের মাধ্যমে বোঝানো হয়। গভীরভাবে বধির শিশুদের জন্য এই পদ্ধতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিশু তার শিক্ষকের মুখের সামনে আঙুল ধরে রাখে অথবা শিক্ষকের গলায় হাত দিয়ে স্পর্শ করে থাকে এবং শিক্ষকের উচ্চারণের ফলে যে কম্পনের সৃষ্টি হয়, তার মাধ্যমেই সে শব্দ চিনতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ‘b’ এবং ‘p’ শব্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় তাদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। যাই হোক এভাবে বারংবার করার পর তার মধ্যে সঠিক শব্দ চেনার ক্ষমতা গড়ে ওঠে। তবে এই পদ্ধতি বেশ জটিল এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।[৬২]

ii. দর্শনীয় উপকরণের মাধ্যমে বাচিক শিক্ষণ (Speech Training) : যে সমস্ত শিশু বধির এবং অন্ধ তাদের জন্য স্পর্শ পদ্ধতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু যে সমস্ত শিশু বধির ও অন্ধ নয়, তাদের ক্ষেত্রে দর্শণেন্দ্রিয়কে ভাষা শেখানোর কাজে লাগানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষক শুদ্ধভাবে ধীরে ধীরে পড়ে যাবেন। শিশু উক্ত শিক্ষকের গদ্যাংশ অনুসরণ করবে এবং শিক্ষকের মুখের ভঙ্গিমা অনুকরণ করবে, যা তার সামনে রাখা আয়নায় সে দেখতে পাবে। এটি সাধারণতঃ একটু বেশি বয়সে শেখানো হয়।[৬৩]

iii. অঙ্গের ইশারার মাধ্যমে বাচিক শিক্ষণ (Speech Training) : শিশু স্পর্শনেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াও বিভিন্ন অঙ্গের চলন পরিবর্তনের দ্বারা ভাষা শিখতে পারে। এক্ষেত্রে পেশিগত চলাচল, মুখের নড়াচড়া, জিহবা, ওষ্ঠ প্রভৃতির ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে শব্দের প্রকাশ করা সম্ভব। আমেরিকার ইঙ্গিত ভাষা ব্যবস্থা (American Sign Language) বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।[৬৪]

iv. শ্রবণ যন্ত্রের মাধ্যমে বাচিক প্রশিক্ষণ (Speech Training) : অনেক বধির শিশুর কিঞ্চিৎ শ্রবণ ক্ষমতা রয়েছে। শক্তিশালী শ্রবণযন্ত্রের মাধ্যমে এদের অবশিষ্ট শ্রবণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং ভাষার পার্থক্যও চিহ্নিতকরণ সম্ভব হতে পারে। বধিরতার প্রধান অসুবিধা হল এই যে, বধির শিশু অন্যের কথা শুনতে পায় না। ভাষা মানব কর্মের জটিল বিষয়। এজন্য শিশুর মধ্যে ধারণা জন্মাতে হবে। কিছু কিছু ক্রিয়াবাচক শব্দ (Verb) যেমন- বসা, লাফানো, ওঠা প্রভৃতি এবং কিছু বিশেষণগত শব্দ (Adjective) যেমন- বড়, ছোট, লাল, সাদা প্রভৃতি শব্দের অর্থ বধির শিশুদের বোঝানো গেলেও অব্যয়, সর্বনাম পদগুলি তাদের বোঝানো খুবই কষ্টকর।[৬৫] উপরন্তু একই রকমের শব্দ যেমন- ‘ডাল’ প্রভৃতি শব্দ বোঝানো বড়োই কষ্টকর।

গাছের **ডাল** কেটো না। আমি **ডাল** দিয়ে ভাত খেয়েছি।

খ. ভাষাগত পঠন ও শ্রবণ প্রশিক্ষণ (Speech Reading & Auditory Training) : অপরের বক্তব্য অনুধাবন করার জন্যে শ্রবণ প্রতিবন্ধির বক্তার ঠোঁট এবং মুখাবয়বের বিভিন্ন ভঙ্গির উপর নির্ভর করতে হয়। এই কারণে প্রাচীন কাল থেকে শ্রবণ প্রতিবন্ধিদের শিক্ষালাভের জন্য Speech reading বা Lip reading একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওষ্ঠপঠনের (Lip reading) ক্ষমতা একটি শব্দ বা বাক্য উচ্চারণের সময় বক্তার মুখাবয়বের নড়াচড়া দেখার উপর নির্ভরশীল। এইভাবে যে শ্রবণ প্রতিবন্ধী ওষ্ঠপঠনের ক্ষমতা ভালোভাবে রপ্ত করতে পারে সে কোন একটি বিষয়ে যে গতিতে মনে মনে পড়তে পারে, প্রায় সেই গতিতেই তা বিভিন্ন ভঙ্গিমায় প্রকাশও করতে পারে। তবে ওষ্ঠ্যবর্ণ যেমন থ, প, ফ, ব ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ সরাসরি সহজেই তারা আয়ত্ত করতে পারে। পক্ষান্তরে যে সমস্ত বর্ণের উচ্চারণ বাহ্যিকভাবে ওষ্ঠের উপর নির্ভর করে না, সেগুলি অনুধাবন করা তাদের কাছে অপেক্ষাকৃত কষ্টকর। যেমন-ক, খ, গ ইত্যাদি।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ শিক্ষক যাঁরা শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাঁরা তাঁদের শিক্ষাদানের সময় বিভিন্ন পদ্ধতি সমন্বিত করে ব্যবহার করেন। শৈশব অবস্থায় শ্রবণ প্রতিবন্ধিদের শেখানোর জন্যে একটি সম্পূর্ণ বাক্য তাদের সামনে বলা হয়। কিন্তু প্রথমাবস্থায় তারা কিছুই বুঝতে পারে না। তখন সেই বাক্যটি তাদের সামনে একইভাবে বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়। ধীরে ধীরে সেই শিশুরা বহুশ্রুত বাক্যটির সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে

সেটির সঙ্গে একটি ধারণা গঠন করে। পরবর্তী পর্যায়ে এই পদ্ধতিতে একটি বিস্তৃত বিষয়ের ধারণা তাদের দেওয়া হয়। এমনকি বিভিন্ন শব্দ বা কথার মধ্যে পার্থক্য তাদের শেখানো হয়। শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ওষ্ঠপঠন পদ্ধতি সারাদিনের প্রতিটি ক্লাসের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়। তবে বিশেষতঃ ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বেশি প্রয়োগ করা হয়। আর যখন শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করা হয় তখন Auditory reading-এর ক্ষেত্রেও এই কৌশল অবলম্বন করা হয়।[৬৬]

গ. ভাষার বিকাশ (Language development) : শ্রবণ প্রতিবন্ধিদের ক্ষেত্রে আর একটি গুরুতর সমস্যা হল অন্যের ভাষা বুঝতে না পারা। মানুষ সাধারণভাবে যে সমস্ত দক্ষতা অর্জন করে তার মধ্যে অন্যতম জটিল বিষয় হল ভাষাগত দক্ষতা। এই ভাষাগত দক্ষতার উপকরণের মধ্যে অন্যতম হল ধারণা গঠন। দৃশ্যমান যেকোন বস্তু বা ক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা গঠন যত সহজ, বিমূর্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে তা ঠিক ততটাই কঠিন। বাক্যের বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদগুলি যত সহজে বোঝানো যায়, অব্যয় ও সর্বনাম পদগুলি তত সহজে বোঝানো যায় না। কারণ বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের দ্বারা দৃশ্যমান্ গুণের প্রকাশ হয়, আর অব্যয় পদের দ্বারা বিমূর্ত ভাব প্রকাশিত হয়।

ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুরা প্রাথমিকভাবে পাঠের (reading) উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কোন একটি বিষয় পড়তে পড়তে সেই ভাষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা গঠন হয়। এইভাবে পাঠের অভিজ্ঞতা ও তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এই দুইয়ের সংমিশ্রণে এক জটিল প্রক্রিয়ায় শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর ভাষার বিকাশ ঘটে। এছাড়া বহুশ্রুত কোন একটি বিষয়ের সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ঘটিয়ে ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে তাদের ধারণা গঠিত হয়। এক্ষেত্রে একটি কার্যকর নীতি হল সান্নিধ্যের নীতি (Contiguity)। এই নীতির মূল বক্তব্য হল যদি যেকোন দুটো জিনিস সবসময় একসঙ্গে উপস্থাপন করা হয়, তবে প্রথমটির একক উপস্থাপক সবসময়ই দ্বিতীয়টির কথা মনে করিয়ে দেয়। বিশেষতঃ একবচন ও বহুবচন, লিঙ্গ, সমধর্মী শব্দ, বিপরীত শব্দ ইত্যাদি বিষয় বোঝানোর ক্ষেত্রে এই নীতি বেশি কার্যকরী। ওষ্ঠপঠনের সাহায্যে এত সহজে এই পার্থক্যগুলি বোঝানো যায় না। তাই বর্তমানে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের ভাষার বিকাশ ঘটানোর জন্য যুক্তিগ্রাহ্য এবং দৃশ্যমান্ পদ্ধতির সামঞ্জস্য ঘটিয়ে অনেক নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে।[৬৭]

ঘ. পঠন (Reading) : শ্রবণ প্রতিবন্ধিদের ভাষাশিক্ষার মতোই পঠনশিক্ষা একটি ধীর গতিসম্পন্ন পরিশ্রমসাধ্য কাজ। বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা গেছে, পঠন ক্ষমতার ক্ষেত্রে শ্রবণ প্রতিবন্ধিরা তাদের প্রকৃত বয়স বা মানসিক বয়সের তুলনায় পিছিয়ে থাকে। উদ্যম (Pugh) শ্রবণ প্রতিবন্ধিদের পঠন ক্ষমতা পরিমাপ করার জন্যে অনেক শিক্ষার্থীর উপর Iowa Silent Reading Test এবং Durrell Sullivan Reading Achievement Test প্রয়োগ করেন।[৬৮] তিনি লক্ষ্য করেন কম বয়সি শিক্ষার্থীদের তুলনায় বেশি বয়সি শিক্ষার্থীরা পঠন ক্ষমতায় যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। তবে তিনি এমন কিছু শিক্ষার্থীও পেয়েছেন যারা পঠন ক্ষমতার ক্ষেত্রে তাদের বয়সের গড় মানের চাইতে অনেক এগিয়ে রয়েছে। এখান থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, সকল শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরাই পঠন ক্ষমতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবে এমন নয়, বরং উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ তৈরি করতে পারলে এরা স্বাভাবিক শিশুদের সমকক্ষ হতে পারে।

ভাষা শেখা, কথা শেখা এবং পড়তে শেখা ইত্যাদি বধির শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের কখনো কখনো জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। তাই এদের মধ্যে সার্থক সমন্বয় ঘটাতে হবে। যেমন- কথা শেখার পর পড়তে শিখবে এবং পড়ার মাধ্যমে ভাষা শিখবে। কখনও এর বিপরীত ক্রমও দেখা যায়। মূলতঃ পড়া এবং ভাষা বধির শিশুদের কাছে একটি সমন্বিত ব্যাপার। কেননা তারা প্রাথমিকভাবে পড়া শেখে ভাষা শিক্ষার মধ্য দিয়ে, আবার ভাষা শেখে পড়ার মাধ্যমে। আসলে একজন বধির শিশুর ভাষার বিকাশ একটি অতি জটিল প্রক্রিয়া যা ধীরে ধীরে পড়া ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

৫.৫. <u>শিক্ষাব্যবস্থা (Educational Provisions)</u> : সাধারণভাবে শিক্ষাগ্রহণের জন্য মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। শ্রবণ প্রতিবন্ধিদের ক্ষেত্রে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ত্রুটির জন্য সাধারণভাবে শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয় না। তবে আধুনিক যুগে তাদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা একপ্রকার সামাজিক অপরাধ। তাই আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন ধরণের বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতিগুলি কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটি নিম্নরূপ :

৫.৫.১. গৃহভিত্তিক ব্যবস্থা : শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার জন্য গৃহভিত্তিক ব্যবস্থা একটি অতি কার্যকরী পদ্ধতি। শৈশবে কোন শিশুর মধ্যে তার পিতা-মাতা যদি প্রতিবন্ধিতার লক্ষণ দেখতে পান এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা এবিষয়ে সুনিশ্চিত হন, তখন তার ক্ষেত্রে এই গৃহভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এক্ষেত্রে দৈনন্দিন গৃহ-পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া করাতে সাহায্যে করা যায়। যেমন— গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজ করার সময়, খাবার খাওয়ার সময়, খেলাধুলার সময় শিশুর পিতা-মাতা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বিভিন্ন উপকরণগুলি বারবার দেখিয়ে বা বারবার কাজটি করে শিশুকে উক্ত বিষয়ে ধারণা দেবেন। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে বাড়িতে তার জন্য শ্রবণযন্ত্রের ব্যবহার, শ্রবণ প্রশিক্ষণ (Auditory training), ভাষাগত প্রশিক্ষণ (Speech training)-এর ব্যবস্থা করবেন। এই গৃহভিত্তিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবস্থা, যা শিশুর প্রতিবন্ধকতার ধরণের উপর ভিত্তি করে আলাদা আলাদা হতে পারে। অবশ্য এই পার্থক্যের ভিত্তি করে শিশুর পিতা-মাতার অংশগ্রহণ, তার বিকাশের হার, মানসিক ক্ষমতা ইত্যাদির উপরও নির্ভর করে।[৬৯]

৫.৫.২. বিশেষ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা : সাধারণতঃ তিন ধরণের শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[৭০] এই তিন ধরণের শিশু হল—

(i) চূড়ান্ত মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু বা বধির।

(ii) যার শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা বিলম্বে নির্ণীত হয়েছে।

(iii) যাকে বাড়িতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি।

এই ধরণের শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে বিশেষ পাঠক্রম অনুসরণ করা হয়। তবে, যেসব শিক্ষার্থী বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে পারে, তাদের জন্য সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাঠক্রমই ব্যবহার করা হয়।

৫.৫.৩. রিসোর্স কক্ষের ব্যবস্থা : কোন কোন শ্রবণ প্রতিবন্ধী সাধারণ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে কিছু কিছু শিক্ষাগত দক্ষতা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অর্জন করতে পারে। বিশেষ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এই শিক্ষার্থীদের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন উপকরণ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের সহযোগে বিদ্যালয়ে একটি

রিসোর্স কক্ষ তৈরি করা হয়। দৈনন্দিন কার্যকালের একটি নির্দিষ্ট অংশে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা এই রিসোর্স কক্ষে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করে। এখানে শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থাৎ শিক্ষক প্রতিটি শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুকে আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষাদান করে থাকেন।[৭১]

৫.৫.৪. সমন্বিত শ্রেণিব্যবস্থা : মৃদু মাত্রার বা মধ্যম মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধী অর্থাৎ যারা কানে খাটো তাদের জন্য এই ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী। যে সমস্ত শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু সাধারণ শিশুদের মতো পুরোপুরি না হলেও কিছু মাত্রায় শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উদ্দীপনা গ্রহণে সক্ষম, তারা বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করেই শুধুমাত্র শ্রবণযন্ত্রের সাহায্যে সাধারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।[৭২]

৫.৫.৫. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা : যে সমস্ত শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর কোন পদ্ধতির সাহায্যেই প্রথাগত শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, তাদের জন্য বিকল্প হিসাবে বৃত্তিমুখী পাঠক্রমের ব্যবস্থা করা হয়। যাতে তারা ভবিষ্যতে বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে স্বাবলম্বী হতে পারে। এছাড়াও উপরি উক্ত বিভিন্ন পদ্ধতিতে যারা শিক্ষালাভ করে তাদেরকেও একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর এই বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

উপর্যুক্ত বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে কোন একটিকে বিশেষ কার্যকরী বলা যায় না। কারণ প্রতিবন্ধকতার মাত্রা, শিক্ষার্থীর অন্যান্য ক্ষমতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। প্রাক্-বিদ্যালয়কালীন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনে শিক্ষার্থী বা তার পিতা-মাতার সদিচ্ছা এবং কখনো কখনো সামাজিক অবস্থার উপর এই শিক্ষাব্যবস্থাগুলির সার্থকতা নির্ভর করে। এছাড়া শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র সঠিক ব্যবস্থায় প্রতিস্থাপন নয়, নিয়মিত পরিদর্শন, মূল্যায়ন এবং উপযুক্ত পরামর্শদানের উপরেও শিক্ষার্থীর সাফল্য নির্ভরশীল, যা আবার পরোক্ষভাবে উক্ত শিক্ষাব্যবস্থাকেই মূল্যায়ন করে।[৭৩]

৫.৬. অস্থিগত প্রতিবন্ধকতার প্রতিকারমূলক বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা : বিশেষ শিক্ষার বিশেষজ্ঞগণ বলেন, মৃদু ও মধ্যম মাত্রার বিকলাঙ্গ শিশুরা শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণ শিশুদের মতোই দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকে। তাই তাদের জন্য বিশেষ কোন শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। কিছু গুরুতর বা

চূড়ান্ত মাত্রার প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রহণ করা প্রয়োজন[৭৪]। এই শিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক হল—

ক. ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূত শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশেষতঃ বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণ বিদ্যালয়েই ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, যদিও তা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ।

খ. শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করার জন্য দ্রুত শনাক্ত করা প্রয়োজন।

গ. বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য বিদ্যালয়ের গঠনগত বিভিন্ন পরিবর্তনসাধন করা দরকার। যাতে হুইল চেয়ার, ক্রাচ ও কৃত্রিম অঙ্গ ব্যবহারের মাধ্যমে তারা সহজেই চলাফেরা করতে পারে।

ঘ. সদর্থক শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিতে স্বাভাবিক শিশুদের পাশাপাশি বিকলাঙ্গ শিশুদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

চ. বিভিন্ন প্রকার বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকে সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকদের বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা উদার মানসিকতা নিয়ে সমস্ত শিক্ষার্থীদের সমদৃষ্টিতে দেখবেন এবং বিকলাঙ্গ শিক্ষার্থীরা যাতে মানসিক, প্রাক্ষোভিক কোন দিকে অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

৫.৭. মানসিক প্রতিবন্ধকতার প্রতিকারমূলক বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা : বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিদের শিক্ষায় বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন। প্রতিটি পদ্ধতি এদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রভাব ফেলেছে। তবে কোন একটি পদ্ধতিকেও সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায় না। নিম্নে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ আধুনিক পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

ক. সেগুইনের শারীর বৃত্তীয় পদ্ধতি (Seguin's Physiological Method) : ১৮৪৬ সালে Edouard Seguin প্রথমবারের মতো বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে লেখেন। তাঁর পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্) প্রশিক্ষণ। বিভিন্ন সহায়ক যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বস্তুর ওজন, আকার, আয়তন, বয়ন (Testure) ইত্যাদি পৃথকীকরণ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। এছাড়াও শ্রবণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে সংগীত ব্যবহার করার রীতি ছিল।[৭৫]

খ. মন্টেসরি শিক্ষাপদ্ধতি (Montessori's Autoeducational Method) : ১৯১২ সালে মন্টেসরির পদ্ধতি ব্যাপকভাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যায়। তাঁর মতে বিদ্যালয় এবং শিক্ষক সরাসরি কোন শিক্ষা দিতে পারে না। শুধু পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে যা শিশুর জন্য উপকারী। সেই ক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতি বর্তমানে ‘Open Classroom’-এর মতো যেখানে ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন কার্যক্রমে লিপ্ত থাকে। শিক্ষক শুধু একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। মন্টেসরি নানা ধরণের শিক্ষা উপকরণ তৈরি করেছিলেন, যা আজও বহুল ব্যবহৃত। যেমন, বিভিন্ন আকারের ব্লক, ছোট থেকে বড়, বিভিন্ন ধরণের বয়নের কাপড়, বোতাম লাগানোর বোর্ড প্রভৃতি শিশুকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছিল।[৭৬]

গ. শিক্ষাব্যবস্থায় পিয়াজ্যের পদ্ধতি (Piaget's Method) : বিভিন্ন দিক দিয়ে পিয়াজ্যো ছিলেন মন্টেসরির উত্তরসূরী। উভয়েই শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহলকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষকদের ভূমিকাকে নূন্যতম বলে আখ্যায়িত করেন। তারা জোর দিয়েছিলেন শিশুরা নিজেরাই তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আবিষ্কার করবে এবং সরাসরি শিক্ষা দিলে সেটি হবে অস্পষ্ট।[৭৭]

ঘ. সনাক্তকরণ পদ্ধতিকর্ম বিশ্লেষণ (The Diagnostic Processtask Analysis) : চিরাচরিত রোগ নির্ণয় পদ্ধতি ভীষণভাবে সমালোচিত হয়েছে। তার প্রধান কারণ শিশুকে তাঁরা একটি ছাপ (Label) দিয়ে দেয় চিকিৎসা ছাড়াই, যা তার জন্য মঙ্গলকর নয়। বর্তমানে সনাক্তকরণের উদ্দেশ্য হল শিশুর ক্রিয়াকলাপের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে নির্ধারণ করা। শিশুরা কিভাবে শেখে, কতোখানি শিখতে পারে এবং কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালো শিখতে পারে। যেমন- শ্রবণ, দৃষ্টি না স্পর্শ প্রভৃতি বিশেষ অঙ্গ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা।[৭৮]

ঙ. কর্ম বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Task Analysis Method) : শিশুর সমস্যা সঠিকভাবে সনাক্ত করার পর পরবর্তী ধাপ হল শিশুর উপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়া। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো উপায় হল শিশুকে যে দক্ষতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, সেটিকে বিশ্লেষণ করা। কর্ম বিশ্লেষণ হল কর্মদক্ষতাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে সবচেয়ে সহজ কর্মটি দ্বারা প্রশিক্ষণ আরম্ভ করা।[৭৯]

৫.৭.১. মানসিক প্রতিবন্ধিদের জন্য বিশেষ পাঠক্রম পদ্ধতি : বিভিন্ন ধরণের মানসিক প্রতিবন্ধিদের পাঠক্রম বিভিন্ন হয়। প্রতিবন্ধকতার মাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিবন্ধিদের বৌদ্ধিক ক্ষমতা, ভাষাগত, কার্যগত সামর্থ্য পরিবর্তিত হয়। কাজেই প্রতিবন্ধিদের শিক্ষাগত, প্রশিক্ষণগত পাঠক্রম বিভিন্ন হয়। তবে প্রায় প্রতি শ্রেণির মানসিক প্রতিবন্ধিদের কমবেশি প্রাথমিকভাবে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সুতরাং বিভিন্ন পাঠক্রম চালু থাকলেও এদের মধ্যে বেশ সাদৃশ্যও রয়েছে। প্রতিবন্ধিতার মাত্রা বেশি হলে পাঠক্রমে দৈনন্দিন জীবনের কার্যক্রম এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রকার মানসিক প্রতিবন্ধিদের উপযোগী পাঠক্রম কিরূপ হবে তা নিম্নে আলোচিত করা হল[৮০] :

(ক) স্বল্প বা মাঝারি মাত্রার মানসিক প্রতিবন্ধিদের উপযোগী পাঠক্রম : এই শিক্ষা কার্যক্রমে শারীরিক এবং মানসিক প্রস্তুতির জন্য যে সমস্ত দক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন হয়, সেগুলি হল :

১. স্থির হয়ে বসা এবং শিক্ষকের প্রতি মনোযোগ দেওয়া।

২. শ্রবণ এবং দৃষ্টি সহায়ক উদ্দীপকগুলির পৃথকীকরণ।

৩. নির্দেশ অনুসরণ।

৪. ক্রমাগত ভাষা ও যোগাযোগের দক্ষতার বিকাশ।

৫. সূক্ষ্ম এবং স্থূল পেশি সংকোচনের সমন্বয়সাধন, যাতে বিভিন্ন কাজ করতে সক্ষম হয়।

৬. নিজের প্রতি যত্ন নেওয়ার জন্য বিভিন্ন কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৭. সহপাঠীদের সঙ্গে দলভুক্ত হয়ে মেলামেশার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

প্রাথমিক পর্যায়ের এই সমস্ত প্রশিক্ষণ শেষে মানসিক প্রতিবন্ধিদের প্রথাগত শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় (Grade) শেখানো হয়। এর ফলে প্রতিবন্ধী শিশু দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন জিনিসের দাম, কাগজপত্র, বইয়ের নাম, খাদ্যবস্তুর প্যাকেটে ছাপানো নাম পড়তে সক্ষম হবে। তবে কিছুটা অর্থ উপার্জন এবং নিজেকে ব্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে এদের পাঠক্রমে কারিগরি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(খ) গুরুতর মানসিক প্রতিবন্ধিদের উপযোগী পাঠক্রম :

১. গুরুতর মানসিক প্রতিবন্ধিদের বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন পাঠক্রম ও উপকরণের ব্যবহার শেখানো হয়।

২. ব্যক্তিগত পরিচর্যা ও দৈনন্দিন জীবনযাপনে অপরিহার্য কাজগুলি (যেমন— কাপড় পরা, নিজে খাওয়া, টয়লেট ব্যবহার করা, চলাফেরা করা ইত্যাদি) সম্পাদনের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩. সমন্বিত কার্যক্রম (Integrated Programme)-এর মাধ্যমে একজন বহু প্রতিবন্ধিতাযুক্ত মানসিক প্রতিবন্ধির সঠিক উন্নতির ব্যবস্থা করা হয়।

৪. অন্যান্য স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গুরুতর মাত্রার প্রতিবন্ধিদের মেলামেশার সুযোগ দিতে হবে। এতে স্বাভাবিক শিশুরা প্রতিবন্ধী বন্ধুর সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

৫. যেকোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রশিক্ষণ বা শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার সাফল্য নির্ভর করে পরিবারের অভিভাবক ও অন্যান্য সদস্যদের উপর। কাজেই পরিবারের সদস্যদের সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে এবং গুরুদায়িত্ব নিতে হবে।

এছাড়াও মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের প্রতিবন্ধকতার মাত্রা এবং মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শ্রেণিকক্ষ ও বিভিন্ন স্কুলের আয়োজন করা যেতে পারে।

৫.৭.২. মানসিক প্রতিবন্ধিদের বিশেষ শিক্ষা প্রক্রিয়া :

মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি পরিবারের বিশেষ বিশেষ ভূমিকাসমূহ : শিক্ষাদানযোগ্য মানসিক প্রতিবন্ধিদের Electronic Medical Record-এর (EMR) মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পাঠ তার গৃহেই শুরু হওয়া উচিত।[৮১] এক্ষেত্রে তার পিতা-মাতা কিছু দায়িত্ব পালন করতে পারেন। যেমন—

ক. সাধারণতঃ যেকোন পরিবারের মা, ঠাকুমা বা দিদিমা শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন। যদি কোন শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক নিয়ম বিলম্বিত বা লঙ্ঘিত হয় তাহলে প্রথমেই তা পরিবারের সদস্যদের নজরে পড়বে। সেক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত।

খ. এই ধরণের শিশুর ক্ষেত্রে মা-বাবা কখনোই অধৈর্য্য বা হতোদ্যম হয়ে পড়লে চলবে না, বরং যাতে শিশুর প্রতিবন্ধিতার মাত্রা যথাসম্ভব কম হয়, তার জন্য সঠিক যত্ন, ডাক্তারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

গ. পরবর্তীকালে বিশেষ বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রস্তুতির জন্য শিশুর গৃহভিত্তিক প্রশিক্ষণ বিশেষ জরুরি। পরিবার বিশেষতঃ শিশুর মা প্রথম কিছুদিন শিশুকে বিভিন্ন দক্ষতা, যেমন দৈনন্দিন জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম, সামাজিক দক্ষতা, ভাষার দক্ষতা, যোগাযোগের দক্ষতা ইত্যাদি বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারেন।

৫.৭.৩. মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি বিদ্যালয় শিক্ষা : মানসিক প্রতিবন্ধিদের শিক্ষাদান শিক্ষাবিদদের কাছে একটি প্রতিযোগিতাস্বরূপ হয়ে থাকে। প্রচলিত প্রথা অনুসারে গুরুতর মাত্রার মানসিক প্রতিবন্ধিদের আবাসিক বিদ্যালয়ে রেখে শিক্ষা দিতে হয়। মধ্যম মাত্রার মানসিক প্রতিবন্ধিদের বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের IEDC (Integrated Education for Disabled Children) প্রকল্প অনুসারে মধ্যম মাত্রার বা শিক্ষাদানযোগ্য মানসিক প্রতিবন্ধিদের সাধারণ বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। তবে এই বিদ্যালয়ে তাদের ভর্তি করার পূর্বে বিশেষ ধরণের প্রাক্‌বিদ্যালয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়।[৮২]

ক. প্রাক্‌বিদ্যালয় শিক্ষা : শিক্ষাদানযোগ্য তিন থেকে ছয় বছর বয়স্ক মানসিক প্রতিবন্ধিদের প্রাক্‌বিদ্যালয় শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এই পর্যায়ে মূলতঃ ভবিষ্যতে পঠনপাঠনে সহায়তাকারী কিছু প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এই প্রস্তুতিমূলক দক্ষতাগুলি খুবই সাধারণ মানের হয়ে থাকে এবং এগুলিতে তাদের পারদর্শী করে তোলার জন্য কখনো কখনো দুই বা তিন বছর সময়ও লাগতে পারে। এই দক্ষতামূলক কাজগুলির কয়েকটি হল :

১. সোজা হয়ে বসা এবং শিক্ষকের প্রতি মনোযোগী হওয়া।

২. দৃশ্য ও শ্রাব্য উদ্দীপকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারা।

৩. নির্দেশ অনুসরণ করা।

৪. ভাষার বিকাশ করা।

৫. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করা (পেনসিল ধরাতে পারা, রাবার ধরা ইত্যাদি)।

৬. স্বাবলম্বী হওয়া (জুতোর ফিতে বাঁধা, জামাপ্যান্টের বোতাম লাগানো কিংবা টয়লেট ব্যবহার করতে পারা ইত্যাদি)।

৭. সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারা।

এই প্রাক্‌বিদ্যালয় প্রশিক্ষণ প্রতিবন্ধকতার মাত্রা, শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং তার গৃহের পরিবেশের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে।

খ. সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা : শিক্ষাদানযোগ্য মানসিক প্রতিবন্ধিদের প্রাক্‌বিদ্যালয় প্রশিক্ষণ শেষে সাধারণ বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গেই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এই শিক্ষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—

১. শিক্ষাদানযোগ্য মানসিক প্রতিবন্ধিদের Electronic Medical Record-এর (EMR) মাধ্যমে শিক্ষাব্যাবস্থার উদ্দেশ্য হল—

ক. পঠনপাঠনে দক্ষতা বৃদ্ধি।

খ. সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি।

গ. অভিযোজনের ক্ষমতা বৃদ্ধি।

ঘ. পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি।

২. প্রতিবন্ধিতার মাত্রা অনুসারে তাদের সাধারণ শ্রেণিকক্ষ অথবা এর পাশাপাশি বিশেষ শ্রেণি বা রিসোর্স কক্ষে নির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে।

৩. প্রাথমিক পর্বের পাঠক্রম সাধারণতঃ প্রাক্‌বিদ্যালয় পাঠক্রমের একটি বর্ধিত রূপ হয়ে থাকে। এই পাঠক্রমে থাকে প্রস্তুতিমূলক দক্ষতা, ভাষার বিকাশ, ধারণা গাঠন, সামাজিক অভিযোজন, লিখন-পঠন-পাটিগাণিতিক দক্ষতা ইত্যাদি। এই সমস্ত বিষয়গুলির অন্তর্গত বিষয়বস্তু খুব সাধারণ মানের হওয়া উচিত।

৪. যদি কোন শিক্ষার্থীর বিশেষ নির্দেশনার প্রয়োজন হয়, তবে সেক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হয়। যেমন—

i. শিক্ষার্থীর বয়স যত কম হবে, শ্রেণিকক্ষের আকার তত ছোট হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর সংখ্যা শ্রেণিতে কম রাখতে হবে।

ii. বয়স ও প্রতিবন্ধিতার মাত্রার ভিন্নতা যত বেশি হবে, শ্রেণিকক্ষের আকার তত ছোট হবে।

iii. বিশেষ শ্রেণির ব্যবস্থা সর্বদাই সাধারণ শ্রেণিকক্ষের পাশেই রাখা উচিত।

iv. কেবলমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক বা ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক দ্বারাই শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া উচিত।

v. বিশেষ শ্রেণিকক্ষে পাঠানোর পূর্বে শিক্ষার্থীর যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার।

vi. ব্যক্তিগত চাহিদার ভিন্নতা অনুসারে বিশেষ শিক্ষার পাঠক্রমে নমনীয়তা বাঞ্ছনীয়।

vii. শিশু সাধারণ শ্রেণি বা বিশেষ শ্রেণি যেখানেই থাকুক না কেন প্রশিক্ষণ একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি ও ধারাবাহিকতা মেনে পরিচালিত হওয়া উচিত।

viii. শিশু যত উন্নতি করতে থাকবে, ততটা প্রস্তুতিমূলক দক্ষতাগুলির উপর গুরুত্ব কমিয়ে, জ্ঞানমূলক চর্চা বাড়ানো উচিত।

ix. ক্রমশঃ তাদের শিক্ষা বৃত্তিমুখী করার দিকে নজর দেওয়া উচিত।

৫. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের পাঁচটি স্তর রয়েছে। যথা-বৃত্তি নির্বাচন, বৃত্তি মূল্যায়ন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, বৃত্তিগ্রহণ এবং বৃত্তির পুনর্মূল্যায়ন।

৬. শিক্ষাদানযোগ্য মানসিক প্রতিবন্ধিদের Electronic Medical Record (EMR) -এর মাধ্যমে পারিবারিক জীবন, যেমন-বিবাহ, সন্তানধারণ, অভিভাবকত্ব, পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কেই প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। যাতে তারা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। এছাড়া সুস্থ নাগরিক জীবনের পক্ষে নাগরিকতার প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।

তথ্যসূত্র:

১. ব্যাতি.শিশু., সম্পা. দেবব্রত দেবনাথ এবং আশিষ কুমার দেবনাথ, পৃ. ১৫।

২. মনু., ৮।৩৯৫

৩. *তদেব*, ৯।৬

৪. *তদেব*, ৯।২০২

৫. অর্থশা., ১।১২।৫।২১, সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১১৯।

৬. *তদেব*, ২।১।৫, সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৯৯।

৭. মনু., ৩।১০

৮. অর্থশা., ৫।৩।৬, সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৩০।

৯. মনু., ৮।৪০৭

১০. *তদেব*, ১২।১১০

১১. সভা., ১১।২৩, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ১০৭।

১২. অযো.কা., ৬৬।৫৫, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ১৪১৪।

১৩. আদি., ৩৫।৩৫, *তদেব*, সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ৪১০।

১৪. P.E., p.485.

১৫. উত্তর., ৩।১৮, রামা., সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১৬. ...., ৩২।৩১, *তদেব*, সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, পৃ. ৫৭৫১।

১৭. ...., ৩২।৩৮, *তদেব*, সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর।

১৮. আশ্রম., ১।৭, মহা., সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

১৯. সভা., ৭।১১, *তদেব*, সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

২০. আদি., ১২।২৪, *তদেব*, সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য।

২১. P.E., p.65.

২২. *তদেব*, p.253.

২৩. আদি., ৩।৮২, *মহা.,* সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২১৯।

২৪. পু.কো., তৃতীয় খণ্ড, সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ৯২২।

২৫. *তদেব,* প্রথম খণ্ড, সম্পা. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. ৮০৩।

২৬. P.E., p.671.

২৭. ব্যাতি., সম্পা. বিষ্ণুপদ নন্দ এবং সারাওয়াতারা জামান, পৃ. ৬৭।

২৮. ব্যাতি. শিশু., সম্পা. দেবব্রত দেবনাথ এবং আশিষ কুমার দেবনাথ, পৃ. ১৩১।

২৯. ব্যাতি., সম্পা. বিষ্ণুপদ নন্দ এবং সারাওয়াতারা জামান, পৃ. ২৮৫।

৩০. *তদেব,* পৃ. ২৮৬।

৩১. ব্যাতি.শিশু., সম্পা. দেবব্রত দেবনাথ এবং আশিষ কুমার দেবনাথ, পৃ. ১৩৪।

৩২. ব্যাতি., সম্পা. বিষ্ণুপদ নন্দ এবং সারাওয়াতারা জামান, পৃ. ২৮২।

৩৩. ব্যাতি.শিশু., সম্পা. দেবব্রত দেবনাথ এবং আশিষ কুমার দেবনাথ, পৃ. ১৩৫।

৩৪. T.C.S.B.S.I., p. 212.

৩৫. তত্রৈব।

৩৬. D.D.I., p. 369.

৩৭. U.T.C.A.B., p. 17.

৩৮. C.A.B.C.V.I., pp. 37-48.

৩৯. ব্যাতি.শিশু., সম্পা. দেবব্রত দেবনাথ এবং আশিষ কুমার দেবনাথ, পৃ. ১৩৭।

৪০. T.M.V.I., p. 54.

৪১. ব্যাতি.শিশু., সম্পা. দেবব্রত দেবনাথ এবং আশিষ কুমার দেবনাথ, পৃ. ১৩৮।

৪২. তত্রৈব।

৪৩. তত্রৈব।

৪৪. তত্রৈব।

৪৫. তত্রৈব।

৪৬. তত্রৈব।

৪৭. ব্যাতি., সম্পা. বিষ্ণুপদ নন্দ এবং সারাওয়াতারা জামান, পৃ. ২৮৯।

৪৮. *তদেব,* সম্পা. বিষ্ণুপদ নন্দ এবং সারাওয়াতারা জামান, পৃ. ২৯০।

৪৯. তত্রৈব।

৫০. তত্রৈব।

৫১. তত্রৈব।

৫২. A.G.V.I.F.S., p. 7.

৫৩. A.N.B.C.S.S.F.M., pp. 5-9.

৫৪. M.A.B.P.S., p.13.

৫৫. A.G.V.I.F.S., p. 18.

৫৬. *তদেব,* p.15.

৫৭. ব্যাতি.শিশু., সম্পা. দেবব্রত দেবনাথ এবং আশিষ কুমার দেবনাথ, পৃ. ১৫২-১৫৩।

৫৮. *তদেব,* পৃ. ১৫৭।

৫৯. তত্রৈব।

৬০. তত্রৈব।

৬১. তত্রৈব।

৬২. S.T.P.G.P.E.E., pp. 58-59.

৬৩. *তদেব,* পৃ. ৯৬।

৬৪. A.S.L.E.W., p. 189.

৬৫. ব্যাতি.শিশু., সম্পা. দেবব্রত দেবনাথ এবং আশিষ কুমার দেবনাথ, পৃ. ১৬০।

৬৬. E.I.A.S.T., p. 285.

৬৭. তত্রৈব।

৬৮. V.D.S.R.C.T., p. 479.

৬৯. ব্যাতি.শিশু., সম্পা. দেবব্রত দেবনাথ এবং আশিষ কুমার দেবনাথ, পৃ. ১৬৬।

৭০. তত্রৈব।

৭১. তত্রৈব।

৭২. তত্রৈব।

৭৩. তত্রৈব।

৭৪. স.শি., সম্পা. প্রণব কুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৯৭।

৭৫. Id., p. 215.

৭৬. তত্রৈব।

৭৭. P.T.S.C.D., p. 27.

৭৮. ব্যাতি., সম্পা. বিষ্ণুপদ নন্দ এবং সারাওয়াতারা জামান, পৃ. ১০৮।

৭৯. তত্রৈব।

৮০. মান.প্রতি., সম্পা. বিষ্ণুপদ নন্দ, পৃ. ১১১-১১২।

৮১. ব্যাতি., সম্পা. বিষ্ণুপদ নন্দ এবং সারাওয়াতারা জামান, পৃ. ১১৪-১১৫।

৮২. তত্রৈব।

উপসংহার

উপসংহার (Conclusion)

যেকোন গবেষণা কর্মের অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার পর উপসংহার পর্বে গবেষণার কর্ম বা মহত্ব পর্যালোচিত হয়। আমার গবেষণা-সন্দর্ভের বিষয় '*বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতের* উপলব্ধ বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান' শীর্ষক গবেষণা-সন্দর্ভের শেষে তাই গবেষণার মহত্বমণ্ডিত দিকগুলি পর্যালোচিত হল :

১. গবেষণার শিরোনামে অক্ষম, পঙ্গু, প্রতিবন্ধী, বিকলাঙ্গ, প্রতিস্পর্ধী, দিব্যাঙ্গ প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তে 'বিকৃতেন্দ্রিয়' শব্দের যথাযথ ব্যবহার করা হয়েছে, অঙ্গহীনের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনার্থে।

২. বিকৃতেন্দ্রিয় শব্দের স্বরূপ ব্যাখায় পাণিননীয় সূত্রদ্বয়ের গুরুত্ব কতখানি, তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. গবেষণা সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে বিকৃতেন্দ্রিয় শব্দের বিবিধ আভিধানিক অর্থ বিবিধ সংস্কৃত শাস্ত্রের ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ বিকৃত + ইন্দ্রিয় = বিকৃতেন্দ্রিয়, এক্ষেত্রে 'বিকৃত' শব্দের আলাদা আভিধানিক অর্থ এবং 'ইন্দ্রিয়' শব্দের আভিধানিক অর্থ নির্ণীত হয়েছে। 'বিকৃত' শব্দের দশটি আভিধানিক অর্থ এবং 'ইন্দ্রিয়' শব্দের তিনটি আভিধানিক অর্থ উদাহরণ সহযোগে স্বীকৃত হয়েছে। এছাড়া বিকৃতেন্দ্রিয় সন্তান জন্মের কারণ পর্যালোচিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ জন্মসূত্রে গর্ভের ছয়টি অংশের মধ্যে যে কোন অংশ দূষিত হওয়ার কারণে বিকৃতেন্দ্রিয় শিশু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তা গবেষণা-সন্দর্ভে তুলে ধরা হয়েছে। কারণ আধুনিক সমাজেও বিকৃত শিশু জন্মালে প্রধানত পরিবার ও সমাজের লোকজন বিকৃত শিশুর মাকেই অনেকাংশে দায়ী করে থাকেন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র মাকে দায়ী করা চলে না। অনেকাংশে জন্মদাতা পিতার শুক্রাণুর দোষেও এইরূপ সন্তান উৎপন্ন হয়, তা গবেষণা-সন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ঋষি দীর্ঘতমস্ পিতা বৃহস্পতির দোষে অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এছাড়া বিকৃতেন্দ্রিয়ের স্বরূপব্যাখাও *আয়ুর্বেদ, মনুসংহিতা* অনুযায়ী ব্যাখাত হয়েছে। ইন্দ্রিয়ভেদে চার প্রকার এই জাতীয় ব্যক্তির স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। *চরকসংহিতা* ও বর্তমান ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী তাদের লক্ষণ ও শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বর্তমানে প্রায় একুশ

প্রকারের বিকলাঙ্গের কথা ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখ থাকলেও, গবেষণা সন্দর্ভে চক্ষু, কর্ণ, অস্থি ও মানসিক এই চার প্রকার প্রধান বিকলাঙ্গ স্বীকৃতি পেয়েছে। কারণ *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারত* মহাকাব্যে মূলতঃ উক্ত চার শ্রেণির বিকলাঙ্গের কথা উল্লেখ রয়েছে। সেই হেতু এই চার প্রকার বিকলাঙ্গের সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ ও অস্বাভাবিক সন্তান জন্মানোর কারণও প্রাচীন ও বর্তমানে চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিত্তিতে ব্যাখাত হয়েছে। কারণ প্রাচীন যুগে ও বর্তমান যুগে যে সকল কারণে বিকৃত শিশু জন্মায় তার ধারণা আমাদের সকলের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ প্রত্যেক পিতা-মাতা সর্বদা সুস্থ স্বাভাবিক শিশু কামনা করে থাকেন। এক্ষেত্রে পিতা ও মাতার শরীরে বিভিন্ন গুপ্ত রোগের উৎপন্ন হওয়ার দরুণ এই প্রকার শিশু জন্ম নেয় এবং সুস্থ শিশুও অনেকাংশে দুর্ঘটনাজনিত কারণেও বিকলাঙ্গ হয়। তাই শুধুমাত্র আধুনিক সমাজে নয়, মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে প্রতিবন্ধিতা বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার নথিপত্রে উল্লিখিত হয়েছে। তা যাতে সকল শ্রেণির মানুষ অবহিত হন। সেই হেতু প্রাচীন ও বর্তমান চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী আলাদা আলাদা আলোচনা করার প্রয়াস করেছি।

৪. *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* যেসকল বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে যেসকল অঙ্গের বিকৃতি ঘটেছে, সেপ্রসঙ্গে অঙ্গহানির কারণও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষিত হয়েছে। এছাড়াও ভবিষ্যতে অনেক বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রের স্বাভাবিক শরীর প্রাপ্তিতে যেসকল পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে, তাও বিশ্লেষিত হয়েছে। *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রসংঘের নামকরণও কীপ্রকারে হয়েছে, তাও ব্যাখা করা হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত পনেরো জন বিকলাঙ্গ ব্যক্তিবর্গের শারীরিক বৈকল্য হওয়ার কারণ তৎকালীন সমাজে তাঁরা যে সকল বাধার সম্মুখীন হয়েছেন এবং তাঁরা সকলে তাদের নিজ নিজ শরীরের অঙ্গবৈকল্যের বাঁধাকে উপেক্ষা করে কর্মের দ্বারা সমাজে আপন জায়গায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যক্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, অপুত্রক রাজা দশরথের পুত্র প্রাপ্তিতে বিকলাঙ্গ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির অবদান, রাজা দশরথের প্রাণত্যাগের কারণরূপে অন্ধক মুনির অভিশাপ, রাজা কুশের বিকলাঙ্গ শতকন্যাকে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে দান ও তার রাজ্যের নামকরণ, মন্থরা অযোধ্যার অন্যতম দাসী হিসাবে নির্বাচিত হওয়া, কুবেরের ধনদেবতা, লঙ্কা ও পুষ্পকরথের অধীশ্বর হওয়া, জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের হস্তিনাপুরের রাজারূপে স্বীকৃতি

লাভ, অরুণের সূর্য্য দেবতার সারথিরূপে যোগদান প্রভৃতি। এক্ষেত্রে সকল বিকৃতেন্দ্রিয়গণ সাময়িক অসুবিধার সম্মুখীন হলেও নিজ গুণে সকলে মহাকাব্যের পরিসরে মহান হয়েছিলেন। অতএব বর্তমান আধুনিক সমাজে এই জাতীয় ব্যক্তিদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করলেও, এঁরা যে সমাজে কোন অংশে ব্রাত্য নন এবং এই জাতীয় ব্যক্তিরা যে নিজ গুণে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন, তা সর্বাংশে স্বীকৃত হয়েছে। যেমন, ধৃতরাষ্ট্রের মতো শারীরিক শক্তি সেইসময় বিশ্বে অন্য কোন যোদ্ধার মধ্যে ছিলনা। শকুনির মতো পাশা খেলায় দক্ষ ব্যক্তি তদানীন্তন বিশ্বে নেই, মন্থরার ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অষ্টাবক্র মুনির ন্যায় বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞান তৎকালীন বিশ্বে প্রায় অমিল ছিল।

৫. *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিকৃতেন্দ্রিয় মানুষেরা পারিবারিক জীবন কীভাবে অতিবাহিত করতেন, তা তুলে ধরা হয়েছে। তাদের জন্মচিত্রও রেখা চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু কিছু বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রসমূহের জন্মকাহিনী ও বৈবাহিক জীবন অতিবাহিত হওয়ার কাহিনী দুই মহাকাব্যে উল্লেখ না থাকায় বিবিধ পুরাণ ও *Pouranic Encyclopedia*-র সাহায্য নেওয়া হয়েছে। যেমন, *বাল্মীকীয় রামায়ণে* মন্থরা ও শূর্পণখা চরিত্র এবং বৈয়াসিক মহাভারতে দীর্ঘতমস্, অষ্টাবক্র মুনি ও একলব্য চরিত্র। যা এই গবেষণা-সন্দর্ভে অনেকাংশে নতুনত্বের ছাপ ফেলেছে।

চতুরাশ্রমকে ভিত্তি করে সমাজ জীবন অতিবাহিত করার কাহিনী ব্যাখাত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রবর্গ নিজ নিজ চতুরাশ্রম পদ্ধতির মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মচর্য আশ্রম-পালন, শাস্ত্রসম্মত বিবাহ-পদ্ধতি এবং গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত প্রত্যেক বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রবর্গের আট প্রকার বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে কোন পদ্ধতিতে বিবাহ করেছিল তা নির্ণীত হয়েছে। এছাড়া বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রদিগের শাস্ত্রসম্মত পুত্রোৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে এবং শাস্ত্রসম্মত দ্বাদশ পুত্র সমূহের মধ্যে কে কী জাতীয় পুত্রের জন্ম দিয়েছে তাও ব্যাখাত হয়েছে। গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রদিগের মধ্যে কতিপয় চরিত্রের বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-জীবন অতিবাহিত করার কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রসমূহ ছল অর্থাৎ রাজনীতিকে আশ্রয় করে দুই মহাকাব্যকে অতিরঞ্জিত করেছেন, সেই সকল রাজনৈতিক ঘটনা

প্রণালীর বর্ণনা বিবিধ স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত রাজধর্ম পালনের মাধ্যমে লক্ষিত হয়েছে। যা তৎকালীন পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব পড়েছিল তা বর্তমানের আঙ্গিকে ব্যাখাত হয়েছে।

৬. *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* সমসাময়িক বিবিধ স্মৃতিশাস্ত্রের বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি অনুশাসন প্রণালী অনুযায়ী তৎকালীন সমাজে তাদের অধিকার সুরক্ষার বিধানসমূহ আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের ন্যায় তৎকালীন সমাজে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রদেশে যেভাবে জীবন ধারণ করতেন, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে দিয়ে কোনপ্রকার ভারী কার্য করানো নিষিদ্ধ ছিল, বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের মন্ত্রণাস্থানে অপসারণ বিধি, বিকলাঙ্গ বা অসুস্থ রাজার অনুপস্থিতিতে রাজ্য পরিচালনের দায়িত্ব প্রণালী আলোচিত হয়েছে, পিতার ধনসম্পত্তির উপর বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণের বিধান, প্রদেশের বিজিগীষু রাজা কর্তৃক বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের গুপ্তচররূপে নিয়োগ প্রভৃতি অনুশাসন প্রণালী গবেষণা সন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে।

পুনরায় বর্তমান ভারতীয় *ন্যায়সংহিতা* (ভারতীয় সংবিধান) অনুযায়ী বিকৃতেন্দ্রিয়ের প্রতি অনুশাসন প্রণালী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সেই সময় ও বর্তমান সময়েও বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি কী প্রকার অনুশাসন প্রণালী উপলব্ধ ছিল যাতে তারা সমাজে সকল মানুষের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে, তা আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ বিকৃতেন্দ্রিয় মানুষের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখার জন্য ভারতীয় সংবিধান অনুসারে যেসকল অনুশাসন প্রণালী লিপিবদ্ধ হয়েছে তা আলোচিত হয়েছে। যেমন প্রদেশের সরকার কর্তৃক বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, শংসাপত্র প্রদান, উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা, বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান, আইনি পরামর্শ নেওয়ার জন্য পৃথক্ আদালত গঠন, লোকস্থানে পৃথক্ ভবন ও শৌচালয় নির্মাণ প্রভৃতি অনুশাসন সংবিধানের পৃথক্ পৃথক্ ধারা অনুযায়ী আলোচিত হয়েছে।

এছাড়া বিকৃতেন্দ্রিয় হওয়ার অন্তরালে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বান্বেষণ ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। এই অংশে আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক এই তিন পদ্ধতি অনুসারে গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের চিকিৎসা পদ্ধতির কথা আলোচনা

করা হয়েছে। প্রথমে *আয়ুর্বেদে* উল্লিখিত *সুশ্রুতসংহিতা* অনুসারে চক্ষু, কর্ণ, অস্থি ও মানসিক অঙ্গে উৎপন্ন বিবিধ রোগের নাম, যা থেকে বিকলতার সৃষ্টি হয় তা আলোচিত হয়েছে। যেমন প্রত্যেক মানুষের চোখে পাঁচটি মণ্ডল, ছয়টি সন্ধি ও ছয়টি পটল রয়েছে। এই অংশে সৃষ্ট *সুশ্রুতসংহিতা* অনুসারে ছিয়াত্তর প্রকার চক্ষু-রোগের নাম এবং তাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও আঠাশ প্রকার কর্ণ-রোগ, সাত প্রকার অস্থি-রোগ ও ছয় প্রকার মানসিক-রোগের নাম ও বৈশিষ্ট্য *সুশ্রুতসংহিতা* অনুসারে আলোচিত হয়েছে। মূলতঃ *সুশ্রুতসংহিতায়* অনেকপ্রকার অস্থি ও মানসিক রোগের নাম উল্লেখ থাকলেও গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয়বর্গের বৈশিষ্ট্যের নিরিখে রোগের নাম ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাত হয়েছে। যেমন কুব্জ জাতীয় অস্থিরোগ মন্থরা চরিত্রের নিরিখে, খঞ্জ ও পঙ্গু জাতীয় অস্থিরোগ অষ্টাবক্র মুনি, শকুনি চরিত্রের আলোকে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া পিত্তজ মূর্চ্ছারোগ রাজা দ্যুমৎসেন ও বিষজ মূর্চ্ছারোগ উপমন্যু চরিত্রের নিরিখে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া গবেষণা সন্দর্ভে উল্লিখিত রোগের চিকিৎসা *ভৈষজ্য-রত্নাবলী* নামক আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ অনুযায়ী প্রাকৃতিক শাকবর্গ, পুষ্পবর্গ, হরিতকীবর্গ, কপূরাদিবর্গ, গুলঞ্চবর্গ ও তৈলবর্গের নিরিখে ঔষধ প্রস্তুতকরণ, তা লাগানোর উপায় এবং রোগের উপশম পদ্ধতি বিশ্লেষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে উৎপন্ন অঙ্গবৈকল্য সৃষ্টি হলেও সেই সকল অঙ্গবৈকল্যের প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মে কোন প্রভাব ফেলে কি না? এবিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

এই অধ্যায়ের সর্বশেষ অংশে আধুনিক হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে মানুষের চোখে, কানে, হাড়ে ও মনে জাত বিভিন্ন রোগের নাম উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত রোগের উপশম পদ্ধতি অবলম্বনে বিবিধ ঔষধের নাম ও সেবন পদ্ধতিও বিশ্লেষিত হয়েছে।

সর্বশেষে বলা যেতে পারে যে *বাল্মীকীয় রাময়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* মূলতঃ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলন ছিল। সেই যুগে হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রচলন সেইভাবে লক্ষিত হয়নি। কিন্তু আয়ুর্বেদ থেকেই হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসার উদ্ভব ঘটেছে। বিবিধ সামাজিক কুসংস্কার ও প্রকৃত চিকিৎসকের অভাবে আয়ুর্বেদ উন্নতি সাধন করতে পারে নি। সেই কারণেই হয়তো তৎকালীন সমাজে সকল বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতির আওতায় না আসার কারণে, তাঁরা সমাজে বিকলাঙ্গ রূপেই রয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু

বর্তমান যুগে উন্নত হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসা করার ফলে অনেক বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গ সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন, আবার অনেকক্ষেত্রে প্রকৃত সুস্থ না হয়েও তাঁরা কর্মক্ষমতার মাধ্যমে জীবনে এগিয়ে চলেছেন।

৭. রাজা বা প্রদেশের মুখ্য ব্যক্তিদের দ্বারা বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি *মনুসংহিতা* ও *অর্থশাস্ত্র* অনুযায়ী যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, তা ব্যক্ত হয়েছে। যেমন বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের বিবাহ-বিষয়ক ব্যবস্থাগ্রহণ, বিকলাঙ্গ ব্যক্তি কর্তৃক নিজ ভার্যার রক্ষণ-বিষয়ক ব্যবস্থা, বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের শিক্ষা, পেশা প্রভৃতি বিষয়ক ব্যবস্থা আলোচিত হয়েছে। *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিসমূহের জীবনধারণের জন্য যেসকল বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, তা ব্যাখাত হয়েছে। অর্থাৎ গবেষণা সন্দর্ভে উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের কেউ পৌরহিত্য, কেউবা পুত্র কর্তৃক ভরণ-পোষণ, কেউবা পিতা কর্তৃক ভরণ-পোষণ, কেউবা রাজকর্মচারী, কেউবা রাজা প্রভৃতি রূপে জীবন ধারণ করতেন।

আবার, বর্তমান সমাজে জীবনধারণের নিরিখে গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত চারপ্রকার বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা আলোচিত হয়েছে। যেমন দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ, ব্রেইল লিখন ও পঠন, দৈনন্দিন জীবনে দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় প্রশিক্ষণ, পরিবেশ পরিচিতি ও নিরাপদে হাঁটার কৌশল প্রশিক্ষণ, অ্যাবাকাস, রেকর্ডকৃত বই প্রভৃতি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁরা সমাজে বেঁচে থাকেন। শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে Auditory Training, Lip Reading ও Speech Correction শেখার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ পদ্ধতিও আলোচিত হয়েছে। অস্থিগত বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের জন্য হুইল চেয়ার, ক্রাচ্ ও কৃত্রিম অঙ্গের ব্যবস্থা ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক শিক্ষকের কাছে কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা প্রভৃতি পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষিত হয়েছে।

৮. বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গদের সম্পর্কে সংস্কৃত সাহিত্যে গবেষণা তুলনামূলকভাবে কম হলেও, প্রাচীনকাল থেকে এই জাতীয় ব্যক্তিদের যে যথেষ্ট প্রভাব ছিল, তা বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। যেমন, ভারতবর্ষে বিশেষ বিশেষ জায়গার নামকরণ করা হয়েছে *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের নামের ভিত্তিতে। যেমন- ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশের বর্তমানে

কনৌজের পূর্ব নাম কান্যকুব্জ হয়েছিল রাজা কুশনাভের কন্যাগণের বিকৃতেন্দ্রিয়ত্বের কারণে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর প্রদেশের নামকরণ করা হয়েছে অষ্টাবক্র মুনির বক্রতা লুপ্ত হয়ে স্বাভাবিক শরীর প্রাপ্তির নিমিত্ত।

৯. *বৈয়াসিক মহাভারতে* বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রসমূহের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য চরিত্র হল দীর্ঘতমস্। যিনি জন্মান্ধ হয়েও 'গোধর্ম' অর্থাৎ দিবা বা রাত্রিতে গোপনে-প্রকাশ্যে রতিক্রিয়ায় মগ্ন থাকার বিদ্যা সুরভি পুত্রের আশ্রমে লাভ করেছিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি গোধর্ম প্রচারে ব্রতীও হয়েছিলেন। তাঁর পরিবার তাকে ত্যাগ করলেও অপুত্রক বলি রাজার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচ সন্তানের জন্ম দেন। সেই পাঁচ সন্তানের নামে ভারতবর্ষে পাঁচ প্রদেশ অঙ্গ (বর্তমানে যা বিহারের চম্পা জেলার অন্তর্গত প্রদেশ), বঙ্গ (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ), কলিঙ্গ (বর্তমানে ওড়িষা), পুণ্ড্র (বর্তমানে বাংলাদেশের বগুড়ায় জেলার মহাস্থাননগর প্রদেশ), সুহ্ম (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তাম্রলিপ্ত বা তমলুক) নামকরণ হয়েছে। বর্তমান দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে 'গোধর্ম' বিদ্যায় রত ব্যক্তিরা হলেন শুক্রাণু দাতা ও দেহপ্রসারিণী ব্যক্তি (Escort Boy)। অতএব বর্তমান দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে দীর্ঘতমস্ জন্মান্ধ ও ঋষি হয়েও এই কাজ করতেন। এইকাজের জন্য তাকে পরিবারের লোকজন বিসর্জন দিলেও সমাজে তিনি সর্বদা যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছেন। জন্মান্ধ হয়েও জীবনে কোনরূপ বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়নি এবং সামাজিক অস্পৃশ্যতাও গ্রাস করতে পারেনি। এছাড়াও তিনি 'গোধর্মকে' জীবিকা হিসাবে স্বাচ্ছন্দ্যে বেছে নিয়েছিলেন।

১০. 'ধর্মের' লক্ষণ প্রসঙ্গে মীমাংসা সূত্রকার জৈমিনি বলেছেন- 'তত্র বেদেন প্রয়োজনমুদ্দিশ্য বিধীয়মানোঽর্থো ধর্মঃ'[১] অর্থাৎ ধর্ম বলতে বোঝায়, বেদে উল্লিখিত অভিলাষিত পদার্থের সাধনই হল ধর্ম। পুনরায় জৈমিনি সূত্রে ধর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ'[২] অর্থাৎ যার দ্বারা (বেদশাস্ত্র) জীব বিবিধ কর্মে (যজ্ঞাদি) কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তা হল ধর্ম। ধর্ম প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক হয়ে থাকে। আমার আলোচিত গবেষণা-নিবন্ধে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের ধর্মীয় কার্যকলাপ সামাজিক ও রাজনীতির অধর্মের সান্নিধ্যে থেকেই সর্বদা আলোচিত হয়েছে। যেমন- ধৃতরাষ্ট্র রাজা হওয়া সত্ত্বেও তার সন্তানদের প্রতি অন্ধস্নেহ যেন কুরুবংশের অবক্ষয়ের কারণ বলা যেতে পারে। তেমনভাবেই *রামায়ণে* দেখতে পাই অন্ধকমুনির কাহিনী।

যেখানে মুনি রাজা দশরথকে অভিশাপ ও তাকে অধর্ম থেকে নিবারণের উপায় ব্যক্ত করেছিলেন এবং ধর্মের প্রতি গমন বিষয়ে বর্ণনা করেছিলেন।

১১. গবেষণা সন্দর্ভে উল্লিখিত 'মন্থরা' ও 'একলব্য' চরিত্র নতুন আঙ্গিকে বিশ্লেষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে 'মন্থরা' চরিত্রটির কথা *বাল্মীকীয় রামায়ণে* উল্লেখ না থাকলেও, পৌরাণিক গল্পানুসারে বৃহদশ্রভের কন্যা ছিলেন। যার অপর নাম ছিল বিশালাক্ষী। তিনি তাঁর রূপ-যৌবন ধরে রাখার জন্য কিছু অনুপযুক্ত দ্রব্য সেবন করেছিলেন, যার কারণেই শরীর বৈকল্য প্রাপ্ত হয় এবং সেই সময় থেকেই তিনি মন্থরা নামে খ্যাত হন।

অপর চরিত্র 'একলব্য' বাল্যকালে অভয় বা অভিদ্যুম্ন নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বাল্যকালে অস্ত্রশাস্ত্রে নিষ্ঠা ও সততা দেখে গুরুকুলে একলব্য নামে খ্যাতি লাভ করেছিল।

অতএব অঙ্গৈকল্য বা বিকৃতেন্দ্রিয় আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে, *রাময়ণ* ও *মহাভারত* এই গ্রন্থদ্বয়ে এদের ভূমিকা অপরিমেয়। সেই যুগে মূলতঃ তাঁদের সমাজে চিহ্নিত করণ নামকরণের মাধ্যমেই হয়েছে। যেমন ঋশ্যশৃঙ্গ মুনির মস্তকে হরিণের শিং ন্যায় একশৃঙ্গরূপ মাংসপিণ্ড থাকায় এইরূপ নামকরণ, অষ্টাবক্র মুনির শরীরের আটটি অংশে বিকৃত প্রাপ্ত হওয়ায় এইরূপ নামকরণ, দীর্ঘতমস্ ঋষি বাল্যকাল থেকেই দৃষ্টি শক্তি লোপ হেতু এইরূপ নামকরণ করা হয়েছিল ইত্যাদি। সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষায় সংজ্ঞা বা নাম দুই প্রকার। ব্যুৎপত্তি নিমিত্ত অর্থাৎ যে সংজ্ঞাটির প্রকৃতি প্রত্যয় বিশ্লেষণে সেই সংজ্ঞাই নিরূপিত হয়। অপরটি হল প্রবৃত্তি নিমিত্ত, যেমন গুণ বৃদ্ধি, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি। এক্ষেত্রে গবেষণা-নিবন্ধে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ ব্যুৎপত্তিগত সংজ্ঞা হয়েছে। শুধুমাত্র বিকলাঙ্গ ব্যক্তি নয় তৎকালীন সমাজে বিভিন্ন কর্ম করার নিরিখেও নামকরণ হয়ে থাকে। অতএব ভারতবর্ষের মহাকাব্যদ্বয়ের আঙ্গিকে সকল বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের কৃতকর্ম সমাজে যথেষ্ট ছাপ ফেলেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, *বাল্মীকীয় রামায়ণের* বিকৃতেন্দ্রিয় 'ঋষ্যশৃঙ্গ' মুনি কর্তৃক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্যই অপুত্রক দশরথ পিতা হতে পেরেছিলেন, কুবের যক্ষদের অধিপতি হয়েছিলেন এবং *বৈয়াসিক মহাভারতে* অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বহুকাল হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আসীন থেকে সমগ্র রাষ্ট্রকে রক্ষা করেছিলেন। অতএব এই জাতীয় ব্যক্তিগণ তৎকালীন যুগে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে বেঁচেছিলেন এবং সমাজের সর্বক্ষেত্রে নিজ নিজ গুণে মহত্বের ইতিহাস

রেখে গেছেন। সেই কারণেই অধুনা সমাজজীবনে শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অবদানগুলি অনেক অনিশ্চয়তা, অনেক অস্বাচ্ছন্দ্যকে দূর করে বিকৃতেন্দ্রিয় মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলেছে। বর্তমান যুগের বিকৃতেন্দ্রিয় মানুষের কাছে তথ্যপ্রযুক্তির সমাদর ও সার্থক ব্যবহার এই জাতীয় মানুষকে তৃতীয় প্রজন্মে পৌঁছতে সাহায্য করেছে। শুধুমাত্র প্রযুক্তির ব্যবহার নয়, সমগ্র বিশ্বে এক জাতি, এক রাষ্ট্রের ধারণা বর্তমানে এক বিশ্বজনীন ধারণা। সকলের জন্য ন্যায়বিচার, সাম্য, স্বাধীনতা ও বিশ্বভাতৃত্ববোধের দাবি আজ সবদেশই স্বীকার করে নিয়েছে।

সেই কারণেই প্রতিবন্ধিদের প্রতি বিশেষ শিক্ষাপ্রদান বর্তমানে অত্যন্ত আধুনিক মানের হয়েছে। যাতে সকল প্রতিবন্ধী শিশুরা শিক্ষা গ্রহণে বেশি সমর্থ হয়ে উঠতে পারে এবং নিজের তথা সমাজের, রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বপালনে অংশগ্রহণ করতে পারে। বিকৃতেন্দ্রিয় মানুষেরা সমাজে শুভদা নন, তাও বিভিন্ন আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার মধ্য দিয়ে বর্তমানে অনেকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং গুণমানে ভূষিত হয়েছেন। তাই প্রতিবন্ধী মানুষেরা বর্তমানে বিশেষ বিশেষ শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে অনেকেই ফিরে এসেছেন এবং তাঁরা অনেকেই সন্মানের জীবিকার মাধ্যমে সমাজে যথেষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বর্তমান বিশ্বে বিকৃতেন্দ্রিয় মানুষেরা অঙ্গবিকৃতির এই অভিশাপকে দূরে সরিয়ে আজ সফলতার শীর্ষে পৌঁছেছেন। সেইসমস্ত সফল বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের নাম গবেষণা-নিবন্ধে উল্লিখিত শারীরিক অঙ্গবৈকল্যের নিরিখে নিম্নে প্রদর্শিত হল :

১. বিশ্বে সফল অন্ধ বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গ : হোমার (গ্রীসের দুই মহাকাব্য ইলিয়াড ও ওডিসি লেখক), লুই ব্রেইল (ফরাসি শিক্ষাবিদ), হেলেন কেলার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেখক ও রাজনৈতিক কর্মী), হ্যারিয়েট টুবম্যান (আমেরিকান বিলোপবাদী ও সামাজিক কর্মী), ফ্র্যাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩২তম রাষ্ট্রপতি), টিফানি মারিয়া ব্রার (ভারতের জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী), হাবেন গির্মা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম আইনজীবী), রবীন্দ্র জৈন (ভারতীয় চলচিত্র নির্মাতা), শ্রীকান্ত বোল্লা (ভারতীয় শিল্পপতি), স্বামী রামভদ্রাচার্য (ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃত পণ্ডিত), সাধন গুপ্ত (ভারতীয় আইনজীবি ও রাজনীতিবিদ), অজয় কুমার রেড্ডি (ভারতীয় অন্ধ ক্রিকেট টিমের প্রধান), ডাঃ ওয়াইজি পরমেশ্বর (ভারতীয় চিকিৎসক),

সুরদাস (ভারতীয় ভক্তিবাদী কবি ও গায়ক), শেখর নায়কের (বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক), সাধনা ধন্দ (ভারতীয় প্রেরণাদায়ক বক্তা ও লেখক)।

২. বিশ্বে সফল শ্রবণ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি : ইয়াও মিং (চীন দেশীয় বাস্কেটবল খেলোয়ার), লরেন্টিয়া ট্যান (সিঙ্গাপুরের একজন অশ্বারোহী ক্রীড়াবিদ), মিলি ববি ব্রাউন (অভিনেত্রী), হ্যালি বেরী (অভিনেত্রী), আয়ুমি হামাসাকি (জনপ্রিয় জে-পপ্ তারকা), স্টিফেন কলবার্ট (আমেরিকান অভিনেতা), গ্রাইমস (গায়ক, গীতিকার ও প্রযোজক), এরিক ক্ল্যাপটন (সঙ্গীতশিল্পী), রোনাল্ড রিগান (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪০তম রাষ্ট্রপতি), টমাস এডিসন (বিজ্ঞানী), রবার্ট গ্রান্ট আইটকেন (জ্যোতির্বিজ্ঞানী), টিলি এডিঙ্গার (বিজ্ঞানী), লিন চিং ল্যান (নৃত্যশিল্পী), লার্ক ডেটওয়েলার (নৃত্যশিল্পী), শাহীম সানচেজ (নৃত্যশিল্পী), তাহা রহিম (ফরাসি অভিনেতা), সাধনা ধন্দ (ভারতীয় চিত্রকলা শিল্পী)।

৩. বিশ্বে সফল অস্থিগত বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গ : মালতী কৃষ্ণামূর্তি হোল্লা (ভারতীয় আন্তর্জাতিক প্যারা অ্যাথলেট), মালভিকা আইয়ার (ভারতীয় সমাজকর্মী), অরুণিমা সিনহা (ভারতীয় প্যারামাউন্টেন), প্রীতি শ্রীনিবাসন (ভারতীয় সাঁতার ও তামিলনাড়ু মহিলা ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক), সুধা চন্দ্রন (ভারতীয় ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী), নিকোলাস জেমস ভুজিসিক (অস্ট্রেলিয়ান প্রেরণাদায়ক বক্তা), হ্যারি বনিফেস প্রভু (ক্রীড়াবিদ), দীপা মালিক (প্যারালিম্পিকে প্রথম ভারতীয় পদক সংগ্রহকারী), অজিত যোগী (ছত্রিশগড়ের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী), গিরিশ শর্মা (ভারতীয় প্যারা ব্যাডমিন্টন খলোয়াড়), কিরণ তাক (ভারতীয় সাঁতারু), স্টিফেন হকিং (পদার্থবিদ), জন ন্যাশ (আমেরিকান গণিতবিদ), কে এস রাজন্না (পদ্মশ্রী প্রাপক), দেবেন্দ্র ঝাঝরিয়া (ভারতীয় বিখ্যাত ক্রিড়াবিদ), প্রীতি পাল (প্যারালিম্পিকে ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম ভারতীয় মহিলা ব্রঞ্চ বিজেতা), মনীশ নারওয়াল (২০২৪ প্যারালিম্পিকে রৌপ্য বিজেতা), মোনা আগরওয়াল (২০২৪ প্যারালিম্পিকে ব্রোঞ্চ পদক বিজেতা), অবনী লেখারা (২০২৪ প্যারালিম্পিকে স্বর্ণ পদক বিজেতা), আমির হোসেন লোন (ভারতীয় ক্রিকেটার), অ্যারন ফাদারিংহাম (স্কেটার), মানসী জোশী (ভারতীয় প্যারা-ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়), গরিশ শর্মা (ভারতীয় প্যারা-ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়)।

৪. বিশ্ব সফল মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ : চার্লস ডারউইন (ইংরেজ জীববিজ্ঞানী), জন ন্যাশ (মার্কিন গণিতবিদ ও নোবেল বিজেতা), ডেমি লোভাটো (অভিনেতা), প্যাটি ডিউক (অভিনেত্রী), সঞ্জয় দত্ত (অভিনেতা), জ্যোতি আমগে (অভিনেত্রী)।

তথ্যসূত্র :

১. মীমাং.সূ., ২।১

২. জৈ.সূ., ১।১।২

অনুশীলিত গ্রন্থপঞ্জি

Citation Bibliography

Apte, Vaman Shivram. *The Practical Sanskrit-English Dictionary*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1975 (Rpt.).

Arorā, Niśi. *Carak(a) Saṁhitā kā Saṁkṣipta Svarūpa*. Varanasi: Chaukhambha Bharati Academy. 2019 (Rpt.).

Aśvaghoṣa. *Buddhacaritam*. Ed. and Beng. trans. Jayasri Chattopadhyay. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1415 B.Y. (1st ed.).

Bandyopādhyāy(a), Haricaraṇ(a). *Vaṅgīya Śabdakoṣ(a)*. Vols. I-II. New Delhi: Sahitya Academy, 1353 B.Y. (1st ed.).

Basu, Rajshekhar. *Calantikā*. Kolkata: M. C. Sarkar and Sons Pvt. Ltd., 1418 B.Y. (Rpt.).

Bateman, Barbara. *Sighted Children's Perception of Blind Childrens*. Vol- 29. Sage Journals, 1980 (1st ed.).

Bhattacharjee, Amit. *Prācīn(a) Bhārater(a) Saṁskār(a) Carchā*. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2002 (1st ed.).

Bhattacarya, Dhiresh Chandra. *Mahābhārater(a) Ekaśoṭi Durlabh(a) Muhūrta*. Dhaka: New Age Publisher, 2003 (2nd ed.).

Bhaṭṭācāryya, Durgeśanāth(a). *Prākṛtik(a) Cikiṭsā*. Murshidabad: Kanika Yantralay, 1317 B.Y. (1st ed.).

Bhaṭṭācāryya, Hansanārāyaṇ(a). *Hinduder(a) Devadevī Udbhav(a) o Kramavikāś(a)*. Part- III. Kolkata: Firma K L M Pvt. Ltd., 1386 B.Y. (1st ed.).

Bhattacharya, Pashupati. *Bhāratīya Vyādhi o Ādhunik(a) Cikitsā*. Vol- I. Kolkata: The Book Company Limited, 1936 (1st ed.).

Bhaṭṭācāryya, Śivakālī. *Cirañjīv(a) Vanauṣadhi*. Vols. III-IV. Kolkata: Ananda Publishers Pvt. Ltd., (Vol- III, 1978 1st ed.). (Vol- IV, 1387 B.Y. 1st ed.).

Bhattacharya, Sukhamoy. *Mitākṣarā Dāyavibhāg(a)*. Kolkata: Visva-Bharati Gronthonbibhag, 1354 B.Y. (1st ed.).

______. *Mahābhārater(a) Caritāvalī*. Kolkata: Ananda Publishers Pvt. Ltd., 1364 B.Y. (1st ed.).

______. *Mahābhārater(a) Samāj(a).* Santiniketana: Visva-Bharati Publication, 1366 B.Y. (2nd ed.).

______. *Rāmāyaṇer(a) Caritāvalī*. Kolkata: Farma K L M Pvt. Ltd., 1987 (1st ed.).

Bhaduri, Nrisingha Prasad. *Mahābhārater(a) Aṣṭādaśī.* Kolkata: Ananda Publishers Pvt. Ltd., 2020 (1st ed.).

______. *Mahābhārater(a) Laghu-Guru*. Kolkata: Deep Prakashan, 2023 (2nd Pub.; 2012 1st Pub.).

______. *Mahābhārater(a) Pratināyak(a)*. Kolkata: Ananda Publishers Pvt. Ltd., 2009 (1st ed.).

______. *Rāmāyaṇī*. Kolkata: Ananda Publishers Pvt. Ltd., 2021 (1st ed.).

______. *Mahābhārater(a) Nīti-Anīti-Durnīti.* Kolkata: Deep Prakashan, 2024 (3rd ed.; 2014 1st ed.).

______. *Purāṇī.* Kolkata: Deep Prakashan, 2023 (3rd Pub.; 2021 1st Pub.).

______. *Purāṇakoṣa Mahābhārata-Rāmāyaṇa-mukhya Purāṇa*. Vols. I-V. Kolkata: Sahitya Samsad, (Vol-I, 2021 2nd Pub.; 2016 1st Pub.). (Vol- II, 2023 3rd Pub.; 2018 1st Pub.). (Vol- III, 2023 1st ed.). (Vol- IV, 2023 1st ed.). (Vol- V, 2024 1st ed.).

Bidyālaṅkār(a), Śaśibhūṣaṇ(a). *Jīvanīkoṣ(a)*. Vols. I-V Kolkata: Debabrata Publisher, (Vol- I, 1343 B.Y. 1st ed.). (Vol- II, 1345 B.Y. 1st ed.). (Vol- III, 1345 B.Y. 1st ed.) (Vol- IV, 1346 B.Y. 1st ed.). (Vol- V, 1347 B.Y. 1st ed.).

Biswas, Kalipada & Ekakari Ghosh. *Bhāratīya Vanauṣadhi*. Part- I. Kolkata: Kolkata University, 1950 (1st ed.).

Biswas, Sailendra & Sashibhusan Dasgupta & Dinesh Chandra Bhattacharya & Subhas Bhattacharya. *Saṁsad(a) Bāṁlā Abhidhān(a)*. Kolkata: Sahitya Samsad, 2022 (28th ed.; 1957 1st ed.).

Bhaumik(a), Praboth(a) Kumār(a). *Samāj(a) o Sampradāy(a)*. Kolkata: Sahitya Prakash Bhawan, 1883 (1st ed.).

Byācelara, O Āra. *Cikitsāsāra*. Kolkata: The Association of Baptist Churches in Bengal, 1851 (1st ed.).

Cakravartī, Haridās(a). *Homiopyāthik(a) Cikitsā Paricay(a)*. Sreerampur: Tamohar Press, 1296 B.Y. (1st ed.).

Caraka. *Caraka-Saṁhitā*. With Eng. trans. and Cakrapāṇi Datta's comm. *Āyurveda Dīpikā*. Vols. 1-9. Ed. Ram Karan Sharma & Vaidya Bhagwan Dash. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 2017 (Rpt.).

______. Vols. I-III. Ed. and Beng. trans. Brajendra Chandra Nag. Kolkata: Nabapatra Prakashan Publisher, (Vol- I, 2020 6th Pub.; 1981 1st Pub.). (Vol-II, 2013 4th Pub.; 1984 1st Pub.). (Vol- III, 2016 3rd Pub.; 1988 1st Pub.).

______. Vols. I-III. Eds. Kalikinkar Sensharma & Satyashekhar Bhattacharya with Beng. trans. Yashodanandan Sarkar. Kolkata: Deepayan Publishing House, (Vol- I, 2018 4th Pub.; 2005 1st Pub.). (Vols. II-III, 2013 1st ed.).

______. Ed. P.V. Sharma. Varanasi: Chaukhamba Orientalia, 1998 (4th ed.).

______. Vol- II. Ed. Ram Karan Sharma and Vaidya Bhagwan Das. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 2017 (Rpt.).

Caṭṭopādhyāy(a), Paśupati. *Practice of Medicine (Allopathy)*. Kolkata: Rajendra Libery, 1998 (Rev. ed.).

Chakraborti, Bishnupada. *Rāmāyaṇa Caritamālā*. Kolkata: Ananda Publishers Private Limited, 2012 (1st ed.).

Chandra, Dipak. *Mahābhārater(a) Pāśā*. Kolkata: Dey's Publishing, 2016 (2nd ed.).

Chatterjee, Partha. *State and Politics in India*. New Delhi: Oxford University Press, 1998 (2nd Pub.; 1997 1st Pub.).

Chatterjee, Rakhahari, *Politics India the State-Society Interface*. Kolkata: Levant Books, 2014 (3rd ed.).

Chattopadhyay, Ashima. *Bhārater(a) Vanauṣadhi*. Kolkata: Visva-Bharati Granthalaya, 1353 B.Y. (1st ed.).

Chattopadhyay, Prabhakar. *Dṛṣṭaphal(a)-Cikitsā*. Kolkata: Institute of Hindu Chemistry and Ayurvedic Reasearch, 1955 (2nd ed.).

Choudhury, Bishnu. *A Handbook of Ayurvedic Medicine*. Varanasi: Chaukhambha Orientalia, 2016 (1st ed.).

Dāśa, Pi. Ji. *Pāścātya Rāṣṭracintā & Bhāratīya Rāṣṭradarśan(a)*. Kolkata: New Central Book Agency Private Limited, 2009 (3rd ed.).

Das, Pramatha Nath. *Rog(a) Nidān(a) o Cikitsā*. Kolkata: Calcutta Press, 1875 (1st ed.).

Dasgupta, S.N. *A History of Sanskrit Literature*. Vol- I. Calcutta: University of Calcutta, 1947 (1st ed.).

Dash, S.C. *The Constitution of India a Comparative Study*. Allahabad: Chaitanya Publishing House, 1968 (2nd ed.; 1960 1st ed.).

Devavāhādura, Rādhākānta. *Śabdakalpadrumaḥ*. Vols. I-II. Delhi: Nag Publishing House, 1987 (1st ed.)

Debībhāgabat(a) Purāṇam. Ed. and Beng. trans. Pañcānana-Tarkaratna. Kolkata: Nababharat Publisher, 1994 (1st ed.).

Debanath, Ashish Kumar & Debabrata Debanath. *Vyatikramadharmī Śiśu o Tār(a) Śikṣā.* Kolkata: Rita Book Agency, 2014 (5th ed.; 2005 1st ed.).

Dey, Nundolal. *The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India.* London: Luzac & co., 1927 (2nd ed.).

Dey, S. C. *Historicity of Rāmāyaṇa and The Indo-Aryan Society in India & Ceylon*. Delhi: Ajanta Publication, 1976 (1st ed.).

Different Types of Disabilities: List of 21 Disabilities.

Disability Rights (Rights of Persons with Disabilities Act & National Trust Act) and Mental Healthcare Act, India: National Human Rights Commission, 2021.

Disability as per Persons with Disabilities (PwDs) Act 1995.

Disability as per Persons with Disabilities (PwDs) Act 2016.

Dunn, L. M. *Children with Mild General Learning Disabilities.* New York: Holt, 1973 (2nd ed.).

Dutta, Rakhal Chandra. *Phalita Cikitsābidhāna.* Dhaka: East Bengal Printing and Publishing House, 1318 B.Y. (1st ed.).

Faser, G.R. & A. I. Fridman. *The Causes of Blindness in Childhood: A study of 776 children with severe visual handicaps*. Baltimore: The Johns Hopking Press, 1986 (1st ed.).

Fraser, R. G. *The Causes of Profound Deafness in Childhood.* Battimore: The Johns Hopkins University Press, 1976 (1st ed.).

Ghosh, Amal Kumar. *Mahābhārater(a) Caritra Pariciti*. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2016 (1st ed.).

Ghoṣ(a), Kedāranāth(a). *Homiopyāthik(a) Cikitsā*. Sreerampur: Naba Kavyaprakash Press. 1309 B.Y. (1st ed.).

Hazra, R. C. *Studies in The Purāṇic Records on Hindu Rites and Customs*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1987 (1st ed.).

Holden, H. R. *Prediction of Mental Retardation in Infancy*. London: American Psychological Association, 1972 (3rd ed.).

Jāmān(a), Sārāoyārātārā & Biṣṇupada Nanda. *Vyatikramī Śiśu*. Dhaka: Mowla Brothers, 2005 (1st ed.).

Jasrai, Y.T. *The Ayurvedic System of Indian Medicine*. Vol- II. Delhi: Bharatiya Kala Prakashan, 2006 (Rev. ed.).

Johari, J.C. *Major Modern Political Systems*. Jalandhar: Shobanlal and Co., 2003 (5th Pub.; 1977 1st Pub.).

Kali, Chandra Sekhar(a). *Homiopyāthik(a) Cikitsā-vidhān(a)*. Vol- IV. Kolkata: The Fine Art Press, 1907 (5th ed.).

Kar, Anita. *Birth Defects in India Epidemiology and Public Health Implications*. New Delhi: Springer, 2021 (1sted.).

Kar, Anita. *Birth Defects in India*. Pune: Sprinjer Journals, 2022 (5th ed.).

Kauṭilya. *Arthaśāstra*. Ed. and Beng. trans. Manabendu Bandyopadhyay. *Kauṭilīyam Arthaśāstram*. Vols. I-II. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, (Vol- I, 2014 6th ed.). (Vol- II, 2011 2nd Pub.; 2001 1st Pub.).

______. Ed. T. Ganapati Sastri. *Arthaśāstra of Kauṭilya*. With Eng. trans. N. P. Unni. Delhi: New Bharatiya Book Corporation, 1924 (1st ed.).

Kālidās(a). *Raghubaṁśa*. Ed. Vāsudev(a) Śarmā & Tukārāma Jābajī. with Sans. trans. and own Sans. comm. together with Mallinātha's comm. *Sañjīvinīṭīkā*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parisad, 1961 (1st ed.).

______. Ed. and Sans. trans. Jvālāprasād(a) Miśr(a) with own Sans. comm. Delhi: Modern Book Agency, 1907 (Rpt.).

______. Ed. Kasinath Pandurang Parab. *The Raghuvaṃśa of Kālidāsa with the commentary (the Sañjīvinī) of Mallināth.* New Delhi: Cosmo Publications, 2005 (1st ed.).

Kane, P.V. *History of Dharmasastra*. Poona: Bhandarkar Orient Research Institute, 1941 (1st ed.).

Kar, Parimal Bhusan. *Samājatattver(a) Rūparekhā.* Kolkata: New Central Book Agency Private Limited, 2012 (2nd ed.).

Konigsmark, B.W. *Genetic Hearing Loss with no Associated Abnormalities: A Review Journal of Speech and Hearing Disorder*. Vol- I. New York: American Speech-Language-Hearing Association, 1972 (1st ed.).

Krishnamoorthy, K & S. Jithendra Nath. *A Critical Inventory of Rāmāyaṇa Studies in The World*. Vol- II. New Delhi: Sahity Akademi, 1993 (1st ed.).

Lahiri, Jagadishchandra. *Gr̥ha-Cikitsā*. Kolkata: Lahiri and Co., 1292 B.Y. (1st ed.).

Liṅgapurāṇa. Ed. and Beng. trans. Pañcānana-Tarkaratna. Kolkata: Nababharat Publisher, 1396 B.Y. (1st ed.).

M. Winternitz. *History of Indian Literature*. Vol- I. Kolkata: University of Calcutta, 1927 (1st ed.).

Macdonell, Arthur Anthony. *A Practical Sanskrit Dictionary*. London: Oxford University Press, 1924 (1st ed.).

Mahābhārata. Ed. Kisari Mohan Ganguli. *The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa*. Delhi: Munshiram Manoharial Publishers Pvt. Ltd., 1981 (1st ed.).

______. Ed. Vishnu S. Sukthankar. *The Mahābhārata Critical Edition*. Pune: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1937 (1st ed.).

______. Ed. Biṣṇupada Cakravartī. Kolkata: Ananda Publishers Pvt. Ltd., 2020 (10th Pub.; 1399 B.Y. 1st Pub.).

______. Ed. Haridās(a)-Siddhāntavāgīś(a)-Bhaṭṭācāryya with Beng. trans. and own Sans. comm. *Bhāratakaumudī* together with Nīlakaṇṭha Śarman's comm. *Bhāratabhāvadīpa*. Vols. 1-43. Kolkata: Biswabani Prakashani, 1383 B.Y. (2nd ed.).

______. Ed. Ishvar Chandra Sharma & O. N. Bimali. Delhi: Parimal Publications, 2004 (Rev. ed.).

______. Ed. with Beng. trans. Rajshekhar Basu. Kolkata: M C Sarkar and Sons Pvt. Ltd., 1418 B.Y. (13th Pub.; 1356 B.Y. 1st Pub.).

Mahapatra, Anadi kumar. *Nirvācita Śāsanavyavasthā o Rājanīti*. Kolkata: Suhrid Publication, 1997 (5th Pub.; 1989 1st Pub.).

______. *Tulanāmūlak(a) Rājanīti o Śāsanvyavasthā*. Kolkata: Suhrid Publication, 2012 (5th ed.).

______. *Rājanaitik(a) Samājatattva*. Kolkata: Suhrid Publication, 2007 (2nd ed.).

Majumadar, Jitendranath. *Homiopyāthik(a) Cikitsāsār(a)*. Kolkata: Bilane Indian Press, 1311 B.Y. (1st ed.).

Majumadar, Pratapachandra. *Homiopethik(a) Cikitsā Prakaraṇa*. Vol- II. Kolkata: Indian Press, 1303 B.Y. (1st ed.).

______. *Strī-cikitsā.* Kolkata: Bengal Medical Library, 1915 (2nd ed.).

Mallick, Ramchandra. *Pāṣcāttya Cikitsā Vijñān(a)*. Vol- I. Kolkata: Bijnana Press, 1293 B.Y. (1st ed.).

Mani, Vettam. *Puranic Encyclopedia* : *a comprehensive dictionary with special reference to the epic and Puranic literature*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1975 (1st ed.).

Miles, M. *Disability Care and Education in 19th Century India: Some Dates, Places and Documentation.* Action Aid Disability News, 1994 (1st Pub.).

Mitra, Avishek. *Bhāratīya Rāṣṭracintā Kauṭilya theke Amartya Sen.* Kolkata: Progressive Publishers, 2020 (1st ed.).

Manusaṁhitā. (With Kullūkabhaṭṭa's Commentary). Ed. and Beng. trans. Manabendu Bandyopadhyay. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1419 B.Y. (3rd ed.; 1410 1st ed.).

______. Ed. and Beng. trans. Pañcānana-Tarkaratna & Intro. Manabendu Bandyopadhyay. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1993 (Rev. ed.).

______. Ed. and Beng. trans. Pañcānana-Tarkaratna. Kolkata: Natabar Chakrabarty, 1914 (1st ed.).

Matsapurāṇa. Ed. and Beng. trans. Pañcānana-Tarkaratna. Kolkata: Nababharat Publisher, 1990 (1st ed.).

Mādhabakar(a). *Bhaiṣajyaratnāvalī*. Vols. I-III. Ed. Kālīkiṅkar(a) Senaśarmā & Satyaśekhar(a) Bhaṭṭācāryya with Beng. trans. Govinda Dās(a). Kolkata: Deepayan Publishing House, 2013 (1st ed.).

Mārkeṇḍeyapurāṇa. Ed. and Beng. trans. Pañcānana-Tarkaratna. Kolkata: Nababharat Publisher, 1390 B.Y. (1st ed.).

Max Müller. Ed. *A History of Ancient Sanskrit Literature*. London: Williams and Norgate, 1859 (1st ed.).

Nanda, Bishnupada. *Mānasik(a) Prativandhitā: Jīvavijñān(a) o Cikitsāvijñāngata Dik(a)*. Kolkata: Deep Prakashan, 2009 (2nd ed.).

Pāṇini. *Aṣṭādhyāyī*. Ed. with Beng. trans. Tapan Sankar Bhattacharyya. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2012 (2nd ed.).

Parāśarasmṛti. Ed. K. L. Joshi with Eng. trans. Manmatha Nath Dutt. Delhi: Parimal Publications, 2009 (Rpt.).

Peterson, A. R. *Hearing Loss of Children.* Baltimore: University Park Press, 1977 (2nd ed.).

Pramanik, Nimai. *Sāmājik(a) o Rājanaitik(a) Dhāraṇā o Vicārya Viṣayasamūher(a) Rūparekhā*. Kolkata: Chhaya Prakashani Limite, 2001 (2nd ed.).

Raghavan, V. *The Rāmāyaṇa Tradittion in Asia.* New Delhi: Sahitya Academy, 1980 (1st ed.).

Rāy(a), Rāmakumāra. *Vālmīki Rāmāyaṇa Koṣa.* Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1965 (1st ed.).

______. *Mahābhārata-Koṣa (A Descriptive Index to the Names and Subject in the Mahābhārata)*. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 2011 (1st ed.).

Robinson, M. N. & Rpbinson, B. H. *The mentally retarded child: A Psychological approach*. New York: Mc Graw Hill, 1976 (1st ed.).

Roy, Himanshu & Singh Mahendra, Prasad. *Indian Political Thought Themes and Thinkers*. Delhi: Pearson, 2011 (1st ed.).

Śatapath(a) Brāhmaṇ(a). Vol- I. Ed. and Beng. trans. Vidhuśekhar(a) Bhaṭṭācāryya. Kolkata: Vangiya Sahitya Parishat, 1386 B.Y. (1st ed.).

Śarmā, Hārādhan(a) & Bholānāth(a) Mukhopādhyāy(a). *Cikitsā-Darśan(a)*. Kolkata: Ananta Lal Laha, 1290 B.Y. (2nd ed.).

Śiromaṇi, Prasannacandra. *Cikitsā Jñānāñjana*. Kolkata: Gupta Press, 1282 B.Y. (1st ed.).

Śrīmadbhagabadgīta. Ed. and Beng. trans. Nalinīkānta Brahma with own Sans. comm. together with Madhusūdan(a) Sarasbatī comm. and Beng. trans. *Bhāvaprakāśa*. With Beng. trans. and own Sans. comm. Bhūtanāth(a) Saptatīrtha. Kolkata: Nababharat Publisher, 1393 B.Y. (1st ed.).

Sarkar, Anilaratana. *Vicitra Prathā uVibāha*. Hooghly: Sarkar Book Stall, 2016 (1st ed.).

Sarkar, Vimal. *Mahābhārater(a) Mahāsāgare*. Parts. I-III. Kolkata: Dey's Publishing, (Part- I, 2020 2nd Pub.; 2015 1st Pub.). (Part- II, 2019 1st ed.). (Part- III, 2021 1st ed.).

Sarkar, Sudhirchandra. *Paurāṇik(a) Abhidhān(a)*. Kolkata: M C Sarkar and Sons Pvt. Ltd., 1365 B.Y. (1st ed.).

Sastri, Gaurinath. *An Index to the proper names occurring in Vālmīki's Rāmāyana*. Varanasi: Sampurnananda Sanskrit Vishwavidyalaya, 1984 (1st ed.).

Seervai, H.M. *Constitutional Law of India a Critical Commentary with Supplement*. Bombay: N. M. Tripathi Private Ltd., 1968 (2nd Pub.; 1907 1st ed.).

Sen(a), Vinodalal & Pulinakr̥ṣṇa Sen(a)**.** *Āyurvēda-Vijñān(a)*. Part- IV. Kolkata: Adi Ayurveda Machine Press, 1332 B.Y. (1st ed.).

Sengupta, Debendranath & Upendranath Sengupta. *Āyurvēda Saṅgraha.* Vol- II. Kolkata: Dipayan, 1814 (1st ed.).

Sen, Sujit. *Jātapāter(a) Rājanīti.* Kolkata: Pustak Bipani, 1989 (1st ed.).

Sengupta, Nagendra. *The Ayurvedic System of Indian Medicine*. Vols. I-III. Delhi: Bharatiya Kala Prakashan, 2006 (Rev. ed.).

Shamim, Ahmed. *Mahābhārate Vibāha*. Kolkata: Gangchil, 2015 (1st ed.).

Sharma, Amit Kumar & Ajay Kumar Sharma & Shivali Arora. *Āyurvedīya Rog(a) Vijñānaevam Vikr̥ti Vijñān(a)*. Varanasi: Chaukhambha Visvabharati, 2019 (Rpt.).

Sharma, Ramashraya. *A Socio-political Study of The Vālmīki Rāmāyaṇ(a).* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1971 (1st ed.).

Sharma, Ram Sharan. *Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India.* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 2005 (3rd Rpt. ed.).

Singh, Avadhesh Kumar. *Rāmāyaṇa through the Ages Rāma Gātha in different Versions.* New Delhi: D. K. Printworld Pvt. Ltd. 2007 (1st ed.).

Srinivasa Iyengar, K. R. *Asian Variations in Rāmāyaṇa*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1983 (1st ed.).

Soma, Subhash Candra. *Janapraśāsana o Bhāratīya Praśāsana.* Kolkata: Calcutta Book House, 1995 (1st ed.).

Sorensen. S. *An Index to The Names in The Mahābhārata*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1904 (1st ed.).

Suśratasaṁhitā. Vols. I-III. Eds. Kālīkiṅkara Senaśarmā & Satyaśekhara Bhaṭṭācāryya with Beng. trans. Yaśodānandana Sarakāra. Kolkata: Deepayan Publishing House, 2013 (3rd Pub.; 1406 B.Y. 1st Pub.).

Shukla. S.V. *Short Notes on the Suśratasaṁhitā*. Varanasi: Chaukhambha Orientalia, 2013 (1st ed.).

Teele, D. W. & J.O. Klein & B. A. Rosner. *Epidemiology of otitis media in children.* Vol- II. U.S.A: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 1980 (1st ed.).

The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

Turner, R.L. *A Comparative Dictionary of The Indo-Aryan Languages*. London: Oxford University Press, 1973 (2nd Pub.; 1966 1st Pub.).

Ūnabiṁśati Saṁhitā. Ed. and Beng. trans. Ashok Kumar Bandyopadhyay. Kolkata: Sodesh, 2018 (1st ed.).

Vāgbhaṭṭa. *Aṣṭāṅgahṛdaym*. Vols. I-II. Eds. Kalikinkar Sensharma & Satyashekhar Bhattacharya with Beng. trans. Upendranath Sen & Debendranath Sen. Kolkata: Deepayan Publishing House, (Vol- I, 1426 B.Y. 3rd Pub.; 1406 B.Y. 1st Pub.). (Vol- II, 2015 3rd Pub.; 1407 B.Y. 1st Pub.).

______. Ed. and Eng. trans. K. R. Srikantha Murthy. Vols. I-III, Varanasi: Chowkhamba Krishnadas Academy, 2007 (Rpt.).

Vālmīki. *Rāmāyaṇa*. Ed. Ravi Prakash Arya. *Rāmāyaṇa of Vālmīki.* Delhi: Parimal Publications, 2005 (1st Pub.).

______. Ed. and Beng. trans. Rāmānanda Caṭṭopādhyāy(a). *Saptakāṇḍa Rāmāyaṇa*. Kolkata: Pravasi Karyalaya, 1353 B.Y. (1st ed.).

______. Ed. G.H. Bhatt. *The Vālmīki Rāmāyaṇa Critical Edition.* India: Oriental Institute Baroda, India, 1960 (2nd ed.).

______. Ed. Amareśvar(a) Ṭhākur(a) with Beng. trans. and own Sans. comm. together with Lokanāth(a) Cakrabartī's comm. *Manoharā Ṭīkā*, Govindarāja's comm. *Rāmāyaṇabhūṣaṇa Ṭīkā,* Rāma's comm. *Rāmāyaṇatilak(a) Ṭīkā,* Śivasahāya's comm. *Rāmāyaṇaśiromaṇi Ṭīkā*. Vols. 1-15. Kolkata: Biswabani Prakashani, 2015 (2nd ed.).

______. Ed. and Beng. trans. Dhyāneśanārāyaṇ(a) Cakravartī. Vols. I-II, Kolkata: Tathagata Prakashana, (Vol- I, 1996 1st Pub.). (Vol- II, 1997 1st Pub.).

______. Ed. and Beng. trans. Pañcānana-Tarkaratna. Delhi: Natabar Chakrabarty Publication, 1315 B.Y. (1st ed.).

______. Ed. and Beng. trans. Rajshekhar Basu. Kolkata: M C Sarkar and Sons Pvt. Ltd., 1390 B.Y. (9th Pub.; 1353 B.Y. 1st Pub.).

______. Ed. and Beng. trans. Satakari Mukhopadhyay. Delhi: Parimal Publication, 1998 (2nd ed.).

Vāyupurāṇa. Ed. and Beng. trans. Pañcānana-Tarkaratna. Kolkata: Nababharat Publisher, 1990 (1st ed.).

Viṣṇupurāna. Ed. and Beng. trans. Pañcānana-Tarkaratna. Kolkata: Nababharat Publisher, 1390 B.Y. (1st ed.).

Williams, Monier. *A Sanskrit-English Dictionary*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 2002 (Rpt., 1899 1st Pub.).

Yājñavalkya. *Yājñavalkyasmr̥ti*. Ed. Srisa Chandra with the comm. of Vijñāneśvara's *Mitākṣarā*. Allahabad: Indian Press, 1918 (1st ed.).

Web Links :

https://archive.org/details/internetarchivebooks.

https://www.amarboi.com.

https://www.ebanglalibrary.com.

https://nationallibraryopac.nvli.in.

https://www.nationallibrary.gov.in/SearchIndex.php.

https://en.wikipedia.org/wiki/Shakuni.

https://shodhganga.inflibnet.ac.in.

https://wecapable.com/disability-indian-mythology.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ekalavya.

https://www.yogapedia.com/definition/9087/manthara.

বর্ণানুক্রমিক শব্দসূচি

(গবেষণা-নিবন্ধে উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের নামের তালিকা)

অন্ধকমুনি - ৫, ২০৫, ২৩৬, ২৫৮, ২৭৭, ৩১৫, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫৬

অরুণ – ৫, ৮৫, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৭৫, ১৮৮, ২০১, ২৭৫, ২৮১, ২৮৯, ৩১৪, ৩৫৪

অষ্টাবক্র মুনি – ৫, ১০২, ১০৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৯৯, ৪০১, ৪০৩, ৪০৪

উপমন্যু – ৫, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ৩৫৬, ৪০১

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি – ৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ২০৪, ৩৫০, ৩৯৮, ৪০৪

একলব্য – ৫, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ৩৫৭, ৩৯৯, ৪০৪

কুবের – ৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ২০৫, ২২২, ২২৩, ২২৪, ৩৫১, ৩৫২, ৪০৪

কুশনাভের শতকন্যা – ৫, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ১৩০, ১৩৪, ৩৫১

দীর্ঘতমস্ – ৫, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৭৪, ২০০, ৩৫৪, ৩৯৭, ৩৯৯, ৪০৩, ৪০৪

দ্যুমৎসেন – ৫, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১৭৬, ৩৫৬, ৪০১

ধৃতরাষ্ট্র – ৫, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ২০৫, ২০৬, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৯, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৭, ৪০৪

পৌষ্য – ৫, ১১১, ১১২, ১১৩, ১৬২, ১৬৩, ১৭৭, ৩৫৬

মন্থরা -৫, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ১৩৫, ১৩৬, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ৩৫১, ৩৯৯, ৪০১, ৪০৪

শকুনি -৫, ১১৭, ১১৮, ১৬৫, ১৭৮, ১৯২, ২০২, ২৩৪, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ৩৫৭, ৪০১

শূর্পণখা – ৫, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৭২, ১৯৮, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৯৯